# কৃষি
# জীবাণু বিজ্ঞান



নীলাংশু মুখার্জী

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

# কৃষি জীবাণু বিজ্ঞান

(Agricultural Microbiology)

জীবাণু ঃ প্রকৃতি, জীবন ও পরিবেশ



**ডঃ নীলাংশু মুখার্জী**, এম. এস্‌সি. (এগ্রি.), পিএইচ. ডি.

অধ্যাপক, উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ

বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

KRISHI JIBANU BIJNAN
Dr. Nilangsu Mukherjee



প্রকাশকাল :
জুলাই, ১৯৮৩

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা )
আর্য ম্যান্‌সন্, নবম তল
৬-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা ৭০০ ০১৩

মুদ্রক :
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
জ্ঞানোদয় প্রেস
৫৫বি কবি সুকান্ত সরণি
কলিকাতা ৭০০ ০৮৫

মূল্য : পঁচিশ টাকা

চিত্র এবং প্রচ্ছদ :
শ্রীনির্মল কর্মকার

Published by Prof. Dibyendu Hota, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board, under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Books and Literature in Regional Languages at the University level launched by the Government of India in the Ministry of Education and Social Welfare (Department of Culture), New Delhi.

# ভূমিকা

খাদ্য, বস্ত্র, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য মানুষ নানা উদ্ভিদ ও প্রাণীর যে "স্বার্থপ্রণোদিত" পরিচর্যা করে তাকে বলা যায় কৃষি। কৃষিতে নিত্যনূতন জ্ঞান অর্জন আর লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ অর্থাৎ 'কৃষি-বিজ্ঞান' ও 'প্রযুক্তির' সামগ্রিক পরিধিটা বিরাট। এর বিভিন্ন স্তরে জীবাণুর প্রভাব ও প্রয়োগের শেষ নেই। এর সাথে জিজ্ঞাসু মানুষের কিছুটা পরিচয় ঘটানো ছিল এই বই লেখার উদ্দেশ্য।

বই নাকি লেখকেরই ছায়া। ছায়া কতটা স্পষ্ট হবে তা নির্ভর করে "আলোর" সার্থক ব্যবহারে। জীবাণু বিজ্ঞানের আঙিনায় অনেক "আলো" সৃষ্টি হয়েছে। কতটা ব্যবহার করতে পেরেছি সেটাই বিচার্য। লেখার সময় মনে হয়েছে জীবাণু বিজ্ঞানের অগ্রগতির চাকাটা ক'টা বছর থামিয়ে রেখে লেখাটা শেষ করি। কিন্তু তা হয়নি।

ইংরাজী ভাষায় এ বিষয়ে বই-এর সংখ্যা কম নয়। কোন ভারতীয় ভাষায় কৃষি-জীবাণু-বিজ্ঞানের বই হয়তো এটাই প্রথম। মনে হয় এ বই উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃষি ও জীবন বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাজে লাগবে। এছাড়া বিরাট আগ্রহী জনসমাজকে কিছুটা আকৃষ্ট করতে পারলেও ধন্য হব। বইতে ব্যবহৃত পরিভাষাগুলি বিদ্বজনের অনুমোদন সাপেক্ষ। বইতে বেশ কিছু ত্রুটি থাকা সম্ভব। তাই ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষকদের সমালোচনা আমি কামনা করি। তাতেই আমার ত্রুটি সংশোধন হবে। অধ্যাপক শঙ্কর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক দিব্যেন্দু হোতা ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদের উপদেশ ও উৎসাহ

একাজে অন্যতম সম্পদ হয়েছে। জ্ঞানোদয় প্রেসের শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আন্তরিকতাও কাজটি সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

বই লেখার মূল উৎসাহ এসেছে আমার বিরাট ছাত্রদলের অদম্য জানার ইচ্ছা থেকে। পারিবারিক সহনশীলতা ও সহযোগিতা ছাড়া এ লেখা শেষ হত না।

২৭শে আষাঢ়, ১৩৯০

বি-১১/৩৮ কল্যাণী — নীলাংশু মুখার্জী

নদীয়া

## উৎসর্গ

আমার বাবা প্রয়াত বিভূতিভূষণ মুখার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে ও
মা শ্রীমতি সুষমা মুখার্জীকে—

নী. মু.

# সূচীপত্র

# এক

# জীবাণু পরিচিতি ও জীবাণু বিজ্ঞানের ইতিহাস
## (Introduction and history)

"গল্পটার সুরু সম্পর্কে আমাদের একটা ধারণা
থাকলেও প্রথম পাতাগুলো পড়তে পারছি না।"
—এইচ. জি. ওয়েলস।

### ১·১১ জীবাণুর পরিচয়

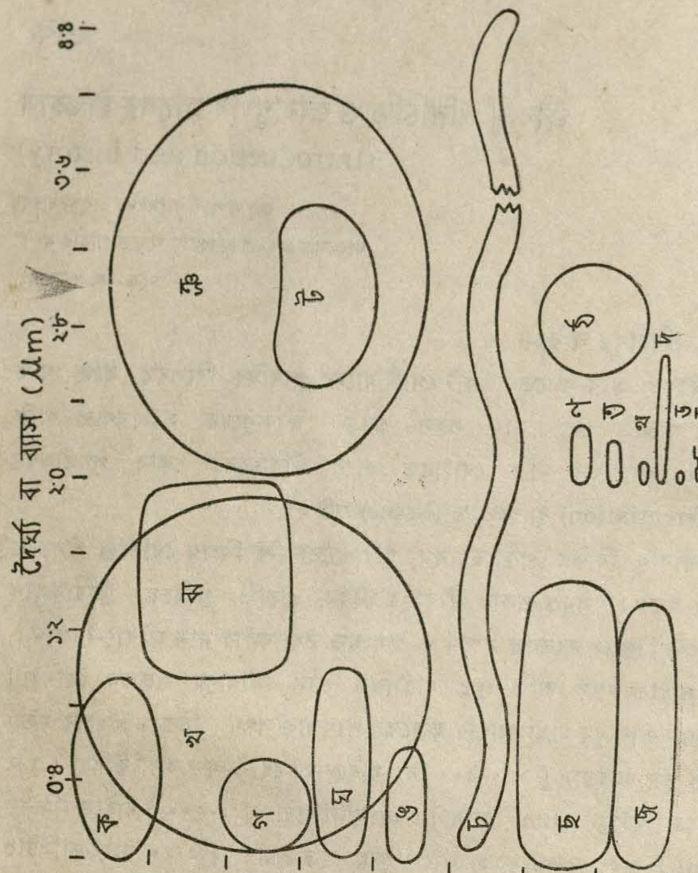
জীবাণু জীব-জগতের একটি গোষ্ঠী যাদের প্রাথমিক বিশেষত্ব হচ্ছে অতি ক্ষুদ্র আকৃতি ও আপাত সরল গঠন। জীবাণুদের সাধারণতঃ খালি চোখে দেখা যায় না। গোষ্ঠীগত ভাবে জীবাণুদের কোষ পৃথগীভবন (differentiation) বা 'কলা'র (tissue) সৃষ্টি হয় না।

জীবাণু বিভিন্ন প্রকারের হয়, যার প্রত্যেকটিই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে অপরটির থেকে স্বতন্ত্র। সমস্ত প্রকার জীবাণুর জীবন, প্রকৃতি, পরিচয়, ক্রিয়াকলাপ ও শ্রেণী বিন্যাস সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ও সুসংহত তথ্যাবলীর নাম জীবাণু-বিজ্ঞান।

সাধারণভাবে অতি ক্ষুদ্র শারীরিক গঠন জীবাণুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিভিন্ন জীবাণুর মধ্যে আবার ক্ষুদ্রত্বের পার্থক্যও লক্ষ্য ( চিত্র-১ ) করার মত। অতি ক্ষুদ্র ভাইরাস [ ১৫০-৩০০ মি. মাইক্রন ] থেকে ক্ষুদ্র ব্যাক্টিরিয়া ( ১-২ মাইক্রোমিটার (μm) ব্যাস ], প্রোটোজোয়া [ ২-৮০০ মাইক্রোমিটার (μm) ] এবং তুলনামূলক ভাবে অল্প ক্ষুদ্র ছত্রাক [ ৫-১০ মাইক্রোমিটার (μm) ব্যাস ] ও শৈবাল [ ৩—৩০ মাইক্রোমিটার (μm)] ইত্যাদি গোষ্ঠীর প্রতিটি উপগোষ্ঠীতেই আকারের বিভিন্নতা প্রকট। কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দর্শনযোগ্য এই জীবাণু গুলির আকৃতি ও পরিমাপের বৈসাদৃশ্য প্রায় অসীম।

### ১·১২ জীব জগতে জীবাণুদের স্থান ঃ

জীবজগতে জীবাণুদের অবস্থান সম্পর্কে নানা মত রয়েছে। জার্মানীর উদ্ভিদ ও প্রাণীবিজ্ঞানী যথাক্রমে শ্লাইডেন এবং শোয়ান ( Schleiden and Schwann) ১৮৩৮ সালেই বলেছিলেন যে সমস্ত জীবের শরীর কোষ (cell) দ্বারা গঠিত। দেখা গেল বেশীরভাগ জীবের শরীরই একাধিক কোষ দ্বারা




চিত্র ১ : জীবাণু পরিচিতি

ক—ঈষ্ট , খ—স্ট্রেপটোকক্কাস, গ—স্টেপটোমাইসেস, ঘ—মাইকো-ব্যাক্টিরিয়াম, ঙ—জান্থোমোনাস, চ—ট্রেপনেমা, ছ—সিউডো-মোনাস, জ—ব্যাসিলাস, ঝ—নাইট্রোসোমোনাস, ঞ—অ্যাজটো-ব্যাক্টর, ট—ক্লোরোবিয়াম, ঠ—স্টাফাইলোকক্কাস, ড—কুকামবার মোসেক ভাইরাস, ঢ—টি-৪ ব্যাক্টিরিওফাজ, ণ—রিকেটসিয়া, ত—মাইকোপ্লাসমা, থ—বার্লিস্ট্রাইপ ভাইরাস, দ—পটাটো ভাইরাস-y

গঠিত। জ্ঞানের এই স্তরে এককোষী জীবাণুগুলি স্বভাবতঃই বিস্ময় ও সমস্যার সৃষ্টি করল। অপরদিকে কোষ সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ করার ক্ষেত্রে এই জীবাণু কোষগুলি সহায়ক হ'ল। সমগ্র জীবজগৎ একই ধরনের কোষ দ্বারা গঠিত হলেও এদের কোষগুলির স্বাতন্ত্র্যও বিস্ময়কর।

জীববিজ্ঞানীরা প্রাথমিক ক্ষেত্রে জীবজগতের দুটি বিভাগ করেন যথা প্রাণীজগৎ (Animal kingdom) ও উদ্ভিদজগৎ (Plant kingdom)। এই বিভাজনের ভিত্তি ছিল দুটি জগতে কোষের স্বাতন্ত্র্য, যার মধ্যে প্রাণীকোষে কোষ প্রাচীরের অভাব বা উদ্ভিদকোষে ক্লোরোপ্লাষ্ট-এর উপস্থিতি ইত্যাদি অন্যতম।

জার্মান-বিজ্ঞানী হেকেল (Haeckel) ১৮৬৬ সালে জীবাণুদের জন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আর একটি জগৎ—যথা জীবাণুজগৎ বা প্রটিষ্টা (Protista)-র প্রস্তাব করেন। এককোষী, বহুকোষী, স্বজীবি, পরজীবি, সঞ্চরণক্ষম (motile) ও সঞ্চরণে অক্ষম (non-motile) সবরকম জীবাণুই এই জীবাণুজগতে রাখা হল। এসময় অবশ্য ভাইরাসগুলি আবিষ্কৃত হয় নি। বর্তমানে প্রটিষ্ট (Protist (s) ) বলতে প্রকৃতিতে বসবাসকারি সমস্ত জীবাণু ও ভাইরাসদের বোঝায়।

জীবাণুজগতেও স্বতন্ত্র প্রকৃতির কোষ দেখা যায়। দুই প্রকার কোষ যথা প্রোক্যারিওট বা সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত ও ইউক্যারিওট বা অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত ( পরে আলোচিত হবে ) জীবাণুদের মধ্যে দেখা যায়। বিজ্ঞানী হোয়াইটেকার (Whitaker) এই ভিত্তিতে যে সব জীবাণুর অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত কোষ রয়েছে তাদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র জগৎ 'মনেরা' (Monera) গঠনেরও প্রস্তাব করেন। তবে সমগ্র জীবাণু গোষ্ঠীকে একটি জগৎ যথা জীবাণু-জগতে (Protista) রাখার ধারণা অধিকতর গ্রহণযোগ্য হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র অসম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস যুক্ত জীবাণুগুলিকেই ইদানীং ( ১৯৭৩ ) প্রোক্যারিওট ( Procaryotae ) বলাহয়।

**১·১৩ দৈহিক গঠন অনুসারে জীবাণুদের শ্রেণীবিভাগ :**

সমগ্র জীবাণুজগতের সমস্ত জীবাণুগুলিকে প্রাথমিক পর্যায়ে দু'টি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, যথা কোষযুক্ত জীবাণু ও জীবাণু-কণা। ভাইরাস বা জীবাণু কণা বা কোষহীন জীবাণু (viruses) :

যে সমস্ত জীবাণুর গঠনে সম্পূর্ণ একটি কোষও সংগঠিত হয় নাই তাদের জীবাণু-কণা বা ভাইরাস (virus) বলা হয়। এই জীবাণুগুলির গঠনে শুধুমাত্র সংখ্যাবৃদ্ধিকারী নিউক্লিক অম্ল অংশ একটি প্রোটিন খোলসে ঢাকা থাকে। জীবাণু জগতে এই ভাইরাস বা জীবাণুকণাগুলি ক্ষুদ্রতম। এদের আলোক-নির্ভর অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না, দেখা যায় ইলেকট্রন-নির্ভর অণুবীক্ষণ যন্ত্রে।

## কোষযুক্ত জীবাণু :

বেশীর ভাগ জীবাণুই কোষযুক্ত। এক বা একাধিক কোষের দ্বারা এদের শরীর গঠিত হয়। এইসব জীবাণু আলো-নির্ভর অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায়।

কোষযুক্ত জীবাণুগুলিকে তাদের নিউক্লিয়াসের (nucleus) প্রকৃতি অনুযায়ী দুটি উপগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক চাটন (Chaton) ১৯৩৭ সালে প্রথম এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন এবং বর্তমানে তা সর্বজনস্বীকৃত। গোষ্ঠী দুটির নাম সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত বা ইউকারিওট (Eucaryote) এবং অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত বা প্রোকারিওট (Procaryote)।

### (ক) অসম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত বা প্রোকারিওট (Procaryote) :

গঠন প্রকৃতি ও ক্রিয়াকলাপের দিক দিয়ে জীবাণু-কণার (virus) থেকে কোষযুক্ত জীবাণুগুলি অনেক বেশী জটিল। কোষযুক্ত জীবাণুর মধ্যে এই গোষ্ঠীর জীবাণুর কোষের গঠনে কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। এই সব জীবাণুর নিউক্লিয়াস (nucleus) কোন আবরণ দ্বারা ঢাকা থাকে না ; ফলে নিউক্লিও-প্লাজম (nucleoplasm) ও সাইটোপ্লাজম (cytoplasm) স্বতন্ত্রীভূত নয়। কোষের অন্যান্য অঙ্গ (organelle) গুলিও কোন একক আস্তরণে (unit membrane) ঢাকা নয়। এসমস্ত জীবাণুকোষে রাইবোজোম (Ribosome) সাধারণতঃ ৮০ এস না হ'য়ে ৭০ এস হয়। এছাড়া এ জাতীয় জীবাণুর আরো যে সব বৈশিষ্ট্য থাকে তার মধ্যে স্বতন্ত্র ভৌত ও রাসায়নিক প্রকৃতি যুক্ত কোষ আবরণ (cell wall), বহু ক্ষেত্রে শুঙ্গ (flagella), গ্যাস-ভ্যাকুওল (gas vacuole) প্রভৃতির অস্তিত্ব লক্ষণীয়। অন্যদিকে যথার্থ ভাবে গঠিত মাইটোকণ্ড্রিয়া (mitochondria) এজাতীয় জীবাণুকোষে থাকে না।

এই গোষ্ঠীভুক্ত জীবাণুর মধ্যে বহু জীবাণুর অন্য আরও অনেক রকমের

অসম্পূর্ণতা দেখা যায়। ব্যাক্টিরিয়া, অ্যাক্টিনোমাইসিট ও নীল-সবুজ শৈবাল-দের (Blue green algae) সাধারণতঃ এই গোষ্ঠীভুক্ত জীবাণু ধরা হয়।

**(খ) সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবাণু বা ইউকারিওট** (Eucaryote) **:**

এই গোষ্ঠীভুক্ত জীবাণুর কোষের নিউক্লিয়াস সম্পূর্ণ ভাবে গঠিত কোষ অংগ হিসাবে থাকে। উন্নত জীব-প্রাণী বা উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কোষে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র এরূপ সম্পূর্ণভাবে গঠিত থাকে। এইসব জীবাণুর কোষকেন্দ্র যথাযথ কেন্দ্র-আস্তরণে (nuclear membrane) ঢাকা থাকার জন্য কেন্দ্ররস ও কোষরস আলাদা ভাবে অবস্থান করে। এদের অন্যান্য কোষ-অংগগুলিও একক আস্তরণে ঢাকা থাকে। রাইবোজোমগুলি প্রধানতঃ ৮০এস জাতের হয়। ছত্রাক, শৈবাল, প্রোটোজোয়া, আঠাল ছত্রাক প্রভৃতি এজাতীয় জীবাণুদের অন্যতম।

উপরোক্ত দুই গোষ্ঠীভুক্ত জীবাণু ও জীবাণুকণা বা ভাইরাস এর বৈশিষ্ট্যের একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হল। (সারণী-১)

**সারণী ১ঃ জীবাণুকণা, অসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবাণু**

| বৈশিষ্ট্য | জীবাণুকণা | কোষযুক্ত জীবাণু | |
|---|---|---|---|
| | | অসম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত | সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত |
| কোষ | নাই | আছে | আছে |
| কোষের মাপ | — | ০·৩-২·০(μm) মাইক্রোমিটার | ২-২০ (μm) মাইক্রোমিটার |
| সংখ্যাবৃদ্ধি | করে | করে | করে |
| কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস | — | আস্তরণহীন | আস্তরণযুক্ত |
| ক্রোমোসম সংখ্যা | একটি | ১-৪ একই প্রকৃতির | একাধিক স্বতন্ত্র প্রকৃতির |
| ক্রোমোসমে হিষ্টোন | থাকে না | থাকে না | থাকে |
| সমবিভাজন (mitosis) | সে অর্থে হয় না | সে অর্থে হয় না | হয় |

| বৈশিষ্ট্য | জীবাণু-কণা | কোষযুক্ত জীবাণু | |
|---|---|---|---|
| | | অসম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত | সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত |
| কোষরসের প্রবাহ | — | হয় না | হয় |
| যৌনতা (নিষেক ক্রিয়া) | — | নিষেক ও অন্য আরও পদ্ধতিতে | শুধু নিষেকক্রিয়া |
| নিষিক্ত ডিম্বাণুর প্রকৃতি | — | অসম্পূর্ণ নিষিক্ত | ডিপ্লয়েড |
| অন্য কোষ অংগ | — | সেই অর্থে নাই | আছে |

গোষ্ঠীগত ভাবে এই বিশেষত্বগুলি ছাড়াও একমাত্র জীবাণুকণা ছাড়া অন্য দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন উপগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগুলি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। এই সমস্ত জীবাণুর বৈশিষ্ট্যগুলির একটি তুলনামূলক প্রারম্ভিক মূল্যায়ন পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল। (সারণী-২)।

## ১·১৪ খাদ্য গ্রহণের রীতি অনুযায়ী জীবাণুদের শ্রেণীবিভাগ :

খাদ্য গ্রহণের রীতি অনুযায়ী জীবাণুদের কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ খাদ্য প্রকৃতির উপর জীবাণুর নির্ভরশীলতা অনুযায়ী দুটি মূল গোষ্ঠীর চিন্তা করা হয়। স্বভোজী বা অটোট্রফ (Autotroph) অর্থাৎ যারা সম্পূর্ণ অজৈব, খনিজ খাদ্যের উপর নির্ভর ক'রে বেঁচে থাকতে পারে। এরা বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড বা মৃত্তিকা ও জলের বিভিন্ন কার্বনেট জাতীয় খনিজ লবণ থেকে কার্বন-কে ব্যবহার করে। অন্য বৃহৎ গোষ্ঠীটি এরকম শুধুমাত্র অজৈব খনিজের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে পারেনা। এদের বেঁচে থাকার জন্য কিছু জৈব রাসায়নিকও লাগে। এদেরই বলা হয় পরভোজী বা হেটারোট্রফ (Heterotroph)। জীবাণুগুলিকে যদিও এত সহজে স্বতন্ত্র দুটি গোষ্ঠীবদ্ধ করা যায়না তবু এই গোষ্ঠী দুটির ধারণা জীবাণুদের খাদ্য নির্ভরতা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেয়। খাদ্য ব্যবহারের প্রকৃতি অনুযায়ীও জীবাণুগুলিকে গোষ্ঠীবদ্ধ করা সম্ভব। নীচের তালিকাতে এটা বোঝা যাবে।

| খাদ্য উৎস | জীবাণুগোষ্ঠী | |
|---|---|---|
| (জীবাণুগোষ্ঠী) | রাসায়নিক শক্তি উৎস | আলো-শক্তি উৎস |
| অজৈব খাদ্য (লিথোট্রফ) | কেমোলিথোট্রফস (chemolithotrophs) : হাইড্রোজেন ব্যাকটিরিয়া রঙহীন গন্ধক ব্যাকটিরিয়া লৌহ ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোজেন জারক ব্যাকটিরিয়া | ফোটোলিথোট্রফস (photolithotrophs) শৈবাল সবুজ গন্ধক ব্যাকটিরিয়া বেগুনী গন্ধক ব্যাকটিরিয়া |
| জৈব খাদ্য (অর্গানোট্রফ) | কেমোঅর্গানোট্রফস (chemo-organotrophs) ছত্রাক, প্রোটোজোয়া, বেশীর ভাগ ব্যাকটিরিয়া এবং ভাইরাস | ফোটোঅর্গানোট্রফস (photo-organotrophs) বেগুনী ব্যাকটিরিয়া (গন্ধক নির্ভর বাদে) |

জৈব খাদ্য নির্ভর কেমোঅর্গানোট্রফ গোষ্ঠীর জীবাণুগুলির মধ্যেও আবার দেখা যায় জৈব খাদ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী দুটি গোষ্ঠী। এরা সকলেই জৈবখাদ্য নির্ভর হলেও একদল জীবাণু মৃত জীবদেহ জাত জৈব পদার্থের (dead organic matter) উপর বৃদ্ধি পায় ও জীবন ধারণ করে। এদের বলা হয় সাপ্রোফাইট বা মৃতজীবি (Saprophyte বা saprobes)। গ্রীক শব্দ 'সাপ্রোস' বা মৃত এবং 'বায়স' বা জীবন (sapros—rotten +bios= life) মিলে এ শব্দের উৎপত্তি। মৃত জৈব পদার্থে জীবন ধারণ করে এই যে জীবাণুগোষ্ঠী এদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আবার মৃত জৈব পদার্থ ব্যতিরেকে বাঁচেই না, বিশেষতঃ জীবিত জীবের সংস্পর্শে। এদের বলা হয় অবলিগেট সাপ্রোবস (Obligate saprobes)। অন্যদিকে যে সমস্ত কেমোঅর্গানোট্রফ জীবাণু জীবিত জীবদেহ আক্রমণ ক'রে তার দেহ থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তাদের বলাহয় প্যারাসাইটস বা পরজীবি (Parasites)। পরজীবি জীবাণু-গুলির মধ্যেও আবার একটি গোষ্ঠী শুধুমাত্র জীবিত জীবদেহেই জীবন ধারণে সক্ষম। তাদের বলাহয় অবলিগেট প্যারাসাইট বা দায়বদ্ধ পরজীবি

(Obligate parasites)। এছাড়া এদের মধ্যবর্তী বিশেষত্বযুক্ত যে বিরাট জীবাণুগোষ্ঠী রয়েছে তাদের সাধারণভাবে ননঅবলিগেট বা দায়হীন (non-obligates) বলা গেলেও যেগুলি প্রাথমিক ভাবে পরজীবি কিন্তু অবস্থা বুঝে মৃতজীবি হতে পারে তাদের বলা হয় ফাকালটেটিভ সাপ্রোফাইট(Facultative saprophyte) আর যারা প্রাথমিক ভাবে মৃতজীবি এবং সুযোগ বুঝে পরজীবি হতে পারে তারা ফাকালটেটিভ প্যারাসাইট (Facultative parasite)। মোটামুটি এই বৃহৎ গোষ্ঠীর জীবাণুগুলি অবস্থা মত নিজেদের খাদ্য উৎসের প্রকৃতি পরিবর্তনে সক্ষম।

## ১·১৫ প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবাণুদের স্থান ঃ

জীবাণুর অবস্থান, বসবাস বা তার ক্রিয়াকলাপ কি পরিস্থিতিতে, কেমন ভাবে নির্ধারিত ও চালিত হ'বে তা বহু বস্তু ও কারণের উপর নির্ভরশীল। বাসস্থান, বা পোষক জীবের বিশেষত্ব, পরিবেশ, স্থানীয় আবহাওয়া এবং সর্বোপরি অন্য জীবাণুর প্রাদুর্ভাব ও প্রভাবের উপর ইহা বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল, জীবাণুর শারীরিক গঠন বিশেষত্ব ছাড়াও তার দলবদ্ধ আচরণ বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়া-কলাপ এবং তা থেকে উদ্ভূত ফলাফল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানই জীবাণুর পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। প্রকৃতিতে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জীবাণু-গোষ্ঠীর (Population) সম্মিলনে যে 'বৃহৎ-গোষ্ঠী' (Community) সৃষ্টি হয় তা সামগ্রিক ভাবে একটি অত্যন্ত জটিল ও প্রভাবশালী পরিস্থিতিতে পরিণত হয়।

## ১·২০ জীবাণু বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের ইতিহাস ঃ

জীবাণুর অভিব্যক্তি সম্ভবতঃ জীবের অভিব্যক্তির অত্যন্ত প্রাথমিক স্তরের অর্থাৎ প্রায় ৫—৬ $\times$ ১০$^{৯}$ বৎসর এরও বেশী পুরাতন ঘটনা। অবশ্য জীবাণু বিজ্ঞানের চর্চা সুরু হয়েছে তার বহু পরে। প্রাথমিক ভাবে এর কারণ জীবাণুর ক্ষুদ্রতা।

জীবাণু সংক্রান্ত চর্চার জন্য আতসকাঁচ (lens) বা অণুবীক্ষণ যন্ত্র (microscope) আবিষ্কারের প্রয়োজন ছিল। জীবাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার পরই এর সম্পর্কে চর্চা ও গবেষণা অতি দ্রুত অগ্রসর হয়েছে, এবং ইদানীং কালে দ্রুত অগ্রসরমান বিজ্ঞানগুলির অন্যতম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবাণু বিজ্ঞানের বৃদ্ধি ও উন্নতিতে প্রাথমিক ভাবে চারটি বিষয়ের অবদান অত্যন্ত অধিক। বিষয়গুলি যথাক্রমে (১) অণুবীক্ষণের আবিষ্কার, (২) স্বতজাত জীব সৃষ্টির প্রকল্প সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, (৩) গাঁজানো ও পচনক্রিয়ার জৈব-কারণ প্রকল্পের আবিষ্কার ও স্বীকৃতি এবং (৪) প্রাণী—বিশেষতঃ মানুষের রোগের কারণ হিসাবে জীবাণুর আবিষ্কার। পরবর্তীকালে আরও বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কৃত হলেও জীবাণু বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ও উন্নতির প্রাথমিক স্তরে উপরিউক্ত কারণগুলি জীবাণু বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক গতি ও পথ নির্ধারণের মূল স্তম্ভ হিসাবে স্বীকৃত।

## ১·২১ অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ববর্তী যুগ ঃ

খৃষ্টপূর্ব ৭৫ শতাব্দী থেকে লুক্রেসিয়াস (Lucretius), ভ্যারো (Varo) ইত্যাদি দার্শনিকরা বিভিন্ন সময় প্রকৃতিতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র জীবের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই ধরনের চিন্তা মানুষকে বহুদিন ধরে প্রভাবিত করেছে। ১২০০ খৃষ্টাব্দে রজার বেকন (Roger Bacon) বা ১৭৬২ সালে ফন প্লেনসিজ von Plensij) প্রভৃতি দার্শনিকেরা এজাতীয় সূক্ষ্মজীবাণুর কথা বললেও প্রমাণ করতে অসমর্থ হন। ভৌত বিজ্ঞানীরাও এই সময় আতস কাঁচ তৈরীর গবেষণাতে লিপ্ত ছিলেন। ৬৩ সালে বিজ্ঞানী সেনেকা (Seneca) আতস কাঁচ আবিষ্কার করলেন। পরে দশম শতকে আলহাজান (Alhajan) এর উন্নতি সাধন করেন, সপ্তদশ শতকে মহাবিজ্ঞানী গ্যালিলিও (Galileo) আতস কাঁচ যথেষ্ট উন্নত ক'রে অণুবীক্ষণ আবিষ্কারের পথ প্রশস্ত করেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে জাকারিয়াস জানসেনই (Z. Janssen) সম্ভবত চশমা তৈরি করার সময় প্রথম অণুবীক্ষণ যন্ত্র প্রস্তুত করেন (১৫৯০ সাল)। গ্যালিলিও (১৬১০) ও একটি উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করেন। অণুবীক্ষণকে এসময় প্রাণীর বিভিন্ন অংশ পরীক্ষার্থে ব্যবহার করলেন ম্যালপিঘি (Malpighi, ১৬২৬—১৬৯৪)। রবার্ট হুক (Robert Hooke, ১৬৩৫—১৭০৩) অণুবীক্ষণ তৈরি ক'রে ব্যবহার করেন মূলতঃ কোষ সংক্রান্ত গবেষণাতে, যদিও কিছু জীবাণু সম্পর্কেও (Mould) তিনি সামান্য তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। পরবর্তী কালে ঐ জীবাণুকে **মিউকর** (Mucor) ছত্রাক বলে জানা গেছে।

### ১·২২ জীবাণুর আবিষ্কার ও প্রমাণ ঃ

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি হলাণ্ডের ডেলফ্ (Delft) শহরে টাউনহলের তদারককারী এন্টনী ফন লীউভেনহোক (Antony van Leeuwenhoek, ১৬৭৬) নামক এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি অবসর সময় ফিতা, বোতাম ইত্যাদি বিক্রি করতেন। তিনি আতস কাঁচ তৈরি করতে করতে একসময় অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করলেন। শুধু তাই নয়, এই যন্ত্রের সাহায্যে তিনি আবিষ্কার করলেন অদৃশ্যপূর্ব এক নতুন জগৎকে। বহু শ্রমসাধ্য গবেষণা মাধ্যমে তিনি যে ক্ষুদ্র জীবদের কথা ঘোষণা করলেন 'কীটাণু' বা 'অ্যানিমালকিউল (animalcule) নাম দিয়ে সেগুলিই 'ব্যাক্টরিয়া' বলে সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে। মৌমাছির শুঁড়, বিভিন্ন ধরনের জল, পচনশীল উদ্ভিদ ইত্যাদি বহু সংখ্যক বস্তু অণুবীক্ষণে পরীক্ষা ক'রে বর্তুল, দণ্ড আবর্ত প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির জীবাণুর সচিত্র পরিচিতি, যা তিনি সেইযুগে সংগ্রহে সমর্থ হয়েছিলেন তা সত্যই নিখুঁত এবং বিস্ময়কর। তাঁর এই অবদান যথা— "জীবাণু জগতের সাথে মানুষকে পরিচিত করানোর সাফল্য" তখনকার রয়াল সোসাইটি, ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস, রাশিয়ার জার দ্বিতীয় পিটার প্রভৃতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। জ্ঞানবিজ্ঞানের অগ্রগতির সেই স্তরে তাঁর গবেষণা ও আবিষ্কার যে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল তা বোঝা যায় যখন দেখা যায় পরবর্তী আরও ১০০ বৎসর কাল ব্যাক্টিরিয়া সংক্রান্ত কোন গবেষণা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

অষ্টাদশ শতকে মূলার (Muller) এই জাতীয় জীবাণুর গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী কয়েকটি নামকরণ করেন, তার মধ্যে **ব্যাসিলাস** (Bacillus), **ভিব্রিও** (Vibrio) এবং **স্পাইরিলাম** (Spirillum) অন্যতম, অন্যদিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের যে সব উন্নতি হয় তার মধ্যে ডোলাণ্ড (Dolland) (১৭৮৪) এর অতি ক্ষুদ্র জীবাণু দেখার জন্য শক্তিশালী তৈল-সিক্ত আতস কাঁচ (oil immersion lens) আবিষ্কার অন্যতম। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এরেনবার্গ (Ehrenberg) এই জীবাণুগুলির শ্রেণী বিন্যাস এর চেষ্টা করেন। যে চারটি গণের নাম তিনি প্রস্তাব করেন সেগুলি হচ্ছে **ব্যাক্টিরিয়াম** (Bacterium), **ভিব্রিও, স্পাইরিলাম ও স্পাইরোকিটি** (Spirochete)। ব্যাক্টিরিয়াম শব্দটি জীবাণু বিজ্ঞানে এইভাবে প্রথম

ব্যবহৃত হল একটি 'গণকে' বোঝাতে। এই সময় জার্মানীতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের কনডেনসার (condenser) আবিষ্কার করেন আবে (Abbe, ১৮৪০-১৯০৫)। জার্মানীতে কার্ল জাইস জেনা (Carl Zeiss Jena) গবেষণাগারে প্রথম রঙমুক্ত (achromatic) আতস কাঁচও তৈরী হল। ঠিক এই সময় বিখ্যাত জীবাণু বিজ্ঞানী ফার্দিনাণ্ড কন (F. Cohn) জীবাণু সংক্রান্ত অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। এই গবেষণাপত্রগুলি আধুনিক ব্যাক্টিরিয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে। জীবাণুর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও যথার্থ পরিচিতি তাঁর গবেষণা থেকে বোঝা যায়। সর্বোপরি জীবাণুর প্রথম ব্যবহার্য শ্রেণীবিন্যাস তিনিই তৈরি করেন।

## ১·২৩ মৃতজাত ও স্বতজাত প্রকল্পের যুগ

(Spontaneous generation and germ theory) :

গ্রীক দার্শনিকরা বহুদিন ধরে বিশ্বাস করতেন যে মৃত বস্তু থেকে জীব সৃষ্টি হতে পারে। অ্যারিষ্টটল (Aristotle) ও বলতেন শুষ্ক বস্তু আর্দ্র এবং আর্দ্র বস্তু শুষ্ক করলে জীবের সৃষ্টি হয়। এই ধারণার সৃষ্টি হয় ঢাকা মাংসের উপর মাছির কীড়ার 'হঠাৎ' আবির্ভাব ইত্যাদি ঘটনার যথাযথ বিশ্লেষণে অসামর্থ্য থেকে। মৃতজাত প্রকল্পের সমর্থকগণ 'ইঁদুর সৃষ্টি' (হেলমন্ট, Helmont) 'মাছির জন্ম' ইত্যাদি পরীক্ষা ক'রে প্রথম প্রথম প্রমাণ করতেন। ফ্রানসিসকো রেডি (F· Redi ১৬২৬-১৬৭৭) জালের সাহায্যে মাংস ঢেকে রেখে দেখালেন যে মাংসে মাছি ডিম পাড়তে না পারলে মৃত মাংস থেকে মাছি সৃষ্টি হচ্ছে না। এভাবে তিনিই মৃতজাত প্রকল্পের বিরুদ্ধে স্বতজাত প্রকল্পের (germ theory) প্রস্তাব করলেন। জন নীঢাম (Needham, ১৭০৩-১৭৮১) ও বাফন (Buffon) মাংসর পচনক্রিয়া থেকে প্রস্তাব করলেন মৃত মাংস থেকে জীবাণু সৃষ্টির। পওচেট (Pouchet) এই প্রকল্প সমর্থন করলেন। কিন্তু বেশ কিছু বিজ্ঞানী যেমন স্পালানজানি (Spallanzhani, ১৭৭৭), শুলজ (Schulje, ১৮৩৬) শোয়ান (Schwann)১৮৩৭), শ্রডার (Schroeder, ১৮৪১), ফন ডুশ von Dusch, ১৮৫৪) ও অন্য অনেকে মাংসকে নির্বীজ (sterile) কাঁচপাত্রে (flask) রেখে, ফুটিয়ে, তারমধ্যে উত্তপ্ত নল দিয়ে পরিস্রুত বাতাস পাঠিয়ে দেখালেন যে মাংসের ব্যাক্টিরিয়া জনিত পচন বন্ধ থাকছে। এ সমস্ত পরীক্ষা মৃতজাত প্রকল্পের অসারত্ব প্রমাণ করলেও সাধারণ মানুষকে এটা বোঝানর

জন্ম মহাবিজ্ঞানী লুই পাস্তরের (Louis Pasteur. ১৮২২-১৮৯৫) আবির্ভাব ও এই গবেষণাতে অংশগ্রহণ প্রয়োজন ছিল। পাস্তর টারটারেট (Tartarate) এর ভৌত ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণার পর ফ্রান্সদেশে লিলে (Lille) তে অধ্যাপক হিসাবে কাজে যোগ দেন। এরপর জীবাণু বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে গবেষণা ক'রে ও বক্তব্য রেখে অল্পদিনেই যশস্বী হলেন। হাঁসের মত দীর্ঘ গলদেশ যুক্ত কাঁচপাত্রে (swan neck flask) মাংস ফুটিয়ে উত্তপ্ত অবস্থাতে পাত্রের মুখ গলিয়ে বন্ধ করে নিশ্চিতভাবে মৃতজাত প্রকল্পের অসারত্ব প্রমাণ করলেন এবং এ ব্যাপারে জীবাণুর বৈশিষ্ট্যের কথাও ব্যাখ্যা করলেন। বাতাসে এই সমস্ত জীবাণুর অবস্থান ও এই ধরনের পচনে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা জন টিন্ডালের (J. Tynda l. ১৮৭৮) বাষ্প পরীক্ষার দ্বারা সাধারণের বোধগম্য হল। পাস্তর বাতাসস্থিত জীবাণু দ্বারা দূষণের (contamination) থেকে আঙ্গুর রসকে মুক্ত করার জন্ম ১৪৫° ফা উষ্ণতায় ৩০-৬০ মি কোটানর যে পদ্ধতি দেখালেন পরবর্তী কালে তাহাই 'পাস্তরাইজেসন' (pasteurization) প্রক্রিয়া নামে বিশেষতঃ দুগ্ধ সংরক্ষণের কাজে বিখ্যাত হয়েছে।

**১·২৪ গাঁজানো ও পচনক্রিয়ার জৈব কারণ প্রকল্প** (germ theory of fermentation and rotting) :

ইউরোপে এসময় বহু মগু কারখানাতে মদ গাঁজানের চৌবাচ্চায় পচনের সমস্যা ছিল। পাস্তর এই গাঁজানো ও পচনের কারণ হিসাবে জীবাণুদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করলেন। এসময় পর্যন্ত লিবিগ (Leibig) ও অন্যান্য রসায়ন বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে গাঁজানো একটি সম্পূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়া। পাস্তর তাঁর অণুবীক্ষণে আবিষ্কৃত বর্তুলাকার, রঙবিহীন জীবাণুগুলি যথা ঈষ্ট (yeast) কেই গাঁজানোর জন্ম দায়ী বলে ঘোষণা করেন। যদিও গাঁজানোর কারণ নির্ণয় প্রথম করেন লাটুর (Latour, ১৮৩৬) তবে পাস্তর এই তথ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এর পরবর্তী কালে নরমাল (Normal) চিনি, জল ও ঈষ্ট-চূর্ণ মিশ্রণে ঈষদোষ্ণ স্থানে কোহল (alcohol) সৃষ্টি ক'রে জীবাণু জনিত গাঁজানো ও কোহল উৎপাদন প্রমাণ ও প্রদর্শন করেন।

১·২৫ ইউরোপে বহু জীবজন্তুর নানা রোগ যেমন ভেঁড়ার আনথ্রাক্স

(anthrax), রেশমগুটীর পচন বা পেব্রিন (Pebrin) বা মুরগীর কলেরা (cholera) মানুষের সামনে রোজই সমস্যা হিসাবে দেখা দিচ্ছিল প্রায় ষষ্ঠদশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে। এসমস্ত রোগের কারণ হিসাবে জীবাণুর জড়িত থাকার কথা ফ্রাকাষ্টারো (Frakastaro) বলতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেখা গেছে প্লেনসিজ (Plenciz) ও এজাতীয় সম্ভাবনার কথা বলছেন। দাঁড়ে (Dande; ১৮৬৩) ভেঁড়ার আনথ্রাক্স রোগ পরীক্ষা করে জীবাণুর সংশ্লিষ্ট থাকার কথা বলেন। কিন্তু পাস্তুরই প্রথম এজাতীয় রোগের কারণ যে জীবাণু তাহা পরীক্ষা ও প্রদর্শনের সাহায্যে প্রমাণ ক'রে মানুষের মধ্যে সেই তত্ব গ্রহণযোগ্য করেন। তিনি ভেড়ার আনথ্রাক্স রোগের ক্ষেত্রে সুস্থ প্রাণীদেহে রোগাক্রান্ত ভেড়ার রক্ত ইনজেক্শন ক'রে রোগ সৃষ্টি করলেন। ভেঁড়া, রেশমগুটি বা মুরগীকে এসব রোগের থেকে রক্ষা করার যুক্তি সংগত পদ্ধতিও তিনি ব'লে যান। যদিও পূর্বেই জেনার (Jenner, ১৭৪৯-১৮২৩) গোবসন্তের টিকা দ্বারা মানুষের ভাইরাসজনিত বসন্ত রোগ প্রতিরোধ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন তবু তৎকালে ৪৩° ডিগ্রী উষ্ণতাতে ৮ দিন গরম করে জীবাণু টিকা দ্বারা রোগ প্রতিরোধ করার যে প্রকল্প, বা বিশেষ ভাবে জলাতঙ্ক রোগের প্রতিরোধ পদ্ধতি আবিষ্কার ইত্যাদি কাজ লুই পাস্তুর কে জীবাণুবিজ্ঞানে তথা মানুষের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। এই স্তরে জীবাণু বিজ্ঞানের উন্নতিতে বিজ্ঞানী রবার্ট কক্ (Robert Koch ১৮৭৫) এর অবদানও অবিস্মরণীয়। প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টি ক'রে যে সমস্ত জীবাণু তাদের বিশুদ্ধ আবাদ (pure culture) করা, সুস্থ জীবদেহে তাহা ইনজেক্শন ক'রে রোগ সৃষ্টি করা ইত্যাদি পদ্ধতিই পরে ককের শর্তাবলী (Koch's postulates) হিসাবে জীবাণুজনিত রোগ বিজ্ঞানে অতি প্রয়োজনীয় পদ্ধতি হিসাবে গৃহীত হয়েছে। জীবাণু বিজ্ঞানের প্রাথমিক পদ্ধতিগুলিকেও কক প্রমিত করেন। কঠিন খাদ্যবস্তুতে (solid medium) জীবাণুর আবাদ ইত্যাদি বহু পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে জীবাণু বিজ্ঞানের উন্নতির পথটিকে দৃঢ়সংবদ্ধ ও নির্দিষ্ট ক'রে গিয়েছেন তিনি।

## ১·২৬ চিকিৎসা জীবাণু বিজ্ঞান ঃ

মূলতঃ পাস্তর ও ককের আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবাণু বিজ্ঞানের এক শাখা মানুষের রোগ সম্পর্কীয় গবেষণায় নিয়োজিত হ'ল। জেনারের আবিষ্কারের সাফল্যও যথেষ্ট উৎসাহের কারণ ছিল। হানসেন, ১৮৭৪ (Hansen) কুষ্ঠ রোগের কারণ ব্যাক্টিরিয়াটিকে আবিষ্কার করলেন। পরবর্তীকালে পরপর বহু রোগের কারণ হিসাবে বিভিন্ন জীবাণু আবিষ্কৃত হ'ল যার মধ্যে ক্লেবস্, ১৮৮৩ (Klebs) ও লফলার, ১৮৮৪ (Loeffler) এর ডিপথিরিয়ার জীবাণু, ফ্রাঙ্কেলের, ১৮৮৬ (Frankel) নিমোনিয়ার জীবাণু, অগাষ্টনের, ১৮৮১ (Augoston) **স্টাফাইলোকক্কাস (Staphyococcus)**, উইচেলহাম, ১৮৮৭ (Wichelham) এর **মেনিনজোকক্কাস (Meningococcus)**, কিটাসাটো, ১৮৮৯ (Kitasato)র টিটেনাস এবং ১৮৯৪ সালে প্লেগ (Plague) রোগ জীবাণুর আবিষ্কার—চিকিৎসা বিজ্ঞানে জীবাণুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করল। উনবিংশ শতকের শেষ দিকে রুশ জীবাণু বিজ্ঞানী মেস্‌নিকফের যুগান্তকারী আবিষ্কার—(Metchnikoff, ১৮৪৫-১৯১৬), রক্তের শ্বেত কণিকার জীবাণু ফাগোসাইটোসিস 'বা গলাধঃকরণ ক্ষমতা' (Phagocytosis) চিকিৎসা-জীবাণু বিজ্ঞানে এক নূতন দিক নির্ণয় করল। অন্যদিকে জন এরলিচের Ehrlich) সিফিলিস রোগের আর্সেনিক জাতীয় ঔষধ (সালভারসন, salvarsan) দ্বারা নিরাময়ে সাফল্য, চিকিৎসা বিজ্ঞানে রাসায়নিক পদ্ধতিতে রোগ নিরাময়ের (Chemotherapy) প্রথম সম্ভাবনা উদ্‌ঘাটিত করল। লিস্টার (Lister) ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে শল্যচিকিৎসার (surgery) প্রবর্তন ও নির্বীজনের (sterilization) কাজে কার্বলিক অম্ল (Carbolic acid) ব্যবহারের পদ্ধতি প্রদর্শন করলেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আঘাতজনিত ক্ষতে **ক্লস্ট্রিডিয়াম (Clostridium)** ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণের কথা আবিষ্কৃত হয়। ইয়লো ফিভার (yellow fever) রোগের জীবাণুর বাহক (মশক) আবিষ্কৃত হ'লে, জীবাণুজনিত রোগের আরও একটি দিক জানা গেল। মেস্‌নিকফের তত্ত্বের আরও উন্নতি ঘটে এরলিচের মনুষ্য রক্তের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সংক্রান্ত গবেষণার মাধ্যমে। বিংশশতাব্দীর আরও একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জীবাণু বিজ্ঞানের অগ্রগতি নতুন খাতে প্রবাহিত

করেছে। সেটি হচ্ছে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming ১৯২৯) এর পেনিসিলিন (Penicillin) আবিষ্কার। মনুষ্যরোগের নিরাময়কারী রাসায়নিক আবিষ্কার এর ক্ষেত্রে ডমাগ, ১৯৩৫ (Domag) এর সালফোনামাইড (Sulfonamide ; Prontosil) আবিষ্কার এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। এক্ষেত্রে ম্যালেরিয়া রোগের ঔষধ কুইনাইন (Quinine) আবিষ্কার (সিনকোনা হইতে) (পেলটিয়ের ও ক্যাভেনটৌ, ১৭৯৫-১৮৭৭ ; Pelletier and Caventou) ও তৎকালীন মনুষ্য সমাজে এক অত্যন্ত মূল্যবান অবদান। এই সমস্ত আবিষ্কার যেমন মানুষের রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে অসীম প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি জীবাণু-বিজ্ঞানের উন্নতি বিধানে ঐতিহাসিক অবদান রেখেছে। বিভিন্ন জীব-জন্তুর জীবাণুজনিত রোগ সম্পর্কে গবেষণাও একই ভাবে জীবাণু বিজ্ঞানের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে। এরমধ্যে গরুর এঁশো (Foot and mouth), সংক্রামক গর্ভপাত (Contagious abortion), স্তন-প্রদাহ (mastitis), ঘোড়ার শ্বাসকষ্ট (strangles), ভেড়ার আনথ্রাক্স (anthrax) বা কুকুরের জলাতঙ্ক (rabies) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

### ১.২৭ ছত্রাক বিজ্ঞান (Mycology) ও উদ্ভিদ-রোগ বিজ্ঞান :

ছত্রাক সম্পর্কে চর্চার প্রাথমিক সূচনা করেন উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরাই। সপ্তদশশতকের শেষ ভাগ থেকে এক এক ক'রে অনেক ছত্রাকের বিবরণ প্রকাশ করেন মিচেলি (১৬৭৯-১৭৩৭) (Michelli)। তিনি ছত্রাকের কৃত্রিম আবাদও করেন নির্বীজিত তরমুজে। পরবর্তী কালে তুলাসেন ভাইয়েরা (Tulasane Bros.) (১৮১৫-১৮৮৫) বা বার্কলে (Barkley) (১৮০৩-১৮৮৯) নামক বিজ্ঞানীরা বহু ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন।

ছত্রাকের উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রথম ঘোষণা করেন বিজ্ঞানী টিলেট (Tillet), ১৭৫০ এ। যদিও এর বহু আগে থেকেই উদ্ভিদ রোগ সম্পর্কে মানুষ যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিল, তা বোঝা যায় ১৬০০-এর বিভিন্ন প্রকাশনায়। রোমানদের 'মর্চে' দেবতার (Robigo) পূজা করার বহু উল্লেখ এরমধ্যে অন্যতম। টিলেটের পরে ফনটানা, ১৭৬৭ (Fontana) ও তারিগনি, ১৭৬৮ (Tarigoni) উদ্ভিদরোগে ছত্রাকের অংশ গ্রহণ সম্পর্কে বিশেষতঃ মর্চে (Rust) ও বান্ট (Bunt) রোগের ক্ষেত্রে অনেক গবেষণা ক'রে

তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ১৮০৭ সালে প্রিভোস্ট (Prevost) গমের ভূষো রোগের সংক্রামক চরিত্র পরীক্ষা করে দেখান। সর্বোপরি এ্যান্টন-ডি-বারী (Anton de Bary) ১৮৩১-১৮৮৮ তাঁর অতি মূল্যবান্ গবেষণার সাহায্যে উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞানকে এক শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে উদ্ভিদ রোগ বিজ্ঞানের 'প্রতিষ্ঠাতা' (father) হিসাবে বিখ্যাত হয়েছেন। কুন, ১৮২৫-১৯১০ (Kuhn) উদ্ভিদ রোগবিজ্ঞানের একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা ক'রে যশস্বী হন। ক্লেবস, ১৮৫৭-১৯১৮ (Klebs) ছত্রাকের স্পোর তৈরীর প্রক্রিয়া ও শারীরবৃত্ত সংক্রান্ত গবেষণা ক'রে ছত্রাক বিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক সোপান সংযোজন করেন।

উদ্ভিদরোগ বিজ্ঞান সংক্রান্ত চর্চার প্রথম দিকে জীবাণু হিসাবে ছত্রাক সম্পর্কেই বহু চর্চা হয়েছে। বুরিল (Burrill), ১৮৮৭ ও স্মিথ, ১৮৯০ (Smith) এর গবেষণাতে ব্যাক্টিরিয়ার উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিতে অবদান প্রমাণিত হ'লে উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়া সম্পর্কেও অনেক কিছু জানা গেছে।

১৮৭০ সালে মেয়ারের (Meyer) তামাকের হলুদ ছোপ রোগ (Tobacco yellow mosaic) সম্পর্কে গবেষণা থেকেই জীবাণুকণা (Virus) যে উদ্ভিদ-রোগ সৃষ্টি করে তা প্রথম জানা গেছে।

**১·২৮ মৃত্তিকা জীবাণু বিজ্ঞান (Soil microbiology) :**

রোমানরা বহুদিন থেকেই শিম্ব (Legume) জাতীয় ফসলের দ্বারা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির কথা বা জৈব পদার্থ থেকে তৈরি কম্পোষ্ট (Compost) সারের দ্বারা মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধির কথা ব'লে আসছেন। ইংরাজ ও ফরাসী বিজ্ঞানীরাও এর যথেষ্ট প্রচার করেছেন। তবে সেই যুগে এই সবের মধ্যে জীবাণুর দায়িত্ব ও অবদান সম্পর্কে কোন ধারণা মানুষের ছিল না। কার্যত বুসিংগল্টও (Bushinggault) ( ১৮৫৮ ) শিম্ব জাতীয় গাছের বাতাস-প্রাপ্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধ ( fixation) করার সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেছিলেন মাত্র। জীবাণুর এ জাতীয় নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার ক্ষমতা প্রমাণ ও প্রদর্শন করেন প্রথমে লাচম্যান. ১৮৫৮ (Lachman) ও পরে ওরোনিন, ১৮৬৬ (Woronin)।

আরো পরে মাটির মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর অবস্থার পরিবর্তনে জীবাণুর অংশ-

গ্রহণের কথা জানা গেছে। মাটিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগের পর তা পরিবর্তিত হ'য়ে নাইট্রেট ($NO_3$) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সম্ভাবনার কথা প্রথম বলেন লিবিগ, ১৮৫৬ (Leibig)। কিন্তু এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। পাস্তুর বল্‌তেন এই পরিবর্তন ব্যাক্টিরিয়া জনিত। তবে প্রদর্শনের মাধ্যমে এটিকে সর্বজনগ্রাহ্য করেন ওয়ারিংটন, ১৮৭৮ Warington)। পরে ভিনোগ্রাডস্কি, ১৮৯০ (Winogradsky) ও বাইজারিঙ্ক, ১৮৯৩-১৯০১ ) (Beijarink) এ সম্পর্কে বহু তথ্য সংগ্রহ করেন। মাটিতে নাইট্রোজেনের অবস্থার পরিবর্তনে জীবাণুর অবদান সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাটা তাঁদের চিন্তার থেকে বোঝা গেছে। জৈব-নাইট্রোজেনের রূপান্তর ও অ্যামোনিয়া-ভবন (ammonification) সম্পর্কে মৌলিক অবদান রয়েছে বিজ্ঞানী লিপম্যান ও ব্রাউন, ১৯০৩ (Lipman and Brown) এর। মৃত্তিকায় অন্য প্রায় সমস্ত খনিজের অবস্থার পরিবর্তনে জীবাণুর অংশগ্রহণের কথা বিজ্ঞানীমহলে সুপ্রতিষ্ঠিত।

এ সম্পর্কে গবেষণার বহু ফল অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য হিসাবে কাজে লাগান হয়েছে। বিখ্যাত জীবাণু বিজ্ঞানী সেলম্যান ওয়াকসম্যান (Waksman) এর মাটির জীবাণু সম্পর্কে গবেষণা ও লেখা অত্যন্ত মূল্যবান।

মাটির ভিতরে বিভিন্ন জীবাণুর পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও/বা বিরোধিতা অথবা সহ-অবস্থানের সম্পর্ক রয়েছে। সম্পর্কগুলি বিভিন্ন নামে যথা সহযোগিতা (Commensalism), বিরোধিতা (Antibiosis), মিথোজীবিতা (Symbiosis), সহভোক্তা (Syntrophism), পরভোজিতা (Predation), পরজীবিতা (Parasitism), মৃতজীবিতা (Saprophytism) ও পরস্পর নির্ভরতা (Mutualism) নামে পরিচিত।

## ১·৩০ জীবাণুর শ্রেণীবিন্যাস ঃ

১·৩১ জীবাণুর শ্রেণী বিন্যাস বেশ জটিল। জীবাণু গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত উভয় রাজ্যের (Kingdom) ই সদস্য রয়েছে। সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস যুক্তদের মধ্যে ছত্রাক, শৈবাল, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি অন্যতম এবং অসম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস যুক্তদের মধ্যে ব্যাক্টিরিয়া ও নীল-সবুজ শৈবাল অন্যতম। এছাড়া আর একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর জীবাণু—ভাইরাস বা

জীবাণুকণা রয়েছে। বার্গীর মানুয়ালের ৭ম সম্পাদনে, ১৯৫৭ (Bergey's Mannual of Determinative Bacteriology, 7th Edition) শতাধিক জীবাণু বিজ্ঞানী যে পদ্ধতি গ্রহণ করেন তাতে দেখা যায় সমস্ত প্রোকারিওট বা অসম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবাণুকে উদ্ভিদ রাজ্যের প্রথমবিভাগ (Division-1 প্রোটোফাইটাতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। এর জীবাণুগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে (Class) ভাগ ক'রে শ্রেণী ১ এ নীল সবুজ শৈবালকে শিজোফাইসি (Schizophyceae) নামে, শ্রেণী ২ এ সমস্ত যথার্থ ব্যাক্টিরিয়াকে শিজোমাই-সিটস (Schizomycetes) নামে এবং শ্রেণী ৩ এ সমস্ত অবলম্বি, অন্তকোষীয় জীবাণুকে মাইক্রোটাটোবায়োটস (Microtatobiotes) নামে রাখা হয়েছিল। বার্গীর মানুয়ালের অষ্টম সম্পাদনে Bergey's Mannual of Determinative Bacteriplogy 8th Edn 1975) এই বিন্যাসের পরিবর্তন করা হয়েছে।

শ্রেণীবিভাজন বলতে সাধারণতঃ একই ধরনের জীবাণুদের সমদলবদ্ধ করা ও ভিন্ন ধরনেরকে ভিন্ন দলবদ্ধ করা বোঝায়। দল বা গোষ্ঠীগুলিকে বলা হয় টাক্সা (taxa)। টাকসোনমি (Taxonomy)শব্দটি গ্রীক টাক্সিস (taxis) বা বিন্যাস এবং নেমো (nemo) অর্থে আমি ব্যবস্থাপনা করি বোঝায়। এসব ক্ষেত্রে দলগুলি আপ্রাবরণ (non-overlapping)। প্রতিস্তরে দল বা গোষ্ঠী গুলিকে বিভিন্ন 'নাম' বা 'ছাপ' দেওয়া হয়। এই নামকরণ করার বিজ্ঞানকে বলা হয় নামকরণ-বিজ্ঞান বা নোমেনক্লাচার (nomenclature)।

একটি জীবাণুকে কার্ল লিনিয়াস (Carl Linnaeus) এর প্রস্তাব অনুযায়ী দুই অংশযুক্ত (binomial) নাম দেওয়া হয়। প্রথম অংশটিকে গণ বা জেনাস (genus) ও দ্বিতীয় অংশটিকে প্রজাতি বা স্পিসিস (species) বলা হয়। জীব বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী জীবাণুর নামটি ল্যাটিনে রূপান্তরিত করা হয়। যেমন **জান্থোমোনাস অরাইজী (Xanthomonas oryzae)**। অনেকগুলি সম বৈশিষ্ট্য যুক্ত গণকে একত্রে একটি পরিবারে (Family) আবার সমবৈশিষ্ট্য যুক্ত কয়েকটি পরিবারকে একটি বর্গ (Order), কয়েকটি বর্গকে একটি শ্রেণী (Class), কয়েকটি শ্রেণীকে একটি বিভাগ (Division), কয়েকটি বিভাগকে একটি পর্ব (Phylum) ও পর্বগুলি রাজ্য (Kingdom) ভুক্ত করা হয়।

জীবাণু সম্পর্কে গবেষণা ও চর্চা সহজতর করার জন্য শ্রেণী বিন্যাসের

প্রয়োজন হয়। জীবাণুদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, ঘনিষ্ঠতা ও দূরত্ব বোঝার মাপকাঠি হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাস। জীবাণুর উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করার জন্যও এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অসংখ্য জীবাণুর পরিচয় জানার এই পদ্ধতিতে একটিকে জেনে তার গোষ্ঠীকে জানা হয়।

অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাজন ও বিন্যাস হয় উদ্দেশ্যমূলক ও কৃত্তিম উপায়ে। ডারউইনের আগে দেখা যায় অ্যারিস্টটলের যে প্রস্তাব যুক্তিসংগত বিভাজন প্রকল্প (Logical Division Theory) তাও জীবাণুর অবশ্য প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব গুলির উপর নির্ভর করে দলবদ্ধ করার একটি প্রস্তাব মাত্র।

জীবাণুর পারস্পরিক (mutual) ও সর্বোপরি (overall) সমতার ভিত্তিতে যে শ্রেণীবদ্ধকরণ তাকে ফেনেটিক শ্রেণীবদ্ধকরণ (phenetic classification) বলা হয়। ভিন্ন উৎপত্তির ভিত্তিতে যে ভিন্ন শ্রেণীবদ্ধকরণ তাকে ফাইলেটিক শ্রেণীবদ্ধকরণ (phyletic classification) বলা হয়। পরবর্তী কালে সংখ্যাভিত্তিক শ্রেণীবিভাজন (Numerical taxonomy) পদ্ধতিতে এই ভিন্নতা ও সমতাকে বিভাজন করার কথা বলা হয়েছে।

## ১·৩২ জীবাণুর শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন পদ্ধতি :

বিজ্ঞানী ফার্দিনান্দ কন (Fardinand Cohn) এর আমল থেকেই শ্রেণীবিন্যাসে জীবাণুদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য বোঝা গেছে। এরজন্যই ব্যাক্টিরিয়া ও নীলসবুজ শৈবালকে একই গোষ্ঠীভুক্ত রাখার কথা ভাবা হচ্ছে এখন। তবে শ্রেণীবিন্যাসের অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটেছে। বার্গীর ম্যানুয়ালের অষ্টমসম্পাদন, ১৯৭৫ দি ম্যানুয়েল (The Mannual) এ পূর্ববর্তী ম্যানুয়ালের তুলনায় আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হয়েছে জীবাণুদের সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান সঞ্চিত হবার ফলে। চাটন ১৯৩৭ সালে যে প্রোকারিওট ও ইউক্যারিওট বা সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত জীবাণু গোষ্ঠী দুটির কথা বলেছিলেন পরবর্তী কালে স্টানিয়ের ১৯৬১ (Stanier) তা যথেষ্ট ভাবে প্রমাণ করেন। তাই বর্তমানে জীবাণুদের দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজ্য (Kingdom) যথা প্রোকারিওটি (Procaryotae) ও ইউক্যারিওটি (Eucaryotae) রাখা হয়েছে। প্রথম গোষ্ঠীতে ব্যাক্টিরিয়াগুলির আলোক নির্ভরতা অনুযায়ী দুটি বিভাগে (Division) যথা ফোটোট্রফিক ব্যাক্টিরিয়া গুলি দি সায়ানোব্যাক্টিরিয়া

(The Cyanobacteria) বিভাগে এবং আলো-অসচেতনগুলি দি ব্যাক্টিরিয়া (The Bacteria) বিভাগে ভাগ করে রাখা হয়েছে। যদিও নীলসবুজ শৈবালগুলি ব্যাক্টিরিয়ার সাথে আলোচনা করা হয়নি তবু দি মাস্থুয়ালে দি সায়ানোব্যাক্টিরিয়া (The Cyanobacteria) র তিনটি শ্রেণীর (Class) একটিতে দেখান হয়েছে। অন্যদিকে **Plantae** রাজ্যের একটি বিভাগ মাইকটা (Mycota)তে সমস্ত ছত্রাককে রাখা হয়েছে। এছাড়াও কিছু ছত্রাক, যাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বোঝা যায়নি তাদের দুটি বর্গভুক্ত (Acrasiales ও Labrinthulales) করে স্বতন্ত্রভাবে রাখা হয়েছে। মাইকটা বিভাগের ছত্রাক গুলিকে দুটি উপবিভাগে (Sub Division) বিভাজন করা হয়েছে, যথা ইউমাইকটিনা (**Eumycotina**) ও মিক্সোমাইকটিনা (**Myxomycotina**)। প্রোটোজোয়াদের অ্যানিমালিয়া (**Animalia**) রাজ্যের একটি পর্বে (**Phylum**) রাখা হয়েছে যার নাম প্রোটোজোয়া (**Protozoa**)।

## ১·৩৩ বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ পদ্ধতি :

বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর শ্রেণী বিভাজনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বত্তম পদ্ধতি বলে কিছু পাওয়া যায়নি। হোক্রেটিনার, ১৯২৯ (Hochreutiner) তাই বলেছেন প্রকৃতিতে কোন পরিবার, কোন বর্গ বা কোন প্রজাতি নেই, আছে শুধু ব্যক্তি (individuals) যাদের পরস্পরের মধ্যে সমতা যথেষ্ট।

(ক) **বিশেষ বৈশিষ্ট্য নির্ভর শ্রেণীবিভাগ** (Monothetic classification) **:**

জীববিজ্ঞানে এই অতি পরিচিত শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এক্ষেত্রে জীবাণুর কতকগুলি বিশেষ বিশেষত্ব (key Characteristics) বেছে নিয়ে তাদের উপর ভিত্তি করে একটা কৃত্রিম দ্বিবিভাজি বা ডাইকটমাস (dichotomous) ব্যবস্থা করা হয়, যাতে জীবাণুর নির্ধারণ সহজ হয়। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষত্বগুলির বিশেষ মূল্য দিয়ে জীবাণুকে চেনা (identification) ও দলভুক্তকরা হয়। শ্রেণী বিভাগের কাজে এই দু'একটি বিশেষত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দেবার পদ্ধতির বহু সমালোচনাও হয়েছে।

(খ) **বহু বৈশিষ্ট্য নির্ভর শ্রেণীবিন্যাস** (Polythetic classification) :

জীবাণুর যত বেশী সম্ভব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ও তার তুলনামূলক বিচার করে যে চেনার ও দলভুক্ত করার পদ্ধতি তাকে সম্পূর্ণ বহু বৈশিষ্ট্য নির্ভর শ্রেণীবিন্যাস বলা হয়। এক্ষেত্রে একই গোষ্ঠীভুক্ত জীবাণুগুলি আরও বেশী একই বৈশিষ্ট্য যুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এটাকে এক ধরনের ফেনেটিক শ্রেণীবিভাগ বলা যায় যা সর্বাত্মক সমতার (overall similarity) ওপর ভিত্তি করে ঠিক হয়। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীগুলি স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম হয়।

(গ) **সংখ্যা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস** (Numerical Taxonomy) : দি মানুয়ালে গৃহীত শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতিটিই বেশী ব্যবহার হয়। সেটি ফেনেটিক ও আপাতঃ বিবর্তন ভিত্তিক। এতে লিনিয়াসের ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিন্যাস (hierarchial) নীতিও অনুসৃত হয়েছে। পদ্ধতিটি যথেষ্ট কার্যকর হলেও তার ব্যবহারে সতর্কতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মাইকেল অ্যাডানসন, ১৭৫৭ (Michael Adanson) প্রথম সংখ্যা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস এর কথা বলেন যার জন্য এটিকে আডানসনিয় পদ্ধতিও (Adansonian method) বলা হয়। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করেন স্নীথ, ১৯৫৬ (Sneath)।

এতে জীবাণুর প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যের সমান 'মান' ধরে তাদের মধ্যে সামগ্রিক সমতা নির্ধারণ করা হয়। কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয় না। অনেক ক্ষেত্রে পরিচিত (Classical) শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির ফলের সাথে এর ফলের মিল পাওয়াতে এর ব্যবহার কিছুটা বেড়েছে। কিছু খুঁত থাকলেও এই পদ্ধতির ব্যবহারের সুবিধা ও নীতিগত ভিত্তি সকলে স্বীকার করেন। এর ব্যবহারে অন্যতম অসুবিধা হচ্ছে সমস্ত গুণগত বৈশিষ্ট্যের মান সংখ্যা দ্বারা নির্ণয় করা।

(ঘ) **বংশতত্ত্বগত বা অণুভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস** (Molecular or biochemical taxonomy) :

জীবাণুর বাহিরে প্রকাশিত (phenotypic) বৈশিষ্ট্যগুলি তার কোষের বহু বংশাণুর (genes) কার্যকর প্রকাশ মাত্র। বংশাণুগুলি নানা উৎসেচকের মাধ্যমে জীবাণুর বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশিত করে। বংশাণুগুলির অন্তর্নিহিত

বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে ডি. এন. এর জৈবক্ষার এর বিন্যাস এর উপর নির্ভরশীল। তাই জীবাণু নির্ধারণে ডি. এন-এর ক্ষার-সংযুতি বিশ্লেষণ করে দেখার প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণতঃ গুয়ানিন ও সাইটোসিন এর অনুপাত (শতাংশ) নির্ণয়ের দ্বারা এটি করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি জীবাণুর ডি. এন. এর সাথে অন্য এক জীবাণুর ডি. এন. এর সংকরণের (hybridization) সাফল্য দ্বারাও তাদের সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়।

**(ঙ) রক্তরস ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস** (Serotaxonomy) :

জীবাণুদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তাদের অ্যান্টিজেনিক (antigenic) বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। যেসব জীবাণুকে তাদের প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একই জীবাণু প্রজাতি বলে নির্ধারিত তাদেরও অ্যান্টিজেনিক বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র ধরনের হ'তে দেখা গেছে। এভাবে একটি জীবাণু প্রজাতির মধ্যে একাধিক বর্ণ (strain) নির্ধারণ করা সম্ভব। এ জাতীয় বর্ণগুলিকে প্রজাতির সেরোটাইপ বা রক্তরস ভিত্তিক বর্ণ (Serotype) বলা হয়। অনেকক্ষেত্রে এই বিভিন্নতা নির্ণয় কার্য্যকর ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

**(চ) ফাজ সচেতনতা ভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস** (Phage typing) :

এটি আরও একটি পদ্ধতি যার দ্বারা জীবাণুর প্রজাতির মধ্যেও বিভিন্নতা নির্ণয় বা ফাজ-সচেতনতা ভিত্তিক বর্ণ (strain) নির্ণয় করা যায়। ফাজ একটি ব্যাক্টিরিয়া আক্রমণকারি ভাইরাস। ফাজ দ্বারা একটি প্রজাতির কতকগুলি বা একটি 'ব্যক্তি'র সচেতনতা নির্ণয় সম্ভব হয়। এধরনের নির্ধারিত বর্ণগুলিকে ফাজ-সচেতন বর্ণ বলা হয় এবং পদ্ধতিটিকে বলা হয় ফাজ-সচেতনতাভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাস।

## ১·৩৪ বিভিন্ন জীবাণুর শ্রেণীবিন্যাস :

(ক) ভাইরাসের শ্রেণীবিন্যাস : অন্য সব জীবাণুর মত ভাইরাস বা জীবাণুকণার ক্ষেত্রেও শ্রেণীবিন্যাসের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে। পোষক-জীব ভিত্তিক, বাহক ভিত্তিক বা ভাইরাস সৃষ্ট রোগভিত্তিক পদ্ধতি প্রস্তাবিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। বর্তমানে জীবাণু-কণাদের শ্রেণীবিন্যাস পোষক উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুযায়ী করা হচ্ছে, যদিও এটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ও

যথার্থ পদ্ধতি নয়। ভাইরাসের গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রেণীবিন্যাস অত্যন্ত কঠিন ও সময় সাপেক্ষ হলেও সেটি বিজ্ঞান ভিত্তিক ও গ্রহণযোগ্য। এই পদ্ধতিতে ভাইরাসের শ্রেণীবিন্যাসের কাজ সুরুও হয়েছে।

সমগ্র ভাইরাস গোষ্ঠীকে তাদের কোর বা অন্তঃস্থলের (Core) নিউক্লিক অম্লের প্রকৃতি অনুযায়ী দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়। যথা ডি. এন. এ ভাইরাস ও আর-এন. এ ভাইরাস বা জীবাণুকণা। এই দুটি উপগোষ্ঠীকে অন্য সমস্ত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আরও বিভাজন করা হয়েছে। কণার গঠনগত সমতা (Symmetry)র ভিত্তিতে করা হয়েছে আবর্তাকার (Helical), বিশতলী (Icosahedral) বা আবরিত (Enveloped) ইত্যাদি।

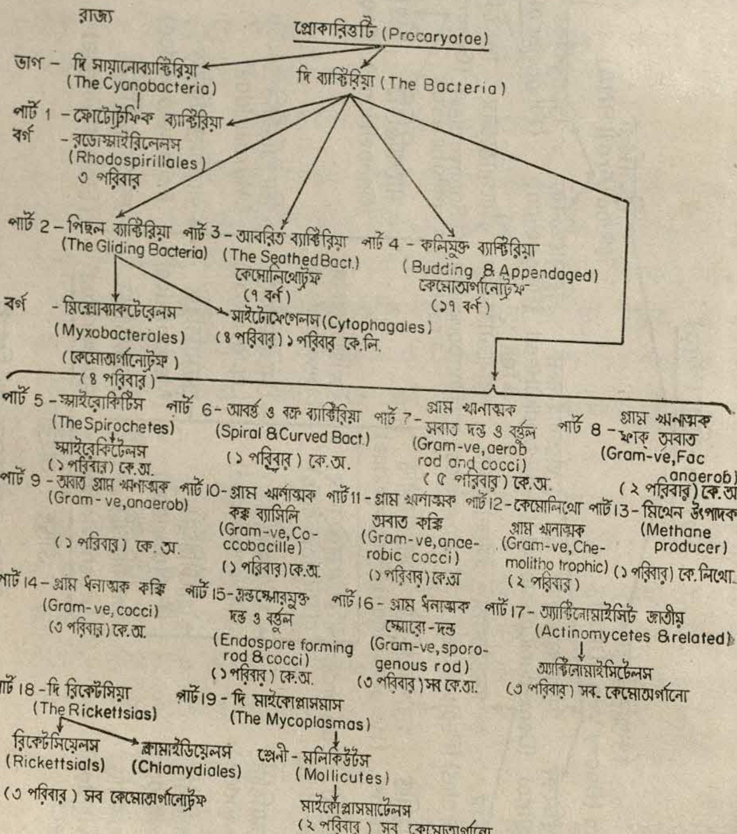
আন্তর্জাতিক জীবাণু বিজ্ঞান পরিষদ (International Microbiological Society) কর্তৃক গঠিত ভাইরাস নামকরণের প্রাথমিক কমিটি (Provisional Committee on Nomenclature of Viruses or PCNV)বিজ্ঞানী আনড্রুর (Andrew) নেতৃত্বে যে নামকরণ পদ্ধতি তৈরী করেছেন তা মূলতঃ লোঅফ, হর্ণ ও তুর্নিয়ের (Lwoff, Horne and Tournier) প্রস্তাবিত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করেই রচিত। উপরিউক্ত শ্রেণীবিন্যাস এর পরিচয় নিম্নে দেওয়া হচ্ছে ( চিত্র-২)।

পরের স্তরের গণ নির্ণয়ের কাজে যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে নিউক্লিক অম্লর ক্ষার-বিন্যাস (base-sequence), ক্ষারগুলির তুলনামূলক সংখ্যা, নিউক্লিওটাইডের সংখ্যা, ক্যাপসোমিয়ার (Capsomere) এর গঠন, এ্যান্টিজেনিক বিশেষত্ব ও আণবিক ওজন, ক্যাপসিড প্রতি ক্যাপসোমিয়ারের সংখ্যা, উষ্ণতাও অম্লক্ষারত্বে কণার প্রতিক্রিয়া, উৎসেচকের প্রকৃতি—প্রভৃতি বিষয়ক তথ্য কাজে লাগানো হয়।

### (খ) ব্যাক্টিরিয়ার শ্রেণীবিন্যাস :

ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে আধুনিক যে স্বীকৃত শ্রেণীবিন্যাস ১৯৭৫ সালে ম্যানুয়ালটিতে (The Mannual) ছাপা হয়েছে তাতে সমগ্র ব্যাক্টিরিয়া গোষ্ঠীকে শক্তি সংগ্রহের পদ্ধতি অনুযায়ী দুটি উপগোষ্ঠী যথা রসায়ন-নির্ভর বা কেমোট্রফিক (Chemotrophic) ও আলো-নির্ভর বা ফোটোট্রফিক (Phototrophic) তে ভাগ করা হয়েছে। এরা যথাক্রমে রাসায়নিক সংশ্লেষণ

ও স্বালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করে। সমস্ত স্বালোক সংশ্লেষক ব্যাক্টিরিয়াকে একটি বর্গ (Order) রডোসপাইরিলেলস (Rhodospirillales) এ গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে। এই বর্গটিকে জিসি (GC) র পরিমাণ অনুযায়ী তিনটি পরিবারে বিভক্ত করা হয়েছে। কেমোট্রফিকগুলি শক্তি সংগ্রহ কাজে কি ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করে তার ভিত্তিতে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।




চিত্র ৩ : ব্যাক্টিরিয়ার শ্রেণীবিন্যাস

কেমোলিথোট্রফিকগুলি (Chemolithotrophic) নাইট্রোজেন, গন্ধক বা লোহা (N, S বা Fe) যুক্ত সরল অজৈব রাসায়নিক জারিত ক'রে শক্তি

সংগ্রহ করে। আর কেমোঅর্গানোট্রফিক (Chemoorganotrophic) গুলি জৈবরাসায়নিক (সরল বা জটিল) হইতে শক্তি সংগ্রহে সক্ষম। এরপর উভয় গোষ্ঠীতেই প্রথমে পিচ্ছল (gliding) ব্যাক্‌টিরিয়া গুলিকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে। পরবর্তী স্তরে কোষের চেহারা, গ্রামবিক্রিয়া (Gram reaction), অবাত বা সবাত প্রকৃতি ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তাদের আরও বিভাজিত ও বিন্যস্ত করা হয়েছে। ব্যাক্টিরিয়ার শ্রেণীবিন্যাস এর একটি চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে। চিত্র—৩।

## (গ) ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস ঃ

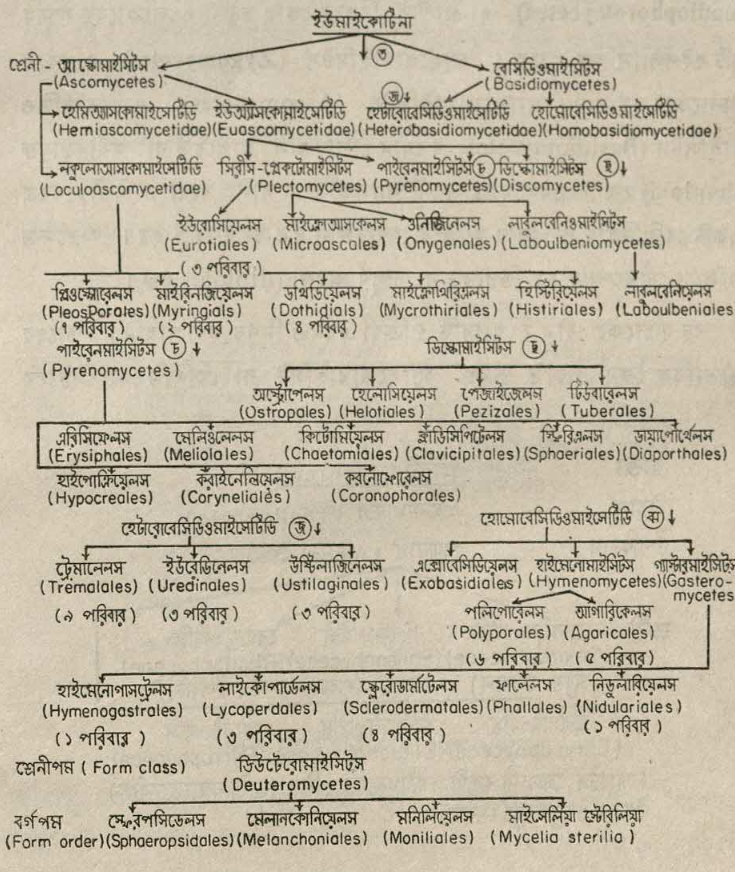
আন্তর্জাতিক উদ্ভিদ বিজ্ঞানগত নাম করণের নিয়মাবলী অনুযায়ী ছত্রাকের যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে তাতে ছত্রাকের বিভিন্ন স্তরের গোষ্ঠী-গুলির নামকরণে সব নামের শেষে মাইকটা (mycota), মাইকটিনা (mycotina), মাইসিটস (mycetes) ইত্যাদি শব্দাংশ যুক্ত করা হবে ব'লে ঠিক হয়।

বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস প্রক্রিয়া সম্পর্কেও যথেষ্ট মতদ্বৈত রয়েছে। পুরাতন পদ্ধতিতে চারটি শ্রেণী যথা ফাইকোমাইসিটস (Phycomycetes), অ্যাসকোমাইসিটস (Ascomycetes), বেসিডিওমাইসিটস (Basidiomycetes) ও ডিউটেরোমাইসিটস (Deuteromycetes) এ যে সহজ গোষ্ঠী ভাগ করা হত সে পদ্ধতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। বিজ্ঞানী গম্যান (Gauman) ঐ চারটির মধ্যে ফাইকোমাইসিটস শ্রেণীর অসংবদ্ধতা উপলব্ধি ক'রে স্বতন্ত্র প্রস্তাব রেখেছিলেন।

আধুনিক ছত্রাক বিজ্ঞানে সমস্ত ছত্রাক ও আঠাল ছত্রাক কে মাইকটা (**Mycota**) বিভাগে রাখা হয়েছে। এই স্তরে এই বিভাগের বাইরে ছত্রাকের দুটি বিচিত্র বর্গের অস্তিত্ব উল্লেখ করা দরকার। এগুলি হচ্ছে অ্যাক্রাসিয়েলস (**Acrasiales**) ও লাবরিনথুলেলস (**Labyrinthulales**)। এদের ছত্রাকগুলির বিশেষত্ব মাইকটা বিভাগের ছত্রাকের থেকে যথেষ্ট স্বতন্ত্র বলে তাদের আলাদা রাখা হয়েছে। মাইকটা বিভাগের মধ্যে কোষ-প্রাচীর বিহীন ছত্রাক গুলিকে আলাদা করে স্বতন্ত্র উপবিভাগ মিক্সোমাইকটিনা (**Myxomycotina**) বা আঠাল ছত্রাকের গোষ্ঠী সৃষ্টিকরা হয়েছে। বাকী ছত্রাকগুলিকে ইউমাইকটিনা

(**Eumycotina**) নামে অভিহিত করা হয়েছে। সমগ্র শ্রেণীবিন্যাস চিত্রটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে। (**চিত্র—৪**)।

ইউমাইকটিনার ছত্রাক গুলিকে তাদের যৌন প্রক্রিয়ায় তৈরী স্পোরের প্রকৃতি অনুযায়ী আটটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এছাড়া এদের সচল

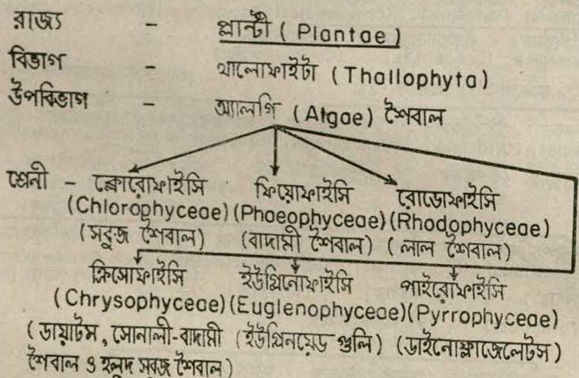



চিত্র ৪ (খ)ঃ ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস

কোষ গুলির শুঙ্গের প্রকৃতিকেও একটি ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়েছে। শুঙ্গ-প্রকৃতির ভিত্তিতে যে দলবিন্যাস করা হয়েছে তাতে দেখা যায় চিট্রিডিও-

মাইসিটস (**Chytridiomycetes**) দের সচলকোষের পশ্চাতে হুইপল্যাস (whiplash) শুঙ্গ রয়েছে। হাইফোচিট্রিডিওমাইসিটসদের (**Hyphochytridiomycetes**) সম্মুখে একটি টিনসেল (Tinsel) জাতীয় শুঙ্গ থাকে। উমাইসিটস্ (**Oomycetes**) দের ক্ষেত্রে দুটি শুঙ্গের একটি হুইপল্যাস ও একটি টিনসেল সম্মুখে ও পশ্চাতে রয়েছে। প্লাসমোডিওফোরোমাইসিটস (**Plasmodiophoromycetes**) এ প্রাচীর বিহীন কোষ ছাড়া সচলকোষের সম্মুখে দুটি হুইপল্যাস শুঙ্গ থাকে। জাইগোমাইসিটস (**Zygomycetes**) এ কোন সচলকোষ হয় না। অ্যাসকোমাইসিটস (Ascomycetes) ও বেসিডিও মাইসিটস (Basidiomycetes) এ যৌন স্পোরগুলি হাপ্লয়েড বা অর্ধাবস্থাযুক্ত (haploid) হয়। প্রথমক্ষেত্রে একটি অ্যাসকাস বা থলির মধ্যে ও দ্বিতীয়ক্ষেত্রে একটি বেসিডিয়াম বা গদার বাহিরে স্পোরগুলি ধৃত বা বাহিত হয়। অন্যক্ষেত্র গুলিতে যৌনস্পোর হয় ডিপ্লয়েড বা সম্পূর্ণ অবস্থা (diploid) যুক্ত।

বহু ছত্রাকের যৌন সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া এখনও নির্ণয় করা যায়নি। তাদের স্বাভাবিক জৈব প্রকৃতি অবশ্য অ্যাসকোমাইসিট বা বেসিডিওমাইসিটদের




চিত্র ৫ : শৈবালের শ্রেণীবিন্যাস

সাথে মেলে। কিন্তু যৌন অবস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য নাই বলে তাদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মত গোষ্ঠীতে (form-class) রাখা হয়েছে।

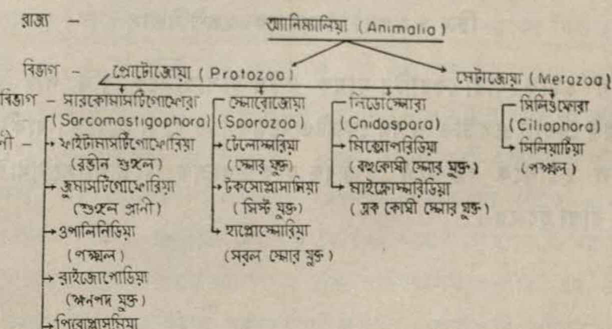
এর নাম ডিউটেরোমাইসিটস। এদেরকে অস্বাভাবিক ছত্রাক গোষ্ঠী (Imperfect Fungi) বা ইমপারফেক্ট ছত্রাকও বলা হয়।

## (ঘ) জীবাণু শৈবালের শ্রেণী বিন্যাস ঃ

প্লান্টী (Plantae) রাজ্যের বিভাগ থালোফাইটার একটি উপবিভাগ হচ্ছে অ্যালগি। এই গোষ্ঠীর জীবাণুর শ্রেণীবিন্যাস চিত্রে (চিত্র-৫) উপস্থাপিত করা হল। অ্যালগি উপবিভাগের সমস্ত শৈবালকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

## (ঙ) প্রোটোজোয়ার শ্রেণীবিন্যাস ঃ

অ্যানিম্যালিয়া রাজ্যের যাবতীয় প্রাণীর একাংশকে একটি স্বতন্ত্র ফাইলাম (Phyllum) বা বিভাগ প্রোটোজোয়াতে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই গোষ্ঠীর

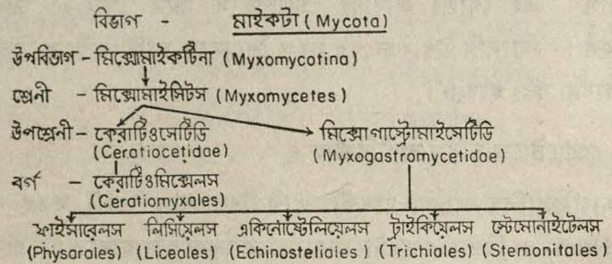



চিত্র ৬ ঃ প্রোটোজোয়ার শ্রেণীবিন্যাস

জীবাণুর শ্রেণীবিন্যাস (চিত্র-৬) দেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে স্পোরের বিশেষত্ব অনুযায়ী সমগ্র বিভাগটিকে চারটি উপবিভাগে বা সাবফাইলামে এ গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী স্তরে প্রোটোজোয়াগুলিকে তাদের শুঙ্গ, পক্ষ্ম, ক্ষণপদ সৃষ্টি-ক্ষমতা, স্পোর বা সিষ্ট তৈরীর বিশেষত্ব অনুযায়ী ১২ টি দলে বা শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। অল্পকিছু রঙীন প্রোটোজোয়াকেও স্বতন্ত্র একটি শ্রেণীতে রাখা হয়েছে।

## (চ) আঠাল ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস :

বিভাগ মাইকটার মধ্যে একটি উপবিভাগ হিসাবে আঠালছত্রাকগুলিকে রাখা হয়েছে। নাম মিক্সোমাইকটিনা। এই গোষ্ঠীর জীবাণুর শ্রেণীবিন্যাস (চিত্র-৭) দেওয়া হল। একটি মাত্র শ্রেণী মিক্সোমাইসিটস্। এর মধ্যে একদল




চিত্র ৭ : আঠাল ছত্রাকের শ্রেণীবিন্যাস

আঠাল ছত্রাক যারা কেরাটিন নামক জটিল রাসায়নিকে বৃদ্ধি পায় তাদের উপশ্রেণী কেরাটিওসেটিডি ও বর্গ কেরটিওমিক্সেলস এ রাখা হয়েছে। বাকী সমস্ত আঠাল ছত্রাককে ৫টি বর্গে গোষ্ঠীবদ্ধ করে উপশ্রেণী মিক্সোগ্যাসট্রোমাইসেটিডিতে রাখা হয়েছে।

# দুই

# জীবাণুর আকৃতি ও জৈব প্রকৃতি

## (Structure and biology of microorganisms)

"বড় মাছিকে কামড়াতে রয়েছে ছোট মাছি
ছোটকে আরও ছোট—এভাবে অনন্ত পর্য্যন্ত
চলেছে !" —হুইফ্ট-ডি-মর্গান

### ২·১০ জীবাণুকণা বা ভাইরাসের আকৃতি ও প্রকৃতি ঃ

২·১১ জীবাণুকণা বা ভাইরাস হচ্ছে এক ধরনের অতি সুক্ষ্ম কণা (particle) বা সত্তা (entity) যাদের বংশবস্তুতে (genome) যে কোন এক ধরনের নিউক্লিক অম্ল যথা ডি. এন. এ. বা আর. এন. এ. থাকে এবং এই অন্ত-বস্তু (core) একটি প্রোটিন জাতীয় খোলসে (coat) ঢাকা থাকে। বর্তমানে ভাইরাস সংক্রান্ত জ্ঞান অনুযায়ী বিশেষতঃ লুরিয়া ও ডারনল, ১৯৬৭ (Luria & Darnol) এবং ফ্রাঙ্কেল কনরাট এর (Frankel-Conrat), ১৯৬৯ গবেষণার ফল থেকে জানা যায় যে ভাইরাস গুলি শুধুমাত্র জীবিত কোষের মধ্যেই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। পোষক কোষে ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি রাইবোসম, t-আর. এন. এ. ও শক্তি উৎপাদনক্ষম প্রক্রিয়ার সহায়তায়ই সম্ভব। সর্বোপরি ভাইরাসেরা পোষক উদ্ভিদ, প্রাণী ও জীবাণু দেহে রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। লোঅফ ও তুরনিয়ের, ১৯৬৬ (Lowoff and Turnier) ভাইরাসের পাঁচটি বিশেষত্বর কথা উল্লেখ করেছেন। বিশেষত্বগুলি ১। শুধু একপ্রকার নিউক্লিক অম্লের উপস্থিতি, ২। নিউক্লিক অম্লের সংখ্যাবৃদ্ধির কাজের পোষক কোষের উপর নির্ভরশীলতা, ৩। রোগসৃষ্টিকরার ক্ষমতা, ৪। নিউক্লিওপ্রোটিন জাতীয় শরীর-গঠন ও ৫। অতি সূক্ষ্ম (sub-microscopic) আকৃতি। বিজ্ঞানী ম্যাথু (১৯৭০) (Mathew)-র তত্ত্বেও এটা সমর্থিত। ভাইরাস (virus) শব্দটি ল্যাটিন, যার অর্থ বিষ। জীবাণু বিজ্ঞানের পরিভাষাতে ভাইরাস বা জীবাণু কণারা হয়ত জীবিত ও মৃত বস্তুর মধ্যবর্তী এক বিশেষ ধরণের জীবাণু গোষ্ঠী।

## ২·১২ ভাইরাস বা জীবাণুকণা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস :

(ক) ভাইরাস বা জীবাণুকণাদের অস্তিত্ব প্রথম বোঝা যায় তাদের উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টি করার মাধ্যমে। এ জাতীয় উদ্ভিদ রোগের প্রথমটি হচ্ছে টিউলিপের পাপড়ি-দাগ (tulip breaking)। পরে (১৭৯১) আলুর পাতা কোঁকড়ান (curl), পীচের হলুদ রোগ (peach yellows) প্রভৃতি রোগের ঘোষণার সাথে সাথে মানুষ এদের সম্ভাব্য অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। নেদারলাণ্ডের বিজ্ঞানী মেয়ার (Meyer) এ ধরনের উদ্ভিদ রোগ নিয়ে গবেষণা ক'রে রোগটিকে হলুদ ছোপ জাতীয় (mosaic like) বলে অভিহিত করেন। অবশ্য তিনি এটিকে একটি ব্যাক্টিরিয়াজনিত সংক্রামক রোগ ব'লে সন্দেহ করেন। এরপর আয়ানস্কি (১৮৯২) (Iwanoski) তামাকের হলুদ ছোপ রোগের জীবাণুগুলিকে পোর্সিলেন ছাঁকনীর মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে অতিক্রম ক'রে যেতে দেখলেন। এ থেকে বোঝা যায় যে উক্ত জীবাণুগুলি অতি ক্ষুদ্র ও সংক্রামক ধরণের। বাইজারিঙ্ক (১৮৯৮) (Beijerink) এই জীবাণুগুলি নিয়ে বহু গবেষণার পর এদেরকে "জীবিত সংক্রামক রস" (contagium vivum fluidum.) বলে অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে এই জীবাণুগুলিই 'ভাইরাস বা জীবাণুকণা' বলে পরিচিত হয়। প্রথমে এই শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ ছিল "অজানা বিষ" থেকে "ব্যাক্টিরিয়া" সবকিছুই। তবে এই জীবাণুগুলির "ছাঁকনী" অতিক্রম করার ক্ষমতা প্রমাণিত হবার ফলে এগুলি যে অতিসূক্ষ্ম আকৃতির এবং ব্যাক্টিরিয়া থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির তা নিশ্চিন্ত ভাবে বোঝা যায়। উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে বিজ্ঞানী স্টানলী (Stanley) এই জীবাণুগুলিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে স্বতন্ত্র করেন এবং ভাইরাসের প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে আর এক ধাপ অগ্রসর হন। পরবর্তী কালে জীবাণুকণাদের নিউক্লিওপ্রোটিন প্রকৃতির কথা ঘোষণা করেন বডেন ও পিরি ১৯৩৭ (Bawden and Pirie)।

(খ) প্রাণী দেহে ভাইরাস দিয়ে রোগ সৃষ্টির কথা প্রথম জানা যায় ১৮৯২ সালে। বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর র‍্যাবিস (Rabies) রোগের কারণ হিসাবে ভাইরাস বা জীবাণুকণাকে চিহ্নিত করলেন। গরুর এঁসো বা ফুট অ্যাণ্ড মাউথ (Foot and Mouth) রোগের ক্ষেত্রেও লোফলার ও ফ্রশ, ১৮৯৮ (Loeffler and Frosch) দেখলেন যে জীবাণুগুলি ব্যাক্টিরিয়া-ধারক (bacteria-free filter)

ছাঁকনীর বাধা অতিক্রমে সক্ষম। এদের সাধারণ অণুবীক্ষণে দেখা যায় না। কৃত্রিম খাদ্যমাধ্যমে জীবাণুগুলির আবাদও সম্ভব ছিল না। মানুষের ক্ষেত্রে প্রথম জীবাণুকণা জনিত রোগ নির্ণয় করেন বিজ্ঞানী রীড, ১৯০০ (Reed)। রোগটি হলুদ-জ্বর (Yellow fever)। কীটের ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রে পাস্তুরের রেশম কীটএর সম্পর্কে গবেষণা উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষেত্রে অন্য যেসব বিজ্ঞানীর অবদান অত্যধিক তন্মধ্যে বিজ্ঞানী ওয়াল (Wahl), এসকেরিখ (Escherich) প্রভৃতি অন্যতম।

(গ) জীবাণুকণা বা ভাইরাস যে অন্য জীবাণুদেরও আক্রমণ করতে সক্ষম তার প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায় ১৯১৫তে বিজ্ঞানী টওর্ট (Twort) এর গবেষণা থেকে। ভাইরাসগুলি **স্টাফাইলোকক্কাস** ব্যাক্টিরিয়া (**Staphylococcus**)-র শরীরে প্রবেশ ক'রে অল্পকালেই পোষক ব্যা ক্টিরিয়া কোষটিকে ধ্বংস করতে পারে। প্রায় সাথে সাথেই ফরাসী বিজ্ঞানী ডি-হেরেলী, ১৯১৭ সালে (D-Herelle) আমাশয় (dysentery) রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়ার উপর এজাতীয় জীবাণুকণার আক্রমণের কথা বললেন। পরবর্তীকালে এই ধরণের কিছু প্রোকারিওট জীবাণু আক্রমণকারী জীবাণুকণাকে "ফাজ" (Phage) নামে অভিহিত করা হয়েছে।

(ঘ) এইভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন অবস্থানে ভাইরাসগুলির অস্তিত্ব জানা গেলেও তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা হতে অনেক সময় লেগেছে। ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণার বেশিটাই উদ্ভিদ-রোগ গবেষণা কালে জানা গেছে। সুলভানিয়া (Sulvania) ১৯২৬ সালে তামাকের ভাইরাসটিকে একটি সরল কলয়েড (simple colloid) বলে ঘোষণা করলেন। রাসায়নিক দিক থেকে একটি উৎসেচকের বৈশিষ্ট্য যুক্ত (enzyme) প্রোটিন। স্টানলী (১৯৩৫) (Stanley)-র গবেষণা এদের প্রোটিন ধরণের প্রকৃতি নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করে। পরে ইংলণ্ডের বডেন ও পিরি, ১৯৩৬ জীবাণুকণার শরীরের দুটি অংশ—নিউক্লিক অম্ল ও প্রোটিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। পরে জীবাণুকণা সম্পর্কে সারা পৃথিবী জুড়ে নানা গবেষণা হয় যার ফলে বর্তমানে ভাইরাস বিজ্ঞান (Virology) একটি অত্যাধুনিক উন্নত বিষয় হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে ভাইরাস সম্পর্কে এ পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক গবেষণা হয়েছে তাদের নীচের সারণী তে ( সারণী-৩ ) দেওয়া হল।

## সারণী ৩ঃ জীবাণুকণা বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশ

| সন | বিজ্ঞানী | গবেষণালব্ধ ফল |
|---|---|---|
| ১৯০৬ | বল (Ball) | শ্যামাপোকা দ্বারা জীবাণুকণার সংক্রমণ (transmission)। |
| ১৯১৮ | নিশিমুরা (Nishimura) | জীবাণুকণার লক্ষণহীন পোষক উদ্ভিদ আবিষ্কার। |
| ১৯২৫ | কারস্নার (Carsner) | জীবাণুকণার পরিব্যক্তি (mutation) আবিষ্কার। |
| ১৯২৯ | ম্যাকিনী (Mckiney) | জীবাণুকণাদের পারস্পরিক প্রতিরোধ (cross-protection)। |
| ১৯৩২ | নোল্যাণ্ড ও রুসকা (Knolland and Ruska) | ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার। |
| ১৯৩৫ | স্টানলি (Stanley) | জীবাণুকণাকে স্বতন্ত্রীকরণ। |
| ১৯৩৭ | বডেন ও পিরি (Bawden and Pirie) | টমাটো গুচ্ছ ভাইরাসের স্বতন্ত্রীকরণ (isolation)। |
| ১৯৩৭ | কুনকেল (Kunkel) | বাহক পোকার শরীরে জীবাণু-কণার সংখ্যা বৃদ্ধি। |
| ১৯৩৯ | ক'শে ও সহকর্মীবৃন্দ (Kausche etal) | টি. এম. ভি (T.M.V)-র ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ চিত্র (হলুদ অ্যাসটার রোগ) |
| ১৯৪০ | ফুকুশি (Fukushi) | জীবাণুকণার সংক্রমণ (transovarial transmission (ধানের বামন রোগ) |
| ১৯৫৫ | ফ্রাঙ্কেল-কনরাট ও উইলিয়ামস্ (Frankel-Conrat & Williams) | টি. এম. ভি কণার পুনর্গঠন (reconstruction of T. M. V particles)। |
| ১৯৬১ | কাসানিস ও নিক্সন (Kassanis & Nixon) | উপগ্রহানুগ (satellite) জীবাণুকণার অস্তিত্ব আবিষ্কার। |
| ১৯৬৭ | ডিয়েনার ও রেমার (Diener & Raymer) | আলুর স্পিন্‌ড্‌ল টিউবার রোগ (ভাইরয়েড জনিত)। |

| সন | বিজ্ঞানী | গবেষণালব্ধ ফল |
|---|---|---|
| ১৯৫৮ | শেফার্ড ও সহযোগীবৃন্দ (Shephard etal) | উদ্ভিদ-ভাইরাসের ডি. এন. এ অম্ল ( ফুলকপির হলুদ ছোপ )। |
| ১৯৭১ | হ্যারিসন (Harrison) | উদ্ভিদ জীবাণু-কণার শ্রেণীবিন্যাস প্রচেষ্টা। |

## ২. ১৩ ভাইরাস বা জীবাণুকণার সাধারণ পরিচয় :

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে জীবাণুকণা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের ধারণা অস্বচ্ছতার অন্ধকারে ডুবে থাকলেও ত্রিশের দশকে উন্নত পরিস্রবণ পদ্ধতি, ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র এবং অতিদ্রুত সেন্ট্রিফিউজের (ultracentrifuge) আবিষ্কারের ফলে ভাইরাসদের আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করা সম্ভব হয়; জানাগেছে যে ভাইরাসগুলি কণার মত (particulate)। কণা গুলিকে ভিরিয়ন (Virion) নাম দেওয়া হয়েছে। জীবাণুকণাগুলি অন্যান্য সংক্রামক জীবাণু থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এদের কেলাসিত হবার প্রবণতা দে'খে এদের সরল ও সুষম আকৃতি যুক্ত বলে চিন্তাভাবনা বৃদ্ধি পেল। সহজেই জীবাণুকণার শরীরের দুই অংশ যথা প্রোটিন ও নিউক্লিক অম্লের স্বতন্ত্রীকরণ সম্ভব হওয়াতে ( টি. এম. ভি ও পোলিও ভাইরাস এর ক্ষেত্রে ) জীবাণুকণার নিউক্লিক অম্ল অংশ শুধু পোষক কোষে অনুপ্রবেশ করতে পারে বলে ভাবা হল।

ভাইরাস জীবিত না মৃত এ নিয়েও অনাবশ্যক দ্বন্দ্ব ছিল। জীবন ও মরণের যে সীমানা তাই কি ভাইরাসদের বিচরণভূমি? ভাইরাস বা জীবাণুকণা সম্পর্কে যতটুকু জানা গেছে তাতে দেখা যাবে জীবনের শর্তগুলির মধ্যে একটি যথা আত্মসংখ্যাবৃদ্ধির (reproduction) যোগ্যতা জীবাণুকণার আছে; উপরন্তু এদের সংক্রামক চরিত্রও অন্য জীবাণুদের সাথে এদের সমভাব বৃদ্ধি করেছে। শারীরিক গঠনের উপাদানদুটি—প্রোটিন ও নিউক্লিক অম্ল জীবিতেরই লক্ষণ। কিন্তু জীবাণু কোষের যে 'সংগঠন' (organization) তা জীবাণু-কণার মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তাই এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যসহ জীবাণুকণাগুলি ভাইরাসই। কতটুকু জীবিত বা কতটুকু মৃত তা অবান্তর। প্রকৃতিগতভাবে অন্য জীবাণুদের সাথে জীবাণুকণার অমিল থাকলেও মিলও অনেক। তাই

এদের সম্পর্কে আলোচনা সংগতি-পূর্ণ ভাবেই সকলে জীবাণুবিজ্ঞানে করে থাকেন।

## (ক) ভাইরাস বা জীবাণুকণার উৎপত্তি বা বিবর্তন ঃ

পৃথিবী পৃষ্ঠে জীব সৃষ্টির ব্যাপারে একটা গ্রহণযোগ্য তত্ত্ব প্রস্তাবিত হ'য়েছে। জীবের উৎপত্তি ও বিবর্তনের একটি সামগ্রিক পটভূমিতে জীবাণু-কণার অবস্থান ও বিবর্তন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

(অ) জীবের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা গেছে যে কতকগুলি অতি সহজ গ্যাসীয় পদার্থ থেকে সরল অজৈব রাসায়নিক সৃষ্টি, অজৈব রাসায়নিক থেকে সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে জৈব রাসায়নিক ও তা থেকে জৈব রাসায়নিকের বৃহদাণু (macromolecules) ও সবশেষে সরল, জলজ কোষ কোটি কোটি বছর ধরে প্রাকৃতিক শক্তি সহযোগে সৃষ্টি হ'য়েছে। এ ধারণার প্রবক্তাদের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ওপারিন (Oparin), হ্যালডেন (Haldane), মিলার (Miller) ও বার্নাল (Barnal) অন্যতম। এই সূত্র অনুযায়ী জীবাণু-কণাদের উৎপত্তি সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব জানা গেছে সেগুলি নিম্নরূপ। আদিমযুগে জীবসৃষ্টির পথে "কোষ সৃষ্টির" ঠিক আগে যে সব 'কণা' সৃষ্টি হয়েছিল তাদের বংশধররাই সম্ভবতঃ ভাইরাস বা জীবাণু-কণা। প্রাক-জৈব যুগে পৃথিবীতে অল্পই অক্সিজেন ছিল। অধিকতর পরিমানে ছিল মিথেন, হাইড্রোজেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন-সালফাইড ও বাষ্প। পৃথিবী ধীরে ধীরে শীতল হ'লে জল-বাষ্প বৃষ্টি হিসাবে পৃথিবী পৃষ্ঠে প'ড়ে জলাশয়ের সৃষ্টি করল। পরে বজ্রপাতে সৃষ্ট উত্তাপের সাহায্যে বায়বীয় পদার্থগুলি বিক্রিয়া করে যেসব অণুর সৃষ্টি করল সেগুলি হচ্ছে কার্বন ডায়অক্সাইড, ফর্মিক অম্ল, সাক্সিনিক অম্ল, গ্লাইসিন, অ্যালানিন, আসপারটিক অম্ল, পুরাইন, পিরিমিডিন, হেক্সোস, পেনটোস প্রভৃতি। জল মধ্যে স্থানে স্থানে এইসব অণু পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সৃষ্টি করল বৃহত্তর ও জটিলতর অণু যেমন প্রোটিন, নিউক্লিক অম্ল, আদিম (native) পলিসাকারাইড, নিউক্লিওটাইড ট্রাই ফসফেট প্রভৃতি। এই সব অণুর মধ্যে ক্র'মে যে অন্যতম বৈশিষ্ট্যটি সংযোজিত হল তা হচ্ছে "বৃদ্ধি" (growth) ও 'বিভাজন' (divison) করার ক্ষমতা। পরবর্তী স্তরে এই সমস্ত অণু পরস্পর সংযোজন ও বিয়োজন ক'রে নতুন,

জটিল ও বৃহত্তর অণু এবং 'কণা' সৃষ্টি করলো। বিজ্ঞানী হালডেনের (১৯৫৪) মতে হয়তো এই সময়ই ভাইরাস বা প্রোটোভাইরাস সৃষ্টি হয়েছিল। তবে এই সূত্রের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হচ্ছে জীবাণুকণারা দায়বদ্ধ পরজীবি বা অবলিগেট প্যারাসাইট (obligate parasite)। ফলে পোষক জীব সৃষ্টির পূর্বে জীবাণুকণার সৃষ্টি হবার তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়।

(আ) অন্য আরেকটি বিজ্ঞানী গোষ্ঠী বিশ্বাস করেন যে জীবাণুকণাগুলি পর-নির্ভর কোষ থেকে পরিবর্তিত হ'য়ে পর-নির্ভর কণা হয়েছে। এটি একটি পশ্চাৎমুখী বিবর্তনের (retrogressive evolution) ঘটনা, গ্রীন, ১৯৩৫ (Green), লেডলো, ১৯৩৮ (Ledlow) বা বার্নেট, ১৯৪৫ (Burnet) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই মতে বিশ্বাসী। একটি পরজীবি জীবাণু তার খাদ্য ও প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য সম্পূর্ণভাবে পোষকের উপর নির্ভরশীল হ'লে তাদের ক্রমবিবর্তন এরকম পশ্চাতমুখী হ'তে পারে, কারণ ঐসময় তারা শরীর গঠনের জন্য শুধুমাত্র সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় অংশগুলি যথা নিউক্লিক অম্ল ও প্রোটিনকে ধ'রে রাখে। জীবাণুকণাদের এইভাবে উদ্ভব হওয়া সম্ভব। প্রোটোজোয়া বা ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে যারা পরজীবি হিসাবে দায়বদ্ধ (obligate parasite) যথা **রিকেটসিয়া** বা **ক্লামাইডিয়া**—তাদের থেকেই হয়ত প্লাসমা আস্তরণের অন্তর্ধান ও ডি. এন. এ থেকে আর. এন. এ তে রূপান্তর মারফৎ এই উৎপত্তি হ'য়ে থাকতে পারে।

(ই) একটি সম্পূর্ণ কোষ থেকেও জীবাণু-কণার উৎপত্তির কথা বলা হ'য়েছে। বিজ্ঞানী ডুবাই ও উড্‌স, ১৯৪৩; (Dubai and Woods), ডারলিংটন, ১৯৪৪ (Darlington) মূলতঃ এই তত্ত্বের প্রস্তাবক। জীব কোষের বিভিন্ন কোষঅংগের (organelle) স্ববিভাজন ক্ষমতা এবং নম্র বা টেমপারেট ফাজের (temperate phage) নিউক্লিক অম্লের, পোষক কোষের নিউক্লিক অম্লের সাথে সহাবস্থান—তাঁদেরকে এই ধরনের চিন্তায় প্রভাবিত করে। তাঁরা বলেন কোষের পরিবর্তনের কোন একটি অবস্থায় ঐ ধরনের কোষ অংগের বা নিউক্লিক অম্লের স্বতন্ত্রীভবন ও পৃথক অস্তিত্বে ভাইরাস হিসাবে প্রকৃতিতে অবস্থান যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য। এই সূত্রের পক্ষে আরও সমর্থক যুক্তিগুলি হচ্ছে—১। কোষ অঙ্গের বংশসূত্রের (genome) মধ্যে জীবাণুকণার বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি, ২। ব্যাক্টিরিয়া কোষের এফ-ফ্যাকটর (F-factor) বা যৌন-বংশসূত্র ব্যাক্টিরিয়ার বংশসূত্র

না হ'য়েও তার সাথে সংযুক্ত (integrated) হ'য়ে থাকার ক্ষমতা ইত্যাদি। সমগ্র পরিস্থিতিটি বিচার করলে মনে হয় এক এক ধরনের ভাইরাস এক এক পদ্ধতিতে উদ্ভূত। উৎপত্তির বিভিন্ন পদ্ধতি গুলি নিম্নরূপ হতে পারে। (প) সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াসযুক্ত কোষের ডি. এন. এ জীবাণু কণাগুলি উক্ত কোষেরই অঙ্গের ডি. এন. এ থেকে তৈরী ; বিশেষতঃ যখন নিউক্লিয়াসের ডি. এন. এ ঐ সব কোষ অঙ্গের ডি. এন. এ-র উপর কর্তৃত্ব হারায়, (ফ) কোষের কেন্দ্রের (nucleus) ডি. এন. এ-রই কোন অংশ বা বংশাণু (gene) স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর হ'য়ে পরবর্তীকালে প্রোফাজ (prophage) হ'তে পারে। ব্যাক্টিরিয়োফাজ (bacteriophage) এর উৎপত্তি সম্ভবত এই ভাবেই হ'য়েছে। বিজ্ঞানী লিনডেগ্রেন, ১৯৬২ মনে করেন (Lindegren) কোন কোষ অংগের ডি. এন. এ পরিব্যক্তি (mutation)-র ফলে একটি ভাইরাস-ডি. এন. এ তে রূপান্তরিত হ'তে পারে, যেটি প্রথম অবস্থাতে সংযুক্ত (integrated) থাকে। (ভ) কিছু আদিম স্ববিভাজী অণু জীব কোষের মধ্যে প্রবেশ করে প্লাসমিড (plasmid) হিসাবে অথবা বংশসূত্রের (chromosome) অংশ হিসাবে কাজ করে। এইগুলি পরে ভাইরাসে রূপান্তরিত হয়। -(ম) আর. এন. এ ভাইরাসগুলির উৎপত্তি সম্ভবত ডি. এন. এ ভাইরাস থেকেই কারণ জীবাণু-কণার আর. এন. এ পোষক কোষে ঢুকে সংবাদবাহক আর. এন. এ (messenger RNA) হিসাবে কাজ ক'রে ও কোষ মধ্যে শরীরের প্রোটিন অংশ গঠন করে। সুতরাং কোন সময় সং. আর. এন. এ (m. RNA) স্ববিভাজনে সক্ষম হ'য়ে পড়লে ভাইরাসে রূপান্তরিত হ'তে পারে। পোষক কোষের নিজের সং. আর. এন. এ ও এরকমভাবে জীবাণুকণাতে রূপান্তরিত হ'তে পারে। ভাইরয়েড (viroid) এর উৎপত্তি সম্পর্কে দিয়েনার, ১৯৭২ (Diener) ইদানীং এরকম সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সাধারণভাবে পোষক কোষের নিউক্লিক অম্লই যে নানা পদ্ধতি দ্বারা জীবাণুকণাতে রূপান্তরিত হ'তে পারে তা বর্তমানে সর্বজনস্বীকৃত।

## ২·১৩ (অ) ভাইরাস বা জীবাণুকণার শারীরিক গঠন ও রাসায়নিক প্রকৃতি ঃ

অতিসূক্ষ্ম আকৃতি হওয়ার জন্য নিখুঁত, সূক্ষ্ম ও পরিচ্ছন্ন পদ্ধতি ছাড়া

জীবাণুকণার শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ খুব কঠিন কাজ। কয়েকটি সুক্ষ্ম পদ্ধতি যেমন ইলেকট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র, রঞ্জনরশ্মি বিচ্ছুরণ পদ্ধতি (X-ray diffraction method), বৈদ্যুতিক পৃথগীকরণ (electrophoresis), ক্রমঘনত্বে অপকেন্দ্রিক ঘূর্ণায়ন (density gradient centrifugation), ক্রোমাটোগ্রাফী (chromatography) ইত্যাদি দ্বারা এগুলি বোঝা গেছে। সমস্ত সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যায় যে জীবাণু-কণার শরীরের কেন্দ্রাংশ (core) অর্থাৎ নিউক্লিক অম্ল একটি প্রোটিন খোলসের মধ্যে (shell or capsid) বসানো (integrated) থাকে। প্রোটিন খোলসটি একই ধরনের একাধিক প্রোটিন অণু দ্বারা গঠিত। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই বহিরাবরণ বা খোলসটির গঠনে লিপিড (lipid) অথবা লিপোপ্রোটিনও (lipoprotein) থাকে। সেক্ষেত্রে আবরণটিকে বহিরাবরণ (envelop) বলা হয়। একটা সম্পূর্ণ ভাইরাস কণাকে বলা হয় ভিরিয়ন (virion)। ভাইরাস বা জীবাণু-কণার শরীরটি একটি অণুমাত্র নয়, অনেকগুলির সমষ্টি তবু জীবাণু-কণার "ভর" কে আণবিকভরই (molecular weight) বলা হয়।

## (ক) ভাইরাস বা জীবাণুকণার কেন্দ্রাংশ—নিউক্লিক অম্ল ঃ

একটা জীবাণু-কণার শরীরে একরকম নিউক্লিক অম্লই তার কেন্দ্র গঠন করে। সমগ্র ভাইরাসজগতের মধ্যে দুই রকমের নিউক্লিক অম্ল কেন্দ্রাংশ যুক্ত জীবাণু-কণার দুটি গোষ্ঠী দেখা যায়। একটিতে কেন্দ্রাংশ রিবোনিউক্লিক অম্ল বা আর. এন. এ. ও আর একটি গোষ্ঠীতে ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অম্ল বা ডি. এন. এ.। সাধারণতঃ উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু-কণাগুলি আর. এন. এ যুক্ত। এক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত একটি মাত্র ব্যাতিক্রম ফুলকপির ভাইরাসের কথা জানা গেছে। প্রাণীদের আক্রমণকারী জীবাণুকণা ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ. উভয় প্রকারই দেখা যায়। কয়েকটি নির্বাচিত জীবাণুকণার গঠন বৈশিষ্ট্য একটি তালিকায় ( সারণী-৪) দেওয়া হচ্ছে।

## সারণী ৪ : জীবাণুকণার শারীরিক সংগঠন

| জীবাণুকণা | নিউক্লিক অম্ল | | প্রোটিন | আণবিক ভর | |
|---|---|---|---|---|---|
| | প্রকার | সমগ্র শরীরে% | % | নিউক্লিক অম্ল | ভিরিয়ন |
| (ক) উদ্ভিদ : | | | | | |
| তামাকের ছোপ কণা | আর. এন. এ. | ৬ | ৯৪ | $২·১ \times ১০^{৬}$ | $৪০ \times ১০^{৬}$ |
| টারনিপ হলুদ ছোপ কণা | আর. এন. এ. | ৪০ | ৬০ | $১·৭ \times ১০^{৬}$ | $৫ \times ১০^{৬}$ |
| টমাটো বুসি স্টাণ্ট | ,, | ১৭ | ৮৩ | $১·৭ \times ১০^{৬}$ | $১১ \times ১০^{৬}$ |
| (খ) প্রাণী : | | | | | |
| পোলিও জীবাণু কণা | ,, | ২৫-৩০ | ৭০-৭৫ | $২·২ \times ১০^{৬}$ | $৩·৬ \times ১০^{৬}$ |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু কণা | ,, | ০·৮১ | ৬০-৭৫ | $১ \times ১০^{৬}$ | $২৮০ \times ১০^{৬}$ |
| (গ) জীবাণু : | | | | | |
| কোলিফাজ-টি-2 | ডি. এন. এ. | ৫০ | ৫০ | $১২০ \times ১০^{৬}$ | $৩০০ \times ১০^{৬}$ |
| ,, φ×175 | ,, | ২৫ | ৭৪ | $১·৭ \times ১০^{৬}$ | $৬·২ \times ১০^{৬}$ |

জীবাণুকণার কেন্দ্রাংশে ডি. এন. এ সাধারণতঃ এক জোড়া সূত্রের আবর্ত (helix) হিসাবে অবস্থান করে এবং আর. এন. এ অবস্থান করে একটি সূত্র হিসাবে। দু'একটি ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যাতিক্রম রয়েছে। কোলিফাজ-φ-174 এবং ফাজ-এস-10 এর ডি. এন. এ একজোড়ার বদলে একটি সূত্র আবার রিওভাইরাস (Reovirus) এর কেন্দ্রের আর. এন. এ সূত্র একজোড়া হিসাবে অবস্থান করে।

ভিরিয়নের প্রায় সবটুকু প্রোটিনই একটি খোলস (coat) হিসাবে নিউক্লিক অম্লকে ঢেকে থাকে। এই প্রোটিন খোলসটির নাম ক্যাপসিড (capsid)। বিভিন্ন জীবাণুকণার যে বিভিন্ন প্রকার গঠন-প্রকৃতি বা আকৃতি দেখা যায় তা এই প্রোটিন-খোলস বা ক্যাপসিডের আকৃতির জন্যই। যে সমস্ত বিভিন্ন

আকৃতির জীবাণুকণার কথা এ পর্যন্ত জানা গেছে তাদের একটি তালিকা নিম্নরূপ। (সারণী-৫)।

সারণী ৫ঃ জীবাণুকণার বিভিন্ন ধরনের গঠন-প্রকৃতি ও আকৃতি

| জীবাণুকণা | নিউক্লিক অম্ল | ক্যাপসিড এর গঠন | বহিরাবরণ (envelop) | মাপ (mμ) মিলি মাইক্রন |
|---|---|---|---|---|
| টি. এম. ভি (TMV) (তামাকের নক্সা জীবাণুকণা) | আর. এন. এ | আবর্তাকার দৃঢ় দণ্ড (helical rod) | নাই | ৩০০ |
| আলুর এক্স জীবাণুকণা (Potato virus-X) | আর. এন. এ | আবর্তাকার নমনীয় দণ্ড | নাই | ৫০০ |
| টারনিপের হলুদ ছোপ (Turnip Yellow Mosaic) | আর. এন. এ | আইকসাহেড্রাল (Icosahedral) | নাই | ২৮ |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুকণা | আর. এন. এ | আবর্তাকার | আছে | ৮০-২০০ |
| পোলিও জীবাণুকণা | আর. এন. এ | আইকসাহেড্রাল | নাই | ২৮ |
| হারপিস জীবাণুকণা (Harpes simplex) | ডি. এন. এ | ,, | আছে | ২৩০ × ৩০০ |
| অ্যাডিনো জীবাণুকণা (Adeno virus) | ডি. এন. এ | ,, | নাই | ৭৫ |
| টি-৪ ফাজ (T-4) | ডি. এন. এ | আইকসাহেড্রাল ও আবর্তাকার | নাই | মাথা— ৯৫ × ৬৫ |
| থিটা-১৭৪ (φ-174) | ডি. এন. এ | আইকসাহেড্রাল | নাই | ৩০ |

ক্যাপসিড গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন ছাড়াও উৎসেচক (enzyme) প্রোটিনও কিছু কিছু জীবাণুকণাতে পাওয়া গেছে। ফাজ এর মধ্যে ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীর বিয়োজনক্ষম উৎসেচক লাইসোজাইম (lysozyme) বা মিক্সোভাইরাস (Myxovirus) গুলিতে মিউকোলাইটিক কর্মক্ষম নিউট্রামিনিডেজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভিরিয়নে প্রোটিনের মূল কাজ দু'টি।

(১) জীবাণুকণার নিউক্লিক অম্লকে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে রক্ষা করা এবং (২) পোষক কোষে নিউক্লিক অম্লের অনুপ্রবেশে সাহায্য করা। অবশ্য একাজে প্রোটিন শুধুমাত্র পোষককোষের সংগে জীবাণু-কণার ভৌত সংযোগেই অংশগ্রহণ করে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য নিউক্লিক অম্লের ইন্‌জেকশনের ক্ষেত্রেও প্রোটিন সাহায্য ক'রে।

### (খ) জীবাণুকণা বা ভাইরাসের প্রোটিন-খোলস :

ভিরিয়নের প্রধান দুই অংশ প্রোটিন ও নিউক্লিক অম্ল ছাড়াও কিছু কিছু জীবাণুকণাতে অন্য দু' একটি রাসায়নিক পদার্থ দেখা যায়। এর মধ্যে লিপিড বা স্নেহ জাতীয় পদার্থ অন্যতম। মিক্সোভাইরাস (Myxovirus), হারপিস (Herpes virus) বা আর্বোভাইরাস (Arbovirus) প্রভৃতির শরীরে ৩০% পর্য্যন্ত লিপিড (lipid) পাওয়া গেছে। বসন্ত-কণা (pox-virus) বা ফাজ এম-২ (phage-M-2)-তে লিপিড থাকে ৬ শতাংশ। ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু-কণা (Influenza virus)-তে শালিজাতীয় পদার্থ (carbohydrate) প্রায় ৬%। বিভিন্ন ফাজের ও প্রাণী-ভাইরাস (animal virus) গুলির কণাতে পলিঅ্যামাইনস (polyamines) পাওয়া যায়। এরা নিউক্লিক অম্লর ফসফেট ($PO_4$) গোষ্ঠী (group) গুলিকে প্রশমিত ক'রে (neutralise) রাখে যার ফলে ভিরিয়নের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে নিউক্লিক অম্ল অণুর ভাঁজ করার সুবিধা হয়।

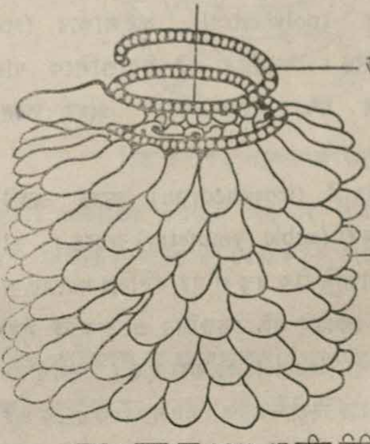
## ২·১৩ (আ) জীবাণুকণা বা ভাইরাসের গঠন-প্রকৃতি ভিত্তিক শ্রেণী বিভাগ :

জীবাণুকণার গঠনপ্রকৃতি বিভিন্ন প্রকারের হয়। গঠনপ্রকৃতি অনুযায়ী ভাইরাসগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা আবর্তাকার (helical), বহুতলী বা আইকসাহেড্রাল (isometric or icosahedral) এবং আবরিত (enveloped)।

### (ক) আবর্তাকার দণ্ডাকৃতি ভাইরাস বা জীবাণুকণা :

সাধারণতঃ এইগুলি দীর্ঘাকৃতি [ ১৮০-১২৫০ নানোমিটার (nm ] কণা। ব্যাস বা প্রস্থে ১০-২৫ নানোমিটার (nm)। দীর্ঘ কণাটিতে প্রোটিনের

উপকণা (sub-units) গুলি আবর্ত সিঁড়ির মত সাজানো থাকে। আবর্তাকার জীবাণুকণাগুলি আবার দুইরকমের হয়। ১। দৃঢ়দণ্ডাকৃতি (Rigid rod) ও ২। নমনীয় রজ্জু-আকৃতি (flexible rope)। দৃঢ়দণ্ডাকৃতি সুক্ষ্ম জীবাণুকণার গঠনগত যে সব তথ্য সংগৃহীত হ'য়েছে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে, ধাতু-ছায়া সৃষ্টি পদ্ধতির দ্বারা অথবা রঞ্জন রশ্মি বিচ্ছুরণগত পদ্ধতির সাহায্যে বিশেষতঃ টি. এম. ভি জীবাণুকণার ক্ষেত্রে তার ভিত্তিতে বিজ্ঞানী ক্লুগ ও কাস্পার, ১৯৬২ (Klugand Kaspar) জীবাণুকণার নিম্নরূপ চিত্র উপস্থাপিত করেছেন। (চিত্র-৮)। টি. এম. ভি-র ক্যাপসিড-টি একই




ক্লুগ ও কাসপার, ১৯৬২ এর ছবির ভিত্তিতে

চিত্র ৮ : টি. এম. ভি ভিরিয়নের অংশ

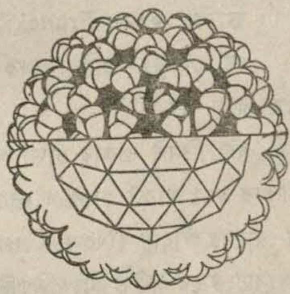
ধরনের প্রোটিন অণু বা উপকণা দ্বারা গঠিত একটি ফাঁপা দণ্ড। উপকণাগুলি ভিরিয়নের দীর্ঘ অক্ষরেখার চারপাশে আবর্তাকারে পাকানো থাকে। প্রোটিন উপকণাগুলির ভিতরের দিকে ভিরিয়নের আর. এন. এ সূত্রটি আবর্তাকারে অবস্থিত; কিছুটা উপকণা-পুঁতি দিয়ে গাঁথা মালার সূত্রের মত। অন্য দণ্ডাকার জীবাণুকণা যেমন ক্লোভারের ছোপ (White Clover Mosaic Virus) সৃষ্টিকারী জীবাণুকণার গঠনও একই রকম; যদিও এর দ্রাঢ্য তুলনামূলক ভাবে কম।

(খ) **বহুতলযুক্ত ভাইরাস বা জীবাণুকণা** (Polyhedral viruses) :

কুড়ি বা বিশটি তল যুক্ত যেকোন কঠিন কণাকে বলা হয় আইকসাহেড্রাল। এরকম বিশ-তল আকৃতিযুক্ত জীবাণুকণা বা ভাইরাস কে বলা হয় বিশতলযুক্ত ভাইরাস বা আইকসাহেড্রাল ভাইরাস। এরকম আকৃতিযুক্ত উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাসগুলির অন্ততঃ ১৩টি গোষ্ঠী রয়েছে। এর মধ্যে ১২টি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই উক্ত কুড়িটি তল সমান মাপের। এই ধরনের কুড়িটি সমান মাপের তলযুক্ত কণাগুলিকে আবার বলা হয় আইসোমেট্রিক বা সমমাপী তল যুক্ত জীবাণুকণা ( কুরস্টাক ১৯৮১, Kurstak)। এই ধরনের আকৃতিযুক্ত ভাইরাস বা জীবাণুকণাগুলিকে ক্ষেত্র বিশেষে নানা নাম যথা বহুতলযুক্ত বা পলিহেড্রাল (polyhedral), বর্তুলাকার (spherical), অধিবর্তুলাকার দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই কণাগুলিকে সাধারণভাবে বহুতলযুক্ত বা পলিহেড্রাল বলা হচ্ছে কারণ এদের তলের সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে কুড়ি নয়।

এক্ষেত্রে বিশতলযুক্ত কণাটি (icosahedron) হচ্ছে একটি বহুতলী (polyhedron) যার ঘন-সমতা (cubic symmetry) রয়েছে। তাই অনেকে বর্তুলাকার বল্লেও এই কণাগুলি ঠিক বর্তুল নয়, বিভিন্ন ধরনের অনেক তল-যুক্ত বহুতলী। আর অনেক ক্ষেত্রেই এই তলগুলির প্রত্যেকটই সমান মাপের হয় ব'লে কণাগুলিকে সমমাপী (isometric) বলা হত। তলগুলির আকৃতি সাধারণতঃ হয় এক একটি সমবাহু ত্রিভূজের মত। মাপের দিক থেকে এই কণাগুলি ২৫-৩০ নানোমিটার (nm) ব্যাসের, যদিও অল্প কিছু বেশ বড় মাপের ৭০-১০০ নানোমিটার (nm) কণাও পাওয়া গেছে। এরমধ্যে অন্যতম ধানের বামন রোগের জীবাণুকণা বা আঘাতজনিত অর্বুদ সৃষ্টিকারী জীবাণুকণা (Wound Tumor Virus)। দু'একটি খুব ছোট মাপেরও এরকম কণা রয়েছে যেমন তামাকের নেক্রোসিস জীবাণুকণা (Tobacco Necrosis Satellite Virus) বা চিনি-বীটের কুঞ্চিত শীর্ষ (Sugarbeet Curly Top) জীবাণুকণার ব্যাস মাত্র ১৬-১৭ নানোমিটার (nm)। বিশতলযুক্ত কিন্তু তলগুলি সমমাপী নয় এমন ভাইরাসের সংখ্যা খুবই সীমিত। আলফাআলফা মোসেক ভাইরাস এরকম একটি ভাইরাস যে বিশতল যুক্ত দণ্ডাকৃতি (Bacilli-form)। বর্তুলাকার এই সমস্ত জীবাণুকণা গঠনের একটি সুন্দর চিত্র ফিঞ্চ এর **উরানিল অ্যাসিটেট**

(uranyl acetate) দ্বারা ঋণাত্মক রাঙানো টারনিপ হলুদ ছোপ ভিরিয়ন (Turnip Yellow Mosaic Virion) এর ছবি (চিত্র-৯) উপস্থাপিত করা হল। প্রোটিন উপকণাগুলি, যাদের ক্যাপসোমিয়ার (capsomere) ও বলা হয়, তাদের সংখ্যা প্রতি ভাইরাসে নির্দিষ্ট থাকে, যেমন $\phi \times 174$ ফাজে ১২টি বা হারপিস ভাইরাসে ১৬২টি ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি



চিত্র ৯ : বর্তুলাকার জীবাণুকণা

ক্যাপসোমিয়ার একাধিক প্রোটিন অণু দ্বারা গঠিত হয়। কিন্তু এজাতীয় জীবাণুকণাতে নিউক্লিক অম্লের অণু যে ঠিক কি ভাবে অবস্থান করে তা সম্পূর্ণ বোঝা যায়নি।

(গ) **আবরিত ভাইরাস বা জীবাণুকণা** (enveloped virus) :

কতকগুলি ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখা যায় সম্পূর্ণ কণাটি আর একটি খোলস বা বহিরাবরণে ঢাকা থাকে। এই ধরনের জীবাণুকণাগুলিকে আবরিত জীবাণুকণা (enveloped virus) বলা হয়। প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকণাদের মধ্যে বহু এবং উদ্ভিদ-জীবাণু-কণাদের মধ্যে এ পর্যন্ত ১৫টি ভাইরাস এই জাতীয় ব'লে জানা গেছে। এই বহিরাবরণটি একটি ত্রিস্তর খোলস। সম্ভবতঃ বহিরাবরণটি পোষক কোষের নিউক্লিয়াসের আস্তরণ থেকে উদ্ভূত। হারপিস ভাইরাসের ক্ষেত্রে কণাটি নিউক্লিয়াস থেকে কোষরসে (cytoplasm) যেতে এই বহিরাবরণটি লাভ করে বলে এই ধারণা হয়েছে। আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের ক্ষেত্রে নতুন ভিরিয়নগুলি কলি হিসাবে কোষগাত্র থেকে ঝরে পড়ার (bud-off) সময় কোষের প্লাসমা আস্তরণ থেকে এটি লাভ করে। বহিরাবরণে তৈল জাতীয় পদার্থ বা লিপিড থাকে ১৯-২০ শতাংশ, এবং

এছাড়া প্রোটিনও থাকে। আবরিত ভাইরাসগুলির মধ্যে আবর্তাকার (helical) ও বর্তুলাকার (icosahedral) দুই রকম গঠনই দেখা যায়, উদাহরণ যথাক্রমে মিক্সোভাইরাস (Myxovirus) ও হারপিস (Herpes)। জীবাণু-কণার বহিরাবরণ পোষক কোষে বিশোষণ (absorption) ও অনুপ্রবেশের (penetration) কাজে লিপ্ত। বহিরাবরণহীন অবস্থাতে এই ভাইরাস কোষে অনুপ্রবেশে অক্ষম। ( ফ্রাঙ্কি, ১৯৭২ ; Francki)। বহিরাবরণটি কণার গঠনে স্থায়িত্বও আনে। এই গোষ্ঠীর ভাইরাসদের বাহকপোকার সাথে (vector) ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

(ঘ) ভাইরাস গঠনে এই তিনটি প্রকার ছাড়া আরও কিছু কিছু বৈচিত্র দেখা যায়। কিছু বর্তুলাকার কণা আবর্তাকারে সাজানো উপকণার মাধ্যমেও গঠিত হয়। নিউ কাস্‌ল রোগের জীবাণু (New Castle Disease Virus) কণা এরকম। এদের আবর্তাকারে গঠিত ক্যাপসিডটি একটি সূতার গোলার মত পাকানো থাকে এবং সমগ্র কণাটি বহিরাবরণে ঢাকা থাকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণু-কণার ক্ষেত্রেও এটি দেখা যায়।

ভাইরাসের গঠনের এই বিশেষত্বের কারণ বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক (১৯৫৬-৫৭) এর মতে এদের বংশবস্তুর (genome) অতিক্ষুদ্র আয়তন। পোলিও (polio virus) ভাইরাস এর ক্ষেত্রে রিবোনিউক্লিক অম্ল সূত্রটিতে মাত্র ৬×১০$^{৩}$ টি নিউক্লিওটাইড আছে। প্রতি অ্যামিনো অম্লের সংশ্লেষণের জন্য ৩টি নিউক্লিওটাইড লাগে। এই হিসাবে উপরিউক্ত পরিমাণ নিউক্লিক অম্ল দ্বারা ২০০০টি অ্যামিনো অম্ল বা মোটামুটি ১০-১৫টি প্রোটিন তৈরি করা সম্ভব। প্রোটিন ক'টির মধ্যে গঠন কাজে প্রয়োজনীয় এবং উৎসেচক দুই প্রকার প্রোটিনই থাকতে হবে। ঠিক এই জন্যই ক্যাপসিডটি একই ধরনের প্রোটিন উপকণা দ্বারা গঠন করতে হয়েছে। এছাড়া ভাইরাস গুলির গঠন স্থায়ী (stable) ধরনের হলে তাতে মুক্ত-শক্তি (free energy) সবচেয়ে কম পরিমানে থাকতে পারে।

(ঙ) পরিশেষে বিভিন্ন ধরণের জীবাণু-কণার গঠন বিশেষত্বযুক্ত একটি তালিকা ( সারণী-৬ ) দেওয়া হচ্ছে।

## সারণী ৬ : কিছু ভাইরাসের গঠন বিশেষত্ব

| জীবাণুকণা বা ভাইরাস | গঠন প্রকৃতি ও আকৃতি | | অন্য বিশেষত্ব |
|---|---|---|---|
| (ক) আবরণ হীন আর. এন. এ যুক্ত উদ্ভিদ ভাইরাস : | | | |
| * রিও ভাইরাস (Reoviridae) | আইসোমেট্রিক বড় | | ds-আর. এন. এ |
| * কলিমো ভাইরাস (Caulimovirus) | ,, | ,, | ds-ডি. এন. এ |
| * কুকুমো ভাইরাস (Cucumovirus) | ,, | মাঝারি | ss-আর. এন. এ |
| * কমো ভাইরাস (Comovirus) | ,, | ,, | ,, |
| * নেপো ভাইরাস (Nepovirus) | ,, | ,, | ,, |
| * মটরের ইনেশন মোসেক ভাইরাস (Pea enation mosaic virus) | ,, | ,, | ,, |
| ভূট্টার ক্লোরোটিক ডোয়ার্ফ ভাইরাস (Maize Chlorotic Dwarf virus) | ,, | ,, | ,, |
| * টাইমো ভাইরাস (Tymo virus) | ,, | ,, | ,, |
| * টমবাস ভাইরাস (Tombus virus) | ,, | ,, | ,, |
| * সাদার্ন বীন মোসেক ভাইরাস (Southern Bean Mosaic Virus) | ,, | ,, | ,, |
| টোবাকো নেক্রোসিস ভাইরাস (Tobacco necrosis virus) | ,, | ,, | ,, |
| * লুটিও ভাইরাস (Luteo virus) | ,, | ছোট | ,, |
| * ব্রোমো ভাইরাস (Bromo virus) | ,, | ,, | ,, |
| * ইলার ভাইরাস (Ilar virus) | ,, | মাঝারি | ,, |
| * আলফাআলফা মোসেক ভাইরাস (Alfalfa Mosaic Virus) | দণ্ডাকৃতি ছোট আইকসাহেড্রন | | ,, |

| জীবাণুকণা বা ভাইরাস | গঠন প্রকৃতি ও আকৃতি | | অন্য বিশেষত্ব |
|---|---|---|---|
| **(খ) আবরণহীন আর. এন. এ যুক্ত দীর্ঘাকৃতি উদ্ভিদ ভাইরাস ঃ** | | | |
| * টোব্রা ভাইরাস (Tobra virus) | দণ্ডাকৃতি | মাঝারি | ss-আর. এন. এ |
| * টোবামো ভাইরাস (Tobamo virus) | ,, | ,, | ,, |
| * হোর্ডি ভাইরাস (Hordei virus) | ,, | ,, | ,, |
| * পটেক্স ভাইরাস (Potex virus) | সূত্রাকৃতি | দীর্ঘ | ,, |
| * কার্লা ভাইরাস (Carla virus) | ,, | ,, | ,, |
| * পটী ভাইরাস (Poty virus) | ,, | ,, | ,, |
| * ক্লস্টেরো ভাইরাস (Clostero virus) | ,, | ,, | ,, |
| **(গ) আবরণহীন ছোট ডি. এন. এ ভাইরাস ঃ** | | | |
| * জেমিনি ভাইরাস (Gemini virus) | যুগল বর্তুল | ছোট | ss-ডি. এন. এ |
| **(ঘ) উদ্ভিদের আবরিত আর. এন. এ ভাইরাস ঃ** | | | |
| * রাবডো ভিরিডি (Rhabdoviridae) | দণ্ডাকৃতি | বড় | ss-আর. এন. এ |
| টমাটো স্পটেড উইল্ট ভাইরাস (Tomato Spotted Wilt Virus) | বর্তুলাকৃতি | বড় | ss-আর. এন. এ |

ds—দুই সূত্রযুক্ত (double stranded) ss—এক সূত্রযুক্ত (single stranded) ; *আন্তর্জাতিক ভাইরাস টাক্সোনমি কমিটি (ICTV) অনুমোদিত নাম।

**২.১৩ (ই) বহুঅংশযুক্ত উপগ্রহানুগ ও বিকলাঙ্গ ভাইরাস বা জীবাণুকণা (Multicomponent, satellite and defective viruses) ঃ**

(ক) বহুঅংশযুক্ত ভাইরাস ঃ বিভিন্ন উৎস থেকে ভাইরাস পরিস্রবণের সময় অবলম্বন বা সাসপেনসন (suspension) তৈরি করলে স্বাভাবিক কণাগুলি ছাড়া কিছু ছোট কণাও পাওয়া যায়। এইগুলি মূলতঃ পূর্ণাঙ্গ কণার

ভগ্ন অংশ। ভগ্ন অংশ হলেও এগুলি পূর্ণাঙ্গ কণার মতই ক্রিয়া-বিক্রিয়া করে। ফলে এই ভগ্নাংশ কণাগুলি পূর্ণাঙ্গ কণার সংক্রমণে বা সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ভগ্ন কণাগুলি 'ক্রমঘনত্বে অপকেন্দ্রিক ঘূর্ণায়ন' পদ্ধতির সাহায্যে আলাদা করার পর যে আলাদা আলাদা নিউক্লিওপ্রোটীন জাতীয় অবক্ষেপ (sediment) পাওয়া যায় তাদের বহু অংশযুক্ত জীবাণু-কণা বা ভাইরাস বলা হয়। এই জীবাণুকণাদের বিচ্ছিন্ন বংশবস্তু (split genome) যুক্ত ভাইরাসও বলা হয়। সাধারণতঃ এরকম একটি বহুঅংশী ভাইরাস থেকে তিনটি আলাদা অবক্ষেপ পাওয়া যায়। তিনটির নাম উর্দ্ধাংশ (T বা Top), মধ্যাংশ (M, Middle) ও নিম্নাংশ (B বা Bottom) বলা হয়। সাধারণতঃ বহু-অংশী জীবাণুকণার তিনটি স্বতন্ত্রীকৃত অংশের মধ্যে শুধু B ও M অংশই সংক্রামক এবং সংক্রমণ ক্ষমতা পূর্ণাঙ্গ কণার চেয়ে কম। উর্দ্ধাংশে শুধু মাত্র সংক্রমণ ক্ষমতাহীন আর. এন. এ থাকে। বীনের শুঁটীতে ছোপ ধরানো কণা (Bean Pod Mottle Virus), বরবটীর ছোপ ধরানো কণা (Cowpea Mosaic Virus), স্কোয়াসের ছোপ ধরানো কণা (Squash Mosaic), তামাকের রিংদাগ ধরানো কণা ( Tobacco Ring Spot) প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভাইরাসগুলি বহু অংশী গোষ্ঠীভুক্ত। এই ধরনের 'কণা' প্রায়ই অন্য কণার সাথে সংযোজিত হ'য়ে নতুন 'বর্গ' (strain) সৃষ্টি করে ; উদাহরণ আলফা আলফার ছোপ ধরানো কণা (Alfalfa Mosaic Virus)। ছোট ও বড় কণা সংযোজিত হ'য়ে বেশী সংক্রামক হতে পারে। উদাহরণ—তামাকের রাটল ভাইরাস, (Tobacco Rattle virus) যার কণা পোষক উদ্ভিদে সহজে মানিয়ে নিতে পারে।

(খ) উপগ্রহপম ভাইরাস বা জীবাণুকণা (satellite virus) : অন্য ভাইরাসের সংগে যুক্ত ও অন্য কণার উপর নির্ভরশীল থাকে যে সমস্ত কণা তাদের উপগ্রহপম (satellite) ভাইরাস বলা হয়। সংযুক্ত দুই জীবাণু-কণার পরস্পর নির্ভরশীলতা আবশ্যিক হলে (obligate) সেই সম্পর্ককে বলা হয় উপগ্রহপম নির্ভরশীলতা (satellitism)। উপগ্রহকণাটিকে অন্য যে কণাটি সংক্রমণ ক্রিয়াতে সাহায্য করে তাকে শক্তিদাতা কণা (activator) বলা হয়। উপগ্রহপম-তামাক শুকানো কণা (Satellite Tobacco Necrosis Virus) তামাকের শুকানো কণার (Tobacco Necrosis Virus) সাথে এই ভাবে সম্পর্কিত।

(গ) বিকলাঙ্গ ভাইরাস বা জীবাণুকণা (Defective viruses) : অনেক ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখা গেছে নিউক্লিক অম্লের কিছুটা অংশের অভাব থাকলে (deficient) সে তার খোলস (coat) গঠনে অক্ষম হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য সে অন্য জীবাণুকণার সহায়তায় খোলস গঠনে সক্ষম হয়। অন্য কিছু ক্ষেত্রে নিউক্লিক অম্লের অঙ্গবৈকল্য বা খুঁতের জন্য এমন প্রোটিন অণু সংশ্লেষণ করে যা তার নিউক্লিক অম্লের সাথে মিলে ভিরিয়ন কণা গঠনে অক্ষম হয়। এই রকম জীবাণুকণাদের বিকলাঙ্গ (defective) বলা হয়। এই সমস্ত জীবাণুকণা অস্থায়ী ধরনের হয়। তামাকের হলুদ ছোপ কণার ক্ষেত্রে অনেক সময় ক্যাপসিডের মধ্যে যথাযথ নিউক্লিকঅম্লও থাকে না।

## ২·১৪ জীবাণুকণা বা ভাইরাসের সংখ্যা বৃদ্ধি (Virus replication) :

ভাইরাস শুধুমাত্র জীবিত কোষেই সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সংখ্যাবৃদ্ধির রীতির দিক দিয়েও ভাইরাসদের অন্য জীবাণুর সাথে পার্থক্য অনেক।

(অ) বিভিন্ন ভাইরাস ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পোষক কোষে অনুপ্রবেশ করে। তবে সমস্ত জীবাণুকণা একই পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। জীবাণু-কণার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি সর্বপ্রথম ব্যাক্টিরিয়া আক্রমণকারী জীবাণু-কণা বা ফাজ (phage) এর ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট জানা যায়।

ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য প্রথমে পোষক-কোষে প্রবেশ করে। শুধুমাত্র নিউক্লিক অম্লটিই পোষক কোষে প্রবেশ করতে পারে। পোষককোষে কণার নিউক্লিক অম্ল সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, ও সমস্ত শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে। জীবাণুকণার নিউক্লিক অম্ল ইহার পর প্রোটিন সংশ্লেষণের জন্য সংকেত (code) প্রেরণ করে ও প্রোটিন সংশ্লেষণ সম্পন্ন করে। নিউক্লিক অম্লও সে এইভাবে সংশ্লেষিত করে। পরবর্তীস্তরে কণার গঠনের উপযোগী নিউক্লিক অম্ল ও প্রোটিন অণুগুলি যথাযথ ভাবে সংযুক্ত হ'য়ে নূতন ভাইরাস কণা গঠিত হয়। সাধারণতঃ প্রতিটি পোষক কোষে ১০ হইতে ১০০টি পর্যন্ত কণা তৈরি হতে পারে। প্রত্যেক জীবাণুকণারই নিজস্ব নির্দিষ্ট (specific) পোষক কোষ থাকে, সে প্রাণী, উদ্ভিদ বা জীবাণু যাই হোকনা কেন। পরীক্ষাগারে অবশ্য কিছু কিছু ভাইরাসকে স্বতন্ত্র 'কলা' তে সংখ্যাবৃদ্ধি করানো

সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ প্রাণী-জীবাণুকণাগুলির মুরগীর ডিমের মধ্যস্থ ভ্রূণে সংখ্যা বৃদ্ধির কথা বলা যায়। অবশ্য ঐ একই জীবাণুকণা পূর্ণাঙ্গ মুরগীর দেহে সংখ্যাবৃদ্ধিতে অক্ষম। বর্তমানে একটি প্রাণীর জীবাণু-কণাকে অন্য প্রাণীদেহে বা একটি উদ্ভিদের জীবাণুকণাকে অন্য উদ্ভিদ দেহে নানা প্রয়োজনে সংখ্যাবৃদ্ধি করানো সম্ভব হচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাঁদরের শরীরে মানুষের মাম্‌স (mumps) বা পোলিও (polio) জীবাণুকণার, বা শিম্পাঞ্জীর দেহে ইনফ্লুয়েঞ্জা জীবাণুকণা বা ইঁদুরের শরীরে র‍্যাবিস (Rabies) জীবাণুকণা প্রভৃতির কথা উল্লেখ করা যায়।

## ২·১৫ ভাইরাসের জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ :

ভাইরাসের প্রধান বা প্রায় একমাত্র জৈবনিক ক্রিয়া হচ্ছে বিভিন্ন জীবের রোগ সৃষ্টি। এরা বিভিন্ন জীব যথা প্রাণী, উদ্ভিদ, কীট-পতংগ ও অন্য জীবাণুর রোগ সৃষ্টি করে।

### (অ) জীবাণুকণা বা ভাইরাস দ্বারা প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টি :

ভাইরাস বিভিন্ন জীবের রোগ সৃষ্টি করলেও মূলতঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীর উপর রোগ সৃষ্টির যে ক্রিয়াকলাপ তা নিয়েই বিজ্ঞানীরা চিন্তা ভাবনা করেছেন।

উদ্ভিদ-জীবাণু-কণাদের মত প্রাণী-জীবাণুকণাদের মূলতঃ লক্ষণ দ্বারা নির্ণয় করা যায়না। কণাগুলি যে রোগ সৃষ্টি করে তা তাদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সংখ্যাবৃদ্ধি চক্রের ফলশ্রুতি। ভাইরাসগুলি অন্য জীবাণুর মত কোন নির্গতবিষ (exotoxin) তৈরি করেনা। সেজন্য এইসব কণাদের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া বোধগম্য হলে রোগের প্রকৃতিও বোঝা সম্ভব হয়। প্রাণী কোষে বা কলাতে কণার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটলে সেই সমস্ত কোষের জৈবিক বিকৃতি ঘটে যা প্রকাশ প্রায় শারীরবৃত্তিয় কাজকর্মে। এর ফলে প্রাণীটির মৃত্যুও ঘটে।

কিছু প্রাণীদেহের কণা রয়েছে যারা শুধুমাত্র শ্বাসযন্ত্র বা শ্বাসনালীর (respiratory tract) বিশেষ কোষেই সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে যেমন ইনফ্লুয়েঞ্জা কণা। অন্য বহু ভাইরাস আবার নানা ধরনের কোষে বা কলাতে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর জীবাণুকণার উদাহরণ—বসন্ত (small-pox)-এর জীবাণুকণা যা মানুষের চামড়া, ফুসফুস ও শরীরের মধ্যে

ও আরও বহু কোষে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এরা এক কলা থেকে অন্যতে রক্ত প্রবাহ মারফৎ স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করে।

**(ক) গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ভাইরাস বা কণা সংক্রমণ** (Invitro infections) :

যে সমস্ত কোষে ভাইরাসের আক্রমণ সম্ভব অর্থাৎ আক্রমণযোগ্য (susceptible) কোষ এবং যে সমস্ত কোষের প্লাসমা আস্তরণে (plasma membrane) কণার গ্রাহক (receptor) রয়েছে সেখানে কণা বিশোষিত (absorb) হয় এবং যে কোষে কণার জৈবনিক প্রয়োজনের সন্তুষ্টি হতে পারে সেখানেই কণার সংক্রমণ (infection) সম্ভব। সংক্রামিত কোষে যে ভাবে কণার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে তা জীবিত কোষ/কলাতে আবাদ (tissue culture) হিসাবে পরিচিত। এই সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি নিম্নরূপ। ১। আসঞ্জন (adsorption) স্তরে ভিরিয়ন পোষককোষের প্লাসমা আস্তরণে আসঞ্জিত হয় ; ২। গলাধঃকরণ বা পিনোসাইটোসিস (pinocytois) পদ্ধতিতে ভিরিয়ন কণাটির অনুপ্রবেশ (penetration) ঘটে ; ৩। কোষের মধ্যে ভিরিয়নের সাময়িক অবলুপ্তি (eclipse) ঘটে, যা উৎসেচক দ্বারা ক্যাপসিড-মুক্তি (decapsidation)-র ফলে হয় ; ৪। অবসরকালে (latent period) নতুন ভিরিয়নের শরীরের অংশগুলি গঠিত হয় ; ৫। গঠিত দেহাংশগুলি একত্রিত (assembly) হয় ; ৬। ভিরিয়নগুলি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ ভাবে গঠিত হয়, ৭। পোষক কোষের ধ্বংসের (lysis) মাধ্যমে নূতন ভিরিয়নগুলি মুক্ত হয়। পোলিওকণার ক্ষেত্রে সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া এরকম। আবার ইনফ্লুয়েঞ্জা কণার ক্ষেত্রে ভিরিয়ন গুলি কুঁড়ি ঝরা পদ্ধতিতে (budding-off) মুক্ত হয়। প্রক্রিয়াটি শেষ হতে প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগে।

ভাইরাসের সংখ্যাবৃদ্ধির সময় কোষের উপর যে প্রভাব দেখা যায় তাকে কোষরোগ প্রভাব (cytopathic effect) বলা হয়। বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত এই প্রভাবের একটি তালিকা (সারণী-৭) দেওয়া হল।

**সারণী ৭ : ভাইরাস বা জীবাণুকণার প্রভাব**

| প্রভাবের প্রকৃতি | কোন কণার ক্ষেত্রে |
|---|---|
| কোষ সংখ্যাবৃদ্ধি (Hyperplasia) | হারপিস সিমপ্লেক্স কণা (Herpes simplex) |
| বৃহৎ কোষ সৃষ্টি (Polycytosis) | হামরোগের কণা (Measles virus) |
| কোষ অভ্যন্তরে বস্তু সৃষ্টি (Inclusion Body) | বসন্তরোগের কণা (Pox virus) |
| কোষের শূন্যগর্ভতা (Vacuolation) | সিমিয়ান কণা (Simian virus) |
| কেন্দ্রের শূন্যগর্ভতা (Vacuolation) | শূকরের বসন্ত (Pig pox virus) |
| শুকান পচন (Necrosis) | পোলিও কণা (Polio virus) |
| অসুস্থ কোষ (Malignant Cell) | পাপোভা কণা (Papova virus) |

বাহ্যিক লক্ষণের দ্বারা জীবাণুকণাজনিত রোগের নির্ণয় প্রায় অসম্ভব। লক্ষণ দ্বারা সম্ভাব্য নির্ণয় (presumtive diagnosis) সম্ভব হলেও গবেষণাগারে সেরোলজী, জৈবরাসায়নিক বিক্রিয়া প্রভৃতি (serology, biochemical etc) পরীক্ষা দ্বারাই রোগ নির্ণয় করতে হয়। ভাইরাসজনিত রোগের ক্ষেত্রে অন্য জীবাণুজনিত রোগের মত জৈব-প্রতিরোধক অনাক্রম্যতা (antibody immunity) রোগ প্রতিরোধে খুব কার্যকরী হয়না। জীবাণু-কণাজনিত রোগ থেকে মুক্তির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হচ্ছে কোষে 'হস্তক্ষেপক-অণু' বা 'ইনটারফেরন' (interferon) নামক একপ্রকার প্রোটিন অণুর সৃষ্টি। এই ইনটারফেরন অণুগুলি কোষে ভাইরাস সংক্রমণের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয় এবং নির্দিষ্ট জীবাণুকণার বিরুদ্ধে কার্যক্ষম হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কণা-সংক্রমণের বিরুদ্ধে ইনটারফেরন অণুগুলি স্বতন্ত্র কোন প্রক্রিয়া দ্বারাও সৃষ্টি হতে পারে। জীবাণুকণার নিউক্লিক অম্ল থেকে 'সংবাদ অণু (message) আর. এন. এ 'প্রতিলিপি হিসাবে সৃষ্টি হবার (transcription) সময় 'ইনটারফেরন' ঐ সংবাদবাহক আর. এন. এ (messenger RNA) র সাথে রাইজোমের (ribosome) সংস্পর্শে এসে পলিসোম (polysome) গঠনে বাধা দেয়। আক্রান্ত কোষটির মৃত্যু হলেও জীবাণুকণা সৃষ্টির কাজে ছেদ পড়ে। ইদানীং যে সমস্ত 'ধীর-জীবাণু-কণা' (slow viruses) আবিস্কৃত হয়েছে যেমন চিনা

(CHINA বা Chronic Infectious Neuropathic Agents) ইত্যাদি বহুদিন ধরে রোগসৃষ্টি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

## (আ) ভাইরাস দ্বারা উদ্ভিদদেহে রোগ সৃষ্টি :

উদ্ভিদদেহের রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরাস অসংখ্য। তাদের সকলের পরিচয়ও জানা যায় নি। এইসব জীবাণুকণার মধ্যে অধিকাংশের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কেই সম্পূর্ণ ধারণা না থাকায় এদের সাময়িক ভাবে সৃষ্ট রোগের লক্ষণ অনুযায়ী অভিহিত করা হয়। অন্য কিছু পদ্ধতি যথা সেরোলজী (serology) ইত্যাদি দ্বারাও এদের স্বাতন্ত্র বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। তবে গঠন প্রকৃতি না জানা পর্যন্ত এদের সৃষ্ট লক্ষণ-বৈশিষ্ট্যের উপরই প্রধানতঃ নির্ভর করা হয়। জীবাণু-কণা উদ্ভিদদেহে বহুলাঙ্গবাহী (systemic) এবং স্থানিক (localised) উভয় প্রকার সংক্রমণ করতে পারে। লক্ষণের প্রকৃতি অনেকাংশে এর উপর নির্ভরশীল। একই ভাইরাস একটি পোষক উদ্ভিদে বহুলাঙ্গবাহী হয়েও অন্য পোষক উদ্ভিদে স্থানিক হতে পারে। এমনকি একই জীবাণুকণার বিভিন্ন বর্ণ (strains) বিভিন্ন স্বতন্ত্র লক্ষণ সৃষ্টি করতে সক্ষম। সবসময় যে লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাও নয়। ভাইরাস বা জীবাণুকণাজনিত রোগের লক্ষণের বহিঃপ্রকাশ না হলে সে অবস্থাকে বলা হয় অপ্রকাশ (inapparency)। লক্ষণের অপ্রকাশ স্থায়ী হলে তাকে বলা হয় স্থায়ী-অপ্রকাশ (latency) আর অস্থায়ী হ'লে বলা হয় অস্থায়ী-অপ্রকাশ (masking) (বস, ১৯৭১ ; Bos)। জীবাণুকণাজনিত উদ্ভিদ-রোগের লক্ষণের একটি ক্রম অনুযায়ী বহিঃপ্রকাশ ঘটে। প্রথমে স্থানিক লক্ষণ প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী স্তরে বহুলাঙ্গ সংক্রমণের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

## উদ্ভিদ দেহে ভাইরাস জনিত রোগের লক্ষণ :

বিভিন্ন উদ্ভিদে কণার আক্রমণজনিত যে সব লক্ষণ দেখা যায় তার দুটি দিক আছে—বাহ্যিক (external) ও অভ্যন্তরীণ (internal)।

বাহ্যিক লক্ষণগুলি বিজ্ঞানী বস-এর রীতি অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। (ক) বৃদ্ধিহ্রাস (growth reduction) জাতীয় লক্ষণ যা মটরের অবৃদ্ধি (stunt) বা বেগুনের তুলসীলাগা (litttle leaf) প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। এতে ভাইরাসের আক্রমণে বিভিন্ন ভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। (খ) রঙের

পরিবর্তন (color deviation) জাতীয় লক্ষণ আলুর হলুদ ছোপ (potato mild mosaic), চিনিবীটের হলুদ রোগ (Sugarbeet yellowing) ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। (গ) জলাভাব (water deficiency) মূলক লক্ষণ শশা ও আঙুরের ঢলা (Cucumber mosaic virus) বা বীনের শুকানো (Bean stipple streak) প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেখা যায়। (ঘ) শুষ্ক পচন (necrosis) এর লক্ষণ দেখা যায় তামাকের দাগধরা (Tobacco Ring spot), আলুর পাতাশুকান (Potato severe mosaic) বা লেবুর দ্রুত শুকানো (Quick decline) প্রভৃতির ক্ষেত্রে। উপরিউক্ত লক্ষণগুলি মূলতঃ শারীরস্থানিক অস্বাভাবিকতা (anatomical abnormality) জনিত অস্বাভাবিক রূপগ্রহণ (aberration)। অন্যান্যক্ষেত্রে কোষ ও কলার বিশৃঙ্খল গঠন (disorganization) জনিত যে সব লক্ষণ দেখা যায় সেগুলি নিম্নরূপ। (ঙ) কর্কসৃষ্টি (cork formation) মূলক লক্ষণ দেখা যায় লেবুর সোরোসিস (Citrus psorosis) বা আপেলের অমসৃন খোসা (Apple rough skin) প্রভৃতি ক্ষেত্রে। (চ) অপগঠন (malformation)এর লক্ষণ দেখা যায় কোকোর শাখা-স্ফীতি (Swollen shoot of cacao) বা পেঁপের পত্রকুঞ্চন (leaf curl) রোগে। আরও কিছু কণাজনিত রোগের ক্ষেত্রে উদ্ভিদ দেহে আক্রমণজনিত প্রভাবে কোষে কিছু অন্তর্ভূক্ত অংশ (inclusion body) সৃষ্টির ফলে বিবিধ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়।

(ছ) ভাইরাস জনিত উদ্ভিদ রোগের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ লক্ষণগুলি সম্পর্কে শারীরস্থানিক (anatomical) গবেষণা ভিত্তিতে দেখা যায় কোষবস্তুর বিভিন্ন পরিবর্তন (cytological deviation)। ফরাসীবীনের ক্ষেত্রেও সাদা ক্লোভার মোসেক রোগের (White clover mosaic) আক্রমণে এ জাতীয় পরিবর্তন দেখা যায়। এক্ষেত্রে পারেনকাইমাতে আঠাল (gummosis in parenchyma) বা শুষ্ক পচন (necrosis) প্রভৃতি পরিবর্তন অন্যতম। আলুর পাতা পাকানো (leaf roll) রোগে কন্দে অত্যধিক ক্যালোজ (callose) সৃষ্টিও এজাতীয় লক্ষণ। আপেলে রাবারি-উড ভাইরাস (Rubbery Wood Virus) এর আক্রমণে জাইলেম (xylem) ও ট্রাকিড (tracheid) এর বিকৃতি এবং লিগ্‌নিন জমা (lignification) হওয়ার অভ্যন্তরীণ লক্ষণ দেখা যায়।

**(ই) কীটের ভাইরাস দ্বারা সৃষ্টরোগ :**

কীট-পতংগের জীবাণুকণাজনিত রোগ মূলতঃ দুই প্রকারের দেখা যায়।

(ক) কীটের কিছু কণাজনিত রোগের ক্ষেত্রে কীট দেহের যে কোন কোষের মধ্যে প্রায়ই ভাইরাসগুলি অন্তর্ধৃ´ত (occluded) হ'য়ে বহুতলী প্রোটিন কেলাস (polyhedral protein crystal) সৃষ্টি করে বা দানা-দানা (granule) বস্তুতে পরিণত হয়, অথবা মাকুর আকৃতিযুক্ত (spindle shaped) কতকগুলি অংশেও পরিণত হয়। এই রকম পরিবর্তন কোষের যে কোন অংশে এমনকি কেন্দ্রেও হতে পারে। এইগুলিই অন্ত´ভুক্ত অংশ (inclusion body) নামে অভিহিত হয়। লেপিডপটেরা (Lepidoptera) গোষ্ঠীর কীটগুলি এবং কিছু কিছু হাইমেনপটেরা ( Hymenoptera), ডিপটেরা (Diptera) প্রভৃতি কীট-গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে ত্বকে রক্তে, চর্বি, শ্বাসনালিকাতে (trachea) বা কেন্দ্রে এই ডি. এন. এ কণাগুলি সংখ্যা বৃদ্ধি করে, দেহকলাগুলি গলিত করে এবং ত্বককে দুর্বল ক'রে বিস্ফোরিত করে। লেপিডপটেরা গোষ্ঠীতে আর একটি আর. এন. এ ভাইরাস কোষের বস্তু (cytoplasm) কে আক্রমণ করে। লেপিডপটেরার শুককীটের গ্রানুলোজ (granulose) রোগের ক্ষেত্রে দেহকলাতে লক্ষ লক্ষ দানা দেখা যায়। এক্ষেত্রে কণাটি ডি. এন. এ জাতীয়। আবার মেললন্থার (**Melolontha**) ওপর একটি আবর্তাকার জীবাণুকণার আক্রমণ হয় যেক্ষেত্রে অন্ত´ভুক্ত অংশগুলিও আবর্তাকার হয়।

(খ) দ্বিতীয় যে ভাইরাসজনিত কীট-রোগ দেখা যায় তাতে কোষের বস্তু (cytoplasm) তে কোন অন্ত´ভুক্ত অংশ থাকেনা। এধরনের কীট-রোগগুলির মধ্যে মৌমাছি-আক্রমণকারী জীবাণুকণা, ঝিঁঝিঁর পক্ষাঘাত (paralysis) রোগ, রেশম কীটের স্বচ্ছ-মস্তক রোগ, ভারতীয় গণ্ডারে পোকার মালয় রোগ বা ফল-মাছি বা ড্রসফিলার (**Drosophila**) সিগমা রোগ (Sigma) প্রভৃতি অন্যতম। এসব ক্ষেত্রে জীবাণুকণাগুলি বেশীরভাগই বতু´লাকার বিশতলী।

(গ) অন্য জীবের অর্থাৎ প্রাণী বা উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী বহু ভাইরাস ও বিভিন্ন কীটের শরীরে অবস্থান বা সংখ্যা বৃদ্ধি করে। মশা, ছারপোকা প্রভৃতি রক্ত শোষক কীটের শরীরে মনুষ্য রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকণা অবস্থান করে ও তাদের লালা নিঃসরণকারী গ্রন্থিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এ জাতীয়

জীবাণুকণাকেই আরবো জীবাণুকণা (Arbovirus) বলা হয়। বহু উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুকণাও এভাবে কীটের শরীরে অবস্থান করে।

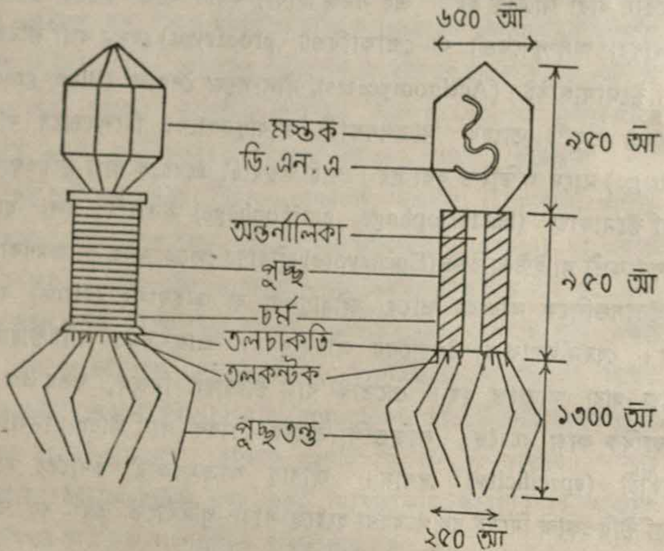
## (ঈ) অন্য জীবাণুর ভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট রোগ :

ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক ও শৈবাল জাতীয় জীবাণুরাও প্রায়শঃই তাদের স্ব-স্ব ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সমস্ত জীবাণু-কণার মধ্যে যাদের পোষক জীবাণুরা অসম্পূর্ণকেন্দ্রী বা প্রোকারিওট (procaryot) যেমন ব্যাক্টিরিয়া, আক্টিনোমাইসিটস (Actinomycetes), নীল-সবুজ শৈবাল (Blue green algae) প্রভৃতি তাদের আক্রমণকারী জীবাণুকণাদের বিশেষভাবে ফাজ (phage) নামে অভিহিত করা হয়। গোষ্ঠী অনুযায়ী এদেরকে ব্যাক্টিরিওফাজ, আক্টিনোফাজ (bacteriophage, actinophage) ইত্যাদি বলা হয়। সম্পূর্ণকেন্দ্রী বা ইউকারিওট (Eucaryote) জীবাণুর ক্ষেত্রে অবশ্য আক্রমণকারী ভাইরাসগুলিকে সাধারণ ভাবে জীবাণুকণা বা ভাইরাসই (virus) বলা হয়। যেমন ছত্রাক বা শৈবালের জীবাণুকণা। প্রায় সমস্ত ব্যাক্টিরিয়াই ফাজ দ্বারা আক্রান্ত হয়। প্রত্যেক ব্যাক্টিরিয়ারই নিজস্ব, স্বতন্ত্র এক বা একাধিক ফাজ রয়েছে। ফাজগুলি তাদের পোষক ব্যাক্টিরিয়া নির্বাচনে নির্দিষ্টী (specificity) দেখায়। জীবাণু আক্রমণকারী কণাদের মধ্যে ব্যাক্টিরিওফাজ নিয়েই বহু গবেষণা হয়েছে সারা পৃথিবীতে এবং বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

## (ক) ফাজের গঠন প্রকৃতি :

এ পর্যন্ত যতরকমের ফাজের কথা জানা গেছে তার মধ্যে লাঙ্গুল যুক্ত ও বর্তুলাকার ফাজই সর্বাধিক। এছাড়া সূত্রাকৃতি ও অন্য কিছু আকৃতির ফাজও দেখা গেছে দু-একটি। লাঙ্গুল যুক্ত ফাজগুলি আকৃতিতে কোনাচে হয় এবং এর একটি পুচ্ছ বা লাঙ্গুল (tail) ও একটি মস্তক (head) রয়েছে। এই ফাজগুলির আকৃতি হয় কিছুটা বেঙাচির (tadpole) মত। (চিত্র-১০)। বেঙাচি আকৃতির ফাজের মাথাটি সাধারণতঃ ষড়ভূজাকার, জোড়া পিরামিড আকৃতি যুক্ত প্রিজম (hexagonal bipyramidal prism) এর মত। দৈর্ঘ্যে ৯৫০ আঁ (আংস্ট্রম) ও প্রস্থে ৬৫০ আঁ। মস্তকের তলে আটকানো পুচ্ছটি ঋজু। দৈর্ঘ্যে ৯৫০ আঁ ও প্রস্থে ২৫০ আঁ। একটি ফাজ কণার ঘনফল (volume)

তার পোষক ব্যাক্টিরিয়া কোষের প্রায় ১০০০ ভাগের ১ ভাগ হয়। মস্তকটি একটি ফাঁপা খোলের মত এবং পুচ্ছটিও একটি ফাঁপা নালিকা, যার চতুর্দিক যেন চর্মাবৃত (sheath)। পুচ্ছের অন্তর্ভাগের নালিকাটিকে অন্তর্নালিকা (Core) বলা যায়। গায়ে জড়ান চর্ম (sheath) টি মূলতঃ কতকগুলি সমাকৃতি প্রোটিন




চিত্র ১০ : ফাজের গঠন প্রকৃতি

একক আবর্তাকারে সাজানোর ফলে তৈরি হয়। পুচ্ছ-নালিকার অন্তর্ভাগের ব্যাস ২৫ অাঁ। নালিকার নিকটবর্তী (proximal) প্রান্ত মস্তকে লাগানো থাকে আর দূরতম (distal) প্রান্তে লাগানো থাকে একটি ষড়ভূজাকার (hexagonal) চাকৃতি (plate)। ঐ চাকৃতিটির ছয় কোনে ছয়টি দৃঢ়, ছোট কন্টক (spike) থাকে যাদের বলা হয় তলকন্টক বা বেস স্পাইক (base spikes)। চাকৃতিটির নাম তল-চাকৃতি (base plate)। তলচাকৃতিতে অন্য ছয়টি দীর্ঘ তন্তু (fibre) লাগানো থাকে যাদের পুচ্ছ-তন্তু (tail-fibre) বলা হয়। পুচ্ছ-তন্তুগুলি দৈর্ঘ্যে ১৩০০ অাঁ ও প্রস্থে ২০ অাঁ। তন্তুগুলির দৈর্ঘ্যের মাঝে একটি ক'রে ভাঁজ (kink) থাকে। তল-চাকৃতিটির কেন্দ্রে

একটি ছিদ্র থাকে যার ব্যাস ২৫ অাঁ। ছিদ্রটি পুচ্ছ নালিকার বহির্মুখ হিসাবে কাজ করে।

অন্য আকৃতির ফাজ বা জীবাণুকণাগুলির মধ্যে অত্যন্ত ক্ষুদ্র, বর্তুলাকার ফাজ অন্যতম। বর্তুলাকার ফাজ গুলির মধ্যে $\Phi \times 174$ নামক ডি এন. এ যুক্ত ফাজ এবং কিছু আর. এন. এ যুক্ত ফাজ রয়েছে।

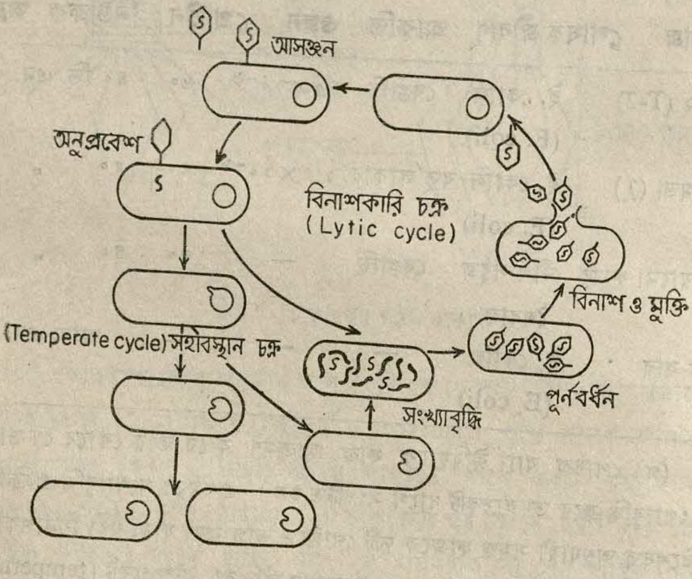
(খ) ফাজের রাসায়নিক প্রকৃতিও অন্য জীবাণুকণার মত। ফাজেরও দুটি রাসায়নিক অংশ যথা প্রোটিন ও নিউক্লিক অম্ল ( ডি. এন. এ ) রয়েছে। নিম্নলিখিত সারণীতে ( সারণী-৮ ) কয়েকটি ফাজের আকৃতি ও রাসায়নিক প্রকৃতি দেওয়া হল।

**সারণী ৮ : ফাজের আকৃতি ও রাসায়নিক প্রকৃতি**

| | | | | রাসায়নিক গঠন | |
|---|---|---|---|---|---|
| ফাজ | পোষক জীবাণু | আকৃতি | ওজন | প্রোটিন | নিউক্লিক অম্ল |
| টি-২ (T-2) | ই. কোলি (E. coli) | বেঙাচি | $৫\times১০^{-৬}$ | ৬০ | ৪০ ডি. এন. এ |
| লামডা (λ) | ই. কোলি (E. coli) | বর্তুলাকার | $১\cdot৫\times১০^{-৬}$ | ৫০ | ৫০ „ |
| সায়ানো ফাজ | নীল সবুজ শৈবাল | বেঙাচি | — | ৬০ | ৪০ „ |
| কে-বার | ই. কোলি (E. coli) | — | — | — | আর. এন. এ |

(গ) পোষক ব্যাক্টিরিয়াকে ফাজ আক্রমণ ক'রে তার কোষে যে ভাবে সংখ্যাবৃদ্ধি করে তা কয়েকটি ধাপে সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার বিশেষত্ব অনুযায়ী সমস্ত ফাজকে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, যথা বিনাশকারী বা লাইটিক (lytic) ফাজ ও সহাবস্থানকারী বা টেম্পারেট (temperate) ফাজ। লাইটিক ফাজগুলি পোষক কোষে অনুপ্রবেশ ক'রে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্ত স্তর পার হ'য়ে ব্যাক্টিরিয়া কোষটিকে বিনষ্ট (lyse) করে ও বর্ধিত সংখ্যায় কোষের বাহিরে আসে। এ ধরনের জীবনচক্রকে বলা

হয় বিনাশ চক্র (lytic cycle)। টেমপারেট ফাজগুলি পোষক ব্যাক্টিরিয়ার কোষে প্রবেশ করার পর ফাজ এর নিউক্লিক অম্ল কিছু সময়ের জন্য পোষক কোষের সাথে সহঅবস্থান করে। এই সহঅবস্থান পোষকের কয়েক পুরুষ (generation) ধরে চলা সম্ভব। যার ফলে পোষক ব্যাক্টিরিয়ার কোষ বিভাজনের সময় ফাজের নিউক্লিকঅম্লও দ্বিবিভাজন করে, দুই ব্যাক্টিরিয়া কোষে যায় ও দীর্ঘ সময় ধরে সহঅবস্থান করে। এই ধরনের ফাজকে সহঅবস্থানকারী ফাজ বা প্রোফাজ (pro-phage) বলা হয়। এই ধরনের পোষক কোষকে বলা হয় সহনশীল (lysogenic) বা লাইসোজেনিক কোষ। পরবর্তীকালে এই প্রোফাজ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে বিনাশকারী বা লাইটিক (lytic) অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও বিনাশচক্র অনুযায়ী জীবনচক্র শেষ করে। এ ধরনের জীবনচক্রকে বলা হয় সহাবস্থানচক্র বা টেম্পারেট চক্র (temperate cycle)। (**চিত্র-১১**)।




চিত্র ১১ : ফাজের জীবনচক্র

(ঘ) ফাজের ব্যাক্টিরিয়া কোষে জীবনচক্র সম্পাদন সম্পর্কে পুচ্ছ-যুক্ত ফাজগুলির ক্ষেত্রে নানা গবেষণা মাধ্যমে অনেক কিছু জানা গেছে। সমগ্র

জীবনচক্রটিকে পাঁচটি স্তরে ভাগ করা হয়। ১। আসঞ্জন (adsorption) স্তর : ব্যাক্টিরিয়া কোষ ও ফাজ কণা অনির্দিষ্ট (random) সংঘর্ষের মাধ্যমে পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। ফাজ তার পোষক কোষ সম্পর্কে অত্যন্ত নির্দিষ্ট (specific) প্রকৃতির। তাই শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পোষকের সাথে সংঘর্ষের ক্ষেত্রেই আসঞ্জন সম্ভব। এই আসঞ্জন ক্রিয়া ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীরেই ঘটে। ব্যাক্টিরিয়ার সংস্পর্শে আসার আগে ফাজের পুচ্ছ-তন্তুগুলি পুচ্ছের গায়েই জড়ানো থাকে। ব্যাক্টিরিয়ার সংস্পর্শে এলে মুক্ত হ'য়ে ব্যাক্টিরিয়ার কোষটিকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে। পরিবেশ এই আসঞ্জনের কাজে নানা প্রভাব রাখে। বিশেষতঃ কিছু ধনাত্মক আয়ন (cation) যেমন টি-৮ (T-8) এর ক্ষেত্রে $Ca^{++}$ বা লামডা (λ) র ক্ষেত্রে ম্যাগনেসিয়াম ($Mg^{++}$) এর উপস্থিতি ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীরের উপরের আধান (charge) প্রশমনের (neutr-alise) কাজে লাগে। টি-৪, টি-৬ প্রভৃতি ফাজ এর ক্ষেত্রে এল-ট্রিপটোফান (L-tryptophan) পুচ্ছ তন্তুর আবর্তন খোলার কাজে লাগে। ২। অনুপ্রবেশ (penetration) : ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীরে আসঞ্জিত পুচ্ছ-প্রান্তে লাইসোজাইম (lysozyme) উৎসেচকের সাহায্যে একটি ছিদ্র তৈরি হয়। পুচ্ছচর্মের (sheath) সংকোচনের শক্তি দ্বারা ফাজের মস্তিস্কস্থিত নিউক্লিক অম্ল মস্তিস্ক থেকে পুচ্ছনালিকা ও পরে কোষ প্রাচীরে সৃষ্ট ছিদ্রের মধ্য দিয়ে ব্যাক্টিরিয়ার কোষে অনুপ্রবেশ করে। নিউক্লিক অম্ল পোষক কোষে অনুপ্রবেশ করার ফলে বহিস্থ ফাজ খোলসটি বিনষ্ট (collapse) হয় ও 'অশরীরী' বা গোষ্ট (ghost) নামে অভিহিত হয়। ৩। পোষক কোষে ফাজের সংখ্যাবৃদ্ধি (intercellular development of phage) : কোষ মধ্যে ফাজের নিউক্লিক অম্লের সংখ্যাবৃদ্ধি হয় রৈখিক হারে। নিউক্লিক অম্লের পূর্বসূরী অণুর (precursor) এক তৃতীয়াংশ আসে ব্যাক্টিরিয়ারই ডি. এন. এ থেকে। অনুপ্রবেশের পর ফাজের বিশেষত্ব মত সংবাদ বাহক আর. এন. এ. (m. RNA) তৈরি হয়। তারপর মস্তিষ্ক ও পুচ্ছের জন্য গঠন মূলক প্রোটিন সংশ্লেষণ হয়। এই সংশ্লেষণে অ্যামিনো অম্ল আসে খাদ্যবস্তু থেকে। গঠন-মূলক প্রোটিনের আগে উৎসেচক প্রোটিন অণু তৈরি হয়। এই স্তরে ব্যাক্টিরিয়া-কোষে ফাজগুলির উপস্থিতি বোঝা যায় না। এজন্য এই স্তরের অন্যনাম, 'গ্রহণ' (eclipse) স্তর। ৪। পূর্ণবর্ধনস্তর (Maturation) : ফাজের

ডি. এন. এ ও প্রোটিনের সঞ্চয় (pool) গড়ে ওঠে, এবং ফাজকণার গঠন স্থরু হয়। প্রথমে ডি. এন. এ অণু সংশ্লেষিত (condensation) হয়। পরবর্তী স্তরে ডি. এন. এ-র চার পাশে প্রোটিন উপাঙ্গগুলি সহযোগে প্রথমে মস্তিষ্ক ও পরে পুচ্ছ তৈরি হয়। ৫। ব্যাক্টিরিয়ার বিনাশ ও ফাজের মুক্তি (lysis of bacferia & release of phages) : পোষক কোষটি সম্ভবতঃ লাইসোজাইমের সহায়তায় বিস্ফোরিত হয়। পোষক কোষ প্রতি কয়েক শত ফাজকণা মুক্ত হয়। দু'একটি ফাজ যথা এম-১৩ ($M_{13}$) প্রভৃতির ক্ষেত্রে পোষক কোষের বিস্ফোরণ ঘটে না। ফাজ ছিদ্র পথে নির্গত হয় (leak)।

সাধারণতঃ একটি ব্যাক্টিরিয়ার আবাদে (culture) ফাজের উপস্থিতি বিভিন্ন ভাবে বোঝা যায়। কঠিন খাদ্যমাধ্যমের (solid medium) ক্ষেত্রে প্লেক্ (plaque) বা ব্যাক্টিরিয়া-মুক্ত অঞ্চল হিসাবে দেখা যায় আর তরল খাদ্যমাধ্যমে ঘোলাটে আবাদ (turbid culture) স্বচ্ছ তরলে পরিবর্তিত হয় (clearing)।

## ২.২০ ব্যাক্টিরিয়ার আকৃতি ও জৈব প্রকৃতি :

ব্যাক্টিরিয়া একটি অতি ক্ষুদ্র, দৃঢ় (rigid), ও মূলতঃ এককোষী জীবাণু। ব্যাক্টিরিয়ার কোষে উদ্ভিদ-ক্লোরোফিল বা অন্য কোন রঙ (pigment) সাধারণতঃ থাকে না। এরা কোষের প্রস্থচ্ছেদের (transverse fission) মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিয়াস (nucleus) কোন সছিদ্র আস্তরণ (nuclear membrane) দিয়ে ঢাকা থাকে না। অন্য কোষ অঙ্গগুলিও সম্পূর্ণ কেন্দ্র যুক্ত (procaryote) জীবাণুদের মত উন্নত নয় এবং কোন একক আস্তরণে (unit membrane) ঢাকা নয়। ব্যাক্টিরিয়ার কোষে কোন রকম কোষরস-প্রবাহ (cytoplasmic streaming) দেখা যায় না। ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীর, শুঙ্গ (flagellum) প্রভৃতির গঠনও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া হিসাবে এদের অন্য জীবের মত কোন নির্দিষ্ট বংশবিস্তার চক্র দেখা যায় না। ব্যাক্টিরিয়ার কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াটিও বিশেষত্বে ভরা। এটি সমবিভাজন বা মাইটোসিস (mitosis) অথবা অর্ধবিভাজন বা মায়োসিস (meiosis) কোন নীতিই অনুসরণ করে না। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে কোষ বা কেন্দ্র কোনটিই সমান দুই ভাগে ভাগ হয় না। এই সমস্ত বিশেষত্ব

ব্যাক্টিরিয়াকে জীবাণুদের মধ্যে এক বিশেষ স্থান দিয়েছে। অনেক বিজ্ঞানী এই সমস্তকে আদিম জীবনের লক্ষণ বলে মনে করেন।

বর্তমানে ব্যাক্টিরিয়া বলতে উপরিউক্ত বিশেষত্ব যুক্ত কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর এক বিশাল গোষ্ঠীকে বোঝায়। বেশীর ভাগই অতিক্ষুদ্র ০·১৫ থেকে ১·৫ (μm) মাইক্রোমিটার ব্যাসের জীবাণু। তবে সর্ববৃহৎ ৫ মাইক্রোমিটার (μm) ব্যাসযুক্ত এবং দৈর্ঘ্যে ১-২ (μm) মাইক্রোমিটার থেকে সর্ববৃহৎ ৫০০ মাইক্রোমিটার (μm) পর্যন্ত ব্যাক্টিরিয়ার কথা জানা গেছে। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষুদ্রত্ব অন্যভাবেও দেখা যায়। যেমন ১ মিলিলিটার আয়তনে (volume) প্রায় $৬ \times ১০^{১৪}$ ব্যাক্টিরিয়া কোষের স্থান সঙ্কুলান হতে পারে বা এরকম একটি ব্যাক্টিরিয়ার আয়তন মাত্র $৬ \times ১০^{-১৪}$ মিলিলিটার।

জীবজগতে ক্ষুদ্রত্বের সুবিধা বা অসুবিধা কি হতে পারে? সুবিধার সম্ভাবনাগুলি হচ্ছে:—

(১) পৃষ্ঠদেশ (surface) ও আয়তনের (volume) অনুপাত ব্যাক্টিরিয়াতে অন্য জীবের তুলনাতে অত্যন্ত বেশী। একটি বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে এটি মাত্র ০·৩ হলে, মুরগীর ডিমের ক্ষেত্রে ১·৫, অ্যামিবার ক্ষেত্রে ৪০০·০ ও ব্যাক্টিরিয়ার ( ০·৫ মাইক্রোমিটার (μm) ব্যাস ) ক্ষেত্রে প্রায় ১·২ লক্ষ। ফলে ব্যাক্টিরিয়ার প্রতি একক আয়তনে জৈবনিকক্রিয়ার হার (metabolic rate) অত্যধিক। এজন্য একটি ব্যাক্টিরিয়া কোষ তার শরীরের ওজনের ১০০০—১০,০০০ গুন পরিমান ল্যাকটোস (lactose) আত্তীকরণ (metabolise) করে মাত্র ১ ঘণ্টায় যেখানে একজন মানুষ তার শরীরের ওজনের ১০০০ গুণ পরিমাণ লাক্টোস আত্তীকরণে ২·৫ লক্ষ ঘণ্টা সময় নেয়।

(২) ব্যাক্টিরিয়ার জৈবনিক যোগ্যতাও (metabolic efficiency) অতি উচ্চ। একটি ব্যাক্টিরিয়া কোষের জলীয় অংশ বাদে মোট শুষ্ক-বস্তুর (dry-matter) পরিমাণ যা থাকে তাতে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিনের সংখ্যা খুব বেশী হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রতিটি জৈবনিক বিক্রিয়াতে অন্ততঃ ১টি উৎসেচক প্রোটিন লাগালেও ব্যাক্টিরিয়া কোষে খুব স্বল্পসংখ্যক প্রোটিনেরই ব্যবস্থা রয়েছে। তবুও এই কোষ বহু জটিলঅণু সংশ্লেষণ করতে পারে। এতে এদের উচ্চ জৈবনিক যোগ্যতাই প্রমাণিত হয়।

## (অ) ব্যাক্টিরিয়া বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস :

ব্যাক্টিরিয়া সংক্রান্ত বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক অগ্রগতি পূর্বে (১·২) সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচিত হয়েছে। মোটামুটি সবক্ষেত্রেই ব্যাক্টিরিয়া-বিজ্ঞানের উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে নতুন নতুন গবেষণা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞানী রবার্ট কক্ (Robert Koch) যা সুরু করেছিলেন তা অবিচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়েছে। গত দু-তিন দশকে অবিশ্বাস্য গতিতে ও অকল্পনীয় পথে এই অগ্রগতি হয়েছে। এই সমস্ত গবেষণ-পদ্ধতি ও গবেষণা-লব্ধ ফল অন্য বহু বিষয়ে গবেষণা বা অন্য প্রকল্পে সহায়তা করেছে।

ব্যাক্টিরিয়ার সম্পর্কে গবেষণা প্রথমে এদের ক্ষুদ্রতার জন্য ধীরগতিতে অগ্রসর হয়। ব্যাক্টিরিয়ার রাঙানোর একটি সফল পদ্ধতি প্রথম প্রস্তাব করেন এরলিচ, ১৮৮২ (Ehrlich)। তবে পরে বিজ্ঞানী গ্রাম (Gram) রাঙানোর যে মূল্যবান পদ্ধতির প্রস্তাব করলেন সে'টি ব্যাক্টিরিয়ার রাঙানোর একটি পদ্ধতি ও তাদের প্রাথমিক শ্রেণীবদ্ধ করার প্রক্রিয়া ব'লে গৃহীত। পরে বিশেষ রাঙানো পদ্ধতিতে ব্যাক্টিরিয়ার কেন্দ্রের (nucleus) নির্ণয় সম্ভব হল বিজ্ঞানী রবাইনো (Robinow), বিসেট (Bisset) প্রভৃতির মূল্যবান অবদানে ও বিখ্যাত ফালজেন (Feulgen) রাঙানো পদ্ধতির আবিষ্কারের মাধ্যমে। আরও বহু বিশেষ ধরনের পদ্ধতি যথা অম্ল-অটল রাঙানো (acid fast), স্পোর রাঙানো (spore staining), শুঙ্গ রাঙানো (flagella staining) প্রভৃতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এই বিজ্ঞানের বহু উন্নতি হয়েছে। ব্যাক্টিরিয়া বিজ্ঞানের প্রধান ঘটনাবলী নিম্নে তালিকাবদ্ধ করা হল। সারণী-৯।

### সারণী ৯ : ব্যাক্টিরিয়া-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক বিকাশ

| সন | বিজ্ঞানী | গবেষণালব্ধ ফল |
|---|---|---|
| ১৬৭৬ | লীউভেনহোক | প্রথম ব্যাক্টিরিয়ার অস্তিত্ব ঘোষণা ও প্রদর্শন। |
| ১৭৭৩ | মুলার (Muller) | ভিব্রিও, ব্যাসিলাস (Vibrio, Bacillus) প্রভৃতি বিভিন্ন নামকরণ। |
| ১৮৩৮ | এরেনবার্গ (Ehrenberg) | "কীটাণুর" শ্রেণীবিন্যাস, চারটি গোষ্ঠীর নামকরণ। |

| সন | বিজ্ঞানী | গবেষণালব্ধ ফল |
|---|---|---|
| ১৭৮৪ | ডোলাণ্ড (Dolland) | অণুবীক্ষণযন্ত্রের তৈলসিক্ত আতসকাঁচ (oil-immersion lens) আবিষ্কার। |
| ১৮৭০ | আবে (Abbe) | কনডেনসর (condensor) আবিষ্কার। |
| ১৮৭২ | কন (Cohn) | বহু গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন। বহু ব্যাক্টিরিয়ার বিশেষত্ব আলোচনা-পূর্বক শ্রেণীবিন্যাস করেন। |
| ১৭৪৫ | নীডাম (Needham) | মৃতজাত প্রকল্পের প্রবক্তা। |
| ১৭৭৭ | স্পালানজানি (Spallanzani) | মৃতজাত প্রকল্পের বিরোধিতা ও স্বতজাত প্রকল্পের সমর্থন। |
| ১৮৫৪ | পাস্তুর (Pasteur) | হংস-গ্রীবাযুক্ত কাঁচপাত্র সাহায্যে স্বতজাত প্রকল্পের প্রমাণ। রোগের ব্যাক্টিরিয়াজনিত কারণ প্রমাণ। |
| ১৮৭৫ | কক (Koch) | রোগসৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়ার 'আবাদ' করেন। রোগ প্রমাণের নিয়মাবলী রচনা ও যথাযথ পদ্ধতির আবিষ্কার করেন। |
| ১৮৮২ | এরলিচ (Ehrlich) | ক্ষয় রোগের ব্যাক্টিরিয়ার রাঙানোর পদ্ধতি আবিষ্কার। |
| ১৮৮৪ | গ্রাম (Gram) | স্বতন্ত্রীকারক (differential) রাঙানো পদ্ধতি। |
| ১৮৮৮ | বাইজারিঙ্ক (Beijerinck) | মূল-অর্বুদ মাধ্যমে নাইট্রোজেন আবদ্ধ-কারী ব্যাক্টিরিয়া। |
| ১৮৯০ | ভিনোগ্রাডস্কী (Winogradsky) | মৃত্তিকায় ব্যাক্টিরিয়াজনিত নাইট্রি-ফিকেশন পদ্ধতি (nitrification)। |
| ১৮৮৮ | বুরিল (Burrill) | উদ্ভিদের ব্যাক্টিরিয়াজনিত রোগ ঘোষণা। |
| ১৯০৩ | চেস্টার (Chester) | ব্যাক্টিরিয়ার নির্ণয়মূলক পদ্ধতি লিপিবদ্ধকরণ। |

| সন | বিজ্ঞানী | গবেষণালব্ধ ফল |
|---|---|---|
| ১৯০৮ | বাইজারিঙ্ক (Beijerinck) | অ্যাজোটোবাক্টার আবিষ্কার। |
| ১৯২৩ | বার্গি (Bergey), সম্পাদক | বার্গির নির্ণয়মূলক ব্যাক্টিরিয়া বিজ্ঞানের সারগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ (Bergey's Manual of Determinative Bacteria) |
| ১৯২৮ | গ্রিফিথ (Griffith) | ট্রানসফরমেসন (transformation) প্রক্রিয়ার আবিষ্কার। |
| ১৯৪০ | বিসেট | ব্যাক্টিরিয়ার কেন্দ্র রাঙানোর পদ্ধতি। |
| ১৯৪৪ | অ্যাভারী, মাকলিওড ও মাকার্টি (Avery, Mcleod & Mc Carty) | টানসফরমেশন প্রক্রিয়ার প্রকৃতরূপ নির্ণয়। |
| ১৯৪৭ | টাটাম ও লেডেরবার্গ (Tatum & Lederberg) | ব্যাক্টিরিয়ার রিকমবিনেসন (recombination )আবিষ্কার। |
| ১৯৫০ | রবাইনো | ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিয়াস রাঙানোর পদ্ধতি আবিষ্কার। |
| ১৯৫০ | নভিক ও সিলার্ড (Novik & Szilard) | কেমোস্ট্যাট (chemostat) আবিষ্কার। |
| ১৯৫২ | লেডেরবার্গ | ব্যাক্টিরিয়ার মিউটেসন প্রমাণের বিখ্যাত পদ্ধতি রেপ্লিকা প্লেটিং (replica plating) আবিষ্কার। |
| ১৯৫২ | জিনডার ও লেডেরবার্গ (Zinder) | ব্যাক্টিরিয়ায় ট্রানসডাক্‌সন (transduction) আবিষ্কার। |

(আ) **ব্যাক্টিরিয়ার আকৃতি** (Shape of bacteria) :

আকৃতিগতভাবে সমস্ত ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে বেশীরভাগই এককোষী ও দৃঢ়প্রকৃতির। এই মূল গোষ্ঠী ছাড়া আরও ভিন্ন প্রকৃতির ব্যাক্টিরিয়া রয়েছে। তাদের মধ্যে খোলসযুক্ত (Sheathed), মুকুল ও উপাঙ্গযুক্ত (Budding and

appendaged), পিছলানো ব্যাক্টিরিয়া (Gliding bacteria), আবর্তাকার (Spirochete)সূত্রপম ব্যাক্টিরিয়াবা আক্টিনোমাইসিট্স (Actinomycetes), রঙ্গীনকোমল ব্যাক্টিরিয়া বা **মিক্সোব্যাক্টিরিয়া** (Myxobacteria), নমনীয় ব্যাক্টিরিয়া বা **মাইকোপ্লাসমা (Mycoplasmas) রিকেটসিয়া (Rickettsia), মাইকোব্যাক্টিরিয়া (Mycobacteria)** প্রভৃতি অন্যতম।

(ক) নির্দিষ্ট আকৃতি ও দৃঢ়কোষযুক্ত ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে তিনটি মৌলিক (fundamental) আকৃতি দেখা যায়। (১) বর্তুলাকার (spherical) কোষযুক্তগুলিকে ব্যাক্টিরিয়া বিজ্ঞানের ভাষায় কক্কাস (coccus) ও বহুবচনে কক্কি (cocci) বলা হয়। গ্রীক শব্দ kokkos-এর অর্থ বেরী (berry, বীচিহীন ক্ষুদ্র রসালো ফল)। এর থেকেই শব্দটির উৎপত্তি। সাধারণতঃ ০·২ হইতে ৪ (μm) পর্যন্ত ব্যাসযুক্ত বর্তুলাকার বা উপবৃত্তাকার (ellipsoidal) কোষগুলি এই দলভুক্ত। (২) ঋজুদণ্ডাকৃতি (straight rods) কোষযুক্ত ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে বলা হয় ব্যাসিলাস (bacillus) বা বহুবচনে ব্যাসিলি (bacilli)। গ্রীক শব্দ 'bakterion' পরিবর্তিত হয়ে ব্যাকট্রন (baktron) হ'ল, যার অর্থ একটি দণ্ড (a rod)। এই আকৃতির ব্যাক্টিরিয়া বহু রয়েছে। (৩) বক্রদণ্ড (bent rod) আকৃতিযুক্ত ব্যাক্টিরিয়াগুলি মূলতঃ দণ্ডাকৃতি হলেও দণ্ডটি বিভিন্ন ভাবে বাঁকা বা আনমিত থাকে। দণ্ডটিতে একটি বাঁক থাকলে ইংরাজী কমা (comma, ',') চিহ্নের মত দেখায়। তখন সেই সমস্ত বক্রদণ্ডাকৃতি ব্যাক্টিরিয়াকে **ভিব্রিও (Vibrio)** বলা হয়। কলেরা রোগের জীবাণু এরকম আকৃতিযুক্ত একটি ব্যাক্টিরিয়া। দণ্ডটি একাধিকবার বাঁকা বা আনমিত হলে দণ্ডের আকৃতি পেঁচান স্ক্রুর মত হয়। এই বক্রদণ্ডাকৃতি ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে **স্পাইরিলাম (Syirillum)** বলা হয়। এরা সাধারণতঃ জলে মৃতজীবি হিসাবে থাকে। এরা সকলেই গ্রামঋণাত্মক ও দুই বা এক মেরুতে শুঙ্গ যুক্ত।

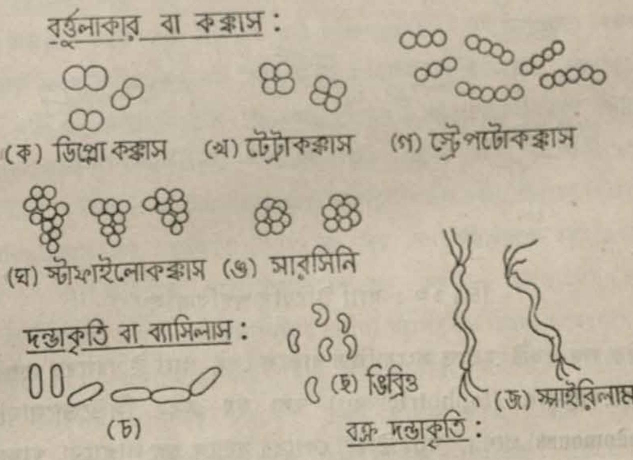
ঋজুদণ্ডাকৃতি ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে অবশ্য মৃতজীবি, পরজীবি বা গ্রাম ধনাত্মক ও ঋণাত্মক, উদ্ভিদ ও প্রাণীরোগ সৃষ্টিকারী—সবরকম ব্যাক্টিরিয়াই পাওয়া যায়।

(ই) **ব্যাক্টিরিয়া কোষের পুঞ্জীভবন** (aggregation) :

এককোষী ব্যাক্টিরিয়াদের মধ্যে কিছুকিছু গোষ্ঠীতে কোষগুলির একস্থানে দলবদ্ধ বা পুঞ্জীভূত হ'য়ে থাকার প্রবণতা দেখাযায়। বিশেষভাবে বর্তুলাকার ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে এই প্রবণতা খুবই। এই পুঞ্জীভবনের প্রকৃতি ব্যাক্টিরিয়াদের গণের বিশেষত্ব হিসাবে দেখা যায় ব'লে এদের ব্যাক্টিরিয়া নির্ণয়ের কাজেও লাগানো হয়েছে। বর্তুলাকার ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে পুঞ্জীভবনের প্রকৃতি বিশেষত্ব হিসাবে গ্রহণযোগ্য হলেও ঋজুদণ্ডাকৃতিদের ক্ষেত্রে যেটুকু পুঞ্জীভবন দেখাযায় তা অপরিবর্তনীয় (consistent) নয়।

বর্তুলাকার ব্যাক্টিরিয়ারও একদলের মধ্যে কোন পুঞ্জীভবন হয় না। এই ব্যাক্টিরিয়ার কোষগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি ও স্বতন্ত্র থাকে। এদেরকে সাধারণভাবে **মাইক্রোকক্কাস (Micrococcus)** বলা হয়। এদের মধ্যে গ্রাম ঋণাত্মক ও ধনাত্মক দুইই রয়েছে। ধনাত্মকগুলি মানুষের মুখে বা কিছু জন্তুর পাকস্থলীতে থাকে। আর ঋণাত্মকগুলির মধ্যে মনুষ্যরোগ সৃষ্টিকারী **মেনিনজোকক্কাস (Meningococcus), গনোকক্কাস (Gonococcus)** প্রভৃতি অন্যতম। বাকী সমস্ত বর্তুলাকার ব্যাক্টিরিয়া পুঞ্জীভূত হয়। মোট পাঁচরকম পুঞ্জীভবন দেখা গেছে। এই বিভিন্ন পুঞ্জ সৃষ্টির মূলে এইসব ব্যাক্টিরিয়ার কোষ বিভাজনের নির্দেশ (direction) ও সংখ্যা রয়েছে। বর্তুলাকার কোষগুলি পুঞ্জীভূত অবস্থাতে পরস্পর মধ্যবর্তী প্রাচীরগুলিকে চাপা করে রাখে। (১) বর্তুল বা গোলকগুলি যখন পাশাপাশি যুগল হিসাবে থাকে তাদেরকে **ডিপ্লোকক্কাস (Diplococcus)** বলা হয়। উদাহরণ মনুষ্যরোগসৃষ্টিকারী **Diplococcus pneumoniae,** যাদেরকে পূর্বে নিউমোকক্কাস (Pneumococcus) বলা হত। (২) পাশাপাশি দুই বা ততোধিক গোলকের নেকলেশ বা মালার আকৃতি গ্রহণকে বলা হয় **স্টেপটোকক্কাস**। এক্ষেত্রে 'streptos' শব্দের অর্থ মালার মত পাকান (twisted)। এক্ষেত্রেও বিভাজনের প্রকৃতি একই তলে (plane) তবে একাধিকবার বিভাজন হয়। দুধ ট'কে যাওয়ার (souring) কারণ যে ব্যাক্টিরিয়া **Streptococcus lactis,** সেটি তিনটি করে গোলকের মালাকৃতি ব্যাক্টিরিয়া। (৩) ব্যাক্টিরিয়া পুঞ্জে চারটি গোলক দুটি ক'রে উপর-নীচে সাজানো থাকলে তাদের বলা হয় **টেট্রাকক্কাস (Tetracoccus)**। দু'টি তলে (plane) একবার করে পরস্পর লম্বভাবে

বিভাজনের ফলে এরকম পুঞ্জ সৃষ্টি হয়। **পেডিকক্কাস (Pedicoccus)**, **গাফকিয়া (Gaffkya)** প্রভৃতি ব্যাক্টিরিয়া এই শ্রেণীভুক্ত। (৪) যে সব ক্ষেত্রে ব্যাক্টিরিয়াপুঞ্জে কোষগুলি এলোমেলোভাবে সাজানো অবস্থাতে একটি আকৃতি যা ছবিতে কিছুটা আঙুর গুচ্ছের মত দেখায় সেক্ষেত্রেও বিভাজন দু'টি তলে হয় কিন্তু তল দুটি পরস্পর সমকোনে থাকে না। এদের বলা হয় **স্টাফাইলোকক্কাস (Staphylococcus)**। শব্দটির উৎপত্তি গ্রীকশব্দ স্টাফাইলোস থেকে যার অর্থ আঙুরগুচ্ছ। মানুষের ত্বকের বিভিন্ন সংক্রামক রোগে এই ব্যাক্টিরিয়া (**S. aureus**) খুবই পরিচিত। (৫) আটটি গোলক চারটি চারটি করে দুই থাকে সাজানো থাকলে, প্যাকেটটির সবদিক থেকেই চারটি করে গোলক দেখা যায়। এদের বলাহয় **সারসিনা (Sarcina)**। এক্ষেত্রে তিনটি পরস্পর সমকোনে অবস্থিত তলে ১ বার করে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার ফলে এই আকৃতি আসে ( **চিত্র—১২** )

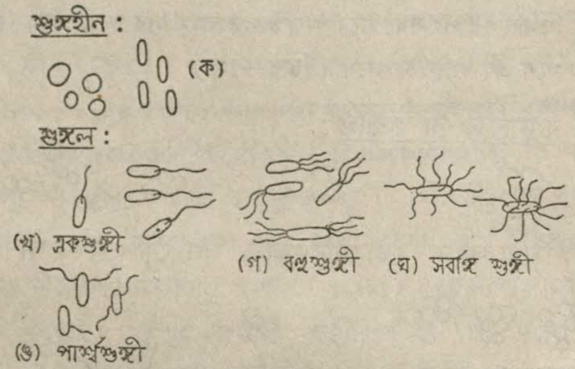



চিত্র ১২ : ব্যাক্টিরিয়ার আকৃতি ও পুঞ্জীভবন

বর্তুলাকার ব্যাক্টিরিয়াগুলি সাধারণতঃ গ্রামধনাত্মক। পুঞ্জীভবনের প্রকৃতি এদের একটি গণভিত্তিক বিশেষত্ব। দণ্ডাকৃতি ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে **ডিপ্লোব্যাসিলি (Diplobacilli)** বা **স্ট্রেপটোব্যাসিলি (Streptobacilli)** প্রভৃতি পুঞ্জীভবন দেখা গেলেও সেগুলি কোন গোষ্ঠীগত অটল বিশেষত্ব নয়।

(ঈ) **ব্যাক্টিরিয়ার শুঙ্গ ও শুঙ্গবিন্যাস** (flagella and flagellation) ঃ

সাধারণতঃ কিছু ব্যাক্টিরিয়ার কোষে এক বা একাধিক শুঙ্গ লাগান থাকে। যে সমস্ত ব্যাক্টিরিয়ার শুঙ্গ থাকেনা তাদের শুঙ্গহীন বা অ্যাট্রিকাস (atrichous) বলা হয়। সমস্ত বর্তুলাকার ব্যাক্টিরিয়াই শুঙ্গহীন। সমস্ত বক্রদণ্ডাকার ও প্রায় অর্ধেক ঋজুদণ্ডাকার ব্যাক্টিরিয়া শুঙ্গযুক্ত। শুঙ্গযুক্ত ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াতে বিভিন্ন সংখ্যায় ও পদ্ধতিতে শুঙ্গগুলি সাজানো থাকে। যে ব্যাক্টিরিয়াতে একটিমাত্র শুঙ্গ যেকোন একটি মেরুতে লাগানো থাকে তাদের একশুঙ্গী বা মোনোট্রিকাস (monotrichous) বলা হয় যেমন **জ্যান্থোমোনাস (Xanthomonas)** গণ। **(চিত্র—১৩)**




চিত্র ১৩ ঃ ব্যাক্টিরিয়ার শুঙ্গবিন্যাস

একাধিক শুঙ্গ একটি মেরুতে সংযোজিত থাকলে সেই ব্যাক্টিরিয়াদের বহুশুঙ্গী বা লোফোট্রিকাস (lophotrichous) বলা হয় যেমন **সিউডোমোনাস (Pseudomonas)** গণে। ব্যাক্টিরিয়া কোষের সর্বাঙ্গে শুঙ্গ লাগানো থাকলে তাদেরকে সর্বাঙ্গশুঙ্গী বা পেরিট্রিকাস (peritrichous) বলা হয় যেমন **আরউইনিয়া (Erwinia)** গণে। কখনও কখনও শুঙ্গ ব্যাক্টিরিয়া কোষে অন্যস্থানেও লাগানো থাকে। এদেরকে পার্শ্বশুঙ্গ (sub-polar) বলা হয় যেমন **আগ্রোব্যাক্টিরিয়াম (Agrobacterium)** গণে। তবে শুঙ্গ ব্যাক্টিরিয়ার কোষের স্থায়ী বা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। এছাড়া উপরিউক্ত সাধারণ শুঙ্গবিন্যাস রীতি ছাড়া অন্যরকমের বিন্যাসও (variation) দেখা যায়।

ইদানীং দু'একটি শুঙ্গহীন **আরউইনিয়া** বা শুঙ্গযুক্ত **করাইনেব্যাক্টিরিয়াম** (Corynebacterium) বা ছাড়াছাড়া সর্বাঙ্গ শুঙ্গযুক্ত (sparsely peritrichous) **অ্যাগ্রোব্যাক্টিরিয়াম** গণের ঘোষণা এই ধারণা প্রমাণ করেছে।

ব্যাক্টিরিয়া কোষের আকৃতি ও বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোচনাতে প্রথমেই সাধারণ এককোষী, দৃঢ় ব্যাক্টিরিয়াগুলি ছাড়া অন্যান্য বিশেষ ধরনের আকৃতি ও বিশেষত্ব আলোচিত হচ্ছে।

(উ) কয়েকটি বিশেষ ধরনের ব্যাক্টিরিয়ার আকৃতি ও বিশেষত্ব :

সমগ্র ব্যাক্টিরিয়া গোষ্ঠীর সদস্যগুলির অপরিসীম বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমে অসাধারণ ও বিশেষ আকৃতিযুক্ত ব্যাক্টিরিয়ার গোষ্ঠীগুলির পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

**(ক) সালোকসংশ্লেষক ব্যাক্টিরিয়া** (Photobacteria) :

আকৃতিগতভাবে এরা সাধারণ ব্যাক্টিরিয়ার মতই। তবে সৌরশক্তি থেকে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে এরা শক্তিসংগ্রহে সক্ষম। এদের কোষে এর জন্য প্রয়োজনীয় রঙ বা পিগমেন্ট (pigment) রয়েছে। সাধারণতঃ আর্দ্র মাটিতে, জলাপরিবেশে বা স্থানে, এমনকি সমুদ্রজলে যতদূর আলো পৌঁছায় ততদূর পর্যন্ত এদের পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বেগুনী-গন্ধক ব্যাক্টিরিয়া (Purple sulfur bacteria) ও সবুজ-গন্ধক ব্যাক্টিরিয়া (Green sulfur bacteria) গন্ধককে ব্যবহার করে তাদের সালোকসংশ্লেষণের কাজে। ব্যাক্টিরিয়ার সালোকসংশ্লেষণ শুধু অবাত অবস্থাতেই হয়। ব্যাক্টিরিয়াগুলি ১-২০ মাইক্রোমিটার (µm) ব্যাসযুক্ত এবং গবেষণাগারে আবাদযোগ্য। এদের মধ্যে বর্তুলাকার, ঋজুদণ্ডাকার, ভিব্রিও, স্পাইরিলাম প্রভৃতি সবরকম আকৃতিই রয়েছে। একটি গোষ্ঠীর শুঙ্গও রয়েছে। সবুজ ব্যাক্টিরিয়াগুলির রঞ্জক কোষঅঙ্গে ব্যাক্টিরিওক্লোরোফিল (bacteriochlorophyll) থাকে আর বেগুনী ও বাদামীগুলির ক্ষেত্রে ব্যাক্টিরিওক্লোরোফিলের সাথে কারটিনয়েডও (carotenoid) থাকে। প্রথমোক্ত দলের ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে ক্লোরোব্যাক্টিরিয়েসি (Chlorobacteriaceae) পরিবার-(family) ভুক্ত এবং দ্বিতীয় দলেরগুলিকে থায়োরোডেসি ও অ্যাথায়োরোডেসি (Thiorodaceae & Athiorodaceae) পরিবারভুক্ত করা হয়েছে।

এইসমস্ত ব্যাক্টিরিয়া এণ্ডোস্পোর গঠন (endospore) করে না। এদের একদল ব্যাক্টিরিয়া আবার নাইট্রোজেন গ্যাসকে জৈবনাইট্রোজেনে পর্যবসিত করতে বা নাইট্রোজেন আবদ্ধ (N-fixation) করতে সক্ষম। এজাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধিতে যেহেতু অক্সিজেন লাগেনা তাই বহু জীবাণুবিজ্ঞানী মনে করেন সৃষ্টির প্রথম দিকে—যখন আবহাওয়াতে অক্সিজেন ছিল না তখন এদের উদ্ভব সম্ভব ছিল।

(খ) **মাইকোব্যাক্টিরিয়া** (Mycobacteria) ঃ

মাইকোব্যাক্টিরিয়াগুলি দীর্ঘ, দণ্ডাকৃতি ও গ্রামঋণাত্মক বিক্রিয়াযুক্ত। এদের আকৃতি পরিবর্তনশীল। কোষের বাহিরের রেখা অসমান (irregular) এবং কোষ প্রায়শঃই শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়। এণ্ডোস্পোর (endospore) গঠন করেনা। সময়সময় কোষ পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে মালার আকৃতি ধারণ করে। এদের মধ্যে যথার্থ সচল (motile) ব্যাক্টিরিয়া নাই। রাঙানোয় হচ্ছে এরা অম্লঅটল (acid fast)। ব্যাক্টিরিয়াগুলি অত্যন্ত অক্রিয় (inert) ধরনের বস্তু যথা পারাফিন বা বেনজিন ভাঙ্গতে সক্ষম। জৈবনিক প্রক্রিয়া মূলতঃ সবাত। এদের মধ্যে অতিপরিচিত একটি মনুষ্যরোগ ( যক্ষ্মা ) সৃষ্টিকারী প্রজাতি ( species ) হচ্ছে **মাইকোব্যাক্টিরিয়াম টিউবারকুলোসিস ( Mycobacterium tuberculosis )**। কুষ্ঠরোগের জীবাণুও ( **M. leprae** ) আরএকটি এজাতীয় ব্যাক্টিরিয়া।

(গ) **পিছলানো ব্যাক্টিরিয়া** ( Gliding Bacteria ) ঃ

এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ১'৫ মাইক্রোমিটারেরও ( µm ) কম ব্যাসযুক্ত দণ্ডাকৃতি এই ব্যাক্টিরিয়াগুলির কোষপ্রাচীর নমনীয়। নমনীয়তার জন্য কোষগুলি সহজেই কঠিন বস্তুর উপর পিছলাইতে সক্ষম হয়। জলে ভাসমান অবস্থাতে এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি সর্পিলগতিতে চলাচল করে। ব্যাক্টিরিয়াগুলির কোষপ্রাচীরের বহির্ভাগের আঠালপদার্থর ( slime ) স্তরটি খুবই পুরু। এই ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে গন্ধক-উৎসারী ঝর্ণাতে অবস্থানকারী **বেগিঅটা** ( **Beggiota** ) অন্যতম। আরেকটি গণ হচ্ছে **থায়োথিক্স** ( **Thiothrix** ), যার কোষগুলি দীর্ঘতর ও মালার মত ( chain ) সাজানো থাকে এবং সমগ্র কোষমালাটি আঠাল আস্তরণে ঢাকা থাকে।

এদের বেশীরভাগই গ্রামঋণাত্মক এবং দ্বিবিভাজন পদ্ধতিতেই সংখ্যাবৃদ্ধি করে। মানুষ ও অন্যকিছু জীবের মুখের মধ্যেও একপ্রকার বহুকোষী পিছলান ব্যাক্টিরিয়া দেখা যায় যার নাম **সাইমনসিয়েলা (Simonsiella)**।

**(ঘ) রঙীন কোমল ব্যাক্টিরিয়া** ( Myxobacteria ) :

এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি দণ্ডাকৃতি, নমনীয় এবং কোমলকোষপ্রাচীর যুক্ত। যেকোন চাপে একটি চূর্ণীভূত কোষবস্তুতে পরিণত হয়। কোনকোন ক্ষেত্রে দণ্ডাকৃতি কোষটির মেরু দুটি সূচাল হয়। সংখ্যাবৃদ্ধিকালে প্রচুর আঠালো পদার্থ সৃষ্টি হওয়ার ফলে দলবদ্ধ 'আবাদ'টির আস্তে আস্তে উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, শাখা-প্রশাখার মত বিভিন্ন দিকে বৃদ্ধি হয় এবং ছোটখাট উদ্ভিদের আকৃতি গ্রহণ করে। এই গোষ্ঠীভুক্ত ব্যাক্টিরিয়া বেশীরভাগই লাল রঙের হয়, যদিও কিছু কমলা, হলুদ অথবা সবুজ ইত্যাদি রঙেরও হয়। এসমস্ত রঙের জন্য বিভিন্ন রঞ্জকপদার্থ ( pigment ) যথা কারটিনয়েড, মেলানিন ( melanin ) প্রভৃতিই দায়ী বলে জানা গেছে। এই সমস্ত ব্যাক্টিরিয়া সাধারণতঃ মাটিতে বা পচনশীল জৈবপদার্থে বসবাস করে, যদিও কিছু সামুদ্রিক জাতও রয়েছে। এরা সাধারণতঃ সবাত ধরনের জীবাণু। কিছু রঙীনকোমল ব্যাক্টিরিয়া 'ব্যাক্টিরিয়া ফল'(fruiting body)ও তৈরি করে যার মধ্যে ক্ষুদ্র 'মাইক্রোসিষ্ট' ( microcyst ) নামক স্থিরানঅঙ্গ ( resting body ) থাকে। এজাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে **কণ্ড্রমাইসেস** ( **Chondromyces** ) ও **স্টিগমাটেলা** ( **Stigmatella** ) অন্যতম। মাইক্রোসিষ্টগুলি ঠিক এণ্ডোস্পোরের মত না হলেও কিছুটা উষ্ণতা, শুষ্কতা ইত্যাদি সহনশীল। যে গোষ্ঠীটি ফল তৈরি করে তারমধ্যে একটি **কণ্ড্রোকক্কাস কলামনারিস** ( **Chondrococcus columnaris** ) মাছের রোগসৃষ্টিকারী হিসাবে পরিচিত।

**(ঙ) আবর্তাকার ব্যাক্টিরিয়া** ( Spirochetes ) :

তরঙ্গায়িত আকৃতিযুক্ত দীর্ঘ রজ্জুর মত এই ব্যাক্টিরিয়া গোষ্ঠীর কোষ প্রাচীর নমনীয়। পরিমাপে ৪—৫০০ মাইক্রোমিটার ( μm ) পর্যন্ত দৈর্ঘ্য। দীর্ঘ রজ্জুর মত কোষটির একটি অংশুর মত অক্ষরেখা ( axial filament ) থাকে যার চারপাশে ঢেকে থাকে কোষবস্তু। অক্ষরৈখিক অংশুটি দুটি সূত্র দ্বারা গঠিত ও আকৃতিতে শুঙ্গের মত। ব্যাক্টিরিয়াগুলির চলন উক্ত অক্ষরৈখিক

অংশু দ্বারাই পরিচালিত। তবে কিছু আবর্তাকার ব্যাক্টিরিয়ার কোষের বহির্ভাগে লাগানো শুঙ্গও থাকে। এই গোষ্ঠীর ব্যাক্টিরিয়া অবাত এবং এদের আবাদ কষ্টসাধ্য। কিছু আবর্তাকার ব্যাক্টিরিয়া জলে বসবাস করে। অন্যকিছু প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টি করে। উদাহরণস্বরূপ সিফিলিস রোগের কারণ **ট্রেপোনেমা** ( **Treponema** ) বা পুনরাক্রমণকারী জ্বরের ( relapsing fever ) কারণ **বোরেলিয়া** ( **Borrelia** ) প্রভৃতি অন্যতম।

(চ) **সূত্রপম ব্যাক্টিরিয়া** (Actinomycetes) :

আকৃতি বা গঠনপ্রকৃতির দিকথেকে এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি প্রায়শঃই সূত্রাকার, শাখা-প্রশাখাযুক্ত। সূত্রাণু (hypha) গুলি দেওয়াল-(septa) বিহীন এবং ব্যাস অন্য ব্যাক্টিরিয়ার মত ১·৫ মাইক্রোমিটারের (μm) বেশী নয়। কিছুটা অঙ্গ-বৃদ্ধির পর সূত্রগুলি ডগাতে ছিঁড়ে গিয়ে ক্রমান্বয়ে এককোষী, দণ্ডাকৃতি ১·৫ × ২·৫ মাইক্রোমিটার (μm) মাপের কোষ বা স্পোর সৃষ্টি করে। এরা সকলেই গ্রামধনাত্মক।

এই ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে একটি উপগোষ্ঠী রয়েছে যারমধ্যে **নোকারডিয়া** (**Nocardia**) **আক্টিনোমাইসেস** (**Actinomyces**) প্রভৃতি ব্যাক্টিরিয়া অন্য সাধারণ ব্যাক্টিরিয়ার মত আঠালো কলোনী (colony) গঠন করে। এরা আকৃতিতেও ক্ষুদ্রতর, ১০০ মাইক্রোমিটার (μm) ব্যাস যুক্ত। দ্বিতীয় উপগোষ্ঠীর মধ্যে **ষ্ট্রেপটোমাইসেস** (**Streptomyces**), **মাইক্রোমনোস্পোরা** (**Micromonospora**) ইত্যাদি ব্যাক্টিরিয়া রয়েছে। এদের কলোনী শক্ত, শুষ্ক ও খড়ি-গুড়ার মত গুঁড়াগুঁড়া।

সূত্রপম ব্যাক্টিরিয়াগুলি সবাত প্রকৃতির, সাধারণতঃ মাটিতে বসবাস করে এবং রঞ্জকপদার্থ (pigment) ও বীজঘ্ন বা অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotics) সৃষ্টি করতে পারে।

(ছ) **খোলস-আবৃত ব্যাক্টিরিয়া** (Sheathed bacteria) :

এগুলি বহুকোষী সূত্রাকার (filamentous) ব্যাক্টিরিয়া। এই সূত্রগুলি একাধিক কোষ জুড়ে মালার আকৃতি ধারণ করে। সম্পূর্ণ মালাটি একটি খোলসে (sheath) আবরিত থাকে। খোলসটি লাইপোপ্রোটিন-পলিসাকারাইড

দ্বারা গঠিত (lipoprotein polysaccharide)। এর প্রকৃতি অন্যদের কোষ-প্রাচীর থেকে আলাদা। এগুলি সাধারণতঃ জলে বসবাস করে। এদের খোলসের গায়ে লৌহ ও ম্যাঙ্গানীজের অক্সাইড জমে থাকে। বহুক্ষেত্রে এরা জলাশয়ে বাদামী রঙের ফেনাভর্তি স্তুপ (scum) তৈরি করে। ঠিক এই কারণে তারা জঞ্জালপরিশ্রুতকরণ ব্যবস্থার (sewage treatment plant) পাইপ আবদ্ধ করে ফেলে। একক কোষগুলি দণ্ডাকৃতি, শুঙ্গযুক্ত ও গ্রামঋণাত্মক। এজাতীয় একটি ব্যাক্টিরিয়া হচ্ছে **স্ফেরোটিলাস (Sphaerotilus)**।

(জ) **মুকুল ও বহিরঙ্গ যুক্ত ব্যাক্টিরিয়া** (Prosthecate and Budding bacteria) :

এই ব্যাক্টিরিয়াগোষ্ঠীর বিশেষত্ব হিসাবে দেখাযায় কোষের একদিকে লাঙ্গুলের মত একটি বহিরঙ্গ (prostheca) সংযোজিত থাকে। এই বহিরঙ্গের মুখটি কোন কঠিনবস্তুতে বদ্ধ থাকতে পারে। সংখ্যাবৃদ্ধির সময় এরা দৈর্ঘ্যে বাড়ে এবং বিচ্ছিন্ন হয়। নবজাতক ব্যাক্টিরিয়ার শুঙ্গ থাকে কিন্তু বহিরঙ্গ থাকে না। পরবর্তীকালে উক্ত শুঙ্গের স্থলে বহিরঙ্গ সৃষ্টি হয়। কোষের কোষবস্তু বহিরঙ্গ (prostheca) পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এজন্যে বহিরঙ্গ ব্যাক্টিরিয়া কোষের অন্য উপাঙ্গগুলি (appendage) থেকে আলাদা ধরনের। **কলোব্যাক্টর (Caulobacter)** এজাতীয় একটি ব্যাক্টিরিয়া।

যে সমস্ত ব্যাক্টিরিয়া কোষগাত্রে সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুকুল (bud) সৃষ্টি করে তাদের সংখ্যা ব্যাক্টিরিয়া জগতে খুবই সীমিত। সালোকসংশ্লেষক **রডোমাইক্রোবিয়াম (Rhodomicrobium)** একটি এজাতীয় ব্যাক্টিরিয়া। এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি সাধারণতঃ সবাত, মাটি ও জলে বসবাস করে। ঠাণ্ডা জলের **প্ল্যাঙ্কটোমাইসেস (Planktomyces)** এজাতীয় ব্যাক্টিরিয়া।

(ঝ) **নমনীয় ব্যাক্টিরিয়া বা দি মলিকিউটস্** (The Mollicutes ; The Mycoplasmas) :

এই ব্যাক্টিরিয়াগুলির আকৃতি পরিবর্তনশীল। প্রায়শঃই বর্তুলাকার বা উপবৃত্তাকার দেখায়। এছাড়া বিভিন্ন অবস্থাতে ও আকৃতিতে থাকতে পারে। পরিমাপে অতিক্ষুদ্র, ৮০০ মিলিমাইক্রন (mμ) ব্যাসযুক্ত। কোষের

বাহিরের আস্তরণ হিসাবে থাকে শুধুমাত্র একটি প্লাসমাআস্তরণ; কোন কোষপ্রাচীর থাকেনা। কদাচিৎ এই বর্তুলাকার কোষগুলির মালা তৈরি হয়, কোষগুলি সূত্রাকার হয়ে দুই-একটি শাখা-প্রশাখাও গঠিত হতে পারে, এদের বলাহয় নকলছত্রাক-সূত্র (pseudomycelia)। সংখ্যাবৃদ্ধির পদ্ধতি হিসাবে দ্বিবিভাজন হয়। মুকুল সৃষ্টির মাধ্যমে বা বিচ্ছিন্নকরণের (fragmentation) মাধ্যমেও সংখ্যাবৃদ্ধি করে। ব্যাক্টিরিয়াগুলি সাধারণতঃ গ্রাম-ঋণাত্মক ও অচল। এদের কলোনীও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও ডিমের পোচের (poached-egg) আকৃতির মত হয়। এদের বৃদ্ধির জন্য কোলেস্টেরল (cholesterol) অত্যাবশ্যক। এ জাতীয় জীবাণু উদ্ভিদের ও বহু প্রাণীর কিছু রোগ সৃষ্টি করে। আরও কিছু রয়েছে যারা মৃতজীবি। এই গোষ্ঠীর একটি অতিপরিচিত গণ হচ্ছে **মাইকোপ্লাসমা (Mycoplasma)** যা টেট্রাসাইক্লিন ঔষধে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

এইপ্রকার আরএকটি ব্যাক্টিরিয়ার গণ হচ্ছে **স্পাইরোপ্লাসমা (Spiroplasma)**। এরও কোষপ্রাচীর নাই। তবে প্লাসমাআস্তরণের বাহিরে আরএকটি ক্ষীণ আস্তরণ রয়েছে যা গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে আবর্তাকারে সাজানো ছোটছোট অভিক্ষিপ্ত বহিরঙ্গ (projections) দ্বারা তৈরি। এজাতীয় ব্যাক্টিরিয়া আকৃতিতে মাইকোপ্লাসমার মত হলেও কদাচিৎ আবর্তাকারও (spiral) দেখা যায়। আবর্তাকারগুলি সচল হয়। এরা গ্রামধনাত্মক ও উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিকারী। বৃদ্ধির অন্য বিশেষত্ব মাইকোপ্লাসমার মতই।

(ঞ) **কোমল ব্যাক্টিরিয়া বা রিকেটসিয়া** (Rickettsias) :

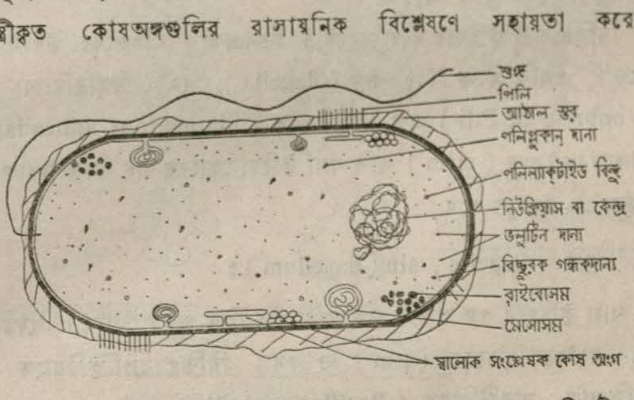
এগুলি ক্ষুদ্র, দণ্ডাকৃতি, অচল ও গ্রামধনাত্মক ব্যাক্টিরিয়া। ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে গবেষণাগারে কৃত্রিমখাদ্যমাধ্যমে আবাদ সম্ভব হয়নি। এরা সাধারণতঃ মানুষ ও জন্তুর টাইফাস (typhus) জাতীয় রোগ সৃষ্টি করে এবং উদ্ভিদেরও কিছু রোগ সৃষ্টি করে। অন্য ব্যাক্টিরিয়ার মত কোষপ্রাচীর নাথাকলেও একটি অনিয়তাকার (amorphous) বস্তুতে গঠিত বহিস্তক আছে। এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি টেট্রাসাইক্লিন (tetracycline) ও পেনিসিলিন (penicillin) উভয় বীজঘ্নতেই বিনষ্ট হয়। অন্য সমগোত্রীয় কোষপ্রাচীর-বিহীন ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে **ক্লামাইডিয়া (Chlamydia)** অন্যতম যাদের

পূর্বে পি. এল. টি (PLT ; Psittacosis Lymphogranuloma Trauchoma) বলা হত।

**২.২২ ব্যাক্টিরিয়া কোষের সূক্ষ্মগঠন** (Fine structure of bacteria) :

ব্যাক্টিরিয়ার কোষের গঠন দৃশ্যতঃ খুব সরল মনে হলেও এর সূক্ষ্মগঠনের তথ্যাদি থেকে বোঝাগেছে যে এদের প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। গত কয়েক দশকে কয়েকটি অত্যন্ত শক্তিশালী বিশ্লেষণ পদ্ধতি আবিষ্কার হবার পরই এই অতিক্ষুদ্র জীবাণুদের কোষের সূক্ষ্মগঠন এপর্যন্ত অনেকটাই বোঝা গেছে।

অত্যন্ত শক্তিশালী, সতর্ক ও নির্ভুল পদ্ধতিগুলি যথা ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ পদ্ধতি ( ফন ইটারসন, ১৯৫৯, ন্যাসি ও বার্কার, ১৯৪৭ ), সূক্ষ্মচ্ছেদন পদ্ধতি (thin sectioning), ঘনত্বের ক্রমযুক্ত ঘূর্ণায়ন (gradient centrifugation), অতিদ্রুত অপকেন্দ্রিক ঘূর্ণায়ন (ultracentrifugation) প্রভৃতির সাহায্যে কোষ-অঙ্গগুলির স্বতন্ত্রীকরণ ও তাদের রাসায়নিক প্রকৃতিনির্ণয় সম্ভব হয়েছে। ( ফন ইটারসন, ১৯৫৯ ; সাইক্‌স ও বোল্ট, ১৯৭১ ; সালটন, ১৯৬১ ; ভাইবুল, ১৯৭০)। এছাড়া হিমায়িত–খোদাই পদ্ধতিতে ( Freeze-etching) স্বতন্ত্রীকৃত কোষঅঙ্গগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণে সহায়তা করেছে।




চিত্র ১৪ : ব্যাক্টিরিয়াকোষের সূক্ষ্ম গঠন। মডেল কোষের চিত্রটিতে বিভিন্ন কোষে প্রাপ্তব্য বিভিন্ন কোষঅঙ্গ বা দানা একসাথে চিত্রায়িত করা হয়েছে

ব্যাক্টিরিয়ার কোষের সমস্ত সম্ভাব্য কোষ-অঙ্গ ও বহিরঙ্গ নিরীক্ষণ করলে ( **চিত্র—১৪** ) দেখা যাবে যে ব্যাক্টিরিয়া কোষে কোষবস্তু (cytoplasm)

প্রাথমিকভাবে একটি কোষআস্তরণের (plasma membrane) দ্বারা ঢাকা থাকে, যেটি আবার একটি দৃঢ়কোষ-প্রাচীরে (cell wall) আবরিত থাকে এবং সর্বশেষে একটি আঠালআস্তরণে (slime layer) সমস্তটুকু আবরিত থাকে। কোষবস্তুর মধ্যে প্রধানতঃ নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র, মেসোসোম (mesosome), রাইবোসোম (ribosome), শূন্যগর্ভ (vacuole), মেদবটিকা (fat-globule) প্রভৃতি অঙ্গ বা বস্তু অন্যতম। কিছুকিছু ক্ষেত্রে ক্রোমাটোফোরও (chromatophore) থাকে। এসমস্ত ব্যতীত কোষের বহিস্তরে কিছু উপাঙ্গও (appendage) থাকে। ব্যাক্টিরিয়ার কোষঅঙ্গগুলি নিম্নলিখিত দুটিভাগে ভাগকরা যায়। (ক) বহিরঙ্গ ও (খ) অভ্যন্তরীণ অঙ্গ। বহিরঙ্গগুলির মধ্যে আবার কতকগুলি (চ) বহিস্তর ও কতকগুলি (ছ) উপাঙ্গ হিসাবে অভিহিত।

**(অ) ব্যাক্টিরিয়ার বহিস্থ উপাঙ্গ** ( Surface appendages ) :

ব্যাক্টিরিয়ার বহিস্তরের উপাঙ্গগুলি অন্য ইউক্যারিওটগুলির জীবাণুর পক্ষ্ম ( cilia ) হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

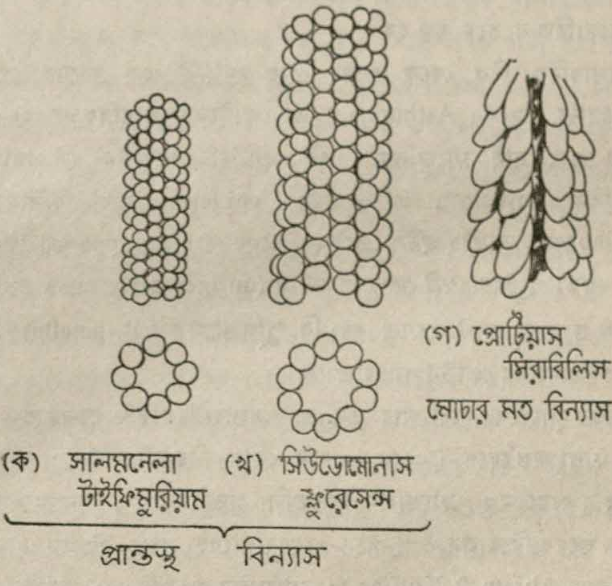
বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে সর্বমোট তিনপ্রকার বহিস্তরের উপাঙ্গ দেখা গেছে। এগুলি হচ্ছে (১) শুঙ্গ ( flagella ), (২) ফিম্ব্রিয়ি বা পিলি ( Fimbriae or Pili ) এবং (৩) অংশু ( filamentous appendage )। ইউক্যারিওট পক্ষ্ম ( cilia ) গুলি ব্যাক্টিরিয়া কোষের এই সমস্ত উপাঙ্গ থেকে অন্ততঃ ১০ গুণ স্থূল হবে।

**(ক) শুঙ্গ** ( flagella ; sing-flagellum ) :

ব্যাক্টিরিয়ার শুঙ্গ অত্যন্ত সূক্ষ্ম, সূত্রাকৃতি কিন্তু ভঙ্গুর উপাঙ্গ। এদের ব্যাস ০·১ মাইক্রোমিটারের ( µm ) ও কম। বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াতে যেমন **ব্যাসিলাস সাবটিলিসে** ( **Bacillus subtilis** ) ০·০১৮৬ ( µm ) বা ১৮৬ আংস্ট্রম (অাঁ), অথবা **প্রোটীয়াস ভালগারিস** ( **Proteus vulgaris** ) এ ০·০১২ মাইক্রোমিটার ( µm ) বা ১২০ অাঁ। শুঙ্গগুলি দৈর্ঘ্যে ব্যাক্টিরিয়া কোষাপেক্ষা দীর্ঘ হয় ; অর্থাৎ ৩—১২ ( µm ) পর্যন্ত। সমগ্র কোষের ওজনের মাত্র ২% আসে এই শুঙ্গ থেকে। শুঙ্গ সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য কয়েকটি বিশেষ গবেষণা পদ্ধতি যেমন নিরালোক দৃশ্যক্ষেত্রে অণুবীক্ষণ পদ্ধতি

( Dark-field microscopy ), ফেজ কনট্রাস্ট-অণুবীক্ষণ পদ্ধতি (phase contrast microscopy), ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ পদ্ধতি ইত্যাদির অবদান অতি মূল্যবান। সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে শুঙ্গগুলিকে দেখার জন্য তাদের উপর এক-প্রকার রাসায়নিক অবক্ষেপনের দ্বারা ব্যাস বৃদ্ধি ক'রে তারপর রাঙানো হয়।

কোষপ্রাচীরের নিম্নতমস্তর ও প্লাসমা-আস্তরণ থেকে শুঙ্গগুলি উদ্ভূত। শুঙ্গের তিনটি অংশ রয়েছে। নিম্নতম যে অংশটি শুঙ্গকে তার উৎপত্তিস্থলের সাথে আটকে রাখে তাকে মূলদেশ বা কলার (collar) বলা হয়। মূলদেশ একটি ডিম্বাকৃতি, ২০—৫০ নানোমিটার (nm) ব্যাসযুক্ত অতি ক্ষুদ্র, ভঙ্গুর অংশ যার সাথে একটি আঙটার ( hook ) মাধ্যমে সূক্ষ্মসূত্রটি ( filament ) সংযোজিত থাকে। শুঙ্গের দ্বিতীয় অংশ এই সূক্ষ্মসূত্রটি ( filament ) অতি দীর্ঘ, সূক্ষ্ম




চিত্র ১৫ : শুঙ্গর বিভিন্ন গঠন-প্রকৃতি : ফ্লাজেলিন অণুর বিন্যাস।

এবং ভঙ্গুর। আঙটাটি শুঙ্গের তৃতীয় অংশ। শুঙ্গের সূক্ষ্মগঠনে দেখা গেছে কতকগুলি সমব্যাসযুক্ত গোলাকার বা ডিম্বাকৃতি একক (unit) যেগুলিকে বলা হয় ফ্লাজেলিন ( flagellin )। সর্বক্ষেত্রেই এই ফ্লাজেলিন এককগুলি প্রথমতঃ

সূত্রাকারে বিস্তৃত থাকে। এরকম তিনটি ফ্লাজেলিন গাঁথা সূত্র পরস্পরের সাথে আবর্তিত হয়ে ( helically ) একটি ফাঁপা নালিকা গঠন করে। শুঙ্গের গঠনের এইটি সাধারণ চিত্র হলেও শুঙ্গের মধ্যে ফ্লাজেলিন এককগুলির বিন্যাসের প্রকৃতি এক এক ব্যাক্টিরিয়াতে এক এক রকম ( **চিত্র-১৫** )। কতকগুলি ক্ষেত্রে গোলাকার এককগুলি প্রান্তস্থ ( peripheral ) যেমন **স্টাফাইলো-কক্কাস টাইফিমুরিয়াম** ( **Staphylococcus typhimurium** ) প্রভৃতিতে। আবার অন্য ক্ষেত্রে বিন্যাসের প্রকৃতি শঙ্কু বা মোচার মত ( pine-cone )। শুঙ্গগুলি সাধারণতঃ তরঙ্গের মত তরঙ্গায়িত হয়। এক একটি ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে শুঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এক এক প্রকার এবং ব্যাক্টিরিয়ার বিশেষত্ব হিসাবে দেখা যায়। দু-একটি বিশেষ ক্ষেত্রে মাত্র একই শুঙ্গে দুইরকম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য জানা গেছে। এই অবস্থাকে দ্বিত্ব ( biplicity ) বলা হয়। আরও কম ক্ষেত্রে শুঙ্গ তরঙ্গায়িত না হয়ে ঋজু হয়।

রাসায়নিক দিক থেকে শুঙ্গের প্রায় ৯৯% ই এক ধরনের প্রোটিন ( অ্যাষ্টবারী, ১৯৫৫ ; Astbury )। এই প্রোটিনের আণবিকভর ৩০—৫০ হাজার এবং নাম ফ্লাজেলিন। এই প্রোটিনটি কেরাটিন ( keratin ), মায়োসিন ( myosin ), এপিডারমিন ( epidermin ) বা ফিব্রিনোজেন ( fibrinogen ) জাতীয় জটিল প্রোটিন। শুঙ্গের আঙটা ও সূক্ষ্মসূত্রের প্রোটিন-গুলি অন্ততঃ প্রতিরোধসৃষ্টি ক্ষমতাগতভাবে (antigenically) স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এ পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি ক্ষেত্রে যথা **বি. পুমিলাসের** ( **B. pumilus** ) শুঙ্গে একাধিক প্রকারের প্রোটিন পাওয়া গেছে।

শুঙ্গের মূলদেশের মধ্যে আর. এন. এ.-র সম্ভাব্য উপস্থিতি সন্দেহ করা হয়। শুঙ্গের ফাঁপা অন্তর্দেশে ( core ) কোন কোন বিজ্ঞানী শর্করার উপস্থিতি আবিষ্কার করেছেন। ফ্লাজেলিন এককগুলি স্বতন্ত্রীকরণ ও পুনঃসংযোজনের মাধ্যমে শুঙ্গের বিয়োজন ও পুনর্গঠন গবেষণাগারেই সম্ভব হ'য়েছে ( আব্রাম ও কফলার, Abram & Kofflar )। ফ্লাজেলিন অণুগুলি ৬·০ অম্লতায় (pH) নিজেরা জুড়ে গিয়ে শুঙ্গ গঠনে সক্ষম। ব্যাক্টিরিয়া কোষে শুঙ্গের বৃদ্ধির হার প্রতি মিনিটে ০·৫ মাইক্রোমিটার ( μm ) অর্থাৎ খুবই দ্রুত। শুঙ্গ ভেঙ্গে গেলে তৎক্ষণাৎ পুনর্গঠিত হয়। শুঙ্গের এই প্রোটিন যথেষ্ট সংকোচক ক্ষমতা ( con-tracting ability ) যুক্ত। জলমাধ্যমে শুঙ্গের পর্য্যাবৃত্তিতে সংকোচনের ফলে

সংশ্লিষ্ট ব্যাক্টিরিয়া কোষের চলন সম্ভব নয়। ব্যাক্টিরিয়ার শুঙ্গ দ্বারা চলনের গতি মোটামুটি প্রতি সেকেণ্ডে ২০—১০০ মাইক্রোমিটার (µm) এই গতি বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াতে বিভিন্ন। সাধারণতঃ মেরুজ শুঙ্গ (polar flagella) যুক্ত ব্যাক্টিরিয়াগুলি দ্রুত চলনে সক্ষম। চলনের সময় শুঙ্গগুলি (একাধিক হ'লে) পরস্পর পাকিয়ে (inter-twine) একটি বা দুটি ১·৫—২·৫ মাইক্রোমিটার (µm) ব্যাসের পুচ্ছসম অঙ্গ ('fascicle or 'tail') সৃষ্টি করে, এবং এর মাধ্যমে চলে। শুধুমাত্র অচল অবস্থাতেই শুঙ্গগুলি স্বতন্ত্র থাকে।

(খ) **পিলি বা ফিমব্রিয়ি** (Pili or Fimbriae):

এই উপাঙ্গগুলিকে ইউরোপে ফিমব্রিয়ি আর আমেরিকাতে পিলি বলা হয়। অতি সূক্ষ্ম, সূত্রাকৃতি এই উপাঙ্গগুলি গ্রাম-ঋণাত্মক ব্যাক্টিরিয়া যথা **সিউডোমোনাস, জ্যান্থোমোনাস** ইত্যাদি বা অন্ত্রে বসবাসকারী ব্যাক্টিরিয়া (enteric) যথা **সালমনেলা** প্রভৃতির কোষে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী হনউইঙ্ক ও ভন ইটারসন, ১৯৫০ (Honwink & van Iterson), ডুগুইড, ১৯৫০ (Duguid) বা ব্রিন্টন, ১৯৬৭ (Brinton) প্রভৃতির গবেষণা থেকে এই উপাঙ্গগুলি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন এই উপাঙ্গগুলি শুঙ্গের চেয়েও সূক্ষ্ম ও হ্রস্বতর। মাত্র ৩-২৫ ন্যানোমিটার (n m) ব্যাসযুক্ত ও ০·২-২০ মাইক্রোমিটার (µm) দৈর্ঘ্যযুক্ত। উপাঙ্গগুলি ঋজু ও তরঙ্গায়িত নয়। এরা সব ক্ষেত্রে কোষের সমস্ত বহিস্তর জুড়ে থাকে, ফলে কোষ প্রতি সংখ্যা অত্যাধিক। বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার কোষে বিভিন্ন ধরনের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থযুক্ত পিলি পাওয়া যায়। এপর্যন্ত ৮ প্রকারের পিলি আবিষ্কৃত হয়েছে। সমস্ত পিলির যে সমস্ত সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেগুলি উল্লেখযোগ্য। পিলি কতকগুলি ক্ষুদ্র উপ-একক (sub-unit) দ্বারা গঠিত। এদের সকলেরই অগ্রভাগে একটি করে উদ্গম (knob) থাকে। এছাড়া পিলি সব ক্ষেত্রে একটি ফাঁপা নালিকার মত। পিলির উপ-এককগুলি 'পিলিন' (pilin) নামক একজাতীয় প্রোটিন দিয়ে তৈরী। পিলিনের আণবিক ভর ১৬,৬০০ ডালটন। উপ-এককগুলি ডানদিকে পেঁচান একটি আবর্ত (helix) তৈরি করেছে। পিলির সূক্ষ্মগঠনে দেখা গেছে যে ক্ষুদ্র পিলিন অণু বা এককগুলি সংযোজিত হ'য়ে দুটি দীর্ঘ সুতার মত অংশ সৃষ্টি হয়। দুটি সুতা আবার

পরস্পর পেঁচিয়ে পিলির ফাঁপা নলটি গঠিত হয়েছে। এপর্যন্ত ঘোষিত পিলিগুলির বিশেষত্ব সারণী ১০-এ লিপিবদ্ধ করা হল।

সারণী ১০ : ব্যাক্টিরিয়া কোষের পিলি

| পিলির নাম | কোষ প্রতি সংখ্যা | কোষে অবস্থান | পরিমাপ (nm) নানোমিটার ব্যাস | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|---|---|
| V | ১ | নিশ্চিত কিছু নাই | ২৫·০ | ১০০০-২০০০ |
| F | ২ | " | ৮·৫ | ১০০০-২০,০০০ |
| VI | ৩ | মেরুজ | ৫·০ | ২০০০-১০,০০০ |
| VII | ১৫ | মেরুজ | ১৫·০ | ২০০-৫০০ |
| I | ১৫০ | সর্বাঙ্গজুড়ে | ৭·০ | ৫০০-২০০০ |
| II | ১৫০ | " | ৪·৮ | ৫০০-২০০০ |
| IV | ১৫০ | " | ৭·০ | ১০০০-২০০০ |
| III | ৩১০ | " | ৬·৭ | ২০০০-৬০০০ |

উপরিউক্ত পিলিগুলির মধ্যে F ও I দুটি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন। সাধারণভাবে এদের বহির্ভাগের ব্যাস বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার, অন্তর্ভাগে নালিকার ব্যাস ন্যূনপক্ষে ২ নানোমিটার ( nm )।

ব্যাক্টিরিয়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় ক্রিয়া পিলির মাধ্যমে সম্পন্ন করে। প্রথমতঃ পিলি ব্যাক্টিরিয়া কোষকে অন্যকোষ বা আর. বি. সি র (R. B.C) সাথে আসঞ্জনের ( adhesiveness ) ক্ষমতা দেয়। রক্তে ব্যাক্টিরিয়ার কোষের যে তঞ্চন ( agglutination ) হয় তাতেও পিলির অবদান রয়েছে। অধিকন্তু পিলির উপস্থিতি ব্যাক্টিরিয়াকে রক্তে 'প্রতিরোধক বস্তু' সৃষ্টির ক্ষমতা ( antigenicity ) প্রদান করে। অতি অল্প অক্সিজেনে ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধির ক্ষমতা আসে পিলির জন্য। পিলি অপসারিত হলে (depiliated) ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধি অর্ধেক হ'য়ে যায়। সর্বপরি 'F' প্রকারের পিলি ব্যাক্টিরিয়ার যৌনক্রিয়াতে ( conjugation ) দাতার ( donor ) ডি. এন. এ. 'গ্রহীতা' ( recipient ) কোষে পৌছানর পথ হিসাবে কাজ করে। পুচ্ছবিহীন ফাজ পোষক ব্যাক্টিরিয়াকে আক্রমণ করলে তার ডি. এন. এ. পিলির নালিকার

মধ্য দিয়ে পোষককোষে অনুপ্রবেশ করে। পিলি কোষ থেকে সামান্য কারণে যেমন সামান্য কম্পনে বা ঔষধের প্রভাবে খসে পড়তে (depiliation) পারে। পিলির পুনর্গঠনও ( repiliation ) অতি দ্রুত ( ৫—১০ মিনিটে ) সম্পন্ন হয়।

**(গ) ব্যাক্টিরিয়ার অংশুবৎ উপাঙ্গ** ( filamentous appendage ) :

এই উপাঙ্গগুলি শুঙ্গের তুলনায় স্থূল ও দীর্ঘতর। এখন পর্যন্ত একটি ব্যাক্টিরিয়াতে এই উপাঙ্গের উপস্থিতির কথা ঘোষিত হয়েছে ( ফন ইটারসন, ১৯৫৮ )। কোষের বহির্ভাগে জোড়া এই উপাঙ্গের নাম অংশু ( filamentous appendage )। অংশুতে লৌহের ভাগ অত্যধিক। লৌহ-সমৃদ্ধ জলাশয়ে বসবাসকারী অংশুযুক্ত ব্যাক্টিরিয়াটির নাম **গালিওনেলা ফেরুজিনা** ( **Gallionella ferrugina** )।

**(ঘ) ব্যাক্টিরিয়া-কোষের বহিঃপ্রলেপ বা আস্তরণ** ( surface layers ) :

গত দুই দশকে ব্যাক্টিরিয়ার বহিস্তরের প্রলেপ বা আস্তরণগুলি সম্পর্কে অভূতপূর্ব সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। কিছু নূতন. বিষমবৃহদাণু ( hetero-polymer ) যথা টেইকোইক অম্ল ( teichoic acid ), পেপটিডোগ্লাইকান ( peptidoglycan ) প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রলেপগুলির গঠনপ্রকৃতি ও বিশেষত্ব বোঝা গেছে এবং ব্যাক্টিরিয়ার উপর বিভিন্ন বীজঘ্নর ক্রিয়াপদ্ধতিও জানা গেছে।

ব্যাক্টিরিয়া কোষের বাহিরের প্রলেপগুলি স্তরে স্তরে ও গায়ে গায়ে সাজানো থাকে। বাহির থেকে ভিতরের দিকে প্রলেপ বা আস্তরণগুলি যথা-ক্রমে আয়নের স্তর ( ionic layer ), আঠাল আস্তরণ ( slime layer ) ও কোষপ্রাচীর ( cell wall )। এছাড়া কিছু ব্যাক্টিরিয়াতে বিশেষতঃ যেসব ক্ষেত্রে কোষের পুঞ্জীভবন হয় তাদের উপরোক্ত প্রলেপগুলি ছাড়াও কিছু মধ্যবর্তী স্তর রয়েছে। এর মধ্যে বিশোষিত আঠাল স্তর ( absorbed slime or gum ) ও সিমেন্টিং স্তর ( cementing layer ) উল্লেখযোগ্য।

প্রলেপগুলির সাজানোর পদ্ধতি সব ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রেই একরকম। তবে তাদের বৃদ্ধির হার বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াতে ভিন্ন। মাইকোপ্লাসমাতে কোষ

প্রাচীর সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। স্পাইরোপ্লাসমাতে প্রাচীরের জায়গাতে একটি অসম্পূর্ণ প্রলেপ রয়েছে যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অভিক্ষিপ্ত অঙ্গ দিয়ে গঠিত। রিকেট-সিয়াতে কোষপ্রাচীরের বদলে একটি দুই স্তরযুক্ত প্রলেপ রয়েছে। গ্রাম ঋণাত্মকদের ক্ষেত্রে একটি জটিল, বহু স্তরযুক্ত কিন্তু ক্ষীণ আস্তরণ বা কোষ-প্রাচীর আর ঋণাত্মকদের ক্ষেত্রে সরল কিন্তু স্থূল কোষপ্রাচীর রয়েছে। একইভাবে আঠাল স্তরের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে।

(ক) **আয়নিক স্তর** ( Ionic layer ) :

ব্যাক্টিরিয়ার কোষের বহিস্তরের উপরিভাগে বিভিন্ন রাসায়নিকের আয়নায়িত অবস্থাগুলি আসঞ্জিত দেখা যায়। এই সম্ভাবনার কথা ব্যাক্টিরিয়া-কোষ রাঙানোর সময় বিজ্ঞানীদের মনে উদয় হয়। সাধারণতঃ এই স্তরে ঋণাত্মক আয়নগুলিরই সংখ্যাধিক্য দেখা যায়। এই ঋণাত্মক আয়নগুলি ধনাত্মক আয়নদের আকর্ষণ করে যার ফলে ধনাত্মক রঙ ( basic-dye ) দ্বারা রাঙানোর প্রক্রিয়া ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়। স্তরটি পরিবর্তনশীল এবং কোষকে একটি মোট-আধান ( net-charge ) দেয়।

(খ) **আঠাল স্তর এবং ক্যাপস্যুল** ( Slime layer and capsule ) :

ব্যাক্টিরিয়ার কোষের বাহিরের স্তরে আঠাল পদার্থ দিয়ে তৈরী একটি আস্তরণ থাকে। এ ধরনের স্তর ব্যাক্টিরিয়া ছাড়া অন্য দু'একটি জীবাণুর কোষেও দেখা যায়। আঠাল স্তরের পুরুত্ব বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াতে অতি সূক্ষ্ম থেকে অতি স্থূল পর্যন্ত নানারকম হতে পারে। বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াতে এটির রাসায়নিক প্রকৃতি বিভিন্ন। এই স্তর কোষপ্রাচীরের ঠিক বাহিরে থাকে। অনেক ব্যাক্টিরিয়াতে আঠাল স্তর কোষের গায়ে আটকে না থেকে পরিবেশে নিঃসৃত হয়। বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াতে আঠাল স্তরের সংশ্লেষণ হয় কোষবৃদ্ধির বিভিন্ন স্তরে। **ডিপ্লোকক্কাসে** হয় বৃদ্ধির শেষদিকে আর **স্টেপটোকক্কাসে** প্রথমে। আবার **অ্যাসিটোব্যাকটরে** ( **Acetobactor** ) প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব সময় তৈরি হয়।

আঠাল স্তর কোষগাত্র থেকে অপসারিত হলেও কোষের জীবন সংশয় হয় না। তবে এই অঙ্গও জীবাণুর একটি বংশগত বৈশিষ্ট্য। আঠাল স্তর

সাধারণতঃ রাঙানো যায় না। তাই নাইগ্রোসিন ( nigrosin ) বা কালি ( India-ink ) দিয়ে পশ্চাদ্‌ভূমি-রাঙানো পদ্ধতিতে ( relief-staining ) এই স্তরের উপস্থিতি বোঝা যায়। পুরুত্ব অনুযায়ী আঠাল স্তরটির তিনরকম নাম দেওয়া হয়। এর পুরুত্ব ০·২ মাইক্রন ( μm ) বা তার বেশী হ'লে বলা হয় পুরু ক্যাপস্যুল বা ম্যাক্রোক্যাপস্যুল ( macrocapsule ), আর ০·২ মাইক্রনের ( μm ) কম হলে বলা হয় সূক্ষ্ম ক্যাপস্যুল বা মাইক্রোক্যাপস্যুল ( microcapsule )।

আর যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই স্তরের পুরুত্ব এত ক্ষীণ যে অণুবীক্ষণে দেখানো যায় না তাদের ক্যাপস্যুল বলা হয় না। শুধু আঠাল স্তর বা স্লাইম-লেয়ার ( slime layer ) বলা হয়। আঠাল স্তর ক্যাপস্যুলের মত পুরু হয় কিনা তা দেখে ব্যাক্টিরিয়ার আঠাল পদার্থ ( slime ) সৃষ্টির করার ক্ষমতা বোঝা যায় না। উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারী কিছু ব্যাক্টিরিয়া যথা **সিউডো-মোনাস** ও **জান্থোমোনাস** প্রভৃতির ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে আঠাল পদার্থ তৈরী হলেও কোষের গায়ে জমা না হ'য়ে পরিবেশে নিঃসৃত হয়। ফলে এই সমস্ত ব্যাক্টিরিয়ার ক্যাপস্যুল হয় না।

বৃদ্ধির পরিবেশ বিশেষতঃ খাদ্যবিষয়ক পরিবেশ ব্যাক্টিরিয়ার আঠাল পদার্থ সৃষ্টির পরিমাণ অনেকাংশে ঠিক করে। **জান্থোমোনাস** গণের ব্যাক্টিরিয়া-গুলি সাধারণ নিউট্রিয়েন্ট-আগার ( Nutrient Agar ) খাদ্যমাধ্যমে যথেষ্ট আঠাল পদার্থ প্রস্তুত করে না ; কিন্তু খাদ্যমাধ্যমে সরল শর্করা দিলে প্রচুর আঠাল পদার্থ সৃষ্টি করে, যার ফলে উক্ত ব্যাক্টিরিয়ার কলোনী আঠাল বা তরল দ্রব্যবৎ ( fluidal ) হয়। **লিউকোনষ্টক ডেক্‌স্ট্রানিকাসের (Leuconostoc dextranicus)** ক্ষেত্রে খাদ্যমাধ্যমে ডেক্‌সট্রোস বা লিভুলোস যোগ করলে সামান্যমাত্র আঠাল পদার্থও সৃষ্টি হয় না কিন্তু সুক্রোস দিলে প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি হয়। খাদ্যবিষয়ক ছাড়া পরিবেশের অন্য কিছু কারণও আঠাল পদার্থ প্রস্তুতকরণ কম বেশী প্রভাবিত করে। যেমন **ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিসে ( Bacillus anthracis )** কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর উপস্থিতিতে ক্যাপস্যুল তৈরি হয়, অন্যথা নয়। অনেক প্রাণীর রোগসৃষ্টিকারি ব্যাক্টিরিয়ার ক্যাপস্যুল তৈরি হয় শুধুমাত্র রক্তের সংস্পর্শে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এই আঠাল স্তর কোষ-প্রাচীর থেকে আলাদা করে দেখা বা বোঝা যায় না। এ ব্যাপারে মাইকেল

সালটনের, ১৯৬১ পর্যালোচনা উল্লেখযোগ্য। ঐ আলোচনার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হচ্ছে। ভৌত গঠনের দিক থেকে আঠাল স্তর হচ্ছে জেলীর মত ( jelly-like ) অথবা তরল দ্রব্যবৎ ( fluidal )। জেলীর মত কোষের গায়ে লাগানো স্তর আবার বিভিন্নভাবে সাজানো থাকতে পারে যা নীচের সারণীতে ( সারণী-১১ ) দেখান হল।

**সারণী ১১ : আঠালস্তরের ভৌত বিন্যাসের কয়েকটি প্রকার**

| বিন্যাস প্রকার | ব্যাক্টিরিয়া | সম্মুখ চিত্র | ছেদ চিত্র |
|---|---|---|---|
| অব্যাহত স্তর ( Continuous ) | ডিপ্লোকক্কাস নিউমোনি |  |  |
| ফিতার মত ( Banded ) | এসেরিসিয়া কোলি (Escherichia coli) |  |  |
| স্থানে স্থানে তালি (Localised patch) | ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম |  |  |

আঠাল স্তরের স্থূক্ষ্মগঠনে দেখা যাচ্ছে **ডিপ্লোকক্কাস নিউমোনিতে** এর অণুগুলি সমভাবে সর্বত্র সাজানো। এগুলি **ক্লেবসিয়েলাতে ( Klebsiella )** আঁশের মত সাজানো থাকে।

আঠাল পদার্থ অনেক রাসায়নিক প্রকারের পাওয়া গেছে। বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াতে আঠাল পদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি ভিন্নতর। এই ভিন্নতর পরিমাপের হার অনেক বেশী। এদের এই ভিন্নতা ( variation ) বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার বৈচিত্র্যকেই প্রতিষ্ঠা করে। আঠাল পদার্থের প্রধান রাসায়নিক প্রকৃতিগুলি নিম্নরূপ।

### (ক) পলিসাকারাইড জাতীয় আঠাল পদার্থ ( Polysaccharide ) :

বেশীর ভাগ ব্যাক্টিরিয়ার আঠাল পদার্থ এই জাতীয়। এই পলিসাকা-রাইডগুলি মূলতঃ ডেক্সট্রোস, লিভুলোস ও গালাকটোস জাতীয় শর্করা দ্বারা গঠিত, সঙ্গে থাকে COOH গ্রুপ। এদের মধ্যে আবার হোমোপলিসাকা-রাইড যেমন গ্লুকান্‌স (Glucans) জাতীয় আঠাল পদার্থ রয়েছে পেডিকক্কাস **(Pedicoccus), লিউকোনষ্টক ( Leuconostoc )** প্রভৃতি ব্যাক্টিরিয়াতে,

সেলুলোস দিয়ে তৈরি **আসিটোব্যাকটরের** ( **Acetobactor** ) আঠাল পদার্থ, লেভান দিয়ে তৈরি **সিউডোমোনাস, জান্থোমোনাস, ষ্ট্রেপটোকক্কাস** প্রভৃতিতে। অন্য কিছু ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে হেটারোপলিসাকারাইড দ্বারা আঠাল পদার্থ গঠিত হয়। **সিউডোমোনাসের** পলিসাকারাইড একাধিক ভিন্ন অণু যথা ডি-ম্যানোস, ডি-গ্লুকুরনিক অম্ল, গ্লুকোস, ডি-গ্যালাক্টোস ও এল-রামনোস দ্বারা গঠিত।

### (খ) পলিপেপটাইড জাতীয় আঠাল পদার্থ (polypeptide) :

ব্যাসিলাস গণের কিছু সদস্য যেমন **বি. সাবটিলিস (B. subtilis) বি. আনথ্রাসিস (B. anthracis), বি. মেসেনটেরিকাস (B. mesentaricus)** এর ক্ষেত্রে আঠাল পদার্থ ডি-গ্লুটামিক অম্ল অণু দ্বারা গঠিত পলিপেপটাইডের তৈরী। আণবিক ভর প্রায় ৫৩০০০ ডালটন।

### (গ) একাধিক রাসায়নিকে গঠিত আঠাল পদার্থ ( Mixed ) :

কয়েকটি ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে আঠাল স্তর একাধিক রাসায়নিক দ্বারা গঠিত। **বি. ডিসেনটেরির** ক্ষেত্রে ( **B. dysenteriae** ) আঠাল পদার্থ পলিসাকারাইড, প্রোটিন ও ফসফোলিপিড (phospholipid) এর মিশ্রনে গঠিত।

**সালমোনেলা টাইফিমুরিয়ামে (Salmonella typhymurium)** আঠাল পদার্থটি কোলানিক অম্ল ( colanic acid ) জাতীয়। আঠাল পদার্থের বিভিন্নতার এক চরম উদাহরণ হচ্ছে **ডি. নিউমোনির** বিভিন্ন বর্ণে (strain) দেখা যায়। এ পর্যন্ত নির্ণীত ৭৫টি বর্ণে ৭৫ রকমের ক্যাপসুল পাওয়া গেছে। **ই. কোলির** ক্ষেত্রেও 'বি' ও 'এল' টাইপে সূক্ষ্ম ক্যাপসুল তৈরি হয় আর 'এ' টাইপে স্থূল ক্যাপসুল। আঠাল স্তরের ক্রিয়াকলাপ : এই স্তর কোষের শুষ্ক অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া ( dessication ) প্রতিরোধ করে, অভ্যন্তরীণ রস (moisture) যথাযথ সংরক্ষণে কাজে লাগে। রোগসৃষ্টিকারী ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত প্রজাতি (species) গুলির অনাক্রম্যতার নির্দিষ্টকরণ-ক্ষমতা (immunogical specificity) আসে আঠাল পদার্থ থেকে। ব্যাক্টিরিয়ার আবাদে উচ্চহারে আঠাল পদার্থ সৃষ্টিকারীদের কলোনী হয় মসৃণ

(smooth) আর অন্যদের অমসৃণ (rough)। অত্যধিক আঠাল পদার্থ সৃষ্টিকারীর কলোনী হয় তরল দ্রব্যের মত। এই স্তরে বহুল পরিমাণে COOH গ্রুপ থাকাতে কোষ ধনাত্মক আয়ন (cation) বন্ধনের ক্ষমতা পায়। বহিস্তরের আঠাল পদার্থ ব্যাক্টিরিয়াকে রক্তকোষ দ্বারা গলাধঃকরণ-এর (phagocytosis) থেকে কিছুটা রক্ষা করে, সম্ভবতঃ লাইসোজাইমের ক্রিয়াকে ব্যাহত ক'রে।

কোষ বা কোষপ্রাচীরের সাথে আঠাল স্তরের সম্পর্ক এখনও স্বচ্ছ নয়। বলা হয় এই স্তর প্রাচীরের সাথে আয়নভিত্তিক (ionic) ও কোভালেণ্ট (covalent) উভয় প্রকার বন্ধনেই আবদ্ধ। আরও গবেষণা থেকে এই ব্যাপারে ও এই স্তরের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সঠিক জানা যাবে।

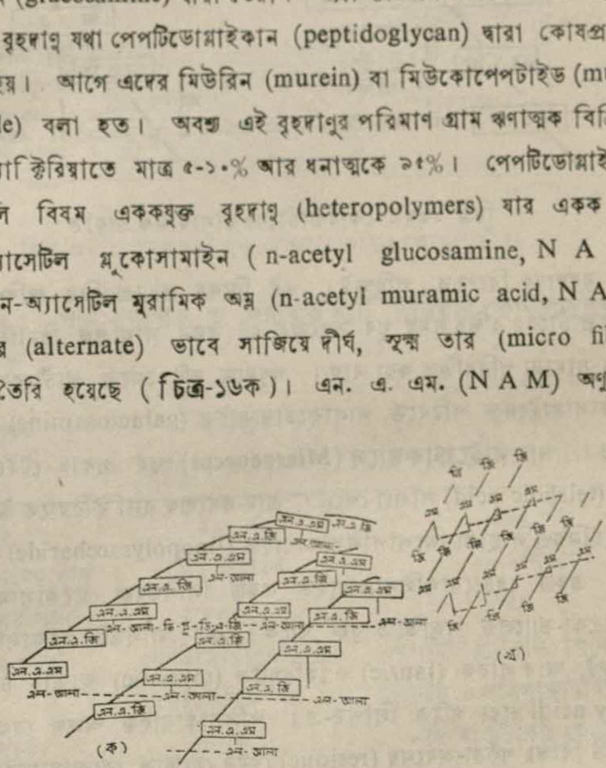
(গ) **ব্যাক্টিরিয়ার কোষপ্রাচীর** (Cell wall of bacteria) ঃ

মাইকোপ্লাসমা, রিকেটসিয়া প্রভৃতি কিছু ব্যাক্টিরিয়া ব্যাতীত সমস্ত ব্যাক্টিরিয়া কোষই সাধারণতঃ একটি দৃঢ় কোষপ্রাচীরে আবরিত থাকে। কোষের শুষ্ক বস্তুর প্রায় ২০-৩৫% কোষপ্রাচীর থেকে আসে। প্রাচীরের গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত জটিল। কোন একটি জৈব দ্রাবক (organic solvent) যেমন ফেনল (phenol), অ্যাসিটোন (acetone), কোহল, ইথার (ether) পিরিডিন (pyridine) বা ইউরিয়া (urea) দ্বারা দ্রবীভূত হয় না। কোষপ্রাচীরটি সাধারণতঃ ১০-২৫ মিলিমাইক্রন (mμ) পুরু।

প্রাচীরটি দুটি অংশ দ্বারা গঠিত (১) বহু সূক্ষ্ম তার (microfibril) দ্বারা তৈরী একটি সুবিন্যস্ত জালিকা (network) এবং (২) একটি ধারকবস্তুর মাধ্যম বা মাট্রিক্স (matrix)। প্রথমোক্ত জালিকাটি মাধ্যমের মধ্যে ঠিক রিইন-ফোরসড কংক্রিটে (reinforced concrete) যেমন লৌহজালিকা বসান হয় সেভাবে বসান থাকে।

ব্যাক্টিরিয়ার কোষপ্রাচীরের ভৌত ও রাসায়নিক গঠন অন্য জীবাণু বা উন্নত উদ্ভিদের প্রাচীর গঠনের থেকে আলাদা। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই এই গঠন প্রকৃতিতে একটা ছন্দ লক্ষ্য করা গেছে। প্রথমতঃ উন্নত উদ্ভিদ, অধিকাংশ শৈবাল ও কিছু ছত্রাক যেমন উমাইসিটস (Oomytes), ঈষ্ট (Yeast), আক্রাসিয়েলস (Acrasiales) প্রভৃতির কোষপ্রাচীর মূলতঃ একটি হোমো-পলিমার (homopolymer) যেমন সেলুলোস দ্বারা তৈরী। সেলুলোস বৃহদাণু

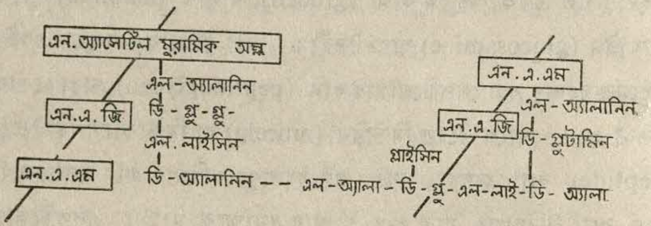
ডেকট্রোস একক অণুর ১ ও ৪ স্থানে বন্ধন (linkage) দ্বারা আবদ্ধ। অন্য কতকগুলি জীবাণু বিশেষত: জাইগোমাইসিটস (Zygomycetes), অ্যাসকোমাইসিটস্ (Ascomycetes) ও বেসিডিওমাইসিট্স ( Basidiomycetes ) গোষ্ঠীর ছত্রাকের কোষপ্রাচীর কাইটিন (chitin) বৃহদাণু দ্বারা তৈরী। এই বৃহদাণুগুলি একক অণু গ্লুকান (glucan), মানান (mannan) বা গ্লুকোসামাইন (glucosamine) দ্বারা তৈরী। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে একটি তৃতীয় ধরনের বৃহদাণু যথা পেপটিডোগ্লাইকান (peptidoglycan) দ্বারা কোষপ্রাচীর তৈরী হয়। আগে এদের মিউরিন (murein) বা মিউকোপেপটাইড (mucopeptide) বলা হত। অবশ্য এই বৃহদাণুর পরিমাণ গ্রাম ঋণাত্মক বিক্রিয়াযুক্ত ব্যাক্টিরিয়াতে মাত্র ৫-১০% আর ধনাত্মকে ৭৫%। পেপটিডোগ্লাইকান অণুগুলি বিষম এককযুক্ত বৃহদাণু (heteropolymers) যার একক অণু এন-অ্যাসেটিল গ্লুকোসামাইন ( n-acetyl glucosamine, N A G ) ও এন-অ্যাসেটিল মুরামিক অম্ল (n-acetyl muramic acid, N A M) একান্তর (alternate) ভাবে সাজিয়ে দীর্ঘ, সূক্ষ্ম তার (micro fibril) গুলি তৈরি হয়েছে ( চিত্র-১৬ক )। এন. এ. এম. (N A M) অণুটিতে




চিত্র ১৬ক : ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীরের গঠন

সব সময় একটি টেট্রাপেপটাইড (tetrapeptide) মালিকা, ডি. লাকটিক অম্ল মারফৎ ( D-lactic acid ) আটকান থাকে। টেট্রাপেপটাইডের অ্যামিনো অম্লগুলি এক একটি ব্যাক্টিরিয়াতে এক এক রকম হতে পারে

(**চিত্র-১৬খ**)। সমগ্র পেপটিডোগ্লাইকান বৃহৎ অণুর মধ্যে অণুগুলির বিন্যাস কিছুটা দড়ির মই-এর মত। নমনীয় পলিপেপটাইড দড়ি বা রজ্জুগুলির মাঝে মাঝে দৃঢ় পলিসাকারাইড ধাপ (rung) সাজিয়ে মইটি তৈরি হয়েছে। পলিসাকারাইড অণুগুলিকে পেপটাইড দ্বারা আবদ্ধ করার পদ্ধতিতে

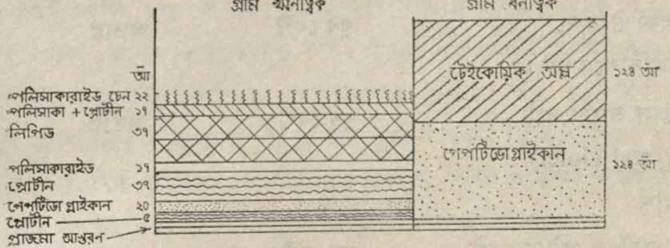



চিত্র ১৬খ : কোষপ্রাচীরের রাসায়নিক প্রকৃতি

এই বৃহদাণুর বিশেষত্ব পরিস্ফুট। এই বিশেষ গঠনপ্রকৃতির সুবিধা হচ্ছে কোষপ্রাচীরের বৃদ্ধির সময় খুব সহজেই এই বন্ধন সামগ্রিক বিন্যাস অটুট রেখে সামান্য পরিবর্তিত করা যায়। শুধুমাত্র দুটি ক্ষেত্রে প্রাচীরের গঠনে গ্লুকোসামাইনের পরিবর্তে গালাক্টোসামাইন (galactosamine) পাওয়া গেছে। আর **মাইক্রোকক্কাসে (Micrococcus)** দুই প্রকার টেইকোয়িক অম্ল (teichoic acid) পাওয়া গেছে। গ্রাম-ঋণাত্মক ব্যাক্টিরিয়াতে উপরোক্ত রাসায়নিকগুলি ছাড়া লিপোপলিসাকারাইড (lipopolysaccharide) থাকে। এতে একটি হেটারোপলিসাকারাইড একটি লিপিডযুক্ত গ্লুকোসামাইনের সাথে কো-ভ্যালেন্ট পদ্ধতিতে যুক্ত থাকে। এই লিপিডটি গ্লুকোসামাইন, ফসফেট, আর লরিক (lauric) ও মিরিসটিক (myristic) জাতীয় চর্বি অম্ল (fatty acid) দ্বারা গঠিত লিপিড-এ। পলিসাকারাইড অংশে দেখা যায় ৫-১০টি বিভিন্ন শর্করা-অবশেষ (residue) যেমন হেক্সোস, হেক্সোসামাইন এবং বিভিন্ন ধরনের ৩-৬ ডাইডো-অক্সি হেক্সোসগুলি যথা কলিটোস (colitose), আবিকোস (abequose) ইত্যাদি। এছাড়া টেইকোইক অম্লটি রিবিটল-ফসফেট বা গ্লিসেরল ফসফেটের বৃহদাণু। ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে অবশ্য দ্বিতীয় ধরনেরই প্রাদুর্ভাব বেশী।

ক্রিশ্চিয়ান গ্রামের (১৮৮৪) (Gram) রাঙানোর পদ্ধতি অনুযায়ী যে

দু'টি দলে সমস্ত ব্যাক্টিরিয়াকে ভাগ করা যায় তাদের কোষপ্রাচীরের গঠন প্রকৃতি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যযুক্ত বলে মনে করা হয়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ব্যাক্টিরিয়ার কোষপ্রাচীরের তুলনামূলক বিশ্লেষণে যে বিশেষত্বগুলি লক্ষ্য করা যায় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ( সারণী-১২, চিত্র-১৭ )।




চিত্র ১৭ : গ্রাম ধনাত্মক ও ঋণাত্মকদের কোষপ্রাচীর

**সারণী ১২ : গ্রাম ধনাত্মক ও ঋণাত্মক ব্যাক্টিরিয়ার কোষপ্রাচীরের বিশেষত্ব :**

| বৈশিষ্ট্য | ধনাত্মক (স্ট্যাফ. অরিয়াস) | ঋণাত্মক (ই. কোলি) |
|---|---|---|
| পুরুত্ব | ২৪০ আঁ | ১৪৫ আঁ |
| নাইট্রোজেনের ভাগ | ৫·১ শতাংশ | ১০·১ শতাংশ |
| ফসফরাসের ভাগ | ৫·৩৫ " | ১·৫২ " |
| রাসায়নিক গঠন | পেপটিডোগ্লাইকান ও টেইকোইক অম্ল | পেপটিডোগ্লাইকান, লিপিড, প্রোটিন ও পলিসাকারাইড। |
| মেসোসোম | আছে | নাই বা দু'একটি ক্ষেত্রে আছে। |
| এক শতাংশ NaOH দ্রবণে | সহনশীল | বিনষ্ট হয় |
| কোষে আর. এন. এ. ও ডি. এন. এ.-র অনুপাত | ৮:১ | ১:১ |

| বৈশিষ্ট্য | ধনাত্মক ( স্টাফ. অরিয়াস ) | ঋণাত্মক ( ই. কোলি ) |
|---|---|---|
| লাইসোজাইমে বিনাশ | কোষপ্রাচীর বিনষ্ট হয় বহুক্ষেত্রে | সাধারণতঃ হয় না |
| সালফা ঔষধ ও পেনিসিলিনে বিনাশ | খুব বেশী | অত্যল্প |
| ক্রিষ্টাল ভায়োলেটে (Crystal violet) বিনাশ | খুব বেশী | অত্যল্প |
| অ্যানায়ণিক ডেটারজেন্টে বিনাশ | খুব বেশী | অত্যল্প |

যতখানি জানা গেছে গ্রাম বিক্রিয়াগত বৈশিষ্ট্য কোন বিশেষ রাসায়নিকের উপর নির্ভরশীল। সম্ভবতঃ দুইটি কোষপ্রাচীরের ভেদ্যতার (permeability) তফাতের জন্যই এটা হয়। গ্রাম রাঙানোর সময় ইথাইল কোহলের সংস্পর্শে প্রাচীরের পেপটিডোগ্লাইকান জালিকার ছিদ্রগুলি সংকুচিত হয়। ঋণাত্মক ব্যাক্টিরিয়ার প্রাচীরে পেপটিডোগ্লাইকান পরিমাণেও কম থাকে এবং এতে ক্রস-বন্ধনের (cross-link) সংখ্যাও কম থাকে। কোহল জনিত সংকোচনের ফলে ছিদ্রগুলি ধনাত্মকে যতটা ছোট হয় ঋণাত্মকে তত হয় না। ফলে সি. ভি. আই. জোট (C V I complex) ধনাত্মকের প্রাচীরে আবদ্ধ হয় কিন্তু ঋণাত্মকের প্রাচীরে হয় না। এছাড়া ধনাত্মকদের কোষপ্রাচীরে মাগনেসিয়াম (Mg) পরমাণু বেশী থাকার কারণ এই গোষ্ঠীর প্রাচীরে অবস্থিত টেইকোইক অম্ল অণু বেশী পরিমাণে মাঙ্গানিজ আবদ্ধ করে রাখতে সমর্থ।

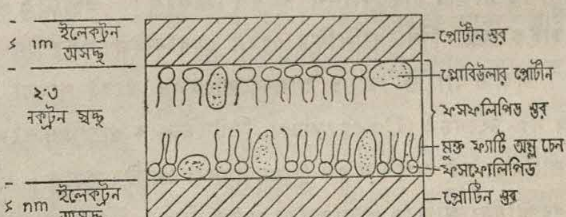
কোষপ্রাচীরের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে কোষের দ্রাঢ্য ও আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অন্যতম। পরিবেশের উচ্চ আস্রাবক (osmotic) চাপ সহ্য করার ক্ষমতাও কোষপ্রাচীরেরই অবদান। প্রাচীর বহু বিষ (toxin) ও ঔষধের (drug) ক্ষতিকারক প্রভাব প্রতিরোধ করে। এ ব্যাপারে টেইকোয়িক অম্লরও বহু অবদান রয়েছে। টেইকোইক অম্ল কোষের যে স্ববিনাশী (autolytic

অনুঘটকের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ ক'রে অনেক আক্রমণকারী ফাজের বন্ধন নিষ্ক্রিয়করণেও এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে ব'লে ইদানীং জানা গেছে।

(ঘ) **ব্যাক্টিরিয়ার কোষের প্লাসমা আস্তরণ** (plasma membrane) :

ব্যাক্টিরিয়ার কোষের অন্তর্ভাগে কোষপ্রাচীরের ভিতরের গায়ে ঠেসে থাকা একটি অতি সূক্ষ্ম আস্তরণ কোষবস্তুকে (cytoplasm) ঢেকে রাখে। প্রথমে এটিকে কোষবস্তুর আস্তরণও বলা হত (cytoplasmic membrane)। আস্তরণটির অস্তিত্বও এক সময় প্রমাণসাপেক্ষ ছিল। কিছু ব্যাক্টিরিয়ার কোষে এই আস্তরণ ও কোষপ্রাচীরের মধ্যে স্থান-ব্যবধান (space) থাকে যার নাম পেরিপ্লাসমিক পরিসর (periplasmic space)। এই পরিসরে কতকগুলি হাইড্রলাইটিক উৎসেচক (hydrolytic enzyme) থাকে।

সাধারণতঃ সম-আস্রাবক পরিবেশে ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীর কোনভাবে বিনষ্ট হ'লে কোষবস্তু এই আস্তরণে আবদ্ধ থাকে এবং একটি গোলাকার কোষে পরিণত হয় যাকে বলা হয় স্ফেরোপ্লাস্ট (sphaeroplast) বা প্রোটো-প্লাস্ট (protoplast)। এই আস্তরণটি ৭·৫ ন্যানোমিটার (nm) পুরু।




চিত্র ১৮ : প্লাসমা আস্তরণের গঠন-প্রকৃতি

আস্তরণটির সূক্ষ্ম গঠন দেখে মনে হোত এটি একটি ত্রিস্তর ঝিল্লি যার বহিস্থ দু'টি স্তর প্রোটিনদ্বারা গঠিত এবং মধ্যবর্তী স্তরটি লিপিড দ্বারা গঠিত **চিত্র-১৮**। আস্তরণের বহির্ভাগ বা পৃষ্ঠদেশ অসংখ্য দানাদানা, ক্ষুদ্র রোঁয়াতে পরিপূর্ণ এবং অন্তর্ভাগটি মসৃণ। এজাতীয় আস্তরণকেই রবার্টসন, ১৯৩৫ ; ডানিয়েলি ও ডেভসন, ১৯৪৫ (Robertson ; Danielli & Daveson) দের প্রস্তাব অনুযায়ী একক আস্তরণ বা ইউনিট মেমব্রেন (unit membrane) বলা হয়।

সম্প্রতি আস্তরণের গঠন সম্পর্কে যে ধারণা উপস্থাপিত হয়েছে তাকে তরল-গঠন নক্‌শা (Fluid mosaic model) বলা হয়। এই ধারণার উদ্গাতা সিংগার ও নিকলসন, ১৯৭২(Singer and Nicolson)। এক্ষেত্রে ৭·৫ ন্যানোমিটার (nm) পুরু এই আস্তরণটিকে বলা হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন ফসফোলিপিড প্রলেপের মধ্যে গোলাকৃতি প্রোটিন অণু ইতস্তত: বসানো একটি স্তর। প্রোটিন ও লিপিড অণুগুলি উভয় পদ্ধতিতেই সাজানো থাকতে পারে। প্রধানত: প্রোটিন ও লিপিড দিয়ে তৈরি। এতে শতকরা ৫০-৬৫ ভাগ প্রোটিন ও শতকরা ৩৫-৫০ ভাগ লিপিড থাকে। প্রোটিন ও লিপিড পরস্পর কো-ভালেণ্ট পদ্ধতিতে যুক্ত। এই আস্তরণে সামান্য পরিমাণ শর্করা, ডি. এন. এ. ও আর. এল. এ.ও থাকতে পারে বলে সন্দেহ করা হয়।

(১) লিপিড: ব্যাক্টিরিয়া ও অন্য প্রোকারিওট জীবাণুর প্লাসমা আস্তরণের লিপিডের প্রকৃতি ইউকারিওটদের সমতুল লিপিডের থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এক্ষেত্রে লিপিডের বৃহত্তর অংশই পোলার (polar) লিপিড, যেমন ফসফাটিডিল ইথানোলামাইন জাতীয় গ্লিসারোফসফোলিপিড, কার্ডিওলিপন জাতীয় ফস-ফাটিডিল গ্লিসেরল, লাইসিল জাতীয় আমাইনো আসিল ফসফাটিডিল গ্লিসেরল বা গ্লাইকোলিপিড জাতীয় গ্লাইকোসিল আসিল গ্লিসেরল। এছাড়াও রয়েছে লিপোটেইকোইক অম্ল, স্পিংগোলিপিড যেমন সেরামাইড ফসফরীল ইথা-নোলামাইন। অবাত ব্যাক্টিরিয়াতে প্লাসমালোজেনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। অন্য বহুরকম সহ-উৎসেচক (Co-enzyme), ভিটামিন-কে প্রভৃতিও রয়েছে।

(২) প্রোটিন: এই অংশে বাহক (transport) প্রোটিন আছে। এটি দ্রব (solute) অণুর প্লাসমা আস্তরণ পারাপারের কাজে লিপ্ত। উৎসেচক প্রোটিনও (enzyme) রয়েছে। এটি কোষের প্রাচীর ও আস্তরণ গঠনে লাগে।

প্লাসমা আস্তরণ ব্যাক্টিরিয়া কোষের পক্ষে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য্য অঙ্গ। পরিবেশ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করা এবং অপ্রয়োজনীয় ও উদ্বৃত্ত দ্রব্যগুলি রেচন করা এর অন্যতম ক্রিয়া। এই আস্তরণ বিভিন্ন কোষ অঙ্গ যথা কোষ প্রাচীর, আঠাল আস্তরণ ইত্যাদি সংশ্লেষণ করে। এই আস্তরণ বহু উৎসেচকের ধারক, সময়বিশেষে রাইবোজমের ধারক হিসাবেও কাজ করে। এই আস্তরণের নির্বাচক ভেদ্যতা (selective permeability) সাধারণত: ক্ষুদ্র অণু যথা অ্যামিনো অম্ল, শর্করা ইত্যাদির বহির্গমন ও কিছু

কোষের পক্ষে ক্ষতিকারক অণুর অন্তর্গমন রোধ করে। শ্বসনক্রিয়াতে ব্যবহার্য বহু প্রয়োজনীয় উৎসেচকের ধারক হিসাবে এই আস্তরণ শ্বসন ক্রিয়াও পরিচালনা করে। এই জাতীয় উৎসেচকের মধ্যে সাইটোক্রোম-সি (cytochrome-c), অম্ল ফসফেটেস (acid phosphatase), টার্মিনাল অক্সিডেজ (terminal oxidase) প্রভৃতি অন্যতম।

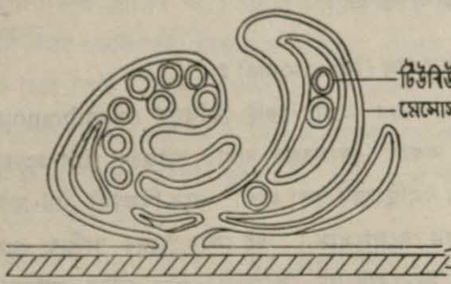
(ঙ) **ব্যাক্টিরিয়ার মেসোসোম** (Mesosome)ঃ

কোষের অভ্যন্তরে কোষবস্তুর মধ্যে একটি ঝিল্লিপূর্ণ (membranous) কোষ অঙ্গ রয়েছে। এই অঙ্গকে কোষবস্তুর মধ্যের আস্তরণ (intracytoplasmic membrane) বা কনড্রিয়য়েড বলা হত। পরে বিজ্ঞানী ফিট-জেমস (Fitz-James) এর নাম দেন মেসোসোম। এই কোষ অঙ্গের অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণিত হয় একটি আক্টিনোমাইসিট কোষে। পরে **স্টাফ. অরিয়াস** (**Staphylococcus aureus**) বা **ব্যাসিলাস সিরিয়াস** ব্যাক্টিরিয়াতে ঘোষণা করা গেছে। মূলতঃ ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের সাহায্যে এই কোষ অঙ্গ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে।

ধনাত্মক ব্যাক্টিরিয়াতে বিশেষতঃ **ব্যাসিলাস** গণের ক্ষেত্রে কোষে মেসোসোম সহজে ও প্রায়ই দেখা যায়। ঋণাত্মকদের মধ্যে **স্পাইরিলাম** গণেও যথেষ্ট দেখা গেছে। এই অঙ্গ আসলে প্লাসমা আস্তরণের অন্তর্মোড়ক (invaginations) দ্বারা গঠিত। সমগ্র মেসোসোমটি স্বভাবতঃই একটি ত্রিস্তর আস্তরণ একক দ্বারা গঠিত। মেসোসোমের লিপিড অংশের প্রকৃতি প্লাসমা আস্তরণের লিপিডের মত। তবে প্রোটিন অংশের প্রকৃতি কিছুটা স্বতন্ত্র। সাধারণতঃ কোষের মধ্যে কেন্দ্রের আশেপাশে এবং বিভাজন-প্রাচীরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মেসোসোম বেশী দেখা যায়।

গঠন প্রকৃতিগতভাবে মেসোসোম বহুগুচ্ছ ফোস্কা (vesicles), ক্ষুদ্রনালিকা (tubules) বা আস্তরণযুক্ত আবর্ত (whorls) প্রভৃতি উপাঙ্গ দ্বারা গঠিত (চিত্র-১৯)। এই উপাঙ্গগুলি এক বা একাধিক সংখ্যাতে একটি মেসোসোমে দেখা যায়। উপাঙ্গগুলি মেসোসোমের গঠনে প্রায়ই অস্থায়ী (unstable) ও পরিবর্তনশীল। কোষকে আস্রাবণজনিত আঘাতে (osmotic shock) বা শীতল পরিবেশে রাখলে কোষমধ্যে মেসোসোম অদৃশ্য হয়।

মেসোসমের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে মেসোসমের ক্রিয়াকলাপ হিসাবে যে যুক্তিভিত্তিক প্রস্তাব করা হয়েছে তা বলা যায়। এই অঙ্গে শ্বসনের বিভিন্ন উৎসেচক পাওয়া গেছে। ফলে শ্বসন এই কোষ অঙ্গের একটি অন্যতম ক্রিয়া। মেসোসমের অন্য কাজও




চিত্র ১৯ : মেসোসোম-এর গঠন-প্রকৃতি

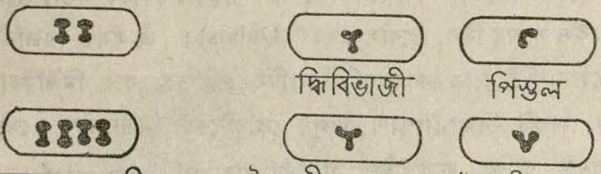
রয়েছে, কারণ অবাত ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে যেমন **ক্লস্ট্রিডিয়াম (Clostridium)** ও **ল্যাক্টোব্যাসিলাসেও (Lactobacillus)** মেসোসোম রয়েছে। মেসোসম কোষপ্রাচীর সংশ্লেষণের কার্যেও লিপ্ত। কোষ বিভাজনের সময় বিভাজক-প্রাচীর গঠনে এই অঙ্গ অংশগ্রহণ করে। মেসোসোমগুলিকে ঐ সময় বিভাজক প্রাচীরের পাশে দেখা যায় এবং যেকোন পদ্ধতিতে এদের অপসারণ করলেও বিভাজন ক্রিয়া বন্ধ হয় বলে এটা ভাবা হচ্ছে। সম্ভবতঃ এণ্ডোস্পোর (endospore) গঠনেও এদের অবদান রয়েছে। বিভিন্ন রাসায়নিক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া যথা নাইট্রিফিকেসন (nitrification) বা নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ (fixation) ইত্যাদি কাজেও মেসোসমের দায়িত্ব রয়েছে। সালোক সংশ্লেষক ব্যাক্টিরিয়াতে আলোকশোষণকারী রঙ্গক (pigment) এই আস্তরণের মধ্যে প্রোথিত থাকে। সেক্ষেত্রে মেসোসমের প্লাষ্টিড-প্রোথিত ফোস্কাগুলিকে (vesicle) বলা হয় **থাইলাকয়েড (thylakoid)**। এছাড়াও কোষের সংশ্লেষিত বস্তু ও দ্রব্যগুলি যথাযথ স্থানে প্রেরণ ও বিন্যাসের কাজেও এই অঙ্গ লিপ্ত রয়েছে। সম্ভবতঃ ক্রোমোসমের দ্বিবিভাজন নিয়ন্ত্রণেও মেসোসম অংশগ্রহণ করে। মেসোসম একটি স্ববিভাজনকারী কোষঅঙ্গ। এটি কোষের বহু প্রয়োজনীয় জৈবনিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে।

**(চ) ব্যাক্টিরিয়ার কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস বা জিনোফোর** (Nucleus or genophore) **:**

ব্যাক্টিরিয়ার কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস সম্পর্কে বহু মতদ্বন্দ্বের অবতারণা হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ব্যাক্টিরিয়ার কোষে নিউক্লিয়াসের অস্তিত্ব সম্পর্কেও সন্দেহ ছিল, ডুবোস ১৯৪৫ (Dubos)। ঐ সমস্ত বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে ব্যাক্টিরিয়ার কোষ অতি আদিম প্রকৃতির, যার নিউক্লিয়াস নাই। অন্য একটি বিজ্ঞানীগোষ্ঠী সম্পূর্ণ কোষটিকেই নিউক্লিয়াস ভেবে ছিলেন। সমস্ত ভ্রান্তির মূলে ছিল ব্যাক্টিরিয়ার অতি ক্ষুদ্র আকৃতি, এর নিউক্লিয়াসের সুসংগঠিত আকৃতির অভাব ও ব্যাক্টিরিয়াকোষের অন্য কিছু বিশেষত্ব। রাঙানোর বিশেষ পদ্ধতি আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী পিয়েকারস্‌কি (Piekarski) ১৯৩৭; রবাইনো ১৯৪২ (Robinow) প্রভৃতি ব্যাক্টিরিয়া কোষে নিউক্লিয়াসের উপস্থিতি প্রমাণ ও প্রদর্শন ক'রে সকল সংশয় দূর করেন। ব্যাক্টিরিয়ার কোষের অত্যধিক আর. এন. এ. হাইড্রোক্লরিক অম্ল দ্বারা দূর করে নিউক্লিয়াসকে ফুকসিন (Fuchsin) দ্বারা রাঙানোর পদ্ধতি ফালজেন (Feulgen) পদ্ধতি নামে বিখ্যাত হয়। পরে আরও বহু পদ্ধতিতে নিউক্লিয়াস রাঙানোর চেষ্টা হয়েছে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা সফলও হয়েছে। অন্য পদ্ধতিগুলির মধ্যে ফালজেন পদ্ধতিতে হাইড্রোক্লোরিক অম্লর পরিবর্তে রাইবোনিউক্লিয়েস উৎসেচক ব্যবহার, জিয়েমসার পদ্ধতি (Giemsa's stain), ফেজ কনট্রাস্ট পদ্ধতি (Phase-contrast microscopy) (ম্যাসন ও পাওয়েলসন) (Mason and Powelson, ১৯৫৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

উপরে বলা কোষরসায়ন বিজ্ঞানগত (cytochemical) পদ্ধতিগুলিতে বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার যে কেন্দ্র দেখা গেছে তা গাঢ় লাল, ছোট, দণ্ডাকৃতি ও ব্যাক্টিরিয়া কোষের দৈর্ঘ্যের সমকোণে অবস্থিত। সাধারণতঃ প্রতিকোষে নিউক্লিয়াস দণ্ডের সংখ্যা ৪টি দেখা যায়, খুব অল্প ক্ষেত্রেই দেখা যায় দুটি। বিজ্ঞানীরা ব্যাক্টিরিয়ার এই বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত অবস্থাটিকে বলেছেন কোষ-বিভাজন ও নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময়ের অসংগতির ফল। অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের বিভাজন যত দ্রুত হয় কোষবিভাজন অত দ্রুত হয় না। সময় সময় ২-১ পুরুষের তফাৎ হয়ে যায়। সাধারণভাবে দণ্ডাকৃতি ডামবেল ছাড়াও অন্য যেসব আকৃতিতে রাঙানো নিউক্লিয়াস দেখা গেছে সেগুলি হচ্ছে দ্বিবিভাজী (bifid), বিভাজন

কামী (dividing), ডামবেল (dumb bell), পিস্তল (pistol) ইত্যাদি (চিত্র-২০)। নিউক্লিয়াসের এই পরিবর্তনশীল আকৃতি পরিবেশের ওপরও নির্ভরশীল।

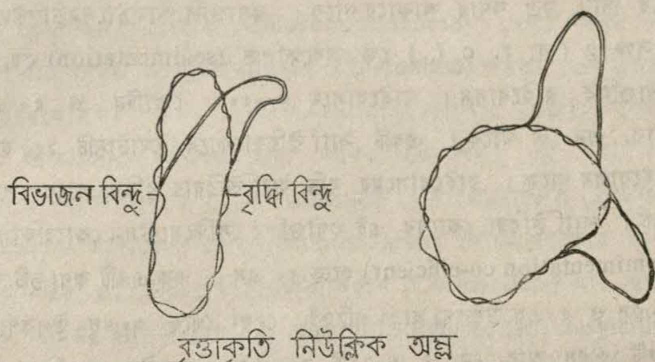



চিত্র ২০ঃ কেন্দ্রের প্রকৃতি

## নিউক্লিয়াসের প্রকৃতিঃ

অন্য সমস্ত জীবের মত ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিয়াসেরও মূলবস্তু ডি. এন. এ। এই তথ্য ফ্লুরেসেন্স অণুবীক্ষণের (Flurescence microscopy) সাহায্যে (আনডারসন ১৯৫৭; Anderson) বা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিয়াসের সাহায্যে প্রমাণিত (মুনসন ও মাক্লিন ১৯৬১; Munson and Maclean)। নিউক্লিয়াস সম্পর্কে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য ফন ইটারসন ও তাঁর সঙ্গীরা ১৯৬০; van Iterson et al তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ। ১। ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিয়াস ২০ অাঁ সূক্ষ্ম তন্তু (fibre) দ্বারা তৈরী জালিকা। ২। এর বহির্ভাগে কোন স্বচ্ছ বা নির্দিষ্ট সীমারেখা বোঝা যায় না বলে মনে হয় এর কোন বহিঃআস্তরণ (nuclear membrane) নেই। ৩। জালিকার সূক্ষ্ম সূত্রগুলি একটি হালকা মশলা-বস্তু বা মাট্রিক্সে (matrix) নিবদ্ধ থাকে। তবে ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিয়াসে এ পর্যন্ত ডি. এন. এ. ছাড়া অন্য কোন বস্তুর উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরে বিজ্ঞানী ক্যারো, ১৯৬১ (Caro) $^3H$ থাইমিডিনের (thymidin) সাহায্যে একস রশ্মিনির্ভর স্বচিত্র (autoradiography) গ্রহণ পদ্ধতিদ্বারা উল্লিখিত সূক্ষ্ম সূত্রগুলির ডি. এন. এ. প্রকৃতি প্রমাণ করেন। বিজ্ঞানী কেয়ার্নস ১৯৬৩ (Cairns) তাঁর অনবদ্য কুশলতায় উপরিউক্ত পদ্ধতিতে **ই. কোলি (E. coli)** নিউক্লিয়াসের যে চিত্র উপস্থাপিত

করেন তা সবদিক দিয়ে যুগান্তকারী। এতদ্বারা নিউক্লিয়াসজালিকার ডি. এন. এ. প্রকৃতি নির্ধারিণ করা ছাড়াও ব্যাক্টিরিয়ার ডি. এন. এ. যে একটি মাত্র ১১০০ মাইক্রোমিটার (μm) দীর্ঘ ডি. এন. এ. সূত্র (জোড়া আবর্ত বা double helix) দ্বারা গঠিত তাও জানা গেল। এই সূত্র যে বৃত্তাকৃতি (circular) অর্থাৎ মুক্ত প্রান্তবিহীন (free end) তাও নিশ্চিতভাবে দেখা গেল




চিত্র ২১ : ব্যাক্টিরিয়ার কেন্দ্রস্থ নিউক্লিক অম্ল

(**চিত্র-২১**)। চিত্রের দ্বিতীয় অর্ধবৃত্তটি ডি. এন. এর দ্বিবিভাজনের সাক্ষ্য। দু'টি দ্বিশৃঙ্গ (double fork) আকৃতির মধ্যে একটি বিভাজন উৎপত্তি বিন্দু (origin) এবং অপরটি অগ্রগামী বিন্দু (growing point)। অন্য ব্যাক্টিরিয়া যেমন **মাইকোপ্লাসমা হোমিনিস (Mycoplasma hominis)** ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই তথ্য সমর্থিত হয়েছে (বোদে ও মোরোউইজ, Bode and Morowitz) যদিও এক্ষেত্রে ২৬৫ মাইক্রোমিটার (μ) দীর্ঘ ডি. এন. এ. সূত্রবৃত্ত পাওয়া গেছে।

অন্যান্য জীব ও জীবাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটিনের অস্তিত্ব ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে সমর্থিত হয় নাই। প্রোটিন বিচ্ছিন্নকারী 'প্রোনেস' উৎসেচক (pronase) নিউক্লিয়াসে প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ হয়। এধরনের পরীক্ষাদি এই ধারণাই দৃঢ় মূল করে যে ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিয়াসে প্রোটিন অনুপস্থিত বা নির্ধারণক্ষম পরিমাণে নাই।

ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিয়াস তাই আস্তরণ বিহীন। একটি মাত্র এবং বৃত্তাকার ক্রোমোসম যুক্ত। এই সমস্ত বিশেষত্বে এই নিউক্লিয়াস জীবজগতে এক বিস্ময়কর বস্তু।

## (ছ) ব্যাক্টিরিয়ার রাইবোসম (Ribosomes) :

ব্যাক্টিরিয়াকোষে সমগ্র আর. এন. এর বিরাট অংশ প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে অতি ক্ষুদ্র কণার আকারে থাকে। কণাগুলি আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রে ১ লক্ষ g ( বা r. c. f. ) তে অবক্ষেপিত (sedimentation) হয়, এই কণাগুলিই রাইবোসম। রাইবোসমে ৩০-৫০% প্রোটিন ও ৫০-৭০% আর. এন. এ থাকে। একটি ব্যাক্টিরিয়াকোষে মোটামুটি ১০ হাজার রাইবোসম থাকে। রাইবোসমের বৃদ্ধি ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধির সাথে সাথেই ঘটে। ব্যাক্টিরিয়া কোষের এই কণাগুলির সেডিমেণ্টেসন কোয়েফিসিয়েন্ট (semimentation co-efficient) হচ্ছে ৭০ এস। এক একটি কণা দুটি অসম ৩০এস ও ৫০এস উপকণা দ্বারা গঠিত। দেখা গেছে ৩০এস উপকণাটিতে একটি ১৬এস আর. এন. এ. ও ২১টি ৯০০-৬৫০০০ ডাল্টন আণবিক ভরের প্রোটিন রয়েছে। এই প্রোটিনগুলির সবকটিই রাইবোসমের কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নয়। আবার ৫০এস উপকণাটিতে ২৩এস ও ৫এস মাপের দুটি আর. এন. এ. অণু রয়েছে। এছাড়া রাইবোসমে পলিঅ্যামাইন (poly-amine), স্পারমিন (spermine), স্পারমিডিন (spermidine) প্রভৃতি অণুও রয়েছে। সমস্ত অংশগুলিকে একত্রিত করার কাজে মাগনেসিয়াম আয়নের নিশ্চিত অবদান আছে। যদিও এই অংশগুলির সঠিক বিন্যাসপ্রকৃতি এ পর্য্যন্ত নির্ধারিত নয়।

রাইবোসমেই ব্যাক্টিরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণ হয়। রাইবোসম কণাগুলি রাইবোসম-মালা (polyribosome) হিসাবে এম. আর. এন. এ সূত্রর দ্বারা গ্রথিত হলেই এটি তৈরি হয়। রাইবোসমের ৩০এস উপকণা-অংশগুলিই উক্ত সূত্রদ্বারা গ্রথিত থাকে। খবরবাহক আর. এন. এ. (m-R N A) ডি. এন. এ. থেকে প্রোটিন-তৈরির বিভিন্ন নির্দেশ (code) বহন করে। ফলে এরা ব্যাক্টিরিয়াকোষে এককালীন ২-৪% পরিমাণ থাকে।

**(জ) ব্যাক্টিরিয়ার সালোক সংশ্লেষক কোষঅঙ্গ** (photosyultetic apparatus) :

ব্যাক্টিরিয়ার স্বজীবি (autotrophic) গোষ্ঠীর মধ্যে একটি উপগোষ্ঠী সালোকসংশ্লেষণের দ্বারা শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে। এপর্যন্ত যত সালোক সংশ্লেষক ব্যাক্টিরিয়ার কথা জানা গেছে তাদের তিনটি স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত করা যায়।

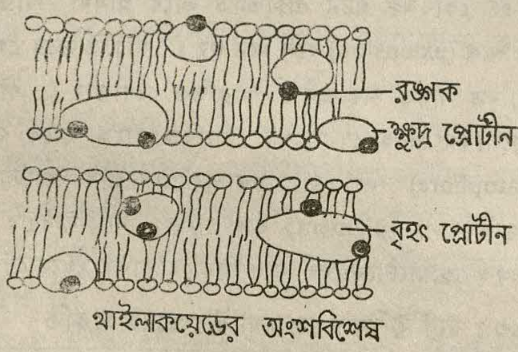
(১) ক্লোরোব্যাক্টিরিয়েসি (Chlorobacteriaceae) গোত্রে সবুজ গন্ধক নির্ভর ব্যাক্টিরিয়া যথা **ক্লোরোবিয়াম (Chlorobium)** অন্যতম। এর সালোক সংশ্লেষককোষঅঙ্গ ১০০–১৫০ × ৩০-৪০ মাইক্রোমিটার (μm) পরিমাপ-যুক্ত, বহুস্তরবিশিষ্ট আস্তরণ দ্বারা আবদ্ধ কোষঅঙ্গ। এই কোষঅঙ্গের সাথে প্লাসমা আস্তরণের কোন সংযোগ নাই। থায়োরোডেসি (Thiorhodaceae) ও আথায়োরোডেসি (Athiorhodaceae) গোত্রে যথাক্রমে বেগুনী গন্ধক নির্ভর ব্যাক্টিরিয়া যথা **ক্রোমাসিয়াম (Chromatium)** আর বেগুনী-গন্ধক অনির্ভর ব্যাক্টিরিয়া : যথা **রডোস্পাইরিলামের (Rhodospirillum)** ক্ষেত্রে এই কোষঅঙ্গ গঠন প্রকৃতিগত ভাবে প্লাসমা আস্তরণের একটি প্রসারিত অংশ (extension) বলে মনে হয়। আকৃতি উভয় ক্ষেত্রেই কোস্কার (vesicle) মত যদিও অন্য প্রকার আকৃতিও দেখা যায়। এই স্তরযুক্ত কোষ অঙ্গে সালোকসংশ্লেষক যে অংশটি প্রোথিত থাকে তাকে ক্রোমাটোফোর (chromatophore) বলা হয়। ক্রোমাটোফোরগুলি প্রোটিন, লিপিড ও বেশ কতগুলি রঙ্গক (pigment) দ্বারা গঠিত। ব্যাক্টিরিয়ার কোষে যেসব বিভিন্ন রঙ্গক ক্রোমাটোফোরের অংশ হিসাবে পাওয়া গেছে সেগুলি নিম্নরূপ।

**সারণী ১৩ : ব্যাক্টিরিয়ার ক্রোমোটোফোরের প্রকৃতি**

| ব্যাক্টিরিয়া | ক্রোমোটোফোরের প্রকৃতি | | |
|---|---|---|---|
| | কুইনোন | রঙ্গক | লিপিড |
| ক্লোরোবিয়াম (Chlorobium) | মেনাকুইনোন (menaquinone) | ক্লোরোবিয়াম-ক্লোরোফিল (chlorobium-chlorophyll)<br>ব্যাক্টিরিওক্লোরোফিল-এ (bacteriochlorophyll-a) | ফসফোলিপিড |

| | ক্রোমাটোফোরের প্রকৃতি | | |
|---|---|---|---|
| ব্যাক্টিরিয়া | কুইনোন | রঙ্গক | লিপিড |
| ক্রোমাসিয়াম (Chromatium) | উবিকুইনোন (ubiquinone) | ব্যাক্টিরিওক্লোরোফিল-এ ” -বি | ফসফাটিডিল ইথানলামাইন (phosphatidyl ethanolamine) |
| রোডোসিউডোমোনাস (Rhodopseudomonas) | উবিকুইনোন | ক্যারটিনয়েড (carotenoid) হাইড্রক্সিস্ফেরয়ডিনোন (hydroxyspheroidinone) | |

সামগ্রিক ভাবে আস্তরণে আবদ্ধ সালোকসংশ্লেষক অঙ্গকে সমস্ত জীব বা জীবাণুর ক্ষেত্রে থাইলাকয়েড (thylakoid) বলা হয়। বিভিন্ন জীবাণুতে এই থাইলাকয়েডগুলি বিভিন্নভাবে সাজানো থাকে (**চিত্র-২২**)।




থাইলাকয়েডের অংশবিশেষ

চিত্র ২২ : সালোকসংশ্লেষক কোষঅঙ্গ

**(ঝ) কোষবস্তুর কোষদানা** (Insoluble particles) :

কোষদানাগুলির মধ্যে সাধারণতঃ শক্তিসঞ্চিত রাসায়নিকই থাকে বেশী। স্বল্প আণবিকভরযুক্ত জৈবরাসায়নিকও থাকে। দানাগুলির অবস্থান ও দৃশ্যগ্রাহ্যতা কোষের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। ব্যাক্টিরিয়ার কোষে বিশেষতঃ যে দানাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি হচ্ছে :

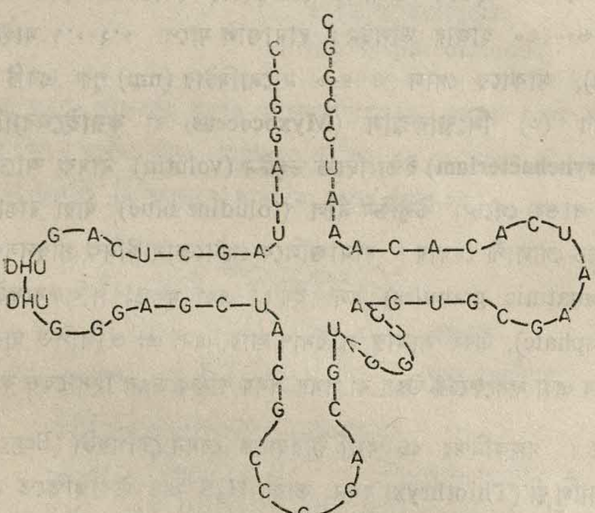
(১) পলিগ্লুকান দানা (polyglucans): এই দানাগুলি আয়োডিনের সংস্পর্শে নীল, লালচে-নীল অথবা বাদামী রঙ ধারণ করে। এদের গঠন-প্রকৃতি কিছুটা গ্লাইকোজেনের (glycogen) মত, শাখাপ্রশাখা যুক্ত। এগুলি শক্তিসঞ্চয়কারী দানা। (২) কিছু ব্যাক্টিরিয়াতে এক জাতীয় দানা কোষবস্তুতে যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান যে দানাগুলি সুদান-কালো (Sudan black) রঙে রাঙানো যায়। এগুলিকে পূর্বে 'লিপিড' বিন্দু ভাবাহত। ইদানীং গবেষণালব্ধ তথ্যে দেখা যাচ্ছে এগুলি জলে অদ্রব এবং অত্যধিক বিজারিত (highly reduced) পলিল্যাক্টাইড (polylactide) যা D(-)-3-hydroxybutyrate অণুগুলি সংযোজিত হয়ে বৃহদাণু হিসাবে সৃষ্টি হয়। এর আণবিক ভর ৬০-২৫০ হাজার ডালটন। দানাগুলি মাপে ০.২-০.৭ মাইক্রোমিটার (μm), আকারে গোল ও ৪-৬ নানোমিটার (nm) পুরু একটি আস্তরণে ঢাকা। (৩) **মিক্সোকক্কাস (Myxococcus)** বা **করাইনেব্যাক্টিরিয়াম (Corynebacterium)** ইত্যাদিতে ভলুটিন (volutin) নামক আরেক ধরনের দানা পাওয়া গেছে। টলুডিন নীল (toludine blue) দ্বারা রাঙালে এদের লালচে-গোলাপী দেখায়। দানাগুলিকে মেটাক্রোমাটিনিক গ্রানুলসও (metacaromatinic granules) বলা হয়। এরা মূলতঃ পলিফসফেট (polyphosphate), এবং সামান্য পরিমাণ আর. এন. এ. ও লিপিড দ্বারা গঠিত। কোষে এরা ফসফেটের উৎস বা সময় সময় শক্তির উৎস হিসাবেও কাজ করে।

৪। গন্ধকনির্ভর বহু ব্যাক্টিরিয়াতে যেমন **বেগিয়টা** (Beggiota) বা **থায়োথ্রিক্স** (Thiothryx) যখন তারা $H_2S$ এর উপস্থিতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি করে তখন তাদের কোষে গন্ধকের আলোকবিচ্ছুরণক্ষম ফোঁটা (droplet) দেখা যায়। এই ফোঁটাগুলি শক্তি-উৎস হিসাবে কাজ করে। **ক্রোমাসিয়ামে (Chromatium)** এগুলি আবার একটি প্রোটিনজাতীয় আস্তরণে আবদ্ধ থাকে। শক্তিউৎস ছাড়া অন্য কিছু অদ্রব দানাও কোষবস্তুতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে কার্বনিল ডাইউরিয়া (Carbonyl diurea) অন্যতম।

(ঞ) **কোষবস্তুর দ্রবণীয় বস্তুগুলি** Cytosol):

অদ্রবণীয় কণা বা ফোঁটা ব্যতীত অন্য বহু অণু রয়েছে যারা কোষবস্তুতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে। দেখা গেছে ব্যাক্টিরিয়াকোষে দ্রবীভূত বস্তুর মধ্যে

সব থেকে বেশী থাকে প্রোটিন, যার মধ্যে উৎসেচকগুলিও অন্তর্ভুক্ত। দ্রবীভূত অণুগুলির মধ্যে বৃহৎ অণুযুক্ত রাসায়নিকগুলি যেমন বাহক আর. এন. এ) (transfer RNA বা tRNA), রঙ্গক (pigments) ইত্যাদি অন্যতম। ক্ষুদ্র অণুগুলির মধ্যেনিউক্লিওটাইড (nucleotides), অ্যামিনো অম্ল (amino acids) ইত্যাদি। প্রায় ২০ প্রকার বাহক আর. এন. এ. পাওয়া যায় ব্যাক্টিরিয়া-কোষে। এক একটি বাহক আর. এন. এ.তে অন্ততঃ ৭০ থেকে ৮০টি করে নিউক্লিওটাইড থাকে। প্রত্যেকটির গঠনে বিভিন্নতা ও বিভিন্ন সংখ্যক ফাঁস (loop) থাকে ( **চিত্র—২৩** )। এধরনের আর. এন. এ সূত্রটির দুটি মুখ




চিত্র ২৩ : বাহক আর. এন. এ.র চেহারা—লবঙ্গপাতা

একটি ফাঁসের প্রান্তদেশে থাকে। এই আর. এন. এ.গুলি সাধারণতঃ প্রোটিন সংশ্লেষণে কাজে লাগে। হোলীর (Holley, ১৯৭৮) গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে বাহক আর. এন. এ.র গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য উপস্থাপিত ( চিত্র—২৩ ) করা হল।

যেসব বিভিন্ন ধরনের রঙ্গক কোষবস্তুতে দ্রবীভূত অবস্থাতে থাকে তাদের রাসায়নিক প্রকৃতিও ভিন্ন। (সারণী ১৪) |

সারণী ১৪ : ব্যাক্টিরিয়া কোষে দ্রবীভূত রঙ্গক

| ব্যাক্টিরিয়া | রঙ্গক | রঙ |
|---|---|---|
| সেরাসিয়া মার্সেসেন্স (Serratia marcescens) | প্রডিজিওসিন (Prodigiosin) | লাল |
| ক্রোমোব্যাক্টিরিয়াম ভায়োলেসিয়াম (Chromobacterium violaceum) | ভায়োলেসিন (Violacin) | বেগুনী |
| সিউডোমোনাস আয়োডিনিয়াম (Pseudomonas iodinium) | ফেনাজিন (Phenazine) | গাঢ় বেগুনী |
| পি. এরুজিনসা (Ps. aeruginosa) | পায়োসায়ানিন (Pyocyanin) | কাল |
| করাইনেব্যাক্টিরিয়াম মিচিগানেনসি (Corynebacterium michiganense) | কান্থাজান্থিন (Canthazanthin) | হলুদ |

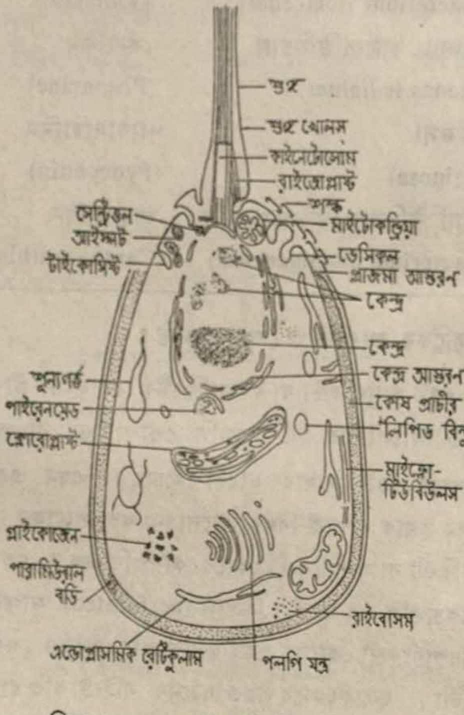
## ২·৩০ ছত্রাকের আকৃতি ও জৈব প্রকৃতি :

ছত্রাক একটি সম্পূর্ণকেন্দ্রী বা ইউকারিওটিক কোষযুক্ত জীবাণু। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে আলোচিত বিশেষত্বগুলি প্রোকারিওট বা অসম্পূর্ণকেন্দ্রীদের বিশেষত্ব সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা দিয়েছে। এখন একটি সম্পূর্ণকেন্দ্রী জীবাণু যেমন ছত্রাক সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা প্রয়োজন।

ইউক্যারিওট বা সম্পূর্ণকেন্দ্রী কোষে কোষপ্রতি এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস থাকে। কেন্দ্রগুলি এক জাতীয় ছিদ্রাল (perforated) আস্তরণ দ্বারা ঢাকা। এছাড়া অসম্পূর্ণকেন্দ্রী কোষের চেয়ে ছত্রাককোষ আরও অন্যভাবেও অধিক উন্নত ও জটিল। ছত্রাককোষে উন্নত ধরনের মাইটোকণ্ড্রিয়ার (mitochondria) ও শূন্যগর্ভের (vacuole) উপস্থিতি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্পূর্ণকেন্দ্রী কোষ ছত্রাক ছাড়া অন্য জীবাণু যেমন শৈবাল, প্রোটোজোয়া, পিচ্ছিল ছত্রাক ইত্যাদিতেও রয়েছে। এদের অন্য কোষঅঙ্গগুলিও প্রোকারিওটদের কোষ অঙ্গের তুলনাতে উন্নত ও জটিল।

## ২'৩১ ইউকারিওট বা সম্পূর্ণকেন্দ্রী কোষের (eucaryotic cell) সূক্ষ্মগঠন :

সাধারণভাবে প্রোটোজোয়া এবং পিচ্ছিল ছত্রাকের সচলকোষ; বা সোয়ার্মকোষ (swarm cell) এবং ছত্রাক ও শৈবালের সচলস্পোর বা জুস্পোর (zoospores) গুলি এককোষী। ছত্রাক ও বহু শৈবালের জায়মান




চিত্র ২৪ : সম্পূর্ণকেন্দ্রী জীবাণুকোষ

অঙ্গ (vegetative part) হচ্ছে বহুকোষী। বর্তমান আলোচনাতে সমস্ত সম্পূর্ণকেন্দ্রী জীবাণুর প্রতিনিধি হিসাবে একটি কাল্পনিক কোষের (**চিত্র-২৪**) সহায়তায় ইউকারিওট কোষের বিশেষত্বগুলি বলা হচ্ছে।

**(অ) কোষপ্রাচীর ও প্লাসমা আস্তরণ (Cellwall and plasma-lemma) :**

সম্পূর্ণকেন্দ্রী কোষের একটা যথার্থ (true) কোষপ্রাচীর রয়েছে। প্রাচীরটি মোটামুটি দৃঢ়, তবে রাসায়নিক গঠনপ্রকৃতি অনুযায়ী এটি ব্যাক্টিরিয়ার কোষ-প্রাচীর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কোষপ্রাচীরটি একটি জৈবমণ্ডলা বা মাট্রিক্সের (matrix) মধ্যে প্রোথিত একটি সূক্ষ্ম সূত্রযুক্ত কাঠামো (micro-fibrillar skeleton or framework)। বেশীরভাগ ছত্রাকে এই কাঠামোটি কাইটিন (chitin) দ্বারা গঠিত যদিও অন্য কিছু ক্ষেত্রে যেমন সবুজ শৈবালে এটি সেলুলোজ দ্বারা গঠিত। এইসব জীবাণুর জীবনচক্রের বিভিন্ন অবস্থাতে কোষপ্রাচীরের গঠনের যথেষ্ট পরিবর্তনও হয়। কিছু শৈবালের কোষগাত্রে একটি আঁশযুক্ত স্তর দেখা যায়। এ ধরনের আঁশ বা অন্যরকম অবক্ষেপ (deposit) অনেক প্রোটোজোয়াতেও দেখা যায়। এগুলি যথার্থ কোষপ্রাচীর স্তরেই থাকে। কতকগুলি প্রোটোজোয়াতে কোষ-বহির্ভাগে আঠাল স্তর (slime layer) ও তন্তু জাতীয় স্তর (filamentous layer) থাকে। ছত্রাক ও শৈবালের ক্ষেত্রে এ জাতীয় স্তর দৃঢ় কোষঅঙ্গে সৃষ্টি হয় না, হয় অন্যত্র।

কোষের মধ্যে কোষবস্তু একটি আস্তরণে ঢাকা থাকে যার নাম প্লাসমা আস্তরণ বা প্লাসমালেমা (Plasmalema)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেমন ছত্রাকের জুস্পোর (zoospore) আস্তরণটি যথেষ্ট মসৃণ অথচ ইউগ্লিনার (Euglena) ক্ষেত্রে এ'টি কুঞ্চিত। বহুকোষের সত্যিকারের কোষপ্রাচীর থাকেনা, শুধুমাত্র প্লাসমা আস্তরণে ঢাকা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে এধরনের কোষকে উন্মুক্তকোষ (naked cell) বলা হয়।

প্লাসমা লেমার সূক্ষ্ম গঠনে দেখা যায় এটি একটি ৭৫-১০০ অাঁ (আংস্ট্রম) পুরু ত্রিস্তরগঠন যার দুটি স্তর ইলেকট্রন নিবিড় (electron dense) ও মধ্যবর্তী একটি স্তর ইলেকট্রন স্বচ্ছ (electron transparent)। প্রতিটি স্তর মোটামুটি ২৫-৩০ আংস্ট্রম (অাঁ) পুরু। এই আস্তরণটি একক আস্তরণ (unit membrane) জাতীয় যা বহু জীবকোষেই বিদ্যমান। লিপিড স্তরদ্বয়ের অণুগুলির মেরুজ প্রান্ত (polar ends) গুলি অন্তর্মুখী হিসাবে সাজানো থাকে। লিপিড স্তর দুটির ইলেক্‌ট্রন-ঘনত্ব আবার স্বতন্ত্র ধরনের। কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রে লিপিডের বহিস্তরটি অন্তঃস্তরের তুলনাতে কম ঘন। উন্নত উদ্ভিদে এটা ঠিক বিপরীত

প্রকৃতির। প্লাসমা আস্তরণ একটি পরিবর্তনশীল আস্তরণ যা কাজের ও সময়ের প্রয়োজনে গঠনের পরিবর্তন ঘটায়। প্রাচীরযুক্ত কোষে এই আস্তরণ সাধারণতঃ প্রাচীরগাত্রে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকে। এছাড়া স্থানে স্থানে এই বন্ধুর (undulating) গঠন কখনও বা ভিতরে কুঞ্চিত (invaginated) থাকে। এই আস্তরণের সাথে সংশ্লিষ্ট উপ-আস্তরণ বা অন্যান্য উপাংগগুলিকে প্যারা মিউরাল বডিস (para mural bodies) বলা হয়। উৎপত্তিগত ভাবে কোষ-বস্তু থেকে উদ্ভূত উপাংগগুলিকে লোমাসম (lomasomes) এবং প্লাসমা আস্তরণ থেকে উদ্ভূতগুলিকে প্লাসমালেমাসম (plasmalemmasome) বলা হয়। এদের উৎপত্তি কোষপ্রাচীর সংশ্লেষণের সাথে যুক্ত হতে পারে। এ ধরনের উপাঙ্গ বহু ছত্রাক, শৈবাল ও উন্নত উদ্ভিদকোষে পাওয়া গেলেও এদের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট জ্ঞান সংগৃহীত হয় নাই। এই আস্তরণের সাথে কোষ মধ্যবর্তী অন্য অঙ্গগুলির সংযোগ সম্পর্কে জ্ঞানও এখনও সীমিত।

### (আ) **ইউকারিওটের কোষকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস** ( eucaryotic nucleus ) ঃ

ছত্রাক এবং অন্যান্য সম্পূর্ণকেন্দ্রী কোষের ক্ষেত্রে কোষের নিউক্লিয়াস একটি দুই স্তরযুক্ত আস্তরণ দ্বারা ঢাকা থাকে। দুই স্তরের মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় পেরিনিউক্লিয়ার স্পেস (perinuclear space)। আস্তরণের প্রত্যেকটি স্তর ৭০-৯০ অাঁ পুরু এবং ছিদ্রাল (perforated)। দু'টি স্তরে ছিদ্রগুলি ঋজু ঋজু ভাবে এক একটি সূক্ষ্ম নালিকা দ্বারা যুক্ত হ'য়ে সম্পূর্ণ আস্তরণটি গঠিত হয়েছে। কিছু সংখ্যক অ্যামিবার (ameba) ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত আস্তরণ থাকে। ঈষ্ট জাতীয় ছত্রাকে আস্তরণটি আবদ্ধ ও উন্মুক্ত দু-রকমই দেখা গেছে। ছত্রাকের বহু স্পোর যেমন জুস্পোর ইত্যাদির ক্ষেত্রে আস্তরণের কিছুটা ছিদ্রহীন। সাধারণতঃ আস্তরণের এই ছিদ্রহীন অংশ কেন্দ্রের উপরিভাগে থাকে ব'লে একে কেন্দ্র-টুপি (nuclear cap) বলা হয়। এই কেন্দ্র-টুপির মধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট রাইবোসমও থাকে। সম্পূর্ণকেন্দ্রী জীবাণুর ক্রোমোসমের গঠনপ্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য খুবই সীমিত। এগুলি অনিয়তাকার (amorphus) ও ইলেকট্রনঘন। আবর্তাকার (helical) অতি সূক্ষ্ম সূত্র দ্বারা গঠিত।

ক্রোমোসমের এই আবর্ত অবশ্য মাপে ডি. এন. এ. আবর্তের চেয়ে অনেক বড়। ডাইনোফ্লাজেলেট (Dinoflagellate) দের ক্ষেত্রে ক্রোমোসমগুলি বন্ধনীর মত (banded) গঠনযুক্ত।

নিউক্লিয়াসে নিউক্লিওলিটি (nucleoli) দৃঢ়সংবদ্ধ ও দানাদার (granular) যার মধ্যে ইলেকট্রন ঘন রাইবোসম সংস্থাপিত। কেন্দ্রের বিভাজনের জন্য সম্পূর্ণকেন্দ্রীকোষের ক্ষেত্রে একটি ২০০-২৪০ আংস্ট্রম (আঁ) মাপের স্পিন্ডল যন্ত্র (spindle apparatus) বা টাকুর আকৃতিযুক্ত সূক্ষ্মনালিকা দ্বারা গঠিত একটি জাল ব্যবস্থা তৈরিও হয়। এই সূক্ষ্মনালিকাগুলি ছত্রাক, পিচ্ছিল ছত্রাক, কিছু শুন্ড ও রোঁয়াযুক্ত (flagellate and ciliate) প্রোটোজোয়ার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের আস্তরণের মধ্যেই তৈরি হয়। এখনও পর্যন্ত বিভাজিত ক্রোমোসমের স্বতন্ত্রীকরণ ঠিক কিভাবে হয় তা সম্পূর্ণ বোঝা যায়নি। নালিকাগুলি সাধারণতঃ ক্রোমসমের উপর বা ভিতরে সংযোজিত হলেও অনেকক্ষেত্রে এদের ক্রোমোসমের সাথে কোন সংযোগ পাওয়াও দুঃসাধ্য হয়েছে। নালিকাগুলি সমবিভাজন (mitosis) কালে কোষের মেরুদেশে একটি নাক্ষত্রিকরশ্মি-সেন্ট্রিওল-জট (astral ray-centriole complex) এর সাথে যুক্ত থাকে। রশ্মিগুলি আসলে সেন্ট্রিওল থেকে বিচ্ছুরিত এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম নালিকা, নয়টি দীর্ঘ সূক্ষ্মসূত্র দ্বারা গঠিত একটি উপঅঙ্গ। এই উপাংগের কিনারা (periphery) দিয়া সূক্ষ্ম-সূত্রগুলি বিন্যস্ত থাকে। প্রতিটি সূত্রই ৩টি উপসূত্র (sub-fibre) দ্বারা গঠিত একটি ত্রিসূত্র (triplet)। এদের নিকট প্রান্ত (proximal end) দিক থেকে প্রতিটি ত্রি-সূত্রই ঘড়ির কাঁটার গতিমুখে (clockwise) হেলান থাকে। সচলকোষের শুন্ডের মূলস্থিত কাইনেটোসম (kinetosome) এর সাথে এই ত্রিসূত্রের সমবিশেষত্ব রয়েছে। সেন্ট্রিওল সবক্ষেত্রেই ক্রোমোসম স্বতন্ত্রীকরণের কাজে সব সময় লিপ্ত নয়, যথা অনাক্ষত্রিক (anastral) ও অকেন্দ্রিক (acentric) সমবিভাজনের ক্ষেত্রে। সেন্ট্রিওল সমবিভাজনের কাজে অংশগ্রহণের পর বিভাজনের কোন এক স্তরে নিজেও বিভাজিত হয়।

জলজ ছত্রাকের ক্ষেত্রে যেমন **কাটেনারিয়া** (**Catenaria**), প্রফেস (prophase) স্তরে সেন্ট্রিওল কেন্দ্রের দুইদিকের যে কোন একদিকে অবস্থান করে, মেটাফেসের (metaphase) আগে বিভাজিত হয় এবং দুটি মেরুতে অবস্থান করে। স্বাভাবিক কারণে এই বিভাজনও দ্বিবিভাজন হওয়া সম্ভব।

সেন্ট্রিওলেও ডি. এন. এ. থাকে। প্রোটোজোয়া কোষে সেন্ট্রিওল সম্ভবত প্রোটিন সংশ্লেষণের কেন্দ্রও হ'তে পারে।

(ই) **শুঙ্গ ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ** (Flagellum and associated organs) :

ইউকারিওট বা সম্পূর্ণকেন্দ্রী জীবাণুর সচল কোষগুলির শুঙ্গ একটি সূক্ষ্ম নালিকার মত অঙ্গ। এর একটি অন্তঃছিদ্র (axial core) বা অ্যাক্সোনেমি (axoneme) রয়েছে। শুঙ্গটি প্লাসমা আস্তরণের সাথে যুক্ত একটি আস্তরণে আবরিত। অন্তঃছিদ্রটির সীমান্তবর্তী (periphery) অংশ ৯টি সূক্ষ্মসূত্র দ্বারা একটি নালিকার আকৃতিতে গঠিত। সীমান্তবর্তী সূত্রগুলি জোড়া উপসূত্রের আবর্তনের দ্বারা গঠিত। সূত্রগুলির প্রত্যেকটির অন্তঃস্থলটি ঘন এবং বহিঃস্থলটি হালকা। প্রোটোজোয়ার পক্ষ্ম বা রেঁায়ার (Cilia) ও শুঙ্গের অন্তঃস্থলের গঠনপ্রকৃতি একই ধরনের। ডাইনোফ্লাজেলেট (Dinoflagellate) দের কোষের দুটি শুঙ্গ পশ্চাত ভাগে (posterior) ও পার্শ্বে (transverse) যুক্ত থাকে। কোষের বহির্ভাগের রন্ধ্র থেকে উদ্ভূত। এদেরও ৯+২ ধরনের সূক্ষ্ম গঠন দেখা যায়। ইউগ্লিনয়েড (Euglenoid) শুঙ্গের আস্তরণের মধ্যে একটি অনিয়তাকার বা কেলাসিত (crystalline) শুঙ্গ পরিবর্ত (paraflagellar) বস্তু থাকে যার ফলে শুঙ্গে একটি স্ফীতি (swelling) লক্ষিত হয়। এই স্ফীতি আলোক গ্রহণের (photo-reception) কাজে লাগে। শুঙ্গের উপর নানা অলংকরণও থাকে। তদনুযায়ী শুঙ্গ চাবুকাকৃতি (whiplash) বা পালকাকৃতি (hairy) হতে পারে। কদাচিৎ একই কোষে দুই প্রকার শুঙ্গ বিদ্যমান দেখা যায়। সাধারণতঃ কোষের সম্মুখভাগে পালকাকৃতি এবং পশ্চাতভাগে চাবুকাকৃতি শুঙ্গ দেখা যায়। এদেরকে বলা হয় বিষমশুঙ্গযুক্ত (heterokont)। কিছু শৈবালের শুঙ্গে আঁশ ও অন্যকিছুর শুঙ্গে কন্টক (flagellar spines) দেখা যায়। শৈবালের হাপটোফাইসি (Haptophyceae) গোত্রের শুঙ্গমূলে একটি ক্ষুদ্র অভিক্ষেপ (projection) থাকে যা শুঙ্গের সাথে সূত্রদ্বারা সংযুক্ত। অভিক্ষেপটি একটি ৭ সূত্রযুক্ত অন্তর্ভাগ (core) ৩ স্তরযুক্ত আস্তরণে ঢাকা উপাঙ্গ যার নাম হেপ্টোনেমা (Heptonema)। এই অন্তর্ভাগ ও আস্তরণের মধ্যে কিছু যোগসূত্র (bridge) থাকে। মূলের কাছে অবশ্য অন্তর্ভাগে সূত্রসংখ্যা দেখা যায় ৯টি।

**(ঈ) অন্তর্কোষীয় ঝিল্লিজালিকা** (Intracellular membranes) **:**

কোষবস্তুর মধ্যে মসৃণ (smooth) ও অমসৃণ উভয় প্রকারের ঝিল্লিই দেখা যায়। এদের এণ্ডোপ্লাসমিক রেটিকুলাম (endoplasmic reticulum) বলা হয়। সম্ভবতঃ এই ঝিল্লিজালিকা কেন্দ্র আস্তরণ ও প্লাসমা আস্তরণের সাথে সংযুক্ত। অমসৃণ আস্তরণগুলিতে বহু রাইবোসম প্রোথিত থাকে।

**(উ) গলগি যন্ত্র** (Golgi apparatus) **:**

গলগিযন্ত্র একটি মসৃণ আস্তরণে আচ্ছাদিত জটিল জালিকা-ভিত্তিক কোষ-অঙ্গ যা বহু কোষে বিদ্যমান। সূক্ষ্মগঠনে এই যন্ত্রে কতকগুলি দীর্ঘ থলি সাজানো থাকে। গলগিযন্ত্রের অন্তর্ভাগ থেকে কলির আকৃতিযুক্ত উপাঙ্গ সৃষ্টি (budding) হ'তে পারে। মূলতঃ নিঃস্বরণক্রিয়াই (secretory) কোষে এই যন্ত্রের অন্যতম কাজ। গলগিযন্ত্র কোষমধ্যে মেরুদেশে অথবা নিউক্লিয়াসের পাশে থাকে। উচ্চশ্রেণীর ছত্রাক বা পক্ষ্মল (ciliate) দের কোষে এদের প্রায়ই দেখা যায় না। সে জন্য মনে হয় কোষের কাজে গলগিযন্ত্র হয়ত অত্যাবশ্যক নয়।

**(ঊ) রাইবোসম** (Ribosome) **:**

রাইবোসমগুলি অতি ক্ষুদ্র (১৭০-২৩০ অাঁ) ইলেকট্রন-ঘন, দানাদার কোষ অঙ্গ, যা মূলতঃ দুটি অসম উপাঙ্গ দ্বারা গঠিত। রাসায়নিক ভাবে এগুলি ৪০% প্রোটিন ও ৬০% আর. এন. এ. দ্বারা গঠিত। কোষের অন্যতম জৈবনিকক্রিয়া প্রোটিন-সংশ্লেষণ এই কোষ-অঙ্গের কাজ। কোষে রাইবোসমের সংখ্যা স্বভাবতঃই প্রোটিন সংশ্লেষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে। রাইবোসমগুলি আকারে ৮০ এস, অসম্পূর্ণ কেন্দ্রী কোষের রাইবোসমের তুলনাতে বৃহৎ এবং অমসৃন অন্তর্কোষীয় আস্তরণের উপর প্রোথিত। যে সমস্ত রাইবোসম ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে প্রোথিত থাকে সেগুলি মাপে অসম্পূর্ণ-কেন্দ্রীকোষের রাইবোসমের সমান।

**(ঋ) মাইটোকণ্ড্রিয়া** (Mitochondria) **:**

মাইটোকণ্ড্রিয়া একটি দুই আস্তরণে ঢাকা কোষঅঙ্গ। এটি বহুসংখ্যক ক্রিস্টি (christae) বা টিউবিউলস (tubules) নামক চেপ্টা স্তরযুক্ত থলিতে (sac)

ভরা একটি অঙ্গ। এর মধ্যে কোষের শ্বসনক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সমস্ত উৎসেচকগুলি পাওয়া যায়। কোষের শারীরবৃত্তিয় কাজের পরিবর্তনের সাথে এদের আকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। বহু সচলকোষে মাইটোকণ্ড্রিয়ার সাথে শুঙ্গেরও যোগসূত্র থাকে। অবাত শ্বসনকারী কিছু জীবাণুতে এই কোষঅঙ্গ দেখা যায় না। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন কেন্দ্রআস্তরণ থেকেই মাইটোকণ্ড্রিয়ার উদ্ভব।

(এ) **প্লাস্টিড, পাইরেনয়েড ও আইস্পট** (plastid, pyrenoids and eye spots) :

শৈবালের সচল, অচল—সব কোষেই প্লাস্টিড থাকে। প্লাস্টিড নানা প্রকারের হয় যেমন ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) ক্রোমোপ্লাস্ট (chromoplast) ও আমাইলোপ্লাস্ট (amyloplast)। উপরিউক্ত প্লাস্টিডগুলির বিশেষ অংশ হচ্ছে যথাক্রমে ক্লোরোফিল (chlorophyll), কারটিনয়েড (carotenoid) ও শ্বেতসার বা স্টার্চ (starch)। ক্লোরোপ্লাস্টগুলির বিভাজন হয় মাতৃক্লোরোপ্লাস্টিডের বিভাজন মাধ্যমে। অন্য ক্লোরোপ্লাস্টগুলি এই বিভাজনক্রিয়া পরিচালনা করে। পাইরেনয়েডগুলি দানাদার, ঘনবস্তু যা ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে প্রোথিত থাকে। যে কোন ক্লোরোপ্লাস্টের দুটি আস্তরণের মধ্যে আবরিত শ্বেতসার বা স্টার্চ (starch) থাকে। ইউগ্নিনয়েড কোষে অন্য একরকম সংগৃহীত দানা যথা পারামাইলন (paramylon) ক্লোরোপ্লাস্টের বাহিরে থাকে। আরও একধরনের ঘন অস্‌মোফিলিক (osmophilic) দানাকে বলা হয় আইস্পট (eye spot)। এই সব কোষঅঙ্গ ফোটোরেসপিরেসনের কাজে লিপ্ত।

(ঐ) **শূন্যগর্ভ বা ভ্যাকিওল ও অন্যান্য কোষঅংশ** (vacuoles, microbodies and storage products) :

ইউক্যারিওট কোষে বিভিন্ন মাপ ও আকৃতির বহু শূন্যগর্ভ (vacuole) থাকে যা প্রোকারিওট কোষে থাকে না। এগুলি একক আস্তরণে আবরিত কোষমধ্যস্থ শূন্য অংশ। এই আস্তরণটিকে টোনোপ্লাস্ট (tonoplast) বলা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে এরা বিবিধ ক্রিয়াকলাপে লিপ্তও থাকে। কিছু শৈবাল ও ছত্রাক কোষে তারা রসদ (storage products) সংগ্রহ ক'রে রাখে।

কোথাও বা জল ধরে রাখে। অনেক প্রোটোজোয়াতে কিছু জটিল প্রকৃতির শূন্য গর্ভও রয়েছে, যাদের বলা হয় কন্ট্রাকটাইল শূন্যগর্ভ (contractile vacuole)। এরা সময়বিশেষে থলি (vesicle)র সাথে ক্ষুদ্র নালিকা দ্বারা যুক্ত থাকে। খাদ্য সঞ্চয়ী শূন্যগর্ভ (food vacuole) গুলি প্লাসমা আস্তরণ অন্তঃকুঞ্চিত হ'য়ে সৃষ্টি হয়। পিনোসাইটোসিস (pinocytosis) প্রক্রিয়া দ্বারা এই শূন্যগর্ভের সৃষ্টি।

ইউকারিওট বা সম্পূর্ণকেন্দ্রী কোষগুলিতে বহু আচ্ছাদিত থলি (vesicles) পরস্পর সংযুক্ত হ'য়ে থাকে। এগুলি অন্তঃকোষীয় ঝিল্লি-জালিকার সাথেও যুক্ত থাকে। এছাড়া প্রোটিন জাতীয় বস্তু, উৎসেচক বিভিন্ন রাসায়নিক কেলাস প্রভৃতি ও এসমস্ত থলিতে সঞ্চিত থাকে।

লিপিড বিন্দু (droplet) ও বহু ছত্রাক কোষে বিশেষতঃ পরিণত স্পোরে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত থলিগুলি সমকেন্দ্রিক আস্তরণ দ্বারা গঠিত।

## ২·৩২ ছত্রাকের সাধারণ পরিচয়ঃ

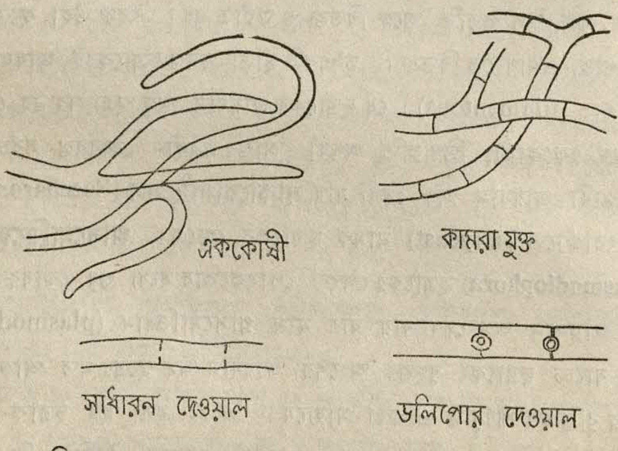
ছত্রাকের জায়মান (vegetative) অঙ্গ উন্নত উদ্ভিদের মত মূল, কাণ্ড, পাতা, ফুল, ফল প্রভৃতি অঙ্গে বিভক্ত ও উন্নীত নয়। বরঞ্চ উহা সূত্রের মত সূক্ষ্ম শাখা-প্রশাখাতে বিভক্ত। দু'একটি ছাড়া সমস্ত ছত্রাকেরই জায়মান অঙ্গ সূত্রাকার (filamentous)। যে ছত্রাকের জায়মান অঙ্গ সূত্রাকার নয় সেখানে ঐ অঙ্গ এককোষী, ডিম্বাকৃতি অথবা আস্তরণবিহীন কোষবস্তু সর্বস্ব হয়। এককোষী জায়মান অঙ্গ দেখা যায় **সাকারোমাইসেস (Saccharomyces)** বা ইংরাজীতে ঈষ্ট (yeast) নামক ছত্রাকের ক্ষেত্রে। **প্লাসমোডিয়োফোরা (Plasmodiophora)** ছত্রাকের ক্ষেত্রে পোষককোষ মধ্যে শুধু কোষবস্তু সর্বস্ব এক জায়মান অঙ্গ দেখা যায় যার নাম প্লাসমোডিয়াম (plasmodium)। দেখা যাচ্ছে ছত্রাকের বৃহত্তর অংশের জায়মান অঙ্গ সূত্রের মত আকৃতিযুক্ত। ইহার বৃদ্ধি হয় শীর্ষবৃদ্ধি প্রক্রিয়া মাধ্যমে। এদের বলা হয় ছত্রাক-সূত্র বা মাইসেলিয়াম (mycelium)। ছত্রাকের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ক্লোরোফিলের (chlorophyll) অভাব এবং নিজের খাদ্য সংশ্লেষণের অক্ষমতা অন্যতম। অতিক্ষুদ্র স্পোরের (spore) মাধ্যমে সংখ্যা বৃদ্ধিও এদের একটি বৈশিষ্ট্য। ছত্রাক যৌন এবং অযৌন উভয় প্রক্রিয়াতেই স্পোর সৃষ্টি করতে

সক্ষম। ছত্রাকের জীবনবৃত্তান্ত, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক, জন্ম ও সংখ্যা বৃদ্ধি প্রভৃতির সামগ্রিক পর্যালোচনাকে বলা হয় ছত্রাকবিজ্ঞান বা মাইকোলজি (Mycology)।

ছত্রাকের মধ্যে পরভোজী, মৃতভোজী ও রোগসৃষ্টিকারী পরজীবি সব রকমই রয়েছে। বেশকিছু ছত্রাক জলে থাকে, আর কিছু স্থলভাগে মাটিতে থাকে। আরও একটি গোষ্ঠী স্থল ও জল উভয় স্থানেই বসবাসে সক্ষম।

**২·৩৩ ছত্রাকের জায়মান অঙ্গ বা ছত্রাক সূত্র** (Vegetative structures of fungi) **:**

ছত্রাকের সূত্রের মত জায়মান অঙ্গের দলবদ্ধ বুননকে বলা হয় ছত্রাকসূত্র (mycelium)। এই সূত্রের প্রত্যেকটি সূত্র-অঙ্গকে স্বতন্ত্রভাবে বলা হয় সূত্রাণু বা হাইফা (hypha)। ছত্রাকের সূত্রাণুগুলি স্বচ্ছ এবং কিছু ক্ষেত্রে রঙীন। শীর্ষবৃদ্ধি প্রক্রিয়া দ্বারা ছত্রাকের জায়মান অঙ্গের বৃদ্ধি হওয়া ছাড়াও সূত্রাণুর যেকোন স্থান থেকে শাখা-প্রশাখা বেরোতে পারে। ছত্রাক সূত্র তার গঠন-প্রকৃতি অনুযায়ী দুই রকম হয়।




চিত্র ২৫ : ছত্রাকের জায়মান অঙ্গ ও সূত্রের দেওয়াল

(অ) **বহুকোষী** (Cellular) **:** যে সমস্ত ছত্রাক সূত্রের দীর্ঘ নালিকা প্রায় সমদূরত্বে দেওয়াল (septum) গঠনের দ্বারা বহু কোষে বিভক্ত হয় এবং যার

ফলে প্রতিকোষে এক বা দুই এর অধিক কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস থাকেনা তাদের বহুকোষী বলা হয়। এজাতীয় ছত্রাক সূত্রকে কামরাযুক্ত (septate) ছত্রাক-সূত্রও বলা হয়। সাধারণতঃ অ্যাসকোমাইসিটস্ (Ascomycetes), বেসিডিও-মাইসিটস (Basidiomycetes) ও ডিউটেরোমাইসিটস (Deuteromycetes) শ্রেণীর ছত্রাকের জায়মান অঙ্গ এরকম দেখা যায় ( **চিত্র-২৫** )।

(আ) **বহুকেন্দ্র যুক্ত** ( Coenocytic, সিনোসিটিক ) ছত্রাকসূত্রে একটি কোষে দুই-এর অধিক নিউক্লিয়াস থাকে। বিভিন্ন ছত্রাকে ছত্রাকসূত্রটি অবিভক্ত বা দেওয়াল-হীন (aseptate) থাকার ফলে এটা হয়। অন্য কিছু ছত্রাকে দেওয়াল দ্বারা বিভক্ত (septate) হওয়া সত্ত্বেও কোষ প্রতি নিউক্লিয়াসের সংখ্যা দুই-এর অধিক হয় ( চিত্র-২৫ )।

(ক) সমগ্র ছত্রাক সূত্রটি দেওয়ালহীন একটি দীর্ঘ, শাখা-প্রশাখা যুক্ত কোষ হিসাবে থাকার ফলে সমগ্র সূত্রতে সমস্ত কেন্দ্রই একই কোষবস্তু মধ্যে কর্মব্যস্ত থাকে। এই ছত্রাক সূত্রকে বলা হয় এককোষীসূত্র (tubular)। পূর্বতন ফাইকোমাইসিটস্ শ্রেণীর (Phycomycetes) সমস্ত ছত্রাকে এ জাতীয় ছত্রাকসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

(খ) অন্য কতকগুলি ছত্রাকে ছত্রাকসূত্রটি দেওয়াল এর সাহায্যে বিভক্ত হলেও প্রতি কোষেই দুই-এর অধিক সংখ্যক নিউক্লিয়াস থাকে। এই বহুকেন্দ্রিক কামরায় বিভক্ত ছত্রাকসূত্রকে কামরা-বিভক্ত বহুকেন্দ্রিক (septate coenocytic) সূত্র বলা হয়। এরকম সূত্র ডিউটেরোমাইসিটস (Deuteromycetes) শ্রেণীর ছত্রাকে রয়েছে।

আকৃতিগতভাবে অবশ্য ছত্রাকসূত্র দুই রকমের বলা যায়—দেওয়াল যুক্ত (septate) ও দেওয়ালহীন (aseptate)।

(ই) অধিকাংশ ছত্রাকে দেওয়ালটি একটি পাতলা ঝিল্লি যার কেন্দ্রস্থলে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। ছিদ্র পথে এক কোষের কোষবস্তু পার্শ্ববর্তী অন্য কোষে যাতায়াত করতে পারে। তবে বেসিডিওমাইসিটস (Basidiomycetes) শ্রেণীর ছত্রাকে দেওয়ালে ছিদ্রের দু-পারে, অল্পদূরে দুটি লঘু-বন্ধনী আকৃতির ঢাকা থাকে এবং ছিদ্রমধ্যে একটি ডিম্বাকৃতি উপাঙ্গ লম্বালম্বি ভাবে ঢাকা দুটিকে প্রায় ছুঁয়ে থাকে। ঢাকা দুটির নাম লঘুবন্ধনী-উপাঙ্গ বা পারেনথোসম

(parenthosome) এবং এজাতীয় দেওয়ালের নাম ডলিপোর দেওয়াল (dolipore septum)। ( চিত্র-২৫ )

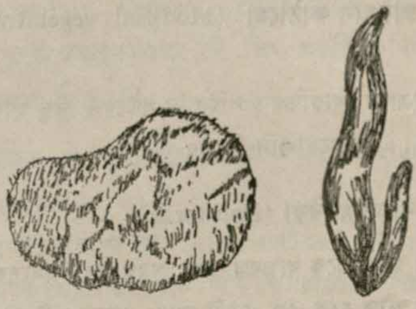
ছত্রাকের কোষপ্রাচীর এবং দেওয়ালগুলি সাধারণতঃ কাইটিন (chitin) দ্বারা গঠিত। কিছু ক্ষেত্রে সেলুলোজ (cellulose) বা কালোজ (callose) ও থাকে। অন্য আরও কিছু ক্ষেত্রে এগুলি বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রণ হিসাবে থাকে।

(ঈ) ছত্রাকসূত্রে (mycelium) বহু সূত্রাণু (hyphae) দলবদ্ধ অবস্থায় থাকলেও তাহাদের স্বতন্ত্র আকৃতি ও সত্তা বজায় থাকে। অনেক ছত্রাকে সূত্রাণুগুলি পরস্পর বুননের মাধ্যমে একটি পুরু কাঠামো গঠন করে। কাঠামোগুলি মাদুর বা অন্য আকৃতির হয়। জটিল বুননের ফলে কাঠামোগুলি কলার (tissue) আকৃতি গঠন করে। কাঠামোগুলিকে তাদের আকৃতি, মাপ প্রভৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয় যথা স্কেলেরোসিয়াম (sclerotium), রাইজোমরফ (rhizomorph) ইত্যাদি। এগুলি উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহের কলার মত। আসল না হলেও এদের বিভিন্ন ভাবে ছেদন করে অণুবীক্ষণে কলার মত দেখায়। সাধারণভাবে এই ছত্রাকসূত্রের বুননগুলিকে ছত্রাকসূত্র বুনন বা প্লেক্‌টেনকাইমা (plectenchyma) বলা হয়। বুননগুলি মূলতঃ দুইপ্রকারের হয়। (ক) শিথিল বুনন বা প্রোসেনকাইমা (prosenchyma) যেক্ষেত্রে সূত্রাণুদের আলাদা ভাবে চেনা যায়। **ক্লাভিসেপসের** (Claviceps) স্ট্রমাটা (stromata) বৃন্তের মধ্যে সূত্রাণুর বুনন এরকম হয়। (খ) নকল পারেনকাইমা (pseudoparenhyma) বা নিবিড় বুননযুক্ত সূত্রাণুগুলি দেখা যাবে বহু ছত্রাকের **স্কেলেরোসিয়ার** **(sclerotia)** ছেদনে।

ছত্রাকসূত্রের বুননে তৈরী কাঠামোগুলি (structure) জায়মান অঙ্গের রূপান্তর (modification) মাত্র। সাধারণতঃ ছত্রাকের পক্ষে অসুবিধাজনক আবহাওয়াতে ( অত্যন্ত শুষ্ক ইত্যাদি ) জীবন রক্ষার জন্য, বা অধিক সংখ্যক স্পোর ধারনের জন্য, অসংখ্য স্পোরধারক বোঁটা তৈরীর জন্য ছত্রাক এগুলি তৈরি করে। ছত্রাককাঠামো (structure) তিন রকমের হয় এবং সেগুলি নিম্নরূপ।

১। **স্ট্রমা বা ছত্রাক-মাদুর** (Stroma) ঃ

নিবিড় বুননযুক্ত মাদুরের মত কাঠামোকে বলা হয় স্ট্রমা। সাধারণতঃ ছত্রাক-মাদুরের আকৃতি অনুযায়ী উপরিভাগে বা অন্তঃস্থলে স্পোরসৃষ্টিকারী-বৃন্ত ও স্পোর সৃষ্টি হয়। **মনিলিয়া** (Monilia) বা **ক্লাভিসেপ্‌স** ছত্রাকে এজাতীয় কাঠামো তৈরি হয় ( **চিত্র-২৬** )।



ছত্রাক মাদুর বা স্ট্রমা স্ক্লেরোসিয়া

চিত্র ২৬

২। **ছত্রাকগুটি বা স্কেলেরোসিয়া** (Sclerotia) (একবচনে স্কেলেরো-সিয়াম) ঃ

অসুবিধাজনক আবহাওয়াতে ছত্রাকে সূত্রের নিবিড় বুননের মাধ্যমে কতকগুলি দৃঢ়, বিভিন্ন রঙযুক্ত আপাত-অসাড় কাঠামো তৈরী হয়। এগুলি বর্তুলাকার থেকে দীর্ঘ দণ্ডাকার প্রভৃতি বিভিন্ন আকৃতির হয়। সাধারণতঃ কালো বা বাদামী রঙের হয়। ছত্রাকগুটি অতিক্ষুদ্র হইতে অতিবৃহৎ এগুলি হয়ে থাকে। পরে সুবিধাজনক আবহাওয়াতে অঙ্কুরোদ্গম হয়ে ছত্রাকসূত্র তৈরী হয়। সাধারণতঃ **রাইজকটোনিয়া** (Rhizoctonia), **স্কেলেরো-সিয়াম** (Sclerotium), **ক্লাভিসেপ্‌স্** প্রভৃতি ছত্রাকে এরকম গুটি দেখা যায়।

৩। **ছত্রাক রজ্জু** (Rhizomorph) ঃ

অতিস্থূল রজ্জুর মত আকৃতিযুক্ত এই কাঠামোগুলি একাধিক ছত্রাকসূত্রের পাশাপাশি সংযুতির ফলে তৈরি হয়েছে। ছত্রাকসূত্রগুলি সত্তা হারিয়ে সংযুক্ত, ঘনবাদামী রজ্জু তৈরি করে যা কিছুটা মূলের মত দেখায়। ছত্রাক-রজ্জুগুলি

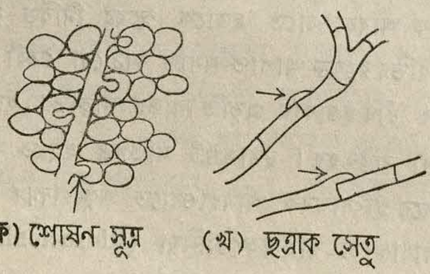
মূলের মতই শীর্ষদেশে বৃদ্ধি পায়, বিভিন্ন স্থানে প্রস্থের মাপ বিভিন্ন। রজ্জু-গুলি মূলের মত দৃঢ় কিন্তু ভঙ্গুর এবং অসুবিধাজনক আবহাওয়াতেও ২—৩ বৎসর জীবিত থাকে। **আর্মিলেরিয়া** **(Armillaria)**, **লাইকোপার্ডন** **(Lycopardon)** প্রভৃতি ছত্রাক এরকম মূলের মত কাঠামো গঠন করতে পারে।

(উ) **ছত্রাকের জায়মান কাঠামো** (Modified vegetative structures of fungi) :

ছত্রাক তার সূত্রাণুর আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটিয়েও কিছু জায়মান কাঠামো গঠন করতে পারে। কাঠামোগুলি নিম্নরূপ।

(ক) **শোষণসূত্র বা হস্টোরিয়া** (Haustoria) :

বিভিন্ন বস্তু বা স্থান থেকে খাদ্যবস্তু তরল অবস্থাতে শোষণের জন্য ছত্রাকের সূত্রাণু স্থানে স্থানে স্ফীত হয়ে এক একটি শোষণ অঙ্গের সৃষ্টি করে। পরজীবি (parasite) ছত্রাক পোষককোষে আক্রমণকালে এই শোষণসূত্র অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। ছত্রাকের শোষণসূত্র বিভিন্ন আকৃতির হয় যথা লম্বাটে, গদার আকৃতি বা শিকড়ের মত **(চিত্র-২৭)**। সাধারণতঃ পর-



চিত্র ২৭

জীবি ছত্রাকের মধ্যে যে দায়বদ্ধ পরজীবি (obligate parasites) গুলি শুধু-মাত্র জীবিত কোষেই বৃদ্ধি ও সংখ্যাবৃদ্ধিতে সক্ষম যেমন **প্লাসমোপারা** **(Plasmopara)**, **পেরনস্পোরা** **(Peronospora)** ইত্যাদি তারাই এরকম শোষণসূত্র তৈরি করে।

(খ) **ছত্রাকসূত্র-সেতু বা ক্লাম্পকানেকসন** (Clamp-connection) :

সূত্রাণুর পাশাপাশি দুটি কোষ যখন একটি উপসূত্রাণু দ্বারা পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তখন ঐ সেতুর মত সূত্রাণুকে ছত্রাকসূত্র-সেতু বা ক্লাম্প কনেকসন বলা হয়। বেসিডিওমাইসিটস্ (Basidiomycetes) শ্রেণীর ছত্রাক-গুলি প্রায়ই এই রকম সূত্র-সেতু গঠন করে। এই শ্রেণীর ছত্রাকগুলির দ্বিতীয় স্তরের (secondary hyphae) সূত্রাণুগুলিতে এই কাঠামোগুলি গঠিত হয়। এই সমস্ত সূত্রাণুর কোষে দুই ভিন্ন প্রকৃতির নিউক্লিয়াস বজায় রাখার জন্য এই ব্যবস্থা (**চিত্র-২৭**)।

(গ) **আবদ্ধকারীসূত্র বা আপ্রেসোরিয়াম** (appresorium) **বহুবচনে আপ্রেসোরিয়া** (appressoria) :

পোষক কোষে অনুপ্রবেশের জন্য সূত্রাণুর একটি চেপ্টানো, চাপ সৃষ্টিকারী অংশ থাকে যা পোষক কোষে ছত্রাককে আট্কে রাখে। অনুপ্রবেশের জন্য এই অংশে একটি আক্রমণ-কীলকও (infection peg) তৈরি করে (**চিত্র-২৭**)।

## ২·৩৪ ছত্রাকের সংখ্যাবৃদ্ধি ও স্পোর-উৎপাদন ক্রিয়া (Fungal reproduction and spore production) :

সাধারণতঃ জীবনচক্রে কিছুটা সময় জায়মান প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধির পর ছত্রাক অযৌন বা যৌন পদ্ধতিতে স্পোর (spore) তৈরি করে। ছত্রাকের স্পোরগুলি কতকগুলি ক্ষুদ্র, বিশেষ আকৃতি ও গঠন প্রকৃতিযুক্ত ছত্রাক-অঙ্গ। এক বা একাধিক সংখ্যায় উৎপন্ন করে। পরে এই স্পোরগুলি অঙ্কুরোদ্গমন ক'রে ছত্রাকটির জায়মান অঙ্গ আবার তৈরি করে। বেশীর ভাগ ছত্রাকই অযৌন ও যৌন উভয় পদ্ধতিতেই স্পোর তৈরি করতে পারে। যৌন ও অযৌন পদ্ধতিতে স্পোর সৃষ্টি তথা সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়াও ছত্রাক অন্য কিছু পদ্ধতিতেও সংখ্যা বৃদ্ধি করে।

ছত্রাকের বহুস্পোর সৃষ্টি ক্ষমতা বা পলিমরফিসম্ (polymorphism) :

একদল ছত্রাক তাদের জীবনচক্রে একাধিক ও বিভিন্ন গঠনের স্পোর তৈরি করে। এই সমস্ত ছত্রাককে বলা হয় বহুস্পোর সৃষ্টিকারী বা পলিমরফিক (polymorphic)। এদের এই ক্ষমতাকে বলা হয় বহুস্পোর সৃষ্টিক্ষমতা (polymorphism)। **পাকসিনিয়া গ্রামিনিস ট্রিটিসি (Puccinia graminis**

tritici) নামক ছত্রাক এভাবে ৫ রকম স্পোর সৃষ্টি করে। স্পোরগুলি ইউরেডোস্পোর (uredospore), টেলিউটোস্পোর (teleutospore), বেসিডিওস্পোর (basidiospore), পিকনিওস্পোর (pycniospore) ও ইশিওস্পোর (aeciospore)।

(অ) **ছত্রাকের সংখ্যাবৃদ্ধি** (reproduction of fungi) **:**

ছত্রাকে সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে জায়মান অঙ্গের কোথাও সবটুকু কোথাও বা অংশবিশেষ ব্যবহৃত হয়। যেসমস্ত ছত্রাকে সমস্ত জায়মান অঙ্গ বা থালাস (thallus) টুকুই সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে লেগে যায় তাকে পূর্ণাঙ্গিক সংখ্যাবৃদ্ধিকারী বা হলোকার্পিক (holocarpic) ছত্রাক বলা হয়, যেমন **সিন্‌কাইট্রিয়াম (Synchytrium)**। ফলে এই সমস্ত ছত্রাকে একই সাথে জায়মান ও জননক্ষম (reproductive) অঙ্গ থাকতে পারে না।

অধিকাংশ ছত্রাক জায়মান অঙ্গের একাংশ মাত্র সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করে। এসমস্ত ছত্রাককে স্বাভাবিক সংখ্যাবৃদ্ধিকারী ছত্রাক বা ইউকার্পিক (eucarpic) বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে যৌনসংখ্যাবৃদ্ধি ক্রিয়া ও জায়মান অঙ্গের স্বাভাবিক জৈবনিক ক্রিয়া একসাথেই চলে। **অলটারনেরিয়া (Alternaria), অ্যাস্‌পারজিলাস (Aspergillus), পিথিয়াম (Pythium), পাক্‌সিনিয়া (Puccinia)** প্রভৃতি বহু ছত্রাকই এই গোষ্ঠীভুক্ত।

**যৌন ও অযৌন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি** (sexual and asexual reproduction) : ছত্রাকের মধ্যে সংখ্যাবৃদ্ধির উভয় প্রক্রিয়াই সক্রিয়। যেসময় দু'টি বিপরীত যৌন প্রকৃতির নিউক্লিয়াসের বা কোষের ( ডিম্বাণু ও শুক্রাণু ) মিলনে সংখ্যাবৃদ্ধি হয় তাকে যৌন প্রক্রিয়া বলা হয় এবং যখন এ জাতীয় বিপরীত প্রকৃতির মিলন ব্যতিরেকেই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে তাকে অযৌন প্রক্রিয়া বলা হয়।

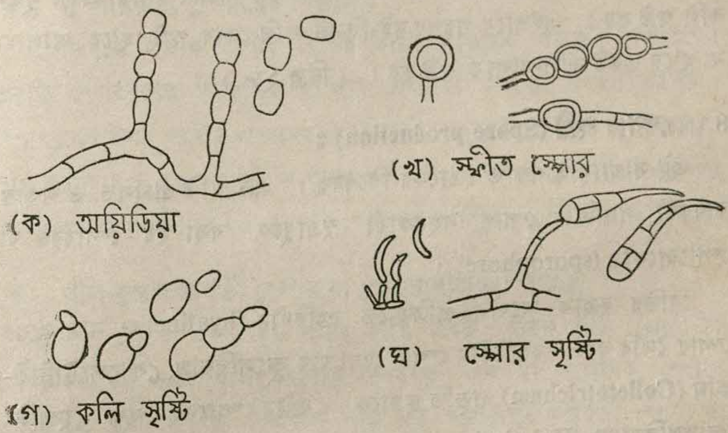
**অযৌন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি :**

অযৌন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি ছত্রাকের মধ্যে অতি প্রচলিত। এই প্রক্রিয়াতে ছত্রাক অত্যন্ত উচ্চহারে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। উচ্চহারে সংখ্যাবৃদ্ধির ক্ষমতা ছাড়া ইহা ছত্রাকের জীবনচক্রে বহুবার সংঘটিত হয় যা যৌন প্রক্রিয়ায় হয় না।

ছত্রাকের অযৌন সংখ্যাবৃদ্ধি চারটি মূল প্রক্রিয়া মাধ্যমে সাধিত হয়। প্রক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ।

১। **বিচ্ছিন্নকরণ** (Fragmentation) :

(ক) সাধারণতঃ বহুকোষী ছত্রাক-সূত্রে কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এক একটি স্পোরে পরিণত হয়। উৎপাদিত স্পোরগুলিকে **অইডিয়া (oidia)** বা একবচনে অয়িডিয়াম (oidium) বলা হয়। **কলিবিয়া (Collybia)** প্রভৃতি ছত্রাক এরকম স্পোর তৈরি করে। ( **চিত্র-২৮** )




চিত্র ২৮ : ছত্রাকের বিভিন্ন পদ্ধতিতে স্পোর উৎপাদন

(খ) বহুক্ষেত্রে ছত্রাক-সূত্রের কিছু কোষ স্ফীত হ'য়ে ওঠে এবং তার চতুর্দিকে কোষপ্রাচীরটি স্থূল হয়। স্ফীত কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে স্ফীত স্পোর (chlamydospore) তৈরি করে ছত্রাক বিজ্ঞানগত ভাবে এইগুলি খাদ্য সঞ্চয়ক্ষম, স্পোরতুল্য স্ফীতকোষ। এ জাতীয় 'স্ফীত স্পোর' ছত্রাক-সূত্রের প্রান্তস্থ বা মধ্যবর্তী কোষে হতে পারে। **ফুসেরিয়াম (Fusarium)** ও অন্য অনেক ছত্রাক স্ফীত স্পোর তৈরি করে। ( **চিত্র-২৮** )

২। **কোষের বিভক্তিকরণ বা ফিসান** (Fission) :

সীমিত কিছু এককোষী ছত্রাক যথা **সাকারোমাইসেস** ইত্যাদির ক্ষেত্রে

কোষের মধ্যবর্তী এলাকাতে সংকোচন (constriction) মাধ্যমে দেওয়াল সৃষ্টি করাতে দু'টি কোষের সৃষ্টি হয়।

**৩। কলিসৃষ্টি বা বাডিং (Budding) ঃ**

সীমিত কিছু ছত্রাক যথা ঈষ্ট প্রভৃতিতে কোষগাত্রে একটি ক্ষুদ্র অংশ স্ফীত হ'য়ে একটি কলির (bud) আকৃতি ধারণ করে। অতঃপর কোষের নিউক্লিয়াস দ্বিধাবিভক্ত হ'য়ে একটি নিউক্লিয়াস স্ফীত, নূতন কোষটিতে পৌছায়। এরপর কলি-কোষটি বৃদ্ধি পায় ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একটি নূতন কোষের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে নূতন কোষটির গায়ে আলাদা হবার আগেই আর একটি নূতন কলি সৃষ্টি হয়। এইভাবে পরপর দুই-তিনটি কলি-কোষ সৃষ্টি হ'য়ে আলাদা না হ'য়ে একটি কলি-মালার সৃষ্টি হয়। ( **চিত্র-২৮** )

**৪। স্পোর সৃষ্টি (Spore production) ঃ**

এই সংখ্যাবৃদ্ধি পদ্ধতি ছত্রাকের বিশেষত্ব। এটি অতি প্রচলিত ও অত্যন্ত কার্যকরী পদ্ধতি। স্পোর বহনকারী সূত্রাণুকে বলা হয় স্পোরবৃন্ত বা স্পোরোফোর (sporophore)।

বিভিন্ন ছত্রাক অযৌন প্রক্রিয়াতে রঙবিহীন (hyaline) ও নানা রঙের স্পোর তৈরি করে। রঙবিহীন স্পোর দেখা যায় **ফুসেরিয়াম, কোলেটোট্রাইকাম (Colletotrichum)** প্রভৃতি ছত্রাকে। রঙীন স্পোরের মধ্যে **হেলমিন্থোস্পরিয়ামে (Helminthosporium)** বাদামী, **নাইগ্রোস্পরা (Nigrospora)** তে কালো, **নিউরোস্পোরা (Neurospora)** তে লালচে, **পেনিসিলিয়ামে (Penicillium)** নীল, কিছু **আস্পারজিলাস (Aspergillus)** এ সবুজ ইত্যাদি বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়। অযৌন স্পোরগুলি পরিমাপ ও আকৃতিতে বহু রকমের হয়। আবার মাপের দিক থেকে **ট্রাইকোডার্মা (Trichoderma)** তে অতিক্ষুদ্র ১·৫ × ২·৫ মাইক্রন (μ). আর **করাইনেস্পোরাতে (Corynespora)** অতি দীর্ঘ ( ৩০০μ ) ও আরও বহু ছত্রাকে এরকম বহু মাপের স্পোর তৈরি হয়। ছত্রাকের স্পোরের আকৃতিগত বৈচিত্র্য প্রায় অসীম। গোলাকৃতি ( **পেনিসিলিয়াম** ), ডিম্বাকৃতি (**ফোমা, Phoma**), মূলাকৃতি বা (fusoid) ( **ফুসেরিয়াম** ), চন্দ্রাকৃতি বা (falcate) ( **কোলেটোট্রাইকাম** ), সূত্রাকৃতি বা (needle-like) ( **সারকোস্পোরা, Cercospora** ),

আবর্তাকার বা (helical) ( **হেলিকোমাইসেস, Helicomyces** ) প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

ছত্রাকের স্পোর এককোষী ( **ফোমা** ), দুইকোষী ( **বট্রাইডিপ্লোডিয়া, Botrydiplodia** ), বহুকোষী ( **সারকোস্পোরা** ) প্রভৃতি হ'তে পারে। ( **চিত্র-২৮** )। বেশীরভাগ স্পোরে এই কোষগুলি আড়াআড়ি (transverse) দেওয়াল দ্বারা সৃষ্টি হয়। কিছু কিছু স্পোরে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি (longitudinal) দুরকম দেওয়ালই থাকে যেমন **অলটারনেরিয়া (Alternaria)**।

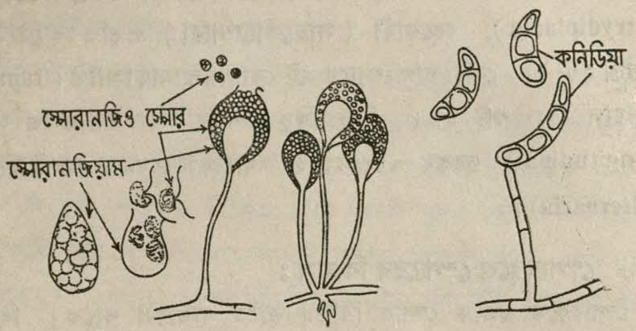
## (আ) স্পোরবৃন্তে স্পোরের বিন্যাস ঃ

স্পোরবৃন্তে ছত্রাক স্পোর বিভিন্ন ভাবে সাজানো থাকে। বিন্যাসের প্রকৃতি স্পোরবৃন্তের আকৃতির ও শাখা-প্রশাখার প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। স্পোরবৃন্তের উপর অযৌন স্পোরের বিন্যাসগুলিকে মোটামুটি দুটি মূলগোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। যথা ১। থলি-বৃন্তের অন্তর্বর্তী স্পোর বা স্পোরানজিওস্পোর (sporangiospore) ও ২। বৃন্তপরি স্পোর বা কনিডিয়া (conidia)।

## (ক) থলি-বৃন্ত অন্তর্বর্তী স্পোর বা স্পোরানজিওস্পোর ঃ

যে সব ক্ষেত্রে স্পোরবৃন্ত স্ফীত হ'য়ে একটি ধারক থলি (sac) তে রূপান্তরিত হয় এবং থলির মধ্যের কোষবস্তু এক বা একাধিক স্পোরে রূপান্তরিত হয় সেসমস্ত স্পোরকে বলা হয় থলিবৃন্তের অন্তর্বর্তী স্পোর বা স্পোরানজিওস্পোর এবং থলিটিকে বলা হয় ধারক থলি বা স্পোরানজিয়াম (sporangium)। এক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী কোষবস্তু প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজিত হ'য়ে, আস্তরণে আবরিত হ'য়ে স্পোরে পরিণত হয়। এই স্পোরগুলি সাধারণতঃ এককোষী। এই জাতীয় ধারক থলির মধ্যে স্পোর তৈরী বহু ছত্রাকেই হয়। থলিগুলিও বিভিন্ন আকৃতির যথা গোলাকৃতি ( **রাইজোপাস, Rhizopus** ), লেবুর আকৃতি (lemon shaped) ( **ফাইটফ্থোরা, Phytophthora** ), লম্বাটে ( **সাপ্রোলেগনিয়া, Saprolegnia** ) প্রভৃতি হয়। আদিম বা নিম্ন শ্রেণীর (lower phycomycetes) ছত্রাকে এগুলি খুবই দেখা যায়। ( **চিত্র-২৯** )। বৃন্তের অন্তর্বর্তী স্পোর বা স্পোরানজিওস্পোরগুলি আবার দুইরকমের হয়। (ক) সচল (motile) : স্পোরগুলির স্থানান্তরে

চলনের শক্তি থাকে, কারণ এদের শরীরে দুটি করে শুঙ্গ (flagella) আটকান থাকে। এই স্পোরগুলির কোন কোষআস্তরণ থাকে না। স্পোরগুলিকে




চিত্র ২৯ : স্পোরানজিওস্পোর ও কনিডিয়া

জুস্পোর (zoospore) বা প্লানোস্পোরও (planospore) বলা হয়। **ফাইটফথোরা, অ্যালবুগো ( Albugo )** প্রভৃতি ছত্রাকে এরকম স্পোর তৈরী হয়। (খ) অচল (non-motile) স্পোরগুলি নিজেরা চলনে অক্ষম আর কোষ আস্তরণযুক্ত। **মিউকর (Mucor), রাইজোপাস** প্রভৃতি ছত্রাক এজাতীয় স্পোর তৈরি করে।

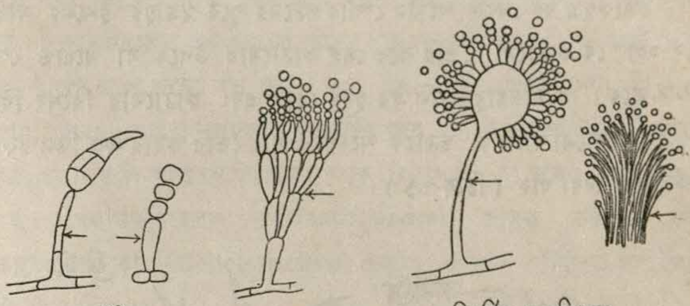
(খ) **বৃন্তপরিস্পোর বা কনিডিয়া** (Conidia, sing-conidium) :

যে সমস্ত অযৌন স্পোর বৃন্তের বহির্ভাগে প্রান্তদেশে বা পার্শ্বে তৈরী হয় তাদের বৃন্তপরিস্পোর বা কনিডিয়া বলে। এসব স্পোরের বাহক বৃন্তকে বলা হয় কনিডিয়াবৃন্ত বা কনিডিওফোর (Conidiophore)। কনিডিয়া-বৃন্ত সাধারণতঃ ঋজু, বিভিন্ন দৈর্ঘ্যযুক্ত ও সীমিত অগ্রবৃদ্ধিতে সমর্থ। তবে আকৃতি ও প্রকৃতিতে বহুরকম হতে পারে। বৃন্তগুলি ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ বা শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়। কনিডিয়াবাহক বৃন্ত মূলতঃ দুইভাবে বিন্যস্ত দেখা যায়। সেগুলি নিম্নরূপ।

১। **সূত্রাণুরূপ বৃন্ত** (simple) :

শাখাবিহীন ছত্রাকসূত্র শীর্ষে কনিডিয়া উৎপাদন করতে পারে। এই বৃন্ত এককোষী সূত্রাণু ( **অ্যালবুগো** ) বা বহুকোষী সূত্রাণু ( **হেলমিনথো-**

**স্পরিয়াম**) দ্বারা তৈরি হতে পারে, এবং শীর্ষে এক বা একাধিক কনিডিয়া ধারণ করতে পারে। (**চিত্র-৩০**)।




চিত্র ৩০ বিভিন্ন প্রকার কনিডিয়াবৃন্ত

২। **শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃন্ত** (Branched conidiophore):

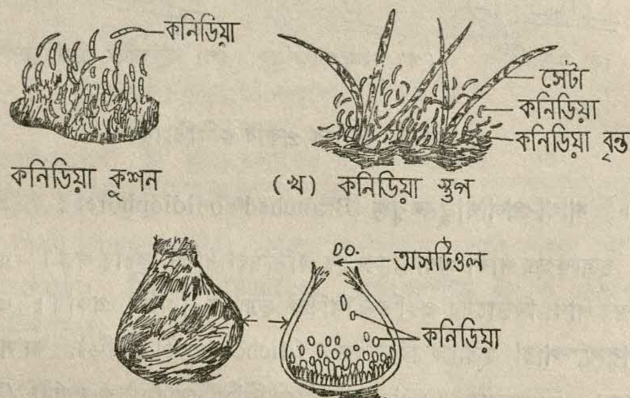
ছত্রাকসূত্র শাখা-প্রশাখাযুক্ত হয় কনিডিয়া ধারণ করার জন্য। কনিডিয়া-বৃন্তের শাখা বিন্যাসের প্রকৃতিও বিভিন্ন ছত্রাকে বিভিন্ন প্রকার। এর মধ্যে **পেরনস্পোরা** ছত্রাকে দ্বিধাবিভক্ত (dichotomus) প্রকৃতির, **আসপারজিলাসে** স্ফীতমস্তক (vesicular), **পেনিসিলিয়ামে** সম্মার্জনী (broom-shaped), **ভারটিসিলিয়ামে (Verticillium)** ভারটিসিলিয়েট প্রভৃতি প্রকৃতি দেখা যায়। যে সব ছত্রাকের যৌনস্পোর তৈরী হয়না তাদের নির্ণয়ের কাজে (identification) বৃন্তের শাখাবিন্যাস প্রকৃতির উপর নির্ভর করতে হয়। (চিত্র-৩০)

(গ) **তোড়াকৃতি বা সিনেমাটা** (Synnemata):

কিছু ছত্রাকে কনিডিয়া-বৃন্তগুলি উৎপত্তি থেকে কিছুদূর পর্যন্ত বহুসংখ্যার পাশাপাশি জুড়ে থাকার পর শীর্ষদেশে ফুলের তোড়ার মত চারদিকে ছড়িয়ে প'ড়ে কনিডিয়া সৃষ্টি করে। এতে পুরো গঠনটি তোড়ার মত দেখায়। **আইসারিয়া (Isaria)** প্রভৃতি ছত্রাকে এই রকম তোড়ার আকৃতিতে কনিডিয়া-বৃন্ত দেখা যায় (চিত্র-৩০)।

(গ) **ছত্রাকের কাঠামোতে স্পোর উৎপাদন** (spore production in or on fungal structures) :

ছত্রাকসূত্র বহু ক্ষেত্রে অযৌন স্পোর গঠনের পূর্বে সূত্রাণুর বুননের মাধ্যমে (২·৩৩) যে কাঠামো তৈরি করে সেই কাঠামোর উপরে বা মধ্যেও স্পোর সৃষ্টি করে। কনিডিয়াবৃন্তগুলি হয় খুবই ছোট এবং কাঠামোর বিশেষ বিশেষ স্থানে সাজানো থাকে। ছত্রাকে অযৌন স্পোর তৈরি করার জন্য তিন রকমের কাঠামো দেখা যায় ( **চিত্র-৩১** )।




চিত্র ৩১ : কনিডিয়া ধারক কাঠামো

১। **কনিডিয়াকুশন বা স্পোরোডকিয়াম** (Sporodochium) :

বিভিন্ন মাপ ও আকৃতির ছত্রাক-কুশনের (stromata) উপরে অসংখ্য কনিডিয়া-বৃন্ত লম্বভাবে দাঁড়িয়ে থাকে এবং শীর্ষদেশে কনিডিয়া তৈরি করে। অনেকক্ষেত্রে বৃন্তগুলিও কিছুটা দৈর্ঘ্য পর্যন্ত পাশাপাশি জুড়ে কুশনটিকে আরো পুরু করে। অনেক উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক উদ্ভিদের কাণ্ডের তলার দিকে ত্বকের উপর এরকম কনিডিয়া-কুশন সৃষ্টি করে, যেমন **নেকট্রিয়া** (**Nectria**) (চিত্র-৩১)।

২। **কনিডিয়াস্তুপ বা আসারভুলাস (Acervulus) ঃ**

একটি বিশেষ ধরনের কুশনের উপরে ক্ষুদ্র ও হ্রস্ব বহু কনিডিয়া-বৃন্ত তৈরী হ'লে সমগ্র কুশনের উপরে বৃন্তগুলিকে দলবদ্ধ ভাবে বৃন্ত-পুঞ্জ বা বৃন্ত-স্তুপ বলা যায়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের স্তুপের বৃন্ত-মধ্যবর্তী স্থানে এক-একটি দীর্ঘ, ঋজু, কালো রঙের সূচের মত ছত্রাক অঙ্গ দেখা যায় যাদের সেটা বা সেটি (seta, plural-setae) বলা হয়। কনিডিয়া স্তুপ প্রায়ই বিভিন্ন উদ্ভিদ রোগের কারণ ছত্রাকগুলি আক্রান্ত উদ্ভিদের কৃত্বক (cuticle) বা ত্বকের নীচে তৈরি করে। মেলানকনিয়েলস্ (Melanchoniales) বর্গভুক্ত ছত্রাক যেমন **কোলেটোট্রিকাম (Colletotrichum)** প্রভৃতি এ রকম কনিডিয়া-স্তুপ তৈরি করে। ( চিত্র-৩১ )।

৩। **কনিডিয়া-কলস বা পিকনিডিয়াম, বহু-পিকনিডিয়া (Pycnidium, pl. Pycnidia) ঃ**

কিছু ছত্রাক কনিডিয়া সৃষ্টির জন্য একটি কলস বা গোলকাকৃতি কাঠামো তৈরি ক'রে। কাঠামোর অন্তর্ভাগে বহু ক্ষুদ্র কনিডিয়া-বৃন্ত তৈরি করে। সাধারণতঃ কাঠামোগুলির একটি ক্ষুদ্র মুখ (ostiole) অন্তর্ভাগে সৃষ্ট কনিডিয়াগুলিকে বাহিরে আসতে দেয়। কনিডিয়া-কলস নানা আকৃতি, মাপ এবং রঙের হয়। সাধারণতঃ উদ্ভিদরোগ সৃষ্টিকারী কিছু ছত্রাক উদ্ভিদের যে কোন অঙ্গের উপরে অথবা ভিতরে প্রোথিত অবস্থাতে এগুলি তৈরি করে। স্ফেরপ্‌-সিডেলস্ (Sphaeropsidales) বর্গভূক্ত ছত্রাকগুলি যেমন **ফোমা** ইত্যাদি এরকম কনিডিয়া-কলস তৈরি ক'রে ( চিত্র-৩১ )।

**ছত্রাকের যৌনপ্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি** (sexual reproduction in fungi) ঃ

দুটি বিপরীতধর্মী কিন্তু মিলনক্ষম (compatible) নিউক্লিয়াসের মিলন জনিত যে সংখ্যাবৃদ্ধি হয় তাকে যৌন প্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি বলে। এই প্রক্রিয়ায় মিলিত নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র (2n) পরবর্তী স্তরে অর্ধবিভাজন বা মায়োসিস (meiosis) এর মাধ্যমে দুই বা ততোধিক কেন্দ্রের অর্ধাবস্থা যুক্ত (n) কোষ সৃষ্টি করে। সর্বশেষ ঐ কোষ থেকে নূতন ছত্রাক সৃষ্টি হয়। যে বিশেষ কোষে যৌন বিশেষত্ব অনুযায়ী বিপরীতধর্মী কিন্তু মিলনক্ষম কেন্দ্রগুলি

অবস্থান করে তাদের যৌনকোষ (sex cells) বলে। কখনও কখনও এই কোষগুলি উৎপন্নও হয় বিশেষ ছত্রাকঅঙ্গের মধ্যে। সেক্ষেত্রে যৌনকোষ বহনকারি অঙ্গগুলিকে বলা হয় যৌনঅঙ্গ (sex-organ)।

(অ) **যৌন সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া** (Process of sexual reproduction) ঃ

যৌন সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি তিনটি প্রধান স্তরে সম্পূর্ণ হয়। স্তরগুলি নিম্নরূপ।

(ক) **কোষবস্তুর মিলন বা প্লাসমোগ্যামি** (Plasmogamy) ঃ

বিপরীত যৌনধর্মী দুটি কোষের কোষবস্তু মিলিত হ'য়ে একটি মিলিত কোষবস্তু (protoplast) গঠিত হয়। মিলিত কোষবস্তু মধ্যে দুটি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র নিকটবর্তী হয়। এই স্তরে স্বতন্ত্র যৌনকোষ দুটির ক্রোমোসমের অর্ধাবস্থা (n, haploid) একই কোষবস্তুতে আগমনের ফলে দুই-অর্ধ বা ডাইকারিয়টিক (n + n, dikaryotic) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের এ ধরনের জোড়কে বলা হয় যুগ্ম-কেন্দ্র বা ডাইকারিয়ন (dikaryon)।

(খ) **নিউক্লিয়াসের মিলন বা ক্যারিওগ্যামি** (Karyogamy) ঃ

পরবর্তী স্তরে কোষবস্তুর মিলনের পরে যুগ্ম-কেন্দ্রর মিলনকে বলা হয় কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসমিলন (karyogamy)। কেন্দ্রমিলনের ফলে একটি 2n বা পূর্ণাবস্থা বা ডিপ্লয়েড (diploid) অবস্থা যুক্ত কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। অন্য জীবের মত ছত্রাকের ক্ষেত্রেও কোষবস্তু মিলনের পরই কেন্দ্রমিলন সংঘটিত হয়, বিশেষতঃ নিম্নস্তরের ছত্রাকগোষ্ঠী ফাইকোমাইসিট্‌সের (Phycomycetes) ক্ষেত্রে। কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রে অবশ্য কোষবস্তু মিলনের বহু পরে এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় ও স্থানে কেন্দ্রমিলন ঘটে। কোষবস্তু মিলনের ফলে উদ্ভূত যুগ্ম-কেন্দ্র-যুক্ত কোষের যথাযথ বিভাজন, বৃদ্ধি সমস্তই ঘটে। ফলে ছত্রাক-সূত্রের কোষে যুগ্মকেন্দ্র, যুগ্ম-সমবিভাজিত হ'য়ে প্রতিটি নূতন কোষে যুগ্ম-কেন্দ্র হিসাবে অবস্থান করে। এরকম ছত্রাক-সূত্র যুগ্ম-কেন্দ্রযুক্ত স্পোরও তৈরি করে। পরে যথাসময় ও স্থানে যুগ্মকেন্দ্রের মিলনে কেন্দ্রমিলন সংঘটিত হয়, যেমন দেখা যায় **পাক্‌সিনিয়া গ্রামিনিস ট্রিটিসি** নামক ছত্রাকে।

**(গ) অর্ধবিভাজন বা মায়োসিস** (Meiosis) **:**

ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের (diploid) বিভাজন হয় অর্ধবিভাজন বা মায়োসিস (reduction division) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। নিউক্লিয়াসের ক্রোমোসম জোড়া যুগলমুক্ত হ'য়ে বিপরীত মেরুতে পৌঁছায়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কেন্দ্র ও পরে স্পোর তৈরি করার জন্য চারটি বা আটটিতে পর্যবসিত হয় সাধারণ মাইটোসিসের মাধ্যমে।

**নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রচক্র** (Nuclear cycle) **:**

অন্য জীবের মত ছত্রাকেও কেন্দ্রের অর্ধাবস্থা (haploid) ও পূর্ণাবস্থা (diploid) একটি চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়। পূর্ণাবস্থা সুরু হয় কেন্দ্রমিলন মাধ্যমে এবং শেষ হয় মায়োসিস বা অর্ধবিভাজন দ্বারা। ছত্রাকে কেন্দ্রের পূর্ণাবস্থা সাধারণতঃ স্বল্পকাল স্থায়ী হয়। ছত্রাকে **অলটারনেশন অব জেনারেশন** বা পুরুষান্তরও (alternation of generation) হয় না।

**বহুকেন্দ্রিকতা বা হেটারোকারিওসিস** (Heterokaryosis) **:**

ছত্রাকের কোষে কেন্দ্রের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্য দেখা যায় প্রায়ই পরিবর্তনশীল। সূত্র প্রতি বা কোষ প্রতি কেন্দ্রের সংখ্যা একই ছত্রাকের মধ্যেও ভিন্ন ভিন্ন দেখা গেছে। আবার এই ধরনের কেন্দ্র-পুঞ্জ প্রতিটি কোষে সব সময় দেখা যায় তাও নয়। একই ছত্রাকে বিভিন্ন কোষে কোষ-প্রতি কেন্দ্রের সংখ্যা বিভিন্ন হওয়াকেই বলা হয় বহুকেন্দ্রিকতা বা হেটারোকারিওসিস।

**ছত্রাকের যৌনমিলের প্রকৃতি (Sexual compatibility) :** যৌনপ্রক্রিয়ায় সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পুরুষ ও স্ত্রী ছত্রাক-অঙ্গ বা কোষের উপস্থিতি ছাড়াও কিছু কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে যৌনমিলের (compatibility) প্রয়োজন আছে। যৌনতা (sexuality) ও যৌনমিল (compatibility) দুটি স্বতন্ত্র বিশেষত্ব। এক্ষেত্রে একই ছত্রাক-দেহে বা থালাসে (thallus) সক্ষম (fertile) স্ত্রী ও পুরুষ অঙ্গ বা কোষ বিদ্যমান থেকে পরস্পর সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও যৌনমিলন ও সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না।

ছত্রাকের যৌন অঙ্গ সৃষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধির পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়। এই বিভাজন মূলতঃ সৃষ্ট যৌনাঙ্গর প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে।

(ক) উভলিংগযুক্ত ছত্রাক বা হারমাফ্রোডাইট (Hermaphrodite) : এই ছত্রাকগুলি একই থালাসে নির্ণয়যোগ্য স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় অঙ্গ বা কোষই তৈরি করে। যৌনক্রিয়াগত ভাবে এরা আন্তঃমিলনক্ষম (self compatible)। ছত্রাকের বিভিন্ন শ্রেণী যথা অ্যাসকোমাইসিটস, বেসিডিওমাইসিটস প্রভৃতিতে বহু আন্তঃমিলনক্ষম ছত্রাক রয়েছে।

(খ) একলিঙ্গ যুক্ত বা ডাইওসিয়াস ছত্রাক (Dioecious) : স্ত্রী ও পুরুষ দু'টি যৌন অঙ্গ কোষ কেন্দ্র সৃষ্টি করতে এ সমস্ত ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র থালাস প্রয়োজন হয়। ছত্রাকের একই সূত্রদেহে বা থালাসে দুটি বিপরীত অঙ্গ বা কোষ বা কেন্দ্র সৃষ্টি হয় না। এ রকম ডাইওসিয়াস ছত্রাকের একটি উদাহরণ হচ্ছে **আক্লায়া বাইসেক্সুয়ালিস (Achlya bisexualis)**।

(গ) অস্বতন্ত্রীভূত যৌনাংগযুক্ত বা আনডিফারেনসিয়েটেড ছত্রাক (undifferentiated) : এই সমস্ত ছত্রাক আকৃতিতে সাধারণ সূত্রাণুবং যৌনাংগ বা কোষ দ্বারাই যৌনক্রিয়া সম্পন্ন করে। সম্ভবতঃ সাধারণ আকৃতি-যুক্ত সূত্রাণুগুলিই সময়ে ও প্রয়োজনে যৌনক্রিয়ার দায়িত্ব নেয়।

উপরোক্ত নীতির ভিত্তিতেও ছত্রাকগুলিকে কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়।

১। **হোমোথ্যালিক বা স্বসক্ষম** (Homothallic) : যে ছত্রাকের থালাস বা দেহ যৌনপ্রক্রিয়ায় সংখ্যা বৃদ্ধিতে স্বনির্ভর তাহাদের স্বসক্ষম বা হোমোথ্যালিক বলা হয়।

২। **হেটারোথ্যালিক বা বিষম-সক্ষম** (Heterothallic) : যে সমস্ত ছত্রাকের যৌন সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য দুটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির ছত্রাকদেহ বা থালাস (thallus) পরস্পর নির্ভরশীল তাদের বিষম-সক্ষম বা হেটারোথালিক (heterothallic) ছত্রাক বলা হয়। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ছত্রাকগুলির ক্ষেত্রে এদের মিলনক্ষমতা মিলনক্ষম থ্যালাস দুটির মধ্যে একজোড়া বা দুজোড়া (bipolar or tetrapolar) বংশাণু দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই কারণে এক লিঙ্গ যুক্ত ছত্রাক স্বসক্ষম বা সমদেহযুক্ত হতে পারে না।

এছাড়া অন্য কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রে তাদের তৃতীয় যুগ্ম-কেন্দ্রযুক্ত সূত্রাণু স্তরে (tertiary) স্বসক্ষম গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যুগ্মকেন্দ্র যুক্ত সূত্রাণুটি বিষম-সক্ষমতা যুক্ত হলেও স্পোর সৃষ্টির সময় প্রতিটি স্পোরে বিপরীত যৌন বিশেষত্বযুক্ত ও

পরস্পর মিলনক্ষম কেন্দ্র, দুটি করে প্রতি স্পোরে যায়। ফলে প্রত্যেক স্পোর অঙ্কুরোদ্গমের পর সৃষ্ট ছত্রাকসূত্রে যৌন বৈপরীত্য যুক্ত মিলনক্ষম কেন্দ্র থাকে। এই কারণে স্বমিলনক্ষম ছত্রাক সূত্রগুলিকে যুগ্মকেন্দ্রযুক্ত স্বসক্ষম (secondarily homothallic) ছত্রাক বলা হয়।

**অর্ধযৌনতা** বা **প্যারাসেক্সুয়ালিটি** (Parasexuality) : অনেক ছত্রাকই একটি যথার্থ যৌনচক্রের মাধ্যমে সংখ্যাবৃদ্ধি করে না। কিন্তু সংঘটিত সংখ্যাবৃদ্ধির মাধ্যমে যৌন সংখ্যাবৃদ্ধির বহু সুবিধাই ভোগ করে। এক্ষেত্রে কোষবস্তুর মিলন, কেন্দ্রমিলন ও অর্ধবিভাজন হয় কিন্তু থ্যালাসের জীবন চক্রের কোন নির্দিষ্ট স্থানে এটি হয় না, বিজ্ঞানী পনটেকরভো (Pontecorvo) প্রথম এই তথ্য আবিষ্কার করেন।

**ছত্রাকের যৌনঅঙ্গ, যৌনকোষ ও কোষবস্তু মিলনের প্রক্রিয়া :** ছত্রাকের যে অংশ যৌনপ্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধির কাজে লিপ্ত হয় তাদের সাধারণতঃ যৌনঅঙ্গ বা গ্যামেটানজিয়াম (gametangium) বলা হয়। পুরুষ যৌনঅঙ্গকে পুরুষাঙ্গ বা অ্যানথেরিডিয়াম (antheridium) এবং স্ত্রী যৌনঅঙ্গকে স্ত্রীঅঙ্গ বা উগোনিয়াম (ogonium) বলা হয়। যৌন অঙ্গ তার শরীর মধ্যে বিশেষ ধরনের ক্ষুদ্র কোষ তৈরি করে যাদের যৌনকোষ বা গামেট (gamete) বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোষের পরিবর্তে এক বা একাধিক যৌন ক্রিয়াক্ষম কেন্দ্র থাকে। ছত্রাকের যৌনঅঙ্গ বা কোষগঠন প্রকৃতি অনুযায়ী তিন শ্রেণীর হ'তে পারে।

(১) সমযৌনকোষ ও সমযৌনাঙ্গ বা আইসোগামেট ও আইসোগামেটানজিয়া (Isogamete and Isogametangia) : মিলনকামী দুটি গ্যামেট বা গ্যামেটানজিয়া আকৃতি ও পরিমাপে একই রকমের হয় এবং কোন্‌টি স্ত্রী বা পুরুষ তা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়। **ক্যাটেনারিয়া (Catenaria)** ইত্যাদি ছত্রাক এরকম যৌনঅঙ্গ বা কোষ তৈরি করে।

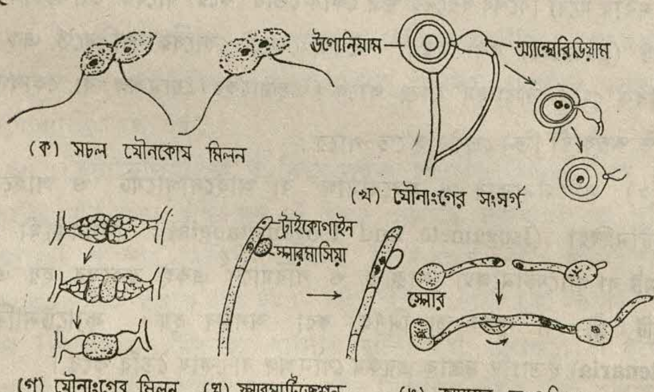
(২) অসম যৌনকোষ বা যৌনাংগ বা আনাইসোগামেটস (Anisogametes) : মিলনকামী গ্যামেট দুটির আকৃতি একই রকম হলেও পরিমাপে অসম হয়। **অ্যালোমাইসেস (Allomyces)** প্রভৃতি ছত্রাকে এরকম গ্যামেট তৈরী হয়।

(৩) বিষম যৌনকোষ ও যৌনাংগ বা হেটারোগ্যামেট ও হেটারো-গ্যামেটানজিয়া (Heterogametes and Heterogametangia) : মিলনকামী দু'টি যৌনকোষ বা যৌনাংগ আকৃতি ও পরিমাপ উভয়ই ভিন্ন প্রকৃতির। ফলে এক্ষেত্রে এদের খুব সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। **মোনোব্লেফারিস (Monoblepharis)** ইত্যাদি ছত্রাক এ জাতীয় যৌনাংগ সৃষ্টি করে।

**যৌনজনন ক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি** (Methods of sexual reproduction)

যৌনজনন ক্রিয়ার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি মূলতঃ কোষবস্তু মিলনের বা প্লাসমোগ্যামিরই বিভিন্ন পদ্ধতি। ছত্রাকের দুটি মিলনকামী বিপরীত যৌনধর্মী কেন্দ্রের মিলন হয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে। মোটামুটি পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ছত্রাকে যৌনমিলন ক্রিয়া ঘটে।

(১) **সচল যৌন-কোষের মিলন** (Planogametic copulation) : এই পদ্ধতিতে দুটি আস্তরণহীন সচল যৌনকোষের সম্পূর্ণ মিলন ঘটে (copulation) যৌনকোষ দুটির বা অন্ততঃ একটির শুঙ্গ থাকে। দুটি যৌনকোষ সম




চিত্র ৩২ : বিভিন্ন যৌন মিলন প্রক্রিয়া

(iso) বা অসম (aniso) প্রকৃতির হতে পারে। **অ্যালোমাইসেস** ছত্রাকে এ রকম পদ্ধতিতে কোষবস্তু ও কেন্দ্রমিলনের ফলে একটি জাইগোট (zygote)

সৃষ্টি হয় যেটি পরবর্তীকালে বহিস্তরে বিভিন্ন অলংকরণের সাহায্যে একটি রেস্টিং স্পোরে (resting spore) পর্যবসিত হয়। পরবর্তীকালে মায়োসিস বা অর্ধবিভাজনও হয় যথাযথ পদ্ধতিতে ( **চিত্র-৩২** )।

(২) **যৌনাংগের সংসর্গ** (gametangial contact) **:** দুটি মিলনক্ষম বিপরীত যৌনঅঙ্গ পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পরস্পরের মধ্যে একটি সংযোগ-নালিকা (fertilization tube) গঠন করে। পরবর্তীকালে উক্ত নালিকা মাধ্যমে পুরুষাংগ হইতে এক বা একাধিক নিউক্লিয়াস ও কোষবস্তু স্ত্রীঅঙ্গর কোষ মধ্যে উপনীত হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নালিকার পরিবর্তে ছিদ্র পথেও এই কেন্দ্র (nucleus) স্থানান্তরন ঘটে। পরবর্তীকালে স্ত্রীঅংগ নিউক্লিয়াস কেন্দ্র মিলন, মায়োসিস বা অর্ধবিভাজন ঘটে। **পাইথিয়ামও** সমবর্গীয় ছত্রাকের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে যৌনপ্রক্রিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে।

(৩) **যৌনঅঙ্গর মিলন** (gametangial copulation) **:**

দুটি বিপরীত যৌনাঙ্গর পরস্পর সংস্পর্শের পর তাহাদের মধ্যবর্ত্তী দেওয়াল বিনষ্ট হ'য়ে উভয় কোষবস্তুর সম্পূর্ণ মিলন ঘটে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষ কোষঅঙ্গর সম্পূর্ণ কোষবস্তু অপর একটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে বিপরীত কোষঅঙ্গ পৌঁছায় ও কোষবস্তুর মিলন ঘটে। প্রথমোক্ত সাধারণ পদ্ধতিতে জাইগোমাইসিটস (zygomycetes) শ্রেণীর সমস্ত ছত্রাকের যৌন প্রক্রিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে যৌনপ্রক্রিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি **রাইজোফিডিয়াম (Rhizophidium)** বা অন্য সমস্ত হলোকার্পিক বা পূর্ণাঙ্গিক সংখ্যাবৃদ্ধিকারি ছত্রাকে দেখা যায়।

(৪) **স্পারমাটিজেশন** (spermatization) **:**

স্পারমাসিয়া (spermatia) নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র, একনিউক্লিয়াস যুক্ত পুরুষ কোষ নানাপ্রক্রিয়া মাধ্যমে বিপুল সংখ্যাতে সৃষ্টি হয়। স্পারমাসিয়াগুলি বাতাস, জল অথবা কীটপতংগের মাধ্যমে স্ত্রীঅঙ্গর সংস্পর্শে আসে। অনেক ক্ষেত্রে স্ত্রী অঙ্গগুলি বিশেষভাবে কতকগুলি সূত্রাণু তৈরি করে যাদের নাম গ্রহীতাসূত্রাণু বা রিসেপ্‌টিভ হাইফা (receptive hypha) গ্রহীতা সূত্রাণু ও স্পারমাসিয়ার সংযোগস্থলে একটি ছিদ্রপথে স্পারমাসিয়ার সম্পূর্ণ-কোষবস্তু ও নিউক্লিয়াস (nucleus) গ্রহীতা-সূত্রাণুর মধ্যে পৌঁছায় এবং

পরবর্তী সমস্ত স্তরগুলির মধ্যদিয়া যৌনপ্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পূর্ণ করে। **পোডস্পোরা (Podospora)** ইত্যাদি ছত্রাকে এই পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচলন আছে। ( চিত্র-৩২ )

(৫) **সোমাটোগামী** বা **জায়মান অঙ্গ মিলন** (somatogamy) :

এই পদ্ধতিতে যৌনপ্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ছত্রাকের জায়মানঅঙ্গ বা কোষের মিলনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে কোন বিশেষ অঙ্গ বা কোষ সৃষ্টি হয় না। দুটি সম্ভবতঃ বিপরীতধর্মী সূত্রাণু পরস্পর মিলিত হ'য়ে ছত্রাক-সূত্র-সেতুর (clamp connection) মাধ্যমে এই কাজ করে। উন্নত শ্রেণীর বেসিডিওমাইসিট্স শ্রেণীর ছত্রাকগুলির মধ্যে এই পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে। **পেনিওফোরা (Peniophora)** এরকম একটি ছত্রাক। ( চিত্র-৩২ )

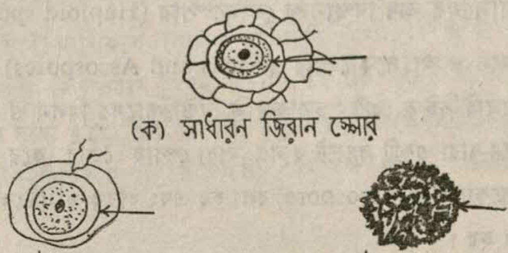
**যৌন প্রক্রিয়াতে তৈরী ছত্রাক-স্পোর** (sexually produced spores in fungi) :

বিভিন্ন ছত্রাক বিভিন্ন ধরনের যৌনস্পোর (sexual spores) তৈরি করে। স্পোরগুলি ক্রোমোসমের হাপ্লয়েড বা অর্ধাবস্থা বা ডিপ্লয়েড বা পূর্ণাবস্থাযুক্ত (n বা 2n) হতে পারে। সমগ্র ছত্রাক জগতে তিনপ্রক্যার পূর্ণাবস্থাযুক্ত (2n) ও দুই প্রকার অর্ধাবস্থাযুক্ত (n) স্পোর দেখা গেছে।

(১) **ক্রোমোসমের পূর্ণাবস্থাযুক্ত স্পোর** (diploid spores) :

(ক) উস্পোর (oospore) : উমাইসিটস্ **(oomycetes)** শ্রেণীর ছত্রাকে এজাতীয় যৌনস্পোর তৈরি হয়। স্পোরগুলি পুরু আস্তরণযুক্ত, মোটামুটি গোলাকৃতি, পূর্ণাবস্থাযুক্ত স্পোর। এগুলি প্রকৃতিগত ভাবে রেস্টিংস্পোর (resting spore)। একটি পুরুষ যৌনকোষ দ্বারা স্ত্রী যৌনকোষের নিষিক্ত-করণের মাধ্যমে এই স্পোর তৈরি হয়। অসমযৌনাংগ দুটির সংসর্গ (gametangial contact) প্রক্রিয়া দ্বারা নিষিক্ত। উস্ফিয়ার (oosphere) বা স্ত্রীযৌনকোষের মধ্যে ক্যারিওগ্যামি হবার ফলে জাইগোট (zygote) সৃষ্টি হয়। জাইগোটটি পুরু আস্তরণ দ্বারা আবরিত হ'য়ে উস্পোর সৃষ্টি হয়। উস্পোর গুলি বহুদিন ধরে নির্জীব অবস্থায় বেঁচে থাকে। পরবর্তীকালে সময়-সুযোগ মত অঙ্কুরোদ্গমকালে মায়োসিস ঘটে ও নূতন ছত্রাক-সূত্র সৃষ্টি হয়। প্রতি

স্ত্রীঅঙ্গ বা উগোনিয়ামে (oogonium) স্ত্রীকোষের উস্ফিয়ারের (oosphere) সংখ্যা এক বা একাধিক হ'তে পারে ( চিত্র-৩৩ )।




চিত্র ৩৩ঃ বিভিন্ন যৌন স্পোর

(খ) জাইগোস্পোর (Zygospore) ঃ জাইগোমাইসিটস শ্রেণীর ছত্রাকগুলি অন্য এক প্রকার রেস্টিংস্পোর তৈরি করে যার নাম জাইগোস্পোর। দু'টি সম-প্রকৃতির যৌনঅঙ্গের সম্পূর্ণ মিলনের (copulation) ফলে এই স্পোর সৃষ্টি হয়। কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের মিলনের পর সৃষ্ট জাইগোটটির আস্তরণ ধীরে ধীরে পুরু ও ঘনবাদামী থেকে কালো রঙের হয়। উপরি স্তরটি উঁচু-নীচু হয়। এই স্পোরগুলিও প্রয়োজন মত অসুবিধাজনক আবহাওয়া অতিক্রম ক'রে নির্জীব অবস্থাতে বেঁচে থাকে ও সময়-সুযোগমত অঙ্কুরোদ্গম হ'য়ে **মায়োসিস** ও নূতন ছত্রাক-সূত্র তৈরি করে ( চিত্র-৩৩ )।

(গ) সাধারণ রেস্টিংস্পোর (Resting spores) ঃ

উপরোক্ত দুই ধরনের রেস্টিংস্পোর ছাড়া আরও কিছু সাধারণ রেস্টিং স্পোর ছত্রাকের মধ্যে দেখা যায়। সাধারণ ধরনের রেস্টিং স্পোর একাধিক শ্রেণীর ছত্রাকের মধ্যে দেখা যায়। এর মধ্যে চিট্রিডিওমাইসিট্‌স্ (Chytridiomycetes), হাইফোচিট্রিডিওমাইসিট্‌স (Hyphochytridiomycetes), প্লাসমোডিওফোরোমাইস্টি্‌স ( Plasmodiophorohmycetes ) প্রভৃতি ছত্রাকের শ্রেণী উল্লেখযোগ্য।

এসব ক্ষেত্রে দুটি সচল যৌনকোষের সম্পূর্ণ মিলনের ফলে একটি পূর্ণাবস্থা-

যুক্ত জাইগোট তৈরী হয়। এই জাইগোট থেকে এক বা একাধিক রেস্টিং স্পোর তৈরী হয় ( চিত্র-৩৩ )।

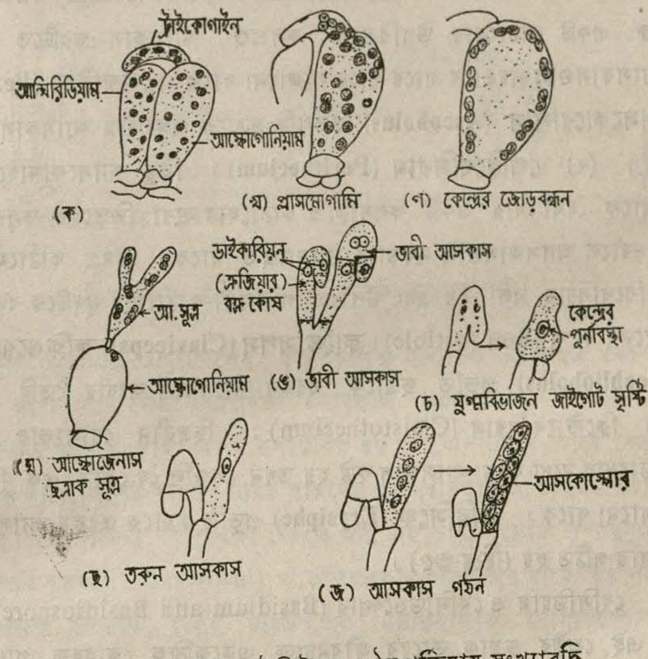
২। **ক্রোমোসমের অর্ধবিস্থাযুক্ত যৌনস্পোর** (Haploid spores) **:**

(ক) অ্যাসকাস ও অ্যাসকোস্পোর (Ascus and Ascospores) :

অ্যাসকোমাইসিট্স শ্রেণীর ছত্রাকগুলি নিউক্লিয়াসের মিলন ও মায়োসিস বা অর্ধবিভাজন দ্বারা একটি লম্বাটে থলির মধ্যে স্পোর তৈরি করে। স্পোরগুলিকে অ্যাসকোস্পোর (ascospore) বলা হয় এবং ধারক-থলিটিকে অ্যাসকাস (ascus) বলা হয়।

এই সমস্ত ছত্রাকের পুরুষাঙ্গকে যথারীতি অ্যান্থিরিডিয়াম বলা হ'লেও স্ত্রীঅঙ্গকে বলা হয় অ্যাসকোগোনিয়াম (ascogonium)। যৌনপ্রক্রিয়াতে সংখ্যাবৃদ্ধির সময় ছত্রাকসূত্রের উপর বহু কেন্দ্রযুক্ত দুটি যৌনঅঙ্গই পাশাপাশি তৈরি হয়। অ্যাসকোগোনিয়াম থেকে একটি দীর্ঘ নল উদ্ভূত হ'য়ে আন্থিরিডিয়ামে সংযোজিত হয়। নলটিকে ট্রাইকোগাইন (trichogyne) বলা হয়। এই নল মাধ্যমে অ্যান্থিরিডিয়ামের নিউক্লিয়াসগুলি অ্যাস্কোগোনিয়ামে পৌঁছায়। কোষবস্তুমিলনের এই স্তরে অ্যাস্কোগোনিয়ামের মধ্যে একটি ক'রে অ্যান্থিরিডিয়াম ও অ্যাস্কোগোনিয়ামের কেন্দ্র ( নিউক্লিয়াস ) যুগলবন্দী হয়। এই প্রক্রিয়াকেই বলা হয় যুগল-বন্দী (pairing)। এরপর অ্যাসকোগোনিয়ামের শীর্ষদেশ থেকে অনেকগুলি সূত্রের মত প্যাপিলি (papillae) সৃষ্টি হয়। কেন্দ্র-যুগলগুলি একে একে এই সূত্রমধ্যে প্রবেশ করে। প্যাপিলিগুলি পরবর্তীকালে অ্যাসকোজেনাস সূত্রাণুতে পরিণত হয়। কেন্দ্র-যুগলগুলি যুগ্মবিভাজনের (conjugate division) পরে এই সূত্রাণুটি দেওয়ালের দ্বারা অনেকগুলি কোষে বিভক্ত হয়। অগ্রবর্তী কোষটিতে ফলতঃ এক জোড়া কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস (nucleus) থাকে, যাকে বলা হয় যুগ্মকেন্দ্র বা ডাইকারিয়ন (dikaryon) এবং কোষটিকে যুগ্মকেন্দ্র যুক্তকোষ (dikaryotic cell) বলা হয়। এই কোষটি অতঃপর দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় এবং বক্র আকার ধারণ করে। তখন ইহাকে ক্রোজিয়ার (crozier) বলা হয়। কোষ মধ্যবর্তী কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস যুগল বিভাজনের উদ্দেশ্যে দুটি পরস্পর সমান্তরাল বিভাজন-টাকু (spindle) গঠন করে ( **চিত্র-৩৪** )। বিভাজনলব্ধ ৪টি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রের মধ্যে একটি

স্ত্রী ও একটি পুরুষ নিউক্লিয়াস ক্রোজিয়ারের শীর্ষদেশে অবস্থান করে। এরপর দুটি বিভাজন-দেওয়াল এমনভাবে গঠিত হয় যে কোষটি তিনটি কোষে বিভক্ত হয় এবং বক্রকোষের শীর্ষদেশস্থ কোষ বক্রকোষ বা ক্রুকসেলটিকে (crook cell) বলা হয় ভাবী অ্যাসকাস (ascus mother cell)। ভাবী অ্যাসকাসের মধ্যেই কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস মিলন ঘটে। এই 2n যুক্ত কোষটি দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায় ও এর মধ্যে মায়োসিস বা অর্ধবিভাজন প্রক্রিয়াতে নিউক্লিয়াস বিভাজিত হ'য়ে চারটি নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রে (n) পর্যবসিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই




চিত্র ৩৪ : অ্যাসকোমাইসিটদের যৌনপ্রক্রিয়ায় সংখ্যাবৃদ্ধি

চারটি কেন্দ্র সমবিভাজনের মাধ্যমে আটটি কেন্দ্রে বা নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়। পরবর্তী স্তরে নিউক্লিয়াস গুলির চতুর্দিকে কোষবস্তু সংযোজিত ও কোষ-প্রাচীর দ্বারা আবরিত হবার ফলে আটটি কোষ সৃষ্টি হয় যেগুলি অ্যাসকো-স্পোর নামে পরিচিত (**চিত্র-৩৪**)।

অ্যাসকাস ও অ্যাস্কস্পোর সৃষ্টিকারী ছত্রাকগুলির মধ্যে একদল উন্মুক্ত পরিসরে ছত্রাকসূত্রের উপরই অ্যাসকাস গঠন করে, অ্যাসকাস সৃষ্টির জন্য কোন আধার সৃষ্টি করেনা তাদের অ্যাসকাসগুলিকে আধারবিহীন (naked) অ্যাসকাস বলা হয়। **টাফ্রাইনা (Taphrina)** ছত্রাকটি এই প্রকারে হলুদ পাতার ত্বক (cuticle) তলে অ্যাসকাস সৃষ্টি করে। বাকী সমস্ত অ্যাস্কাস সৃষ্টিকারী ছত্রাকই কোন না কোন আধারের উপরে বা ভিতরে আস্কাস সৃষ্টি করে। এ পর্য্যন্ত তিন প্রকার অ্যাস্কাস-আধারের কথা জানা গেছে। সেগুলি নিম্নরূপ।

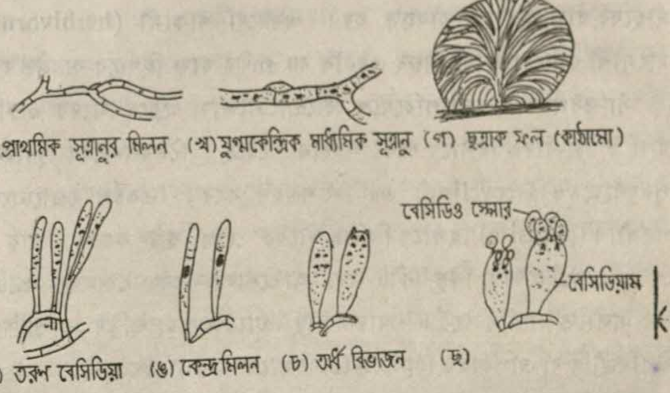
(১) অ্যাপোথেসিয়াম (Apothecium) : গামলার (soccer) মত আকৃতি যুক্ত একটি কাঠামোর উপরিভাগে ফলপ্রসূ অ্যাসকাস স্তরটিতে লম্বাটে অ্যাসকাসগুলি লম্বভাবে গায়ে গায়ে সাজানো থাকে। **পেজাইজা (Peziza), আসকোবোলাস (Ascobolus)** ইত্যাদি ছত্রাকে এজাতীয় অ্যাসকাস তৈরি হয়। (২) **পেরিথেসিয়াম (Perithecium) :** কিছু অ্যাসকোমাইসেটাস ছত্রাকে দেখা যায় একটি কলসাকৃতি কাঠামোর মধ্যে ভিতরের তলভাগের দেওয়ালে অ্যাসকাসগুলি লম্বভাবে সংযোজিত থাকে। সমগ্র কাঠামোটিকে পেরিথেসিয়াম বলা হয় এবং উপরিভাগে কলসী-কাঠামোর মুখটিকে বলা হয় গলদেশ বা অস্টিওল (ostiole)। **ক্লাভিসেপস্ (Claviceps), কক্লিওবোলাস (Cochliobolus)** প্রভৃতি ছত্রাকে এরকম অ্যাসকাস-আধার তৈরি হয়। (৩) ক্লিস্টোথেসিয়াম (Cleistothecium) : ছিদ্রহীন গোলাকার একটি কাঠামোর মধ্যে যখন অ্যাস্কাস সৃষ্টি হয় তখন সেগুলি যে কোন এক দিকেই লাগানো থাকে। **এরিসিফে (Erysiphe)** প্রভৃতি ছত্রাকে এরকম অ্যাসকাস-আধার গঠিত হয় (**চিত্র-৩৫**)।

(খ) বেসিডিয়াম ও বেসিডিওস্পোর (Basidium and Basidiospore) :

এই শ্রেণীর ছত্রাক তাদের জীবনচক্রে এককেন্দ্রিক কোষযুক্ত প্রাথমিক ছত্রাকসূত্র (primary mycelium), যুগ্মকেন্দ্রিক কোষযুক্ত মাধ্যমিক (secondary mycelium) ও কাঠামো গঠনকারি (tertiary mycelium) ছত্রাকসূত্র পরপর তৈরি করে।

প্রথমতঃ যৌন প্রক্রিয়াতে সংখ্যাবৃদ্ধির সময় এই শ্রেণীর ছত্রাক তাদের জায়মানঅঙ্গর মাধ্যমিক সূত্রপরি বেসিডিয়াম (basidium ; pl-basidia)

গুলি তৈরি করে কিছুটা গদার আকৃতির মত। গদাকৃতি এই বেসিডিয়ামের দূরপ্রান্তে চারটি ছোট বৃন্তের (sterigmata) উপর চারটি এককোষী ডিম্বাকৃতি বেসিডিওস্পোর তৈরী হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই বেসিডিয়ামগুলি সুগঠিত কাঠামোর উপরে বা মধ্যেও বিন্যস্ত হয় ( **চিত্র-৩৫** )। কাঠামোগুলিকে বেসি-




চিত্র ৩৫ : বেসিডিয়াম ও বেসিডিওস্পোর সৃষ্টি

ডিয়োকার্প (basidiocarp) বলে। যুগ্ম-কেন্দ্রযুক্ত মাধ্যমিক ছত্রাকসূত্র কোষ-গুলির মধ্যে সাধারণতঃ প্রান্তবর্তী কোষগুলি (terminal) প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে বেসিডিয়ামে রূপান্তরিত হয়। বেসিডিয়াম কোষে কেন্দ্র-মিলন ও মায়োসিসের মাধ্যমে চারটি হাপ্লয়েড বা অর্ধাবস্থাযুক্ত (n) নিউক্লিয়াস সৃষ্টি হয়। বেসিডিয়ামের দূরবর্তী মেরুতে সৃষ্টি হয় চারটি ছোট স্পোরবৃন্ত। এই স্পোর বৃন্তগুলিই উলম্ব (oval) আকৃতির কোষ ধারণ করে যাতে বৃন্ত পথে চারটি কেন্দ্র উপনীত হলেই চারটি এক নিউক্লিয়াসযুক্ত বেসিডিস্পোরও সৃষ্টি হয়।

বেসিডিয়োমাইসিট্স শ্রেণীর ছত্রাকগুলির সৃষ্ট ছত্রাক-ফলগুলি বৈচিত্র্যপূর্ণ। কোথাও তাকের আকৃতি (shelf) কখনও ছাতার মত, ঝিনুকের মত, কোরালের মত বা কোথাও পাফ-বলের (puff-ball) মত। গঠনগতভাবেও এগুলি কখন চামড়ার মত, কখন কাঠের মত শক্ত, কখনও মাংসাল আর কখনও কাগজের মত।

## ২.৪০ প্রোটোজোয়া—আকৃতি ও জৈবপ্রকৃতি :

### (ক) সাধারণ পরিচয়—প্রকৃতি, জীবনচক্র ও বাসস্থান :

আদিপ্রাণী বা **প্রোটোজোয়া** (Protozoa) সরল প্রকৃতির অণুপ্রাণী বা জীবাণু। স্বনির্ভর প্রোটোজোয়া সমুদ্রে, বিভিন্ন জলাশয়ে, মাটিতে বিভিন্ন জীবের মল ও ধূলোবালিতে যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান। কিছু প্রোটোজোয়া মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরমধ্যে শাকাসী (herbivorus) ও মাংসাশী প্রোটোজোয়া মানুষ এমনকি বহু প্রাণীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

স্যাঁতস্যাঁতে ও জলা পরিবেশে বহু প্রোটোজোয়া রয়েছে যাদের প্রকৃতিতে ব্যাক্টিরিয়া-খাদক হিসাবে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। জৈবপদার্থের ঘূর্ণায়ন ও পুনঘূর্ণায়নেও (recycling) এরা অংশগ্রহণ করে। একদল প্রোটোজোয়া পরজীবি (parasite) হিসাবে বিভিন্ন জীবের রোগ সৃষ্টি করে। আর এক গোষ্ঠীর প্রোটোজোয়া কিছু কীট যথা আরশোলা এবং রোমন্থক প্রাণীদের খাদ্যনালীতে বসবাস করে। আরও কিছু প্রোটোজোয়া উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে উপরিজীবি বা এপিফাইট (epiphyte) হিসাবে বসবাস করে।

ছত্রাক, শৈবাল ও প্রোটোজোয়ার মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য যথেষ্ট। **ইউগ্লিনোফাইটা** (Euglenophyta) গোষ্ঠীর শৈবালগুলির সাথে প্রোটো-জোয়ার সাদৃশ্য বা **ক্লামাইডোমোনাস (Chlamydomonas)** ক্লোরোফিল-বিহীন পরিব্যক্ত (mutant) দের সাথে **পলিটোমা (Polytoma)** প্রজাতির প্রোটোজোয়াদের সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। অবশ্য সাধারণভাবে সালোক-সংশ্লেষণের অক্ষমতা, কোষের সংখ্যাবৃদ্ধির স্বতন্ত্র প্রকৃতি প্রভৃতি এই দুই গোষ্ঠীর জীবাণুর মধ্যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

প্রোটোজোয়ারা শুধু যে বহু আকৃতিযুক্ত (polymorphic) তাই নয় একই প্রজাতি বিভিন্ন বাসস্থানে অথবা পোষককোষে বিভিন্ন আকৃতিতে দেখা যায়। পরজীবি (parasitic) প্রোটোজোয়াগুলির পোষকের তালিকার মধ্যে শৈবাল থেকে মানুষ—সবরকম জীবই রয়েছে।

### (খ) প্রোটোজোয়ার গঠনপ্রকৃতি ও জীবন-চক্র :

সাধারণভাবে প্রোটোজোয়ারা এককোষী জীবাণু। কিন্তু কোষ প্রতি একাধিক কেন্দ্র থাকতে পারে। কিছু প্রজাতিতে একাধিক কোষ পরস্পর যুক্ত

হ'য়ে থাকে, যদিও তাদের আচরণ বহুকোষী জীবাণুর মত নয়। প্রোটো-জোয়ারা পরিমাপে ব্যাক্টিরিয়ার চেয়ে বড়, কয়েক মাইক্রন (μm) থেকে কয়েক মিলিমিটার পর্যন্ত হয়। এদের জীবনচক্র বেশ জটিল ও কয়েকটি স্তরে বিভক্ত। প্রোটোজোয়ার কোষ শুধুমাত্র কোষপ্রাচীরের অভাব ব্যাতিরেকে সর্বাংশে অন্য সম্পূর্ণকেন্দ্রী জীবাণু কোষের মতই। কোষগুলি একটি লিপো-প্রোটিন (lipo-protein) জাতীয় আস্তরণে ঢাকা থাকে। উক্ত আবরণটিকে **পেরিপ্লাস্ট** (periplast) বলা হয়। বৃহত্তর প্রোটোজোয়া প্রজাতিগুলিতে এই আস্তরণটি যথেষ্ট পুরু ও দৃঢ়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে এই দৃঢ় আবরণের জন্য কোষের একটি নির্দিষ্ট আকৃতি থাকে। পেরিপ্লাষ্টের নিম্নস্তরেই প্লাসমা আস্তরণ থাকে। অন্তঃবর্তী কোষবস্তু বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় কোষবস্তু বা এণ্ডোপ্লাস্‌ম্ যথেষ্ট তরল। কোষবস্তুর বহির্ভাগের আনুপাতিকভাবে ঘন অংশকে বহিঃকোষবস্তু বা এক্টোপ্লাসম (ectoplasm) বলা হয়। কোষবস্তুর এই অংশ থেকে কোষের কিছু বিশেষ অঙ্গ যথা শুঙ্গ, ট্রাইকোসিস্ট (trichocyst), সাইটোস্টোম (cytostome), সাইটোফারিঙ্কস্ (cytopharynx), পায়ু (anal pore), সংকোচক তন্তু (contractile fibre) প্রভৃতি উদ্ভূত হয়। এগুলি মূলতঃ চলন, প্রতিরক্ষা (defense) ও খাদ্যগ্রহণের (feeding) জন্য বা কোষ মধ্যবর্তী জল-ভাগের আস্রাবক চাপ (osmotic pressure) নিয়ন্ত্রণ (regulation) প্রভৃতি কাজে লিপ্ত। শুঙ্গের গঠন অবশ্য প্রোকারিওট বা অসম্পূর্ণ কেন্দ্রীদের শুঙ্গের গঠন থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

(গ) **খাদ্যগ্রহণ ও রেচন ব্যবস্থা** (nutrition and excretion) :

প্রোটোজোয়ার মধ্যে স্বভোজী (autotroph) ও পরভোজী (hetero-troph) দুইই রয়েছে। পরভোজীদের মধ্যে কিছু মৃতজীবি (saprophyte) ও কিছু পরজীবি (parasite)। সালোকসংশ্লেষক স্বভোজীদের সংখ্যা খুবই সীমিত।

কতকগুলি প্রোটোজোয়া আস্রাবণ পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণে সক্ষম (osmotro-phic) হলেও অধিকাংশ প্রোটোজোয়া সাধারণতঃ কঠিন খাদ্য গলাধঃকরণে (ingest) সক্ষম ও অভ্যস্থ। বেশীর ভাগই দুই বা ততোধিক নকল পদের (pseudopodia) সাহায্যে ফাগোসাইটোসিস (phagocytosis) পদ্ধতিতে খাদ্য

গ্রহণ করে। সিলিয়েটরা (ciliate) তাদের পক্ষ্ম (cili) দ্বারা খাদ্যকণা তাদের কোষথলির (cytopharynx) মধ্যে গ্রহণ করে। একে বলা হয় কোষমুখ পদ্ধতিতে (cytostome) খাদ্যগ্রহণ। এসব প্রোটোজোয়া কোষের অসংখ্য ক্ষুদ্রছিদ্র বা পিনোসাইট (pinocyte) মাধ্যমে ও ফাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতেও তরল খাদ্য গ্রহণ করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় পিনোসাইটোসিস (pinocytosis)। এদের রেচনক্রিয়া সংঘটিত হয় অবশ্য ব্যপন (diffusion) পদ্ধতি মাধ্যমে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রেচিত (exereted) দ্রব্যাদি কোষগর্ভেই (vesicles) আশ্রয় গ্রহণ করে।

(ঘ) **চলন** (locomotion) :

চলার শক্তি অনুযায়ী প্রোটোজোয়া দু'রকমের হতে পারে। যথা সীমিত চলনশক্তি-যুক্ত বা অচল ও চলনশক্তি-যুক্ত। সীমিত চলনশক্তিযুক্ত প্রোটো-জোয়াগুলির মধ্যে পরজীবি (parasitic) ধরনের প্রোটোজোয়াই বেশী। চলৎশক্তিযুক্ত গোষ্ঠীটিতে চলন মূলতঃ শুঙ্গ নির্ভর, যেমন দেখা যায় **মাস্টিগোফোরা (Mastigophora)**, **সারকোডিনা (Sarcodina)** ও **স্পোরোজোয়ার (Sporozoa)** কিছু সদস্যের মধ্যে। **সিলিয়াটাতে (Ciliata)** চলন মূলতঃ পক্ষ্ম নির্ভর। অন্য কিছু **সারকোডিনাতে** চলন হয় ক্ষণপদ দ্বারা, কিছু স্পোরোজোয়াতে আবার পিছলানো (gliding) প্রক্রিয়াতে চলন হয়।

(ঙ) **প্রোটোজোয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি** (Reproduction) ঃ

প্রোটোজোয়ার সর্বাধিক প্রচলিত সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়া হচ্ছে বিচ্ছিন্নকরণ (fission) পদ্ধতি। বিচ্ছিন্নকরণের মাধ্যমে কোষটি প্রায় সমবিভাজিত হয়। আরও কিছু স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে প্রোটোজোয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। উদাহরণস্বরূপ **মাস্টিগোফোরাতে (Mastigophora)** যে দৈর্ঘ্য বিভাজন হয়, **স্পোরোজো-য়াতে (Sporozoa)** যে বহুবিভাজন (schizogamy), বা **সিলিয়াটাতে** (ciliata) পাশাপাশি বিভাজন হয় তা উল্লেখযোগ্য। বহু প্রোটোজোয়াতে যৌন প্রক্রিয়াতেও কোষ সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। এক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটি সরল সংযোগের (conjugation) মাধ্যমে সংঘটিত হয়। প্রোটোজোয়ার বহু প্রজাতিতে যৌন সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ সংঘটিত হয় না। কিছু অর্ধাবস্থাযুক্ত, শুঙ্গল প্রোটোজোয়া স্পোরোজোয়াদের ক্ষেত্রে অর্ধবিভাজন বা মায়োসিস হয় জাই-

গোটের। অন্য কিছু সম্পূর্ণ অবস্থাযুক্ত শুঙ্গলদের, পক্ষ্মল ও সারকোডাইনদের ক্ষেত্রে অর্ধবিভাজন হয় গ্যামেটিক প্রোনিউক্লিয়াস গুলি (gametic pro-nuclei) সৃষ্টি করার জন্য।

কিছু ছত্রাকের ক্ষেত্রে যেমন **সারকোডাইনের (Sarcodine)** ক্ষেত্রে কোষ মধ্যস্থ নিউক্লিয়াস হাপ্লয়েড বা অর্ধাবস্থা থেকে ডিপ্লয়েড বা পূর্ণাবস্থাতে পরিবর্তিত হবার পথে মাঝপথে অর্ধবিভাজন বা রিডাকসন ডিভিসন (reduction division) হয়। আবার প্রোটোজোয়ার কিছু প্রজাতি রয়েছে যাদের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য দুটি বিপরীত কিন্তু মিলনক্ষম যৌন প্রকৃতিযুক্ত ক্লোনের (clone) প্রয়োজন হয়।

### (চ) **প্রোটোজোয়ার প্রতিবেদনশীলতা** (Responsiveness) :

প্রতিবেদনশীলতা উন্নত জীবগুলির মধ্যে দেখা যায়। প্রোটোজোয়ার মধ্যেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবেদনশীলতা দেখা যায়। বিশেষতঃ প্রোটোজোয়ার খাদ্যদ্রব্য বাছাই করে গ্রহণ বা বর্জন করার মধ্য দিয়ে এই প্রতিবেদনশীলতা প্রায়ই প্রকাশ পায়। **ডিডিনিয়াম (Didinium)** প্রোটোজোয়া এই প্রতিবেদনশীলতার সাহায্যে মৃত ও জীবিত **পারামোসিয়াম**(Paramoecium) কোষ নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়। অনেক প্রোটোজোয়া যেমন **ইউগ্লিনার (Euglena)** দেহের নয়নছাপ (eye-spot) তাদের বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মির নির্ণয়ে সক্ষম করেছে। এছাড়া বহু প্রোটোজোয়া উষ্ণতা, বিদ্যুত, মাধ্যাকর্ষণ ও বিভিন্ন রাসায়নিকের প্রতি প্রতিবেদনশীলতা দেখায়।

### (ছ) **প্রোটোজোয়ার সিষ্ট অবস্থা** (Encystment) :

প্রোটোজোয়া জীবনচক্রের কোন কোন স্তরে বিশেষতঃ পরিণত (mature) কোষে যৌনমিলনের (conjugation) ঠিক পরেই কোষের জল উৎসারিত ক'রে কোষের চতুস্পার্শে একটি পুরু কোষপ্রাচীর গঠন করে। ফলে বেষ্টিত কোষটি নিক্রিয় (dormant) অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কোষের এই অবস্থাতে জৈবনিক ক্রিয়ার হার অতি নিম্ন বা প্রায় শূন্যে পৌছায়। এই বেষ্টিত, নিক্রিয় কোষকে বলা হয় সিষ্ট (cyst)। এই সিষ্টগুলি খরা (drought), উষ্ণতা, লবণাক্ততা বা অম্ল বা ক্ষার অবস্থা (pH) সহনশীল হয়। পরবর্তীকালে সুবিধাজনক আবহাওয়াতে জলশোষণ ও জৈবনিক ক্রিয়া সুরু করে, এবং

বিস্ফোরণমুক্তির (bursting) মাধ্যমে সাধারণ প্রোটোজোয়া কোষ (tro-phoid) উন্মুক্ত হয়।

**(জ) পুনঃসজীবভবন** (Regeneration) **:**

প্রোটোজোয়ার অনেক প্রজাতির ক্ষেত্রে দেখা যায় আহত বা ছিন্ন হ'লে তারা পুনঃ সজীবভবনে সক্ষম। কোষের এবং নিউক্লিয়াসের অন্ততঃ ১০ শতাংশ স্বাভাবিক থাকলে কোষের পুনঃ সজীবভবন সম্ভব হয়।

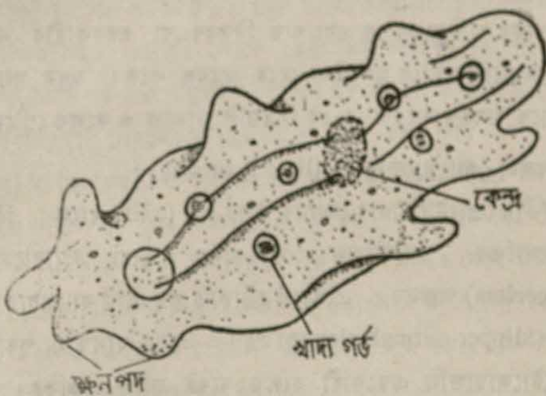
## ২.৪১ প্রোটোজোয়ার কয়েকটি প্রতিনিধিমূলক প্রজাতি :

প্রোটোজোয়ার বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্নভাবে জীবাণু হিসাবেও বহু আলোচিত। এর মধ্যে অ্যামিবা (Ameba), পক্ষ্মল প্রোটোজোয়া (The ciliates), শুঙ্গল প্রোটোজোয়া (The flagellates) ও স্পোরোজোয়া(Sporo-zoans) অন্যতম।

**(অ) অ্যামিবা** (The Amebas) **:**

অ্যামিবার বেশীর ভাগ প্রজাতিই মানুষ বা অন্য উন্নত শ্রেণীর প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকারক নয়। এরা অধিকাংশই জলাশয়ে ও পুষ্করিণীতে প্রচুর ব্যাক্টিরিয়া ও অন্য জৈববস্তুর উপস্থিতিতে বসবাস করে। বেশীর ভাগ অ্যামিবা জীবদ্দশাতে কোন বিশেষ ও স্থির আকৃতিযুক্ত হয়না। এই বহুরূপী আকৃতিই অ্যামিবাকে অন্য প্রোটোজোয়া থেকে স্বতন্ত্র করে। অ্যামিবারা প্রতিনিয়ত নানা আকৃতির নকলপদ সৃষ্টি করে (**চিত্র-৩৬**)। নকলপদ গুলি অ্যামিবার চলনে সহায়তা করে এবং এই রকম চলনক্ষমতা অ্যামিবীয় চলন-ক্ষমতা নামে পরিচিত। এই প্রক্রিয়াতে অ্যামিবাকোষ প্রথম যেদিকে নকলপদ উৎসারিত করে, পরে সেইদিকে ধীরে ধীরে কোষবস্তুকে উৎসারিত ক্ষণপদে প্রবাহিত করে; ফলে কোষটি সামগ্রিকভাবে স্থান পরিবর্তন করে। অ্যামিবার পেরিপ্লাস্ট আবরণটি অত্যন্ত পাতলা ও নমনীয়। কোষের রেচিত দ্রব্যাদি প্লাসমা আস্তরণ ও পেরিপ্লাস্টের মধ্য দিয়া নির্গত হয়। সারকোডিনা গোষ্ঠীর অন্য একটি গণ **ডিফুজিয়াতে** (**Diffugia**) কোষ তার চতুস্পার্শে একটি আঠাল পদার্থ নিঃস্বরণ করে যা বালুকণার সাথে সংযুক্ত হ'য়ে একটি কঠিন আবরণ সৃষ্টি করে। **আরসেলা** (**Arcella**) গণের কোষ আবার একটি কাইটিন (chitin) জাতীয় পদার্থে আবরিত থাকে। সামুদ্রিক গণ **ফোরামিনিফেরাতে**

(Foraminifera) কোষ তার চতুষ্পার্শে অত্যন্ত জটিল রন্ধ্রযুক্ত ক্যালসিয়াম কার্বনেটে ($CaCo_3$) তৈরী একটি খোলসে ঢাকা থাকে। অপর একটি




চিত্র ৩৮ : প্রোটোজোয়া—অ্যামিবা

সামুদ্রিক গণ **রেডিওলেরিয়ার (Radiolaria)** কোষ সিলিকা (silica) নিঃস্বরণ ক'রে খোলস কাঠামো গঠন করে। সমস্ত গুলিই **অ্যামিবার (Ameba)** মত ক্ষণপদ তৈরীতে সক্ষম বহুরূপী আকৃতিযুক্ত (চিত্র ৩৬)।

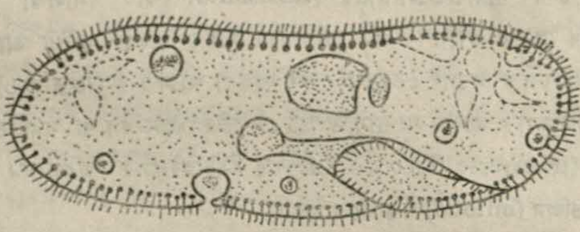
অ্যামিবার অযৌন-সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে কোষটির মিটোসিস বা সমবিভাজনের দ্বারা (transverse fission)। এক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের দ্বিবিভাজন যথাযথ সমবিভাজন (mitotic) পদ্ধতিতে হয়।

বহু জীবের একটি অন্যতম রোগ অ্যামিবাওসিস (amebiosis) অ্যামিবার দ্বারাই সংঘটিত হয়। মানুষের অ্যামিবাওসিস রোগের সর্বাপেক্ষা বিপদজনক নিমিত্ত প্রজাতিটি বর্তমানে **এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা (Entamoeba histolytica)** নামে পরিচিত। এই জীবাণু অন্ত্রের (intestine) দেওয়ালে আক্রমণ করে এবং সেই অংশের স্ফাতি ও ক্ষতের(ulcer)সৃষ্টি করে। এই রোগটি বিশেষ ভাবে অ্যামিবিক আমাশয় রোগ (amoebic dysentery) রোগ নামে পরিচিত। অনেক ক্ষেত্রে এই জীবাণুগুলি প্রোটিন বিভাজনক্ষম উৎসেচক দ্বারা অন্ত্রের দেওয়ালে ছিদ্রের সৃষ্টি করলে রোগী মনজ ব্যাক্টিরিয়ার ঔদরিক গহ্বর সংক্রমণ (peritonitis or infection of abdominal cavity)রোগে আক্রান্ত

হ'য়ে মৃত্যুমুখেও পতিত হতে পারে। এই অ্যামিবাটি রক্তজালিকা ও লসিকার (lymph) মাধ্যমে ফুসফুস, যকৃত, মস্তিষ্ক ও অন্যান্য যন্ত্রে পৌঁছে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি করে। এ ধরনের অ্যামিবা মলের সাথে সিষ্ট (cyst) হিসাবে দেহের বাহিরে আসে এবং খাদ্য বিতরণ বা গ্রহণকারীর অপরিচ্ছন্ন হাত মারফৎ খাদ্যের সাথে মুখ দিয়া দেহে প্রবেশ করে। যখন মলজ দ্রব্য সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন এই সিষ্টগুলি আনাজ ও ফলেও পৌঁছে যায়।

(আ) **পক্ষ্মল প্রোটোজোয়া (Ciliate Protozoa) :**

এ জাতীয় প্রোটোজোয়ার কোষের উপর পক্ষ্ম (cilia) থাকে। ডিম্বাকৃতি বা নেসপাতির আকৃতিযুক্ত কোষগুলির মধ্যে **প্যারামোসিয়াম (Paramoecium)** অন্যতম। এদেরকে চট্টাকৃতি ক্ষুদ্র প্রাণী বা স্লিপার অ্যানিম্যালকুল (Slipper animalcule) বলা হয়। এদের বাসস্থান পুষ্করিণীতে। এই প্রোটোজোয়াগুলি এককোষী হলেও যথেষ্ট জটিল প্রকৃতির। কোষটি একটি নমনীয় আস্তরণে আবরিত থাকে। পক্ষ্মগুলি কোষের উপরিস্তরে সমভাবে বিন্যস্ত থাকে (**চিত্র-৩৭**)। পক্ষ্মগুলির ছন্দবদ্ধ আন্দোলনে কোষটি চলনক্ষম হয়।



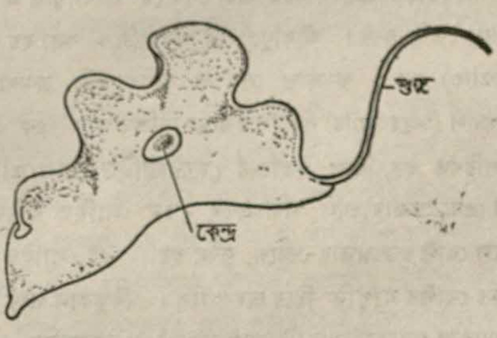
চিত্র ৩৭ : পক্ষ্মল প্রোটোজোয়া—পারামোসিয়াম

ক্ষম হয়। কোষের পার্শ্বস্থিত বিবরটি, যাকে বলা হয় পেরিস্টোম (peristome) খাদ্যবস্তুকে অন্তবর্তী মুখবিবরে (cytostome) পৌঁছে দেয়। ব্যাক্টিরিয়া বা অন্য ছোট প্রোটোজোয়াই এর খাদ্য। খাদ্যবস্তু মুখ-বিবর ও সাইটোফারিঙ্কসের (cytopharynx) মাধ্যমে খাদ্যগর্ভে পৌঁছায়। এই পৌঁছানর প্রাথমিক স্তরে পক্ষ্ম যে তাড়না সৃষ্টি করে তা খাদ্য পৌঁছানতে সাহায্য করে। পাচনক্রিয়া শেষে পরিত্যক্ত বস্তু কোষপশ্চাদ্দেশের পায়ু (anal opening) দ্বারা নির্গত (extruded) হয়।

প্যারামোসিয়ামের প্রতিরক্ষার কাজ ক'রে ট্রাইকোসিস্ট (trichocyst) অঙ্গ। এদের সংখ্যাবৃদ্ধির অযৌন পদ্ধতি দ্বিবিভাজন (binary fission) এবং যৌন পদ্ধতি হচ্ছে যৌন-মিলন (conjugation)। পক্ষ্মগুলির আর একটি গণ টেট্রাহাইমেনার (Tetrahymena) ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিপরীত যৌন প্রকৃতির ক্ষুদ্রকেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসদ্বয় (micro-nucleus) মিলিত ও পরে অর্ধ বিভাজিত হয়। প্রতিটি কোষে তৈরী ৪টি অর্ধাবস্থাযুক্ত বা হাপ্লয়েড কেন্দ্রের ৩টি বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থটি বিভাজিত হইয়া ২ টিতে পরিণত হয়। পরে কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস মিলনের মাধ্যমে প্রতি কোষে একটি করে সম্পূর্ণ অবস্থার (diploid) বা ডিপ্লয়েড কেন্দ্র সৃষ্টি হয় যারা সমবিভাজনের দ্বারা চারটি সম্পূর্ণ কেন্দ্র তৈরি করিলে দুটি বৃহৎ (macro) ও দুটি ক্ষুদ্র নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র হয়। পুরাতন বৃহৎ কেন্দ্র এই সময় বিনষ্ট হয়। অতঃপর মিলিত কোষ দুটি আলাদা হয় এবং কেন্দ্রের বিনাশ ও বিভাজন মাধ্যমে কোষগুলি ৪ কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়। এরপর কোষের মাইটোসিস বা দ্বিবিভাজনে কোষ প্রতি ১টি ক্ষুদ্র ও ১টি বৃহৎ কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াস যুক্ত হয়।

(ই) **শুঙ্গল প্রোটোজোয়া** (The Flagellates) :

মাষ্টিগোফোরা গোষ্ঠির বহু প্রজাতির প্রোটোজোয়া রয়েছে যাদের কোষ




চিত্র ৩৮ : শুঙ্গল প্রোটোজোয়া—ট্রাইপানোসম

ডিম্বাকৃতি বা নাসপাতির আকৃতিযুক্ত। এই সমস্ত প্রোটোজোয়ার দেহের এক প্রান্তে শুঙ্গ সংযোজিত থাকে। পচনশীল খড়ে (hay infusion) বা ড্রেনের

ময়লা (sewage) র মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শুন্দল প্রোটোজোয়া থাকে। এক-জাতীয় প্রোটোজোয়ার অনেক গুলিতে আবার ক্লোরোফিল্ও থাকে কোন কোন শুন্দল প্রোটোজোয়ার প্রজাতি মানুষের দেহে রোগজীবাণু হিসাবে থাকতে পারে যথা **ট্রাইকোমোনাস ভাজিনালিস** **(Trichomonas vaginalis)** ( চিত্র-৩৮ )।

(ঈ) **স্পোরোজোয়া** (Sporozoa) :

এই গোষ্ঠীর প্রোটোজোয়াগুলি বেশীর ভাগই পরজীবি। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু **প্লাসমোডিয়াম (Plasmodium)** এদের অন্যতম। এই গোষ্ঠীর প্রোটোজোয়াগুলির জীবনচক্র খুবই জটিল। প্লাসমোডিয়ামের জীবন-চক্রের অযৌনঅংশ মানুষের দেহে এবং যৌনঅংশ এদের বাহক কীট **অ্যানোফিলিস (Anopheles)** মশার দেহে সম্পাদিত হয়। জীবাণুবাহি একটি মশা মানুষের দেহে কামড়ালে তার লালার সাথে প্রোটোজোয়া মানুষের দেহে প্রবেশ করে। স্ত্রীমশা সাধারণতঃ ডিম তৈরি করতে মানুষের রক্ত থেকে প্রোটিন সংগ্রহ করে। প্লাসমোডিয়াম মানুষের রক্তে মিশে যাবার পর যকৃতে গিয়ে অযৌন পদ্ধতিতে সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এই অবস্থাকে বলা হয় লোহিত কণিকা-পূর্বঅবস্থা (pre-erythrocytic)। পরে এই জীবাণু লোহিত কণিকাতে প্রবেশ করে এবং সেখানে সংখ্যাবৃদ্ধি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গ (segment) তৈরি করে। জীবাণুর এই অবস্থাটিকে বলা হয় ট্রোফোজাইট (trophozite) স্তর। আক্রান্ত লোহিত কণিকাগুলি ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়। ক্ষুদ্র অংশগুলি (segments) সঞ্চালিত রক্তে মিশ্রিত হয়ে এক একটি পরজীবি কোষে পরিণত হয়, এবং ইহাদের **মেরোজাইড** (merozite) বলা হয়। এইভাবে প্রোটোজোয়াগুলি পর্যায়ক্রমে নূতন লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে, ফলে রোগী রক্তাল্পতায় ভোগে, দুর্বল হয়। এই লোহিত কণিকা বিনষ্ট হবার সময় রোগীর কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। কিছুকাল পরে মেরোজাইট-গুলি বৃহদাকার গ্যামেটোসাইটে (gametocyte) রূপান্তরিত হয়। মানুষের দেহে গ্যামেটোসাইটের কোনও কর্মক্ষমতা থাকে না। এরপর এরা আবার স্ত্রীমশার দেহে প্রবেশ করে। এদের পাকস্থলিতে স্ত্রী ও পুরুষ যৌনকোষের (gamets) মিলনের ফলে উদ্ভূত জাইগোট (zygote) পাকস্থলির

প্রাচীন আক্রমণ করে, সেখানে সংখ্যাবৃদ্ধি করে এবং একটি থলির সৃষ্টি করে যাহাকে বলা হয় **উসিস্ট** (oocyst)। এই থলির মধ্যে প্রোটোজোয়ার বিভাজন হয় এবং পরবর্তীকালে থলি বিস্ফোরিত হ'য়ে অসংখ্য নূতন সৃষ্ট প্লাসমোডিয়ামগুলি মশকের লালাগ্রন্থিতে পৌঁছায়। মশকের শরীরে প্রোটোজোয়াগুলি ২ মাসের বেশী থাকতে পারে। (চিত্র-৩৩)

**২.৫০ শৈবাল: আকৃতি ও জৈব প্রকৃতি** (Algae : nature and biological characteristics) :

নীলসবুজ শৈবাল সহ সমস্ত শৈবালই জীবাণুদের মধ্যে বৃহত্তম কার্বো-হাইড্রেট সংশ্লেষক গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত। এদের সাধারণতঃ জলভাগে দেখা যায়। আর যেহেতু পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ৭০ শতাংশই জলভাগ তাই শৈবালদের প্রাধান্য উপলব্ধি করা শক্ত হয় না।

বেশীর ভাগ শৈবালই জীবাণু হলেও এদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার এবং সারা বছর জুড়ে সংখ্যাবৃদ্ধির গতি অত্যন্ত উচ্চ। দেখাগেছে উন্নত উদ্ভিদের মত শৈবালের শরীরেও ক্লোরোফিল-এ (chlorophyll-a) থাকে মূলতঃ যার সাহায্যে সালোকসংশ্লেষ সম্পন্ন করে শৈবাল। পৃথিবী পৃষ্ঠের শৈবাল, জমির উপরের উদ্ভিদের সমপরিমাণ অঙ্গার অন্ততঃ আত্তীকরণ নিশ্চয়ই করে।

**(অ) শৈবালের বাসস্থান ও বিস্তার** (Habitat and distribution of algae) :

শৈবাল সম্পর্কে একটা ধারণা রয়েছে যে এরা জলভাগ ছাড়া বাঁচে না। প্রকৃতপক্ষে শৈবালের জননকোষের (reproductive cell) চলনের (movement) জন্যই জল বা আর্দ্রতার প্রয়োজন হয়। জীবনধারণ বা বেঁচে থাকার জন্য শৈবালের অত্যন্ত শুষ্ক আবহাওয়া বা বাসভূমিও চলনসই। সাধারণতঃ পৃথিবীর প্রায় সমস্ত সমুদ্রাঞ্চলের তীরবর্তী অঞ্চলেই শৈবাল প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। অন্য বহু জলাশয়েও প্রচুর পরিমাণে শৈবাল পাওয়া যায়। এছাড়া ঠাণ্ডা ও ক্রান্তীয় আবহাওয়াযুক্ত বিরাট ভূ-অঞ্চলে আর্দ্রতা থাকলে মাটিতে, পাহাড়ের পাথরে, গাছের উপর প্রচুর পরিমাণে শৈবাল জন্মায়। এক কথায় স্থলভাগে আর্দ্রতা থাকলে সর্বত্র এবং জলভাগের যত গভীর পর্যন্ত আলো

পৌঁছায় ততদূর নানা জাতের শৈবাল বহুল পরিমাণে জন্মায়। জলজ উদ্ভিদের গায়ে বিশেষত ব্রায়োফাইট ও অ্যাঞ্জিওস্পার্মদের গায়েও শৈবাল জন্মায়। এমনকি জলজপ্রাণী যথা মোলাস্ক (molluscs) দের পায়েও প্রচুর শৈবাল বৃদ্ধিপায়।

আদ্র মাটিতে বা পাহাড়ে যেমন মূলতঃ ডায়াটম ও শুঙ্গল শৈবালেরই প্রাধান্য তেমনি সমুদ্রতীরে বাদামী ও লাল শৈবালেরই প্রাধান্য। সর্বপরি সমগ্র জলভাগের উপরিস্তরে একটি বিশাল, সর্বব্যাপী আস্তরণের মত শৈবাল সর্বদাই অঙ্গার আত্তীকরণ করছে। মেরু অঞ্চলে বরফের উপরিস্তরে এবং নীচের স্তরেও এক ধরনের শৈবাল জন্মায় যাদের প্রাধান্যও উল্লেখযোগ্য।

## (আ) শৈবালের গোষ্ঠীগত বিশেষত্ব (characteristics of algae) ঃ

শৈবালের অঙ্গার আত্তীকরণের ফলে প্রকৃতিতে সাধারণতঃ প্রচুর পরিমাণে শ্বেতসার (starch) সংশ্লেষিত হচ্ছে। এছাড়াও শৈবাল অন্য যেসমস্ত রাসায়নিক সংশ্লেষণ করছে তার মধ্যে সেলুলোজ (cellulose), ম্যানোজ (mannose), জাইলোজ (xylose), আলজিনিক অম্ল (alginic acid) প্রভৃতি অন্যতম।

মিষ্টিও লবণাক্ত উভয়প্রকার জলাশয়েই প্রচুর শৈবাল জন্মায়। সমুদ্রের ফাইটোপ্লাঙ্কটনের বেশীর ভাগই (phytoplankton) এককোষী শৈবাল। বহু কোষী, বৃহদাকার শৈবাল বেশীর ভাগ মাটিতেই থাকে।

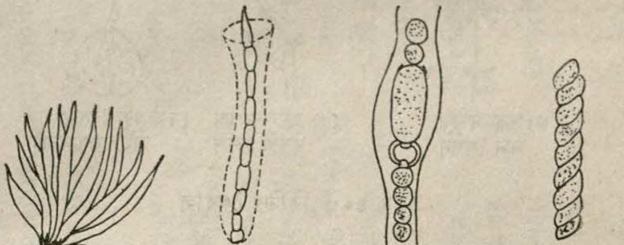
অনুকূল পরিবেশে ও আবহাওয়াতে শৈবালের সংখ্যাবৃদ্ধির হার খুবই দ্রুত। বিভিন্ন জলাশয়ে জলের রঙ পরিবর্তন হতে দেখা যাওয়ার কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই অতিদ্রুত হারে শৈবালের সংখ্যা বৃদ্ধি।

ইদানীংকালে বিভিন্ন সময় ও স্থানে শৈবালের অতিদ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি পরোক্ষভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডাতে আণবিক বিস্ফোরণের (atomic explosion) পরে অথবা ইন্দোনেশিয়ার কারাকাটোয়াতে অগ্ন্যুৎপাতের পর জীবাণুশূন্য এলাকাতে অত্যন্ত দ্রুত হারে যে জীবাণু সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে তাহা মূলতঃ শৈবাল গোষ্ঠীরই। জাপানে সমুদ্রোপকূলে কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন শৈবালের যে চাষ ইদানীং করা হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগানোর জন্য তাও উল্লেখযোগ্য।

(ই) অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত শৈবাল ঃ

নীলসবুজ শৈবাল একটি অসম্পূর্ণকেন্দ্রী জীবাণু এবং প্রকৃতিতে বিপুল সংখ্যায় বিদ্যমান। এই শৈবাল গোষ্ঠীর প্রায় ২ সহস্রাধিক প্রজাতি রয়েছে। আকৃতিগত পার্থক্য ব্যতীত সালোকসংশ্লেষক ব্যাক্টিরিয়ার সাথে এদের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। পৃথিবীপৃষ্ঠে বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে বিভিন্ন বিপরীতমুখী পরিবেশে নীলসবুজ শৈবাল রয়েছে। এই শৈবাল মেরুঅঞ্চল থেকে উষ্ণ প্রস্রবণ, মৃত্তিকা থেকে মিষ্টজল সর্বত্রই বিদ্যমান। এরা উজ্জ্বল রঙের মাধ্যমে এদের উপস্থিতি ঘোষণা করে। সামুদ্রিক প্লাঙ্কটনদের খাদ্য হিসাবেও কাজ করে। মৃত্তিকাতে উদ্ভিদের খাদ্যসংগ্রহ ও সরবরাহ কার্যে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এদের প্রয়োজনীয় খাদ্যও অতিসরল প্রকৃতির। অনেক ক্ষেত্রে অগ্নুৎপাত জনিত জীবনহীন লাভাতে প্রথম যে জীবের আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে তা এই জাতীয় শৈবাল।

এই জীবাণুগুলির আকার ব্যাক্টিরিয়ার তুলনাতে বৃহৎ এবং শুঙ্গহীন ও অচল প্রকৃতির। এই জীবাণুগুলি সবাত এবং ফোটোলিথোট্রফিক (photolithotrophic)। সমস্ত নীল সবুজ শৈবালেই দুটি বিশেষ রঙ্গক যথা সবুজ ক্লোরোফিল (chorophyll) ও নীল ফাইকোসায়ানিন (phycocyanin)



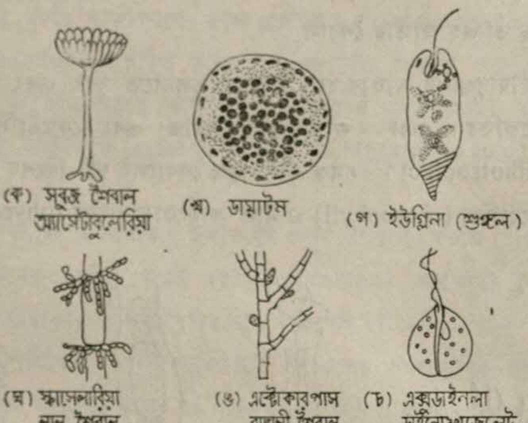

চিত্র ৩৭ ঃ নীলসবুজ শৈবাল

পাওয়া যায় যা অন্য উদ্ভিদে পাওয়া যায় না। এছাড়া প্রাপ্ত অন্য রঙ্গকগুলি হচ্ছে ফাইকোএরিথ্রিন (phycoerythrin), ক্যারোটিন (carotene) ও

জ্যান্থোফিল (xanthophyll)। এই শৈবালগুলি বায়নারি ফিসান বা দ্বিবিভাজন দ্বারা সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এদের কোন নির্দিষ্ট যৌনজনন প্রক্রিয়া এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। নীলসবুজ শৈবালের কয়েকটি পরিচিত গণ হচ্ছে **রিভুলেরিয়া** (**Rivularia**), **নসটক** (**Nostoc**), **অসিলেটোরিয়া** (**Oscillatoria**), **স্পিরুলিনা**(**Spirulina**), **কক্কোক্লোরিস** (**Coccochloris**), **আনাবিনা** (**Anabina**) অন্যতম ( **চিত্র-৩৯** )।

## ২'৫১ শৈবালের আকৃতি ও গঠন প্রকৃতি ঃ

সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত শৈবাল গঠনগতভাবে থ্যালাস থেকে পত্রযুক্ত (leafy) বহু রকমের হয়। পরিমাপের দিক থেকেও জীবাণু থেকে বৃহদাকারে সব রকমই হয় ( **চিত্র-৪০** )। শৈবালের কোষ সচল বা অচল দুই প্রকারই




চিত্র ৪০ঃ বিভিন্ন শৈবাল

রয়েছে। শৈবাল কোষ সাধারণতঃ ক্ষণপদ বা শুঙ্গ দ্বারা চলনক্ষম হয়। কিছু শৈবাল অবিরাম বিভাজন মারফৎ কোষমালার আকৃতি গ্রহণ করে এবং এই কোষমালা একটি আঠাল আস্তরণে আবরিত থাকে। নালিকার আকৃতি যুক্ত শৈবাল সাধারণতঃ কোষবিভাজক দেওয়াল (cross-wall) গঠন করে না। বিভিন্ন শৈবালের গঠনগত পার্থক্য অসীম। নিম্নলিখিত তালিকাতে এই বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য উল্লেখিত হল ( সারণী-১৫ )।

## ২.৫২ শৈবাল কোষের সূক্ষ্মগঠন ঃ

শৈবাল কোষের গঠন কিছু বিশেষত্ব ছাড়া মূলতঃ অন্য সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত জীবাণু কোষের মতই। অধিকন্তু সালোক সংশ্লেষক ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে। শৈবালের কোষ প্রাচীর নানা রকমের গঠনের হয়। তবে বেশীর ভাগ এটি পলিসাকারাইড দ্বারা গঠিত। অনেকগুলি সূক্ষ্মসূত্র (microfibril) দ্বারা প্রাচীরটি গঠিত। অবশ্য কিছু শৈবালে যেমন সাইফোনেসিয়াস সবুজ শৈবাল (siphonaceous green algae) এটি জাইলোস বা মানোস দ্বারা গঠিত।

দুটি গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যেমন হাপটোফাইসি (haptophyceae) ও পারসিনো-ফাইসি (Parsinophyceae) কতকগুলি ম্যানোস দ্বারা গঠিত আঁশ (scales) প্রোথিত থাকে। আবার কক্কোলিথোফোরিল (Coccolithophorils) দের ক্ষেত্রে এজাতীয় আঁশে কেলসিয়াম কার্বনেট (calcium carbonate) থাকে।

শৈবালকোষে বহুল পরিমাণে প্লাসটিড (plastid) রয়েছে। প্লাসটিডগুলি দুই রকমের—(১) রঙ্গকযুক্ত যেমন ক্লোরোপ্লাস্ট ও ক্রোমোপ্লাস্ট এবং (২) রঙ্গক-হীন যেমন অ্যামাইলোপ্লাস্ট (amyloplast)। অ্যামাইলোপ্লাস্ট শুধু ক্লোরো-ফাইটাতেই পাওয়া যায়। গঠনপ্রকৃতি অনুযায়ী প্লাসটিডগুলি একজোড়া আস্তরণে আবৃত থাকে। অন্তর্ভাগটি একটি দানাময় বস্তু (matrix) যার মধ্যে বিভিন্ন সংখ্যক লম্বাটে, চেপ্টা বা গোলাকৃতি থলি (vesicles) প্রোথিত থাকে। এইগুলিকেই বলা হয় থাইলাকয়েড (thylakoid)। উপরোক্ত মূল অংশগুলি ছাড়া প্লাস্টিডে সময় সময় পাইরেনয়েড, শ্বেতসার, অসমোফিলিক দানা (osmophilic granule) বা রঙ্গকযুক্ত দানা যেমন আইস্পট (eye spot) বা স্টিগমা (stigma) থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্লাষ্টিডগুলি অন্তর্কোষীয় নালিকার (endoplasmic reticulum) সাথে যুক্ত। ডাইনোফ্লাজেলেট, ইউগ্লিনয়েড ও জ্যানথোফাইটা প্রভৃতি গোষ্ঠীতে প্লাষ্টিডের আবরণ স্তরহীন। থাইলাকয়েডগুলি ঝিল্লি হিসাবে (lamellae) আস্তরণগুলির দৈর্ঘ্য বরাবর মাঝে মাঝে বিন্যস্ত থাকে। বিভিন্ন শৈবালে থাইলাকয়েডের বিন্যাস প্রকৃতিরও তফাৎ রয়েছে। যেমন লালঅ্যালগিতে একটি করে, **ক্রিপটো-ফাইটাতে (Cryptophyta)** দুটি করে, **ইউগ্লিনোফাইটা** ও **ক্লোরোফাইটাতে** ২-৬টি করে এবং ডাইনোফ্লাজেলেট ডায়াটম, **ক্রিসোফাইটা** ও **ফিয়োফাইটাতে** ৩টি করে। শৈবালের দেহে অনেকক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ধরনের কোষঅঙ্গ থাকে।

বিশেষ কোষ-অঙ্গগুলির মধ্যে ডাইনোফ্লাজেলেটদের ট্রাইকোসিস্টগুলি জটিল এবং এর মধ্যে বর্গাকৃতি অংশে প্রোটিন জাতীয় সূত্র থাকে। প্রয়োজনমত এই সূত্রগুলিই উৎক্ষিপ্ত হয়। ট্রাইকোসিস্টগুলি অনিয়তাকার (amorphus) কোষ অঙ্গ।

## ২.৫৩ শৈবালের শারীরবৃত্তিয় বা জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ :

শৈবাল সবাত সালোকসংশ্লেষক জীবাণু। ক্লোরোফিলগুলি, কারটিনয়েড (কারটিন+জ্যান্থোফিল) এবং ফাইকোবিলিন জাতীয় রঙ্গক দ্বারা বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোকরশ্মি শোষণ জনিত শক্তি দ্বারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) ও জলের বিক্রিয়া সংঘটিত ক'রে শর্করা তৈরি করে। সাধারণভাবে শ্বেতসার তৈরী করা ছাড়া তৈল ও চর্বিজাতীয় পদার্থও তৈরি করে। বহু সামুদ্রিক শৈবাল, নীলসবুজ শৈবাল, প্রভৃতি বাতাস থেকে নাইট্রোজেনকে জৈব-অবস্থাতে আটক বা আবদ্ধ করে।

## ২.৫৪ শৈবালের সংখ্যাবৃদ্ধি :

সমগ্র শৈবালজগতের মধ্যে সংখ্যাবৃদ্ধি প্রক্রিয়াগুলি যথাযথ ভাবে এখনও বোঝা যায় যে শৈবালদের মধ্যে তিন প্রকার সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়াই কমবেশী কার্য্যকরী।

### (ক) অঙ্গজ জনন (vegetative reproduction) :

প্রায় সমস্ত শৈবালেরই অঙ্গজ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে, কোষবিভাজন বা বিচ্ছিন্নকরণের (fragmentation) মাধ্যমে। কোষবিভাজনের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় ডায়াটমদের মধ্যে, ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াস দ্বিবিভাজিত হয় এবং পরে কোষ বিভাজিত হয়।

### (খ) অযৌন জনন পদ্ধতি (asexual reproduction) :

শৈবালের ক্ষেত্রে অযৌন পদ্ধতিতে সংখ্যাবৃদ্ধি হয় অচল এবং সচল—উভয় প্রকার স্পোর সৃষ্টির মাধ্যমে। অবশ্য সচল, অযৌন স্পোর বা জুওস্পোর (zoospore) উৎপাদনের মাধ্যমে বহুক্ষেত্রে শৈবালের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। শৈবালসূত্রের (filament) কোষ-প্রাচীরগুলির কাছে কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয় এবং স্বতন্ত্র কোষটির আস্তরণ পুরু হয়ে যে অচল, অযৌন স্পোর তৈরি হয় কিছু

কিছু ক্ষেত্রে তাদের বলা হয় অ্যাকিনেট (akinets)। সচল জুওস্পোরগুলি শুঙ্গযুক্ত হওয়ার জন্যই সচল হয়।

(গ) **যৌন জনন (sexual reproduction) :**

অনেক ক্ষেত্রে সচল গ্যামেটের মিলনের ফলে জাইগোট উৎপন্ন হয় যেটি পরে একটি পুরু আস্তরণযুক্ত জিরাণ-কোষে (resting cell) রূপান্তরিত হয়। সচল গ্যামেটগুলি সমাকৃতি বা অসমাকৃতি যুক্ত হতে পারে। এছাড়া অন্য ভাবেও কিছু শৈবালের যৌন সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে।

## ২·৫৫ শৈবাল ও লাইকেন (Algae and Lichens) :

কিছু শৈবাল ছত্রাকের সাথে মিথোজীবি হিসাবে জীবন যাপনে সক্ষম। বিশেষ গোষ্ঠীর ছত্রাক ও শৈবালে মিথোজীবি জোটের নাম লাইকেন (lichen) এই মিথোজীবিতা উভয়ের পক্ষেই সুবিধাজনক হলেও দু'একটি ক্ষেত্রে ছত্রাক-গুলি বেশী সুবিধা ভোগ করে। এই মিথোজীবি ছত্রাক ও শৈবালগুলিকে স্বতন্ত্র ভাবে গবেষণাগারে আবাদ করা গেলেও প্রকৃতিতে মিথোজীবি জীবন থেকে এরা বিচ্ছিন্ন হয় না। লাইকেন হিসাবে জীবনযাপনকারি শৈবাল-গুলির মধ্যে নীল-সবুজ শৈবাল **নসটক্ (Nostoc)**, সবুজ শৈবাল **ট্রেবক্সিয়া (Trebouxia)** অন্যতম। প্রতিকূল পরিবেশে ছত্রাক প্রস্তর ও সমগোত্রীয় বস্তু থেকে শোষণ করা খাদ্য সরবরাহ করে। শৈবাল বাতাসের নাইট্রোজেন আবদ্ধ ক'রে সরবরাহ করে এবং শর্করা সংশ্লেষণ করে। ছত্রাক শৈবাল দেহ থেকে এই সমস্ত সংশ্লেষিত খাদ্যবস্তু শোষণসূত্র (haustoria) দ্বারা শোষণ করে। ধোঁয়া অধ্যুসিত শহর বা শহরতলী ছাড়া লাইকেন প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এমনকি উত্তর মেরুর আবহাওয়াতেও লাইকেন জন্মায়। এগুলি ঐ অঞ্চলে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ **ক্লাডোনিয়া (Cladonia)** শৈবালের লাইকেন রাইনডিয়ারের (Reindeer) খাদ্য হিসাবে রাইনডিয়ার মস (Reindeer moss) বলে পরিচিত। মৃত্তিকার উপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রায় ১৫ সে.মি পরিমাপের বৃন্তল, কাপের আকৃতিযুক্ত এই লাইকেনগুলি বহুদেশে মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত। কিছু লাইকেন শিলার ক্ষয় সৃষ্টিতেও সক্ষম, ফলে মৃত্তিকা সৃষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। সর্বপরি কোরাল রিফ (Coral reef) বা প্রবাল প্রাচীর গঠনের ক্ষেত্রে ও শৈবালের মিথোজীবিতা একটি লক্ষ্যনীয় বস্তু।

## ২.৩৬ শৈবালের অন্যান্য বিশেষত্ব ও বৈচিত্র্য :

(অ) গভীর সমুদ্রে যে লাল রঙের শৈবাল দেখা যায় তার অনেক প্রজাতিই খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত। এর মধ্যে 'আইরিশ মস' (Irish moss) বা ডালস (Dulse) অতি পরিচিত। এই শৈবাল শুধুমাত্র গভীর জলেই বসবাস ও সংখ্যাবৃদ্ধি ক'রে, কারণ এদের শরীরের রঞ্জক (pigment) ফাইকোএরিথ্রিন (phycoerythrin) শুধু দীর্ঘতরঙ্গযুক্ত নীল-বেগুনী রশ্মি শোষণে সক্ষম। জেলিডিয়াম (Gelidium) প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল "আগার" (agar) তৈরীর কাজে বহুল ব্যবহৃত। "আগার" এর জটিল রাসায়নিক পদার্থটি বহু মূল্যবান ও বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হয়। ডায়াটম জাতীয় শৈবালে প্রাপ্ত আরও দুটি পলিসাকারাইড যথা কারাজিনিন (carrageenin) ( লাল শৈবাল ) ও অ্যালজিনিক অম্ল (alginic acid) ( বাদামী শৈবাল ) খাদ্য ও ঔষধ শিল্পে অতি প্রয়োজনীয়। ইমালসিফায়ার (emulsifier) বা ঘনত্ব বৃদ্ধিকারক (thickening agent) হিসাবে এদের ব্যবহার হয়। কাগজ, রঙ বা অপরিবাহী (insulator) শিল্পে যে বিপুল পরিমাণ কাইসেলগার (kieselguhr) ব্যবহৃত হয় তাও এই ডায়াটম জাতীয় শৈবালঅবশেষ (diatomaceous earth) হইতে প্রস্তুত হয়। আসলে এ সমস্তের উৎপাদক ডায়াটমগুলি ক্রাইসোফাইসি (chrysophyceae) পরিবার-ভুক্ত এক শ্রেণীর সোনালী-বাদামী রঙের শৈবাল। উপরিউক্ত ডায়াটম-অবশেষগুলি মৃত ডায়াটমের (frustules) দ্বারা গঠিত সিলিকাযুক্ত একটি হালকা 'ঘষি' বা উকো (abrasive) হিসাবেও ধাতু মসৃণ করণের কাজে লাগে। এর দ্বারা এক জাতীয় ছাকনী (filter) তৈরী ছাড়াও এটি অপরিবাহী হিসাবেও ব্যবহৃত হয় কারণ এর উচ্চ তাপ ( ৬০০° সেলসিয়াস ) প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে। ডায়াটমরা যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন- এ ও ডি সৃষ্টি করে যা ডায়াটমভোজী কড জাতীয় মাছে সঞ্চিত হয়।

### (আ) খাদ্য-চক্র ও লাইকেন :

পৃথিবীর সামগ্রিক খাদ্য চক্রে শৈবালই সবচেয়ে বেশী খাদ্যবস্তু সরবরাহ করে। পৃথিবীর বিশাল জলভাগে বিপুল সংখ্যক শৈবাল প্রতিনিয়ত এই কাজে ব্যস্ত। জলজ ক্ষুদ্র প্রাণী মূলতঃ শৈবালকেই তাদের খাদ্য হিসাবে

গ্রহণ করে। জল ভাগের প্রান্তস্থ বসবাসকারী জীব, মাছ ও অন্যান্য বহু জলজ প্রাণীও খাদ্যের জন্য শৈবালের উপর নির্ভরশীল। অন্ত র্ভূভাগে মিষ্ট জলাশয়গুলিতেও শৈবাল বিপুল পরিমাণ খাদ্য সৃষ্টি করেছে প্রতিনিয়ত। জীবজগতের অতি প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের এক বিরাট অংশ এই শৈবালই সরবরাহ করে থাকে। শৈবালের এই ক্ষমতা বা বিশেষত্ব জীবজগতের এক অমূল্য সম্পদ।

(ই) শৈবালের ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ

অন্য সমস্ত জীবের মত কিছু শৈবালের ক্রিয়াকলাপ মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক। কিছু শৈবাল তাদের পরিবেশে যে বিষ (toxin) তৈরি করে তাতে বহু প্রাণী বিষ-গ্রস্থ হতে পারে। তবে প্রকৃত পক্ষে মাছের ওপর এ ধরনের বিষক্রিয়ার কথা জানা গেছে। ইজরায়েলে কৃষিক্ষেত্রের অতিরিক্ত সার ধোয়ানি জলাশয়ে শৈবালের অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটিয়ে এজাতীয় বিষক্রিয়ার সমস্যা সৃষ্টি করেছে।

(ঈ) শৈবাল ও জীবের বিবর্তন ঃ

শৈবালকে জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া উপলব্ধির কাজে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষতঃ শৈবাল উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের নীরব সেতু হিসাবে উপস্থিত বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। এজাতীয় শৈবালের একটি অন্যতম দৃষ্টান্ত ইউগ্লিনোফাইটা (Euglenophyta)। ইদানীং **গাইরোডিনিয়াম (Gyrodinium)** নামক ডাইনোফ্লাজেলেটটিতে অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্তদের মত কেন্দ্র বিভাজন প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হ'বার ফলে বিবর্তন বাদীদের এই বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয়েছে।

## ২·৬০ আঠাল ছত্রাক—আকৃতি ও জৈব প্রকৃতি (Slime moulds or Myxomycetes) ঃ

আঠাল ছত্রাকগুলি এক প্রকার অকোষী (acellular), অযৌন অঙ্গযুক্ত ও সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত জীবাণু। এদের সাথে প্রোটোজোয়ার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আঠাল ছত্রাকের খাদ্য প্রয়োজনের দিক থেকে জৈব খাদ্য নির্ভর (organotrophic) জীবাণু। আঠাল, কোষবস্তু সর্বস্ব, কোষ বিহীন এই জীবাণুগুলি গোষ্ঠী-

গত ভাবে জীবজগতের এক বিস্ময়, যদিও আকারসিয়েলস (Acarsiales) বর্গের কোষযুক্ত আঠাল ছত্রাকগুলি অবশ্য এর ব্যতিক্রম। সংখ্যাবৃদ্ধির প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে ছত্রাকের আবরিত স্পোর তৈরীর প্রক্রিয়ার অনুরূপ। ছত্রাক বিজ্ঞানী ডি-বারি (de-Bary) ১৮৮৭ সালে এই জাতীয় জীবাণুকে প্রাণী ধারণা করে মাইসেটোজোয়া (Mycetozoa) নামকরণ করেন। পরবর্তীকালে মাকব্রাইড, ১৮৯৯ (Macbride) এদের মিক্সোমাইসিট্স (Myxomycetes) নামে অভিহিত করেন। পরবর্তীকালে আঠাল ছত্রাক সম্পর্কে প্রভূত গবেষণা করেন বিজ্ঞানী মারটিন (Martin) এবং এদের যথাযথ ভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ করেন।

### (অ) আঠাল ছত্রাকের বাসস্থান :

আঠাল ছত্রাক সাধারণতঃ বনাঞ্চলে ঠাণ্ডা ও ছায়াচ্ছন্ন পরিবেশে, পচনশীল কাঠে, পাতায় ও অন্য বহু জৈব পদার্থের উপর অত্যধিক আদ্র´ পরিস্থিতিতে জন্মায়। মৃত্তিকামধ্যস্থ আঠাল ছত্রাক ব্যাক্টিরিয়া, শৈবাল ও অন্য জীবাণুকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। প্রকৃতিতে এরাও আবার অন্য বহু জীবের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অর্থনৈতিক দিক থেকে খুব একটা আকর্ষক না হ'লেও জীবাণু হিসাবে এরা অত্যন্ত কৌতূহলদ্দীপক ও বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০০ চিহ্নিত প্রজাতির কথা জানা গেছে।

## ২.৬১ আঠাল ছত্রাকের জীবন বৈশিষ্ট্য :

আঠাল ছত্রাকের শরীর কোষপ্রাচীরহীন প্রোটোপ্লাসম দ্বারা গঠিত। কোষগুলি বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত ও সচল। এদের শরীরের এই জায়মান বা ভেজিটেটিভ অংশকে বলা হয় প্লাসমোডিয়াম (plasmodium)। বহু আঠাল ছত্রাকের প্লাসমোডিয়াম ও তাদের উৎপাদিত ছত্রাকফল (fructifications) গুলি নানা রঙের হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এগুলি জটিল প্যাটার্নে বোনা বলে মনে হয়।

আঠাল ছত্রাকগুলির জীবনের বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনটি অবস্থার কথা জানা গেছে। সেগুলি নিম্নরূপ।

(১) প্লাসমোডিয়াম (plasmodium) : একটি কোষপ্রাচীর বিহীন কোষ-বস্তু পিণ্ড যেটি সচল, বহু কেন্দ্রযুক্ত ও অযৌন অঙ্গ।

(২) নকল প্লাসমোডিয়াম (pseudoplasmodium) : উপরি উক্ত সচল কোষগুলি পুঞ্জীভূত হয়ে একটি অসম্পূর্ণ সংগঠন (organization) তৈরি করে যার নাম নকল প্লাসমোডিয়াম।

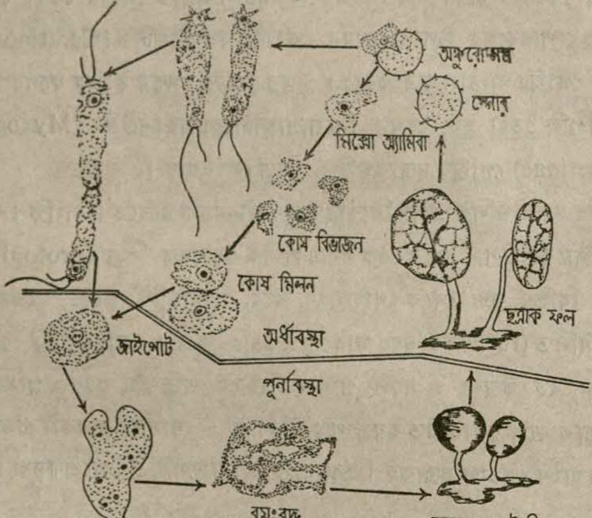
(৩) ছত্রাক ফল (fructification) : নকল প্লাসমোডিয়ামগুলি পরে ছত্রাক ফলে রূপান্তরিত হয় যার মধ্যে আঠাল ছত্রাকের স্পোরগুলি থাকে। এই ছত্রাক ফলগুলি ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়ে বিভিন্ন আকৃতিগত বৈচিত্র্যসহ একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষাকার ধারণ করে। একদল আঠাল ছত্রাক তাদের তৈরী স্পোর ধারণ করে স্পোরবৃন্তের উপরে, যেমন কেরাটিনোমাইসেটিডি (Ceratinomycetidae) গোষ্ঠীর আঠাল ছত্রাকদের। অন্য অনেক ক্ষেত্রে ছত্রাক ফলের মধ্যে এই স্পোরগুলি তৈরী হয়, যেমন মিক্সোগ্যাসটারোমাইসেটিডি (Myxogasteromycetidae) গোষ্ঠীর ছত্রাকগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায়।

আঠাল ছত্রাকগুলির একটি বিশেষত্বে পূর্ণ জীবনচক্র রয়েছে। সংক্ষিপ্তভাবে আঠাল ছত্রাকের স্পোর থেকে এক বা একাধিক কোষবস্তু পিণ্ড (protoplast) মুক্ত হয়, বিভিন্ন বস্তু থেকে খাদ্যগ্রহণ করে, সংখ্যাবৃদ্ধি করে, জোড়ায় জোড়ায় মিলিত (fuse) হয় এবং জাইগোট তৈরি করে। জাইগোটটি কোষ প্রাচীরহীন, বহু কেন্দ্রযুক্ত ও সচল প্লাসমোডিয়ামে পরিণত হয়। প্লাসমোডিয়াম ছত্রাক ফলে রূপান্তরিত হয় স্পোর ধারণার্থে। সামান্য কয়েকটি প্রজাতি ছাড়া অধিকাংশ আঠাল ছত্রাকই মিক্সোগাস্টারোমাইসেটিডি উপশ্রেণীভুক্ত।

## ২.৬২ আঠালো ছত্রাকের জীবনচক্র :

সমগ্র গোষ্ঠীর মধ্যে যেগুলি স্পোর ধারকের ভিতরে স্পোর উৎপাদন করে সেরকম একটি প্রজাতির জীবনচক্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। সহায়ক আবহাওয়াতে আঠাল ছত্রাকের স্পোর অঙ্কুরোদ্গম হ'য়ে এক থেকে চারটি পর্যন্ত সচল কোষ (swarm cell) সৃষ্টি করে। সকল কোষগুলি এক্ষেত্রে যৌনকোষ (gamete) হিসাবে জোড়ায় আবদ্ধ হয় এবং যৌন সংযোগ ঘটায় (copulate)। সময় সময় তারা শুঙ্গ পরিত্যাগ করে কয়েকবার বিভাজিত হয় এবং পরে যৌন সংযোগ ঘটে। ক্যারিওগ্যামি বা কেন্দ্র মিলনের ফলে যে

জাইগোট তৈরী হয় তা প্রথমে শুঙ্গযুক্ত এবং পরে শুঙ্গহীন অ্যামিবার আকৃতি নেয় বা প্রথম থেকেই অ্যামিবার আকৃতি নেয়। জাইগোটের বৃদ্ধির সাথে মিটোসিস বা সমবিভাজনের ফলে একটি বহু নিউক্লিয়াসযুক্ত (সম্পূর্ণকেন্দ্র) প্লাসমোডিয়াম সৃষ্টি হয়। অনেকগুলি জাইগোট মিলিত হ'য়ে বা মিলনকালে ও প্লাসমোডিয়াম সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে প্লাসমোডিয়ামের ঘনত্ব বৃদ্ধি হ'য়ে প্রজাতি অনুযায়ী বিশেষ রঙ ও আকৃতির একটি ছত্রাক-ফল (fructification) গঠিত হয়। সৃষ্ট অর্ধাবস্থাযুক্ত নিউক্লিয়াস কিছুটা কোষবস্তুসহ পুরু আস্তরণে আবরিত হ'য়ে স্পোরে পর্যবসিত হয়। (চিত্র-৪১)




চিত্র ৪১ : আঠাল ছত্রাক—জীবনচক্র

আঠাল ছত্রাকের অন্য সাধারণ বিশেষত্বের মধ্যে এর গোলাকার চেহারা, পুরু কোষপ্রাচীর ইত্যাদি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আঠাল ছত্রাকের কোষ-প্রাচীরের বহিস্তর হয় মসৃণ, কণ্টকাকীর্ণ (spiny), জালিকাবৎ (reticulate) বা কুঞ্চিত (warty)। বহু সংখ্যক স্পোর নানা বর্ণের যথা পীত, গোলাপী, বেগুনী, বাদামী, ছাই, নীল ইত্যাদি হয়। এই স্পোরগুলি সাধারণতঃ প্রতিকূল বিশেষতঃ দীর্ঘ আর্দ্রতাবিহীন অবস্থা সহনশীল।

# তিন

## জীবাণুর শারীরবৃত্ত ও বংশাণুতত্ত্ব
## (Microbial physiology and genetics)

"ভিতর ও বাহিরের শক্তিসংগ্রামে জীবন বিবিধরূপে পরিস্ফুট হইতেছে।"
—জগদীশচন্দ্র বসু

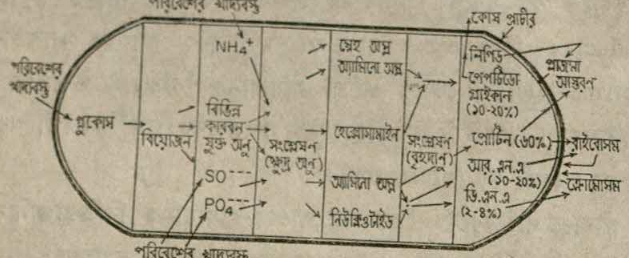
### ৩·০০ জীবাণুর শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপ ঃ

জীবাণুর কোষপ্রাচীর বা বহিস্থঃ স্তরগুলি সাধারণতঃ পরিবেশের বেশীরভাগ রাসায়নিক অণুর পক্ষে ভেদ্য। পরিবেশ থেকে খাদ্যঅণুর কোষের ভিতরে প্রবেশের পথে একটি কার্যকরী নিয়ন্ত্রক হচ্ছে প্লাসমা আস্তরণ। দ্রাব্য অণু এই আস্তরণ অতিক্রম করে একটি বিশেষ বাহকের (carrier) সাহায্যে বা 'বহন পদ্ধতি'র (transport system) মাধ্যমে কোষের ভিতরে প্রবেশের পর খাদ্য-অণুগুলি পরিবর্তিত হয়। খাদ্যঅণু যে ধারাবাহিক রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয় সেই পরিবর্তন প্রক্রিয়াকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় শারীর বৃত্তন (metabolisation)। এই ধারাবাহিক বিক্রিয়া পথটিকে ঐ বিশেষ অণুর শারীরবৃত্তিয় বিক্রিয়াপথ (metabolic pathway) বলা হয়। বিক্রিয়ান্তে সৃষ্ট সর্বশেষ রাসায়নিক দ্রব্যটিকে বলে উৎপাদিত অণু (end-product)। বিক্রিয়াপথের মাঝে সৃষ্ট অণুগুলিকে বলা হয় মধ্যবর্তী অণু (intermediates)। কোষে প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়াই উৎসেচক দ্বারা সংঘটিত হয়। একটি বিশেষ রাসায়নিক সংশ্লেষণের পথে অগ্রবর্তী অণুটিকে বলা হয় পূর্ববর্তী অণু (precursor)।

জীবাণুর শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপে জৈব-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি মূলতঃ দুটি ভিন্নমুখী পদ্ধতিতে হয়। যে বিক্রিয়াগুলি খাদ্য-অণুকে ক্রমান্বয়ে রাসায়নিক গঠনের দিক থেকে জটিল থেকে সরল ও স্বল্প আণবিক ভরযুক্ত অণুতে পরিবর্তিত করে তাদের সমষ্টিগতভাবে বলা হয় অপচিতিমূলক বিক্রিয়াপথ (catabolic pathways)। অন্যদিকে যে সমস্ত বিক্রিয়া সরল অণু থেকে ক্রমান্বয়ে জটিলতর অণুর সৃষ্টি করে তাদের সমষ্টিগতভাবে বলা হয় উপচিতি-

মূলক বিক্রিয়া (anabolic reactions)। জীবাণুকোষে কতকগুলি রাসায়নিক অপচিতি ও উপচিতি উভয় প্রকার জৈবনিক বিক্রিয়াপথেই অংশগ্রহণ করে। এই অণুগুলিকে বলা হয় ডায়াবলিক (diabolic or amphibolic)। অ্যাসিটোল্যাক্টেট (acetolactate) এজাতীয় একটি অণু যা গ্লুকোস (glucose) বিশ্লেষণ করে অ্যাসিটোমিথাইল কার্বিনল (acetomethyl carbinol) তৈরীতে বা ভ্যালিন (valine) অণুর জৈব সংশ্লেষণেও অংশ গ্রহণ করে।

বিশ্লেষক বা অপচিতিমূলক বিক্রিয়া থেকে উদ্ভূত অণুগুলি জীবাণুর শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপে দুইভাবে কাজ করে। (ক) রেচিত বস্তু হিসাবে কোষ থেকে নিঃসৃত হয় ও (খ) পূর্ববর্তী অণু হিসাবে সংশ্লেষক বিক্রিয়াতে কাজে লাগে। ফলতঃ অপচিতিমূলক বিক্রিয়ার জন্য কোষে জৈব শক্তির সৃষ্টি হয় ও এ. টি. পি বা অ্যাডেনোসিন ট্রাইফস্ফেট (adenosine triphosphate, ATP) বা সমগোত্রীয় রাসায়নিক হিসাবে সাময়িক মজুত হয়। সংশ্লেষণের ক্রম যা কোষে সচরাচর অনুসৃত হয় তাতে প্রথমে ক্ষুদ্র অণু যথা অ্যামিনো অম্ল, জৈবক্ষার (organic base), ইত্যাদি, পরে বৃহৎ অণু যথা নিউক্লিক অম্ল, প্রোটিন, পেপটিডোগ্লাইকান ইত্যাদি ও শেষে কোষ অঙ্গগুলি যথা রাইবোসম, মেসোসম, কোষ প্রাচীর, প্লাস্টিড, জিনোকোর বা




চিত্র ৪২ : জীবাণুকোষে জৈবনিক ক্রিয়ার চিত্ররূপ

নিউক্লিয়াস ইত্যাদি সৃষ্টি হয়। শারীরবৃত্তে (metabolism) বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক বিক্রিয়াগুলি ভিন্নমুখী হলেও এদের মধ্যে সম্পর্ক ও সংযোগ

সর্বস্তরেই লক্ষিত হয়। সমগ্র শারীরবৃত্তির ক্রিয়াকলাপগুলি চিত্রে (flow chart) সহজেই প্রমাণ করা যায় ( চিত্র-৪২)।

## ৩·১০ জীবাণুকোষে অণুর প্রবেশ ও নির্গমন :

প্লাসমা আস্তরণই জীবাণুকোষে অণুর প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারণার কারণ কোষে তৈল জাতীয় বস্তুর দ্রাব্য অদ্রাব্য বস্তুর চেয়ে দ্রুত অণুপ্রবেশ করে ; অথবা তৈল জাতীয় বস্তুর দ্রাবক (solvent) যথা টলুইন (toluene) বা জলীয় বুটানল প্রয়োগে কোষ মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র অণুর নিঃসরণ ঘটে। কোষে অণুর প্রবেশের ক্ষেত্রে প্লাসমা আস্তরণের ভূমিকাই প্রধান হলেও কোষ প্রাচীর বা ক্ষেত্রবিশেষে আঠাল স্তর কিছু গৌণ ভূমিকা পালন করে। কোষে অণুর প্রবেশের ক্রিয়াটি অণুর পরিমাপের সাথে কোনক্রমেই যুক্ত নয়। তাই গ্রাম ধনাত্মক ব্যাক্টিরিয়ার কোষে ১০ হাজার ডালটন আণবিকভরের ডেক্সট্রান (dextran) অণু প্রবেশে অসমর্থ হলেও কয়েক মিলিয়ন আণবিক ভরযুক্ত ডি. এন. এ. বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক অম্ল (DNA, Deoxyribonucleic acid) অণু অনায়াসেই প্রবেশ করে 'ট্রানসফরমেশনে'র (transformation) সময়।

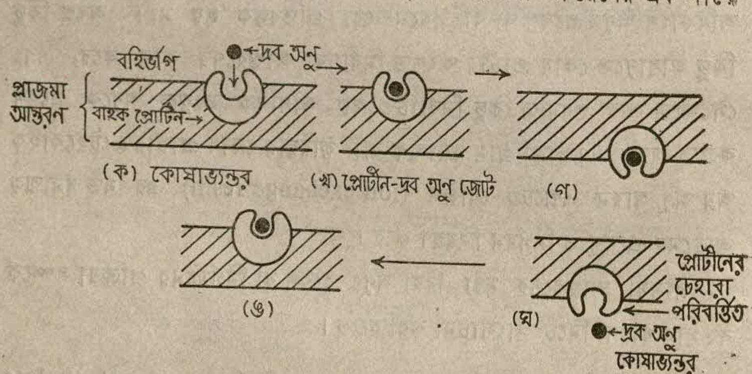
ব্যাক্টিরিয়ার কোষ বহির্ভাগে আঠাল আস্তরণ খুব আলগা ভাবে গঠিত। অধিকাংশ অণুর প্রবেশ বা বহির্গমনে এরা প্রতিবন্ধক হয় না। অবশ্য কিছু কিছু জীবাণুতে কোষ প্রাচীর অংশত নির্বাচক আস্তরণের কাজ করে, এবং সেক্ষেত্রে তারা শুধুমাত্র কিছু নির্বাচিত স্বল্প আণবিক ভরযুক্ত অণুকে প্রবেশ করতে দেয়। এ ছাড়া গ্রাম ধনাত্মক ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীরস্থ টেইকোইক অম্ল অণু আয়ন এক্সচেঞ্জ রেজিন (ion exchange resin) এর মত ধনাত্মক আয়নের প্রবেশ ও নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করে।

প্লাসমা আস্তরণের মধ্য দিয়া অণুর প্রবেশ বা নির্গমনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বর্তমান ধারণা নিচে আলোচনা করা হচ্ছে।

## ৩·১১ দ্রব অণুর কোষে অনুপ্রবেশ ও নির্গমন প্রক্রিয়া (Solute transport process) :

জীবাণু কোষে অণুর প্রবেশ ও নির্গমন একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। গত এক দশক ধরে বহু নিখুঁত ও বুদ্ধিদীপ্ত পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে এবং বিশেষ

ভাবে ফসফাটিডিক অম্ল ও জল দ্বারা গঠিত লাইপোসোম (liposome) নামক দ্বিস্তর আবরিত কৃত্রিম গোলাকার 'জলীয়লিপিড' বিন্দুর সহায়তায় এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশেষ ভাবে জানা গেছে। প্রথমতঃ প্রবেশার্থী অণুর উপর একটি চালক-বল বা ড্রাইভিং ফোর্স (driving force) কাজ করে এবং দ্বিতীয়তঃ একটি 'বাহক' বা ক্যারিয়ার (carrier) বা কার্য-সাধন ব্যবস্থা অণুটিকে প্লাসমা আস্তরণের এক পার হ'তে অন্য পারে নিয়ে যায়। এই অনুপ্রবেশ ক্রিয়াতে 'নিষ্ক্রিয় পরিব্যপনে'র (passive diffusion) ভূমিকা প্রায় অনুপস্থিত। কারণ অণুর ক্ষেত্রে (non-electrolyte) ঘনত্বের প্রভেদ বা আয়নের ক্ষেত্রে তড়িৎ বিভবের (potential) প্রভেদ চালক বল হিসাবে কাজ করলেও নিষ্ক্রিয় পরিব্যপন পদ্ধতিতে কোন বাহকের ব্যবস্থা নাই। নিষ্ক্রিয় পরিব্যপনের সাফল্য উষ্ণতার উপর নির্ভর করে যেটা অণুর প্রবেশের ক্ষেত্রে দেখা যায় না। স্বভাবতই জল ব্যতীত অন্য সমস্ত অণুর ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতির কার্যকারিতা সন্দেহজনক। বিজ্ঞানী রিকেনবার্গ ১৯৫১ (Rickenberg) এর "কার্যসাধন ব্যবস্থা" তত্ত্ব ঘোষিত হবার পর থেকেই এই তত্ত্বের যৌক্তিকতা স্বীকৃত হ'য়েছে। এই পদ্ধতিতে প্লাসমা আস্তরণের কতকগুলি বৃহৎ অণু প্রবেশার্থী দ্রব অণুকে পারাপারের নৌকায় (ferry boat) বহন ক'রে প্রবেশ করায়। এই বৃহৎ "বাহক অণু" "দ্রব অণুকে" প্লাসমা আস্তরণের এক পারে




চিত্র ৪৩ : কোষে অণুর অনুপ্রবেশ ও নির্গমন প্রক্রিয়া

ধারণ করে এবং বহন করে নিয়ে গিয়ে অন্য পারে পরিত্যাগ করে। বিজ্ঞানী বয়ার (Boyer) এ সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব করেন তার নাম প্রবেশার্থী অণুর

বাহক অনুরূপতা সিদ্ধান্ত (carrier conformational theory)। এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রব অণু নিম্ন রূপে ( **চিত্র-৪৩** ) কোষে প্রবেশ করে। এ ব্যাপারে অন্য দু'একটি সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবিত হয়েছে। যার মধ্যে ডিহাইড্রজিনেস কাপলড্ অ্যাকটিভ ট্রানসপোরট (dehydrogenase coupled active transport) অন্যতম। দ্রব অণুর সাথে বাহক বৃহৎ অণুর সম্পর্ক সম্বন্ধে যা জানাগেছে সেগুলির মধ্যে একটি উর্দ্ধমুখী (uphill) প্রক্রিয়া বা কার্যকারিবহন প্রক্রিয়া (active transport), একটি নিম্নমুখী (downhill) প্রক্রিয়া বা সহায়তা সম্বলিত পরিসিঞ্চন প্রক্রিয়া (facilitated diffusion) এবং আর একটি গোষ্ঠী স্থানান্তর (group translocation) প্রক্রিয়া। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াটিতে চালক বল হিসাবে জৈবনিক (metabolic) শক্তি কাজ করে। এক্ষেত্রে দ্রব অণুর সাথে বাহক অণুর কোন বিক্রিয়া হয় না। জৈবনিক শক্তি বা এ. টি. পি. চালক বল হিসাবে কাজ করে ব'লে সমর্থিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি কোষের ভিতর ও বাহিরের রসের রাসায়নিক ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয় প্রকল্পটিতে বলা হয়েছে যে দ্রব ও বাহক অণুর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। অর্থাৎ বাহক অণু কিছুটা উৎসেচকের মত কাজ করে। তিনটির মধ্যে প্রথমোক্ত প্রক্রিয়াটি অনুপ্রবেশের প্রক্রিয়া হিসাবে অধিকতর সমর্থিত।

### (অ) বাহক পদ্ধতিতে প্রবেশ ও নির্গমনের গুরুত্ব ও অর্থঃ

বাহক পদ্ধতিতে কোষে অণুর প্রবেশের যে প্রকল্প তা বহুজন স্বীকৃত। এই প্রকল্পর প্রয়োজনীয় নির্বাচন ক্ষমতাও (selectivity) রয়েছে। একটি জীবাণু কোষে কতটা অঙ্গার অণু এবং শক্তি জোগানদার অণু গ্রহণযোগ্য হবে তা সব সময়ই একটি নির্ধারিত সীমার মধ্যে থাকে। অণু গ্রহণের হার নির্ণায়ক হিসাবেও এই অনুপ্রবেশের নিয়ম কাজ করতে সক্ষম। এ জন্য এই প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তটি শক্তি জোগানদার অণুর গ্রহণযোগ্য হারের সীমা নির্ধারক (rate limiting step) হিসাবেও কাজ করতে পারে।

দু-একটি বীজঘ্ন যথা ক্লোরামফেনিকল (chloramphenicol) বা প্যারাফ্লুরোফিনাইল অ্যালানিন (p-flurophenylalanine) কিছু প্রোটিন উৎসেচকের কাজে বাধা দেয়। এই অণুর প্রবেশ ও নির্গমনেও এরা বাধা দেয়। এক্ষেত্রে ধরা হয় যে বাহক অণুটি নিঃসন্দেহে প্রোটিন জাতীয়।

প্রথমে এই অণুটিকে 'পারমিয়েস' (permease) নামক উৎসেচক বলা হত। ইতিমধ্যে বিটা-গ্যালাকটোসাইডের বাহক অণুটি আলাদা করে দেখা গেছে। সেটির আণবিক ভর ৩০-৫০ হাজার ডালটন। কোষ প্রতি এই বাহক অণুর সংখ্যা ১০০০ থেকে ২০০০টি হবে।

## ৩·২০ জীবাণুকোষে শক্তি উৎপাদক জৈবনিক ক্রিয়াবিক্রিয়া :

বস্তু. শক্তিতে রূপান্তরিত হলে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ (E) হয় পরিবর্তিত বস্তুর ভর (mass) ও আলোককণার গতির বর্গের ($C^2$) গুণফল। পৃথিবীতে সমস্ত মুক্ত-শক্তির (free energy) উৎস হচ্ছে সূর্য। সূর্যে প্রতিনিয়ত এক আণবিক বিক্রিয়া দ্বারা বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে। পৃথিবীতে সমস্ত জীব এবং জীবাণুই এই শক্তির ওপর নির্ভরশীল। একমাত্র ব্যতিক্রম কেমোলিথোট্রফিক (chemolithotrophic) ব্যাক্টিরিয়াগুলি। অন্য সমস্ত জীব বা জীবাণুই 'মুক্তশক্তির' জন্য সূর্যের এই শক্তির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল।

## ৩·২১ মুক্তশক্তি (Free energy) :

কোন একটি রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে নিহিত নির্দিষ্ট মুক্তশক্তি (standard-free energy or G°) হচ্ছে ঐ রাসায়নিকের সম্পূর্ণ বিয়োজনের (decomposition) ফলে সৃষ্ট শক্তির সমান। রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি কোনটিই আপনা-আপনি চলে না। দু'টি রাসায়নিক দ্রব্যের মধ্যে একটির বিক্রিয়া হওয়া নির্ভর করে রাসায়নিকদ্বয়ের মধ্যে নিহিত মুক্ত শক্তির পরিবর্তনের মানের ($\Delta G°$) উপর। ইংরাজীতে এই পরিবর্তনকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় :

$\Delta G° = \xi G°$ products—$\xi G°$ reactants অর্থাৎ একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার $\Delta G°$ এর মান বিক্রিয়াকারী (reactants) ও উৎপাদিত (products) পদার্থগুলির G° এর বিয়োগফলের সমান।

### (আ) মুক্তশক্তি ও রাসায়নিক বিক্রিয়া :

জৈব শক্তিবিজ্ঞানে পি. এইচ. (pH) 7.0 কে ধরা হয় স্থিতাবস্থা (reference state)। পি. এইচ (pH) 7.0 এর একটি বিক্রিয়ার ফলে যে

মুক্ত শক্তির (free energy) পরিবর্তন হয় তার পরিমাপ ইংরাজীতে নিম্নরূপ—

$$\triangle G^{\circ\prime} = -RT\ln K'eq.$$

যেখানে K'eq = বিক্রিয়ার তাপগতির সাম্যাবস্থার (equilibrium constant) মাপ। এর মান নির্ণয় করা সম্ভব রাসায়নিকগুলির সাম্যাবস্থার ক্রিয়াকলাপ নির্ণয়ের মাধ্যমে। উদাহরণ স্বরূপ

$A+B \rightleftharpoons C+D$ বিক্রিয়াটিতে $K'eq = \frac{(C)\,(D)}{(A)\,(B)}$

যেখানে (A), (B), (C), (D) সাম্যাবস্থায় রাসায়নিকগুলির ক্রিয়াকলাপ। সুতরাং K'eq মান নির্ণয় করে $\triangle G^{\circ\prime}$ নির্ণয় করা যায়। বিক্রিয়াগুলির গতি $\triangle G^{\circ\prime}$ এর মানের উপর নির্ভরশীল।

(ক) বিক্রিয়াতে $\triangle G^{\circ\prime}$'র মান ঋণাত্মক হ'লে—বিক্রিয়া $A+B \rightarrow C+D$ অভিমুখে চলে রাসায়নিকগুলির ১ মোলার ঘনত্বে।

এই বিক্রিয়াগুলিকে বলা হয় উষ্ণতা বিকিরক বিক্রিয়া (exergonic reactions).

(খ) বিক্রিয়াতে $\triangle G^{\circ\prime}$'র মান ধনাত্মক হ'লে—বিক্রিয়াটি উপরোক্ত দিকে এগোয়না। এই বিক্রিয়াগুলিকে বলা হয় উষ্ণতা পোষক বিক্রিয়া (endergonic reactions)।

জীবাণুর মধ্যে ব্যাক্টিরিয়াকোষে যে ক্রিয়াবিক্রিয়াচলে পি. এইচ. 7·0এ $\triangle G'$'র মান হয় ধনাত্মক। এ সত্ত্বেও বিক্রিয়াগুলি চলার দুটি কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ বিক্রিয়ার পি. এইচ ও রাসায়নিকগুলির ঘনত্ব এমন থাকে যে $\triangle G^{\circ\prime}$ এর মান থাকে আসলে ঋণাত্মক। দ্বিতীয়ত যে বিক্রিয়াটি হ'চ্ছে ব'লে ধরা হয়েছে তার থেকে ভিন্নতর একটি বিক্রিয়া আসলে সংঘটিত হয়ে থাকে যার $\triangle G^{\circ\prime}$'র মান ঋণাত্মক। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কারণটিই বিদ্যমান।

কোষের মধ্যে একটি উষ্ণতা পোষক বিক্রিয়ার (endergonic reactions) সাথে একটি উষ্ণতা বিকিরক (exergonic) বিক্রিয়াকে সংযোজন করলে

(coupling) উষ্ণতা পোষক বিক্রিয়ার $\Delta G^{o\prime}$ এর মান যতটুকু ধনাত্মক হ'তে পারে তার চেয়ে বেশী ঋণাত্মক বিক্রিয়াটি হ'বার ফলে বিক্রিয়াগুলি চলতে পারে। সাধারণতঃ উষ্ণতা পোষক বিক্রিয়াতে বিক্রিয়াকারীর সংখ্যা উষ্ণতা বিকিরকগুলির তুলনায় বেশী। বিক্রিয়াকারীগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিউক্লিওটাইড ট্রাইফসফেটগুলি যথা এ. টি. পি; জি. টি. পি ও ইউ. টি. পি। এছাড়া অ্যাসিল ফসফেটগুলির মধ্যে অ্যাসেটিল ফসফেট (acetyl phosphate), ফসফোএনল পাইরুভেট (phosphoenol pyruvate) এবং অ্যাসিল থায়ো-ইস্টার (acylthioester) গুলির মধ্যে অ্যাসেটিল কো-এনজাইম-এ (acetyl co-enzyme-A) প্রভৃতি উচ্চশক্তি সম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। এদের উচ্চ $\Delta G^{o\prime}$ মান অন্যকিছু রাসায়নিক যেমন গ্লিসেরল-১-ফসফেট বা গ্লুকোস-১-ফসফেট এর চেয়ে অধিক। শেষোক্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলিকে তাই নিম্নশক্তি সম্পন্ন রাসায়নিক বলা হয়।

এই প্রসঙ্গে এ, টি. পি.র বিশেষ দায়িত্ব পালন করাটা লক্ষ্য করার মত। কোষ মধ্যে এই অণুটি উচ্চ আধানযুক্ত (charge)। পি. এইচ. ৭'০এ এর প্রতিটি ফসফেট গ্রুপ সম্পূর্ণ আয়নিত (ionised)। কোষে এ. টি. পি. $Mg^{++}$ এর সাথে একটি জটিল রাসায়নিক হিসাবে থাকে। জৈবনিক বিক্রিয়াতে এর ব্যবহার্য শক্তিটুকু সাধারণতঃ দুটি প্রান্তিক (terminal) উচ্চ শক্তি যুক্ত ফসফেট বন্ধনে (bond) থাকে যার চিহ্ন ~। এরকম প্রতিটি বন্ধনের শক্তি ৭'৩ কিলো ক্যালরি। ফসফোএনল পাইরুভেট (-১৪'৮) কি.ক্যা বা ১-৩-ডাইফসফোগ্লিসারেট (-১১'৮ কি. ক্যা) এর $\Delta G^{\circ}$ মান খুব বেশী। অ্যাসেটিল কো-এ (-৭'৭ কি. ক্যা) গ্লিসেরল-১-ফসফেট (-২'২ কি. ক্যা) গ্লুকোস-৬-ফসফেট (-৩'৩ কি. ক্যা) প্রভৃতির খুবই কম। এ. টি. পির $\Delta G^{0}$ মান মাঝামাঝি হবার ফলে এই অণু ফসফেট গ্রুপের বাহক হিসাবে ওপরের রাসায়নিকগুলি থেকে ফসফেট নীচের রাসায়নিকগুলিতে নিতে পারে। এ. টি. পি. তার উচ্চ ঋণাত্মক $\Delta G^{0}$ মান নিয়ে সহজেই একটি উষ্ণতা পোষক বিক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়ে বিক্রিয়াটিকে উষ্ণতা বিকিরকে পরিণত করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ Glucose (গ্লুকোস) + Pi (অজৈব ফসফরাস) $\rightarrow$ Gl-6-$PO_4$ + $H_2O$ + ৩'৩০ কি. ক্যা, উষ্ণতাপোষক

বলে বিক্রিয়াটি বামদিক থেকে ডানদিকে এগোতে অক্ষম। কিন্তু এটি নীচের বিক্রিয়াটিকে যুক্ত করা গেলে বিক্রিয়াটি উক্ত গতিতে অগ্রসরে সক্ষম হয়।

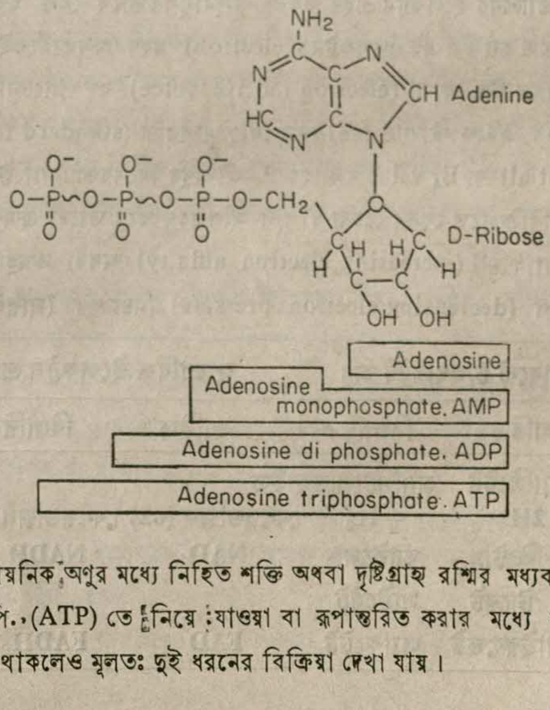
$$ATP \rightarrow ADP + Pi - \text{৭.৩ কি. ক্যা.}$$

বিক্রিয়াটি চলে কারণ $\Delta G^{0'}$ এর যুগ্ম বিক্রিয়া (coupled)

$$Glucose + ATP \rightarrow Gl.\ 6 - PO_4 + ADP$$

এর মান—৪.০০ (৩.৩—৭.৩৩) কিলোক্যালরি। উচ্চতর শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিকের সাথে বিক্রিয়া ঘটানোর সামর্থ রয়েছে বলে এ. টি. পি.কে শক্তি উৎপাদক শারীরবৃত্তিয় কারেনসি (currency) বলা হয়।

ব্যাক্টিরিয়ার কোষে AMP, ADP ও ATP র সম্মিলিত পরিমাণ মোটামুটি ১০—২০ মাইক্রোমোলস (μ moles) প্রতি গ্রাম শুষ্ক ওজনে। এরমধ্যে ATP র পরিমাণ ADP ও এ. এম্. পি.র (AMP) সম্মিলিত পরিমাণের চেয়ে অধিক। ইংরাজীতে অণুগুলির রাসায়নিক চেহারা নিম্নরূপ (সারণী-১৬)।




রাসায়নিক অণুর মধ্যে নিহিত শক্তি অথবা দৃষ্টিগ্রাহ্য রশ্মির মধ্যবর্তী শক্তি এ. টি. পি. (ATP) তে নিয়ে যাওয়া বা রূপান্তরিত করার মধ্যে বহু ক্রিয়া-বিক্রিয়া থাকলেও মূলতঃ দুই ধরনের বিক্রিয়া দেখা যায়।

(ক) সাধারণ ফসফরাইলেশন (Substrate level phosphorylation) :

এই প্রক্রিয়াতে এ. ডি. পি. (ADP) একটি উচ্চ শক্তিসম্পন্ন রাসায়নিকের সাথে বিক্রিয়া ঘটায় যার △জি° (△G°′) র মান এ. টি. পি. (ATP)র G° মানের চেয়ে অনেক বেশী। এভাবে অন্য রাসায়নিক অণু থেকে শক্তি সঞ্চারনে এ. ডি. পি (ADP) এ. টি. পি. (ATP) তে রূপান্তরিত হয়।

(খ) জারণ-ফসফরাইলেশন (Oxidative phosphorylation) :

এ. ডি. পি থেকে এ. টি. পি সংশ্লেষণের বিক্রিয়া জারণ-বিজারণ (oxidation-reduction) বিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যে কোন জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াতে দুই জোড়া স্বতন্ত্র ইলেকট্রন গ্রহণক্ষম রাসায়নিক যৌগের প্রয়োজন হয় যাদের বলা হয় রেডক্স কাপ্‌ল (redox-couple)। যে জোড়াটি বেশী ইলেকট্রন গ্রহণের ক্ষমতা রাখে সে'টি জারক-জোড় এবং অপর জোড়াটিকে বলা হয় বিজারক জোড়। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত বিক্রিয়াটিতে

$$NAD_{rd} + flavoprotein_{ox} \rightarrow NAD_{ox} + flavoprotein_{rd}$$

ফ্লাভোপ্রোটিনের ইলেকট্রন গ্রহণ ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে বেশী হওয়াতে এটিই বিজারিত হল। এই ইলেকট্রন (electron) গ্রহণ ক্ষমতাটিকেই বলা হয় ইলেকট্রন মোটিভ ফোর্স (electron motive force) বা পোটেনসিয়াল (potential)। এটিকে স্টাণ্ডার্ড রিডাকসন পোটেনসিয়াল (standard reduction potential) বা $E_d$ value বলা হয়। জীবাণুর বিশেষতঃ ব্যাক্টিরিয়ার শারীরবৃত্তিয় বিক্রিয়াতে যেসব রেডক্স কাপ্‌ল অংশগ্রহণ করে তাদের ক্রমবর্ধমান ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি (increasing electron affinity) অথবা ক্রমহ্রাসমান ইলেক্ট্রন চাপ (decreasing electron pressure) নিম্নরূপ। (সারণী-১৭)

| | সাবস্ট্রেট/মধ্যবর্তী অণু | | স্বাভাবিক ইলেকট্রন গ্রাহক | |
|---|---|---|---|---|
| | জারিত | বিজারিত | জারিত | বিজারিত |
| -603— | অ্যাসিটেট | অ্যাসিটালডিহাইড | | |
| -400— | $2H^+$ | $\frac{1}{2} H_2$ | ফেরেডক্সিন (ox) | ফেরেডক্সিন (red) |
| | ∝-কিটোগ্লুটারেট | আইসোসাইট্রেট | NAD | $NADH_2$ |
| -200— | পাইরুভেট | ল্যাকটেট | FAD | $FADH_2$ |

| | সাবস্ট্রেট/মধ্যবর্তী অণু | | স্বাভাবিক ইলেকট্রন গ্রাহক | |
|---|---|---|---|---|
| | জারিত | বিজারিত | জারিত | বিজারিত |
| -0— | ফুমারেট | সাকসিনেট | সাইটোক্রোম b (ox) | সাইটোক্রোম b (red) |
| +200— | $O_2$ | $H_2O_2$ | সাইটোক্রোম c (ox) | সাইটোক্রোম c (red) |
| +400— | $NO_3$ | $NO_2$ | সাইটোক্রোম | সাইটোক্রোম |
| +600— | | | $a/a_3$ (ox) | $a/a_3$ (red) |
| +800— | $\frac{1}{2}O_2$ | $H_2O$ | | |

যে কোন জারণ-বিজারণ বিক্রিয়াতে মুক্ত শক্তি হ্রাস পায় অংশগ্রহণকারী রাসায়নিক দুটির $Eo'$ মানের তফাতের জন্য। জারক ফসফরাইলেশনের ভিত্তি হচ্ছে এ. টি. পি. সংশ্লেষণ ও জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ার $\triangle G^{0'}$ এর মানের পরিবর্তনের সংযোগটুকু।

## ৩·৩০ জৈব রাসায়নিকের জারণ, শক্তি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ঃ

বিভিন্ন ধরনের বহু জৈব রাসায়নিক অণুকে জীবাণুরা তাদের শক্তির উৎস হিসাবে কাজে লাগায়। শক্তি সংগ্রহকালে জৈব রাসায়নিক অণুগুলি বিদীর্ণ হয় এবং তার ফলে বিভিন্ন মাপের নূতন ক্ষুদ্র অণু যেমন ২, ৩ বা ৪ কার্বনযুক্ত রাসায়নিকগুলি সৃষ্টি হয়, যা জীবাণু পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লেষণের কাজে লাগায়।

শক্তি সংগ্রহের কাজে বিভিন্ন জীবাণুর মধ্যে বিভিন্ন মৌলিক পদ্ধতি কার্যকরী। মৌলিক পদ্ধতিগুলির বিশেষত্ব নিম্নরূপ।

(ক) ফার্মেন্টেশন (fermentation): যে সমস্ত শক্তি উৎপাদক বিক্রিয়াতে ইলেকট্রন গ্রহীতা ও ইলেকট্রন দাতা উভয়ই জৈব রাসায়নিক তাদের বলা হয় ফার্মেন্টেশন বা গাঁজান।

(খ) অবাত শ্বসন (anaerobic respiration): যে সমস্ত শক্তি উৎপাদক বিক্রিয়াতে সর্বশেষ ইলেকট্রন গ্রহীতা থাকে একটি অজৈব রাসায়নিক তাদের অবাত শ্বশন বলা হয়।

(গ) সবাত শ্বসন (aerobic respiration): যে সমস্ত শক্তি সৃষ্টিকারী

বিক্রিয়াতে শেষ ইলেকট্রন গ্রহীতা হয় অক্সিজেন অণু তাদের বলা হয় সবাত শ্বসন।

বিভিন্ন রাসায়নিক বিয়োজিত ক'রে শক্তি উৎপাদনের মূল বিক্রিয়া এই তিন প্রকার হলেও বিক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

## ৩·৩১ কার্বোহাইড্রেটের বিয়োজন বা জারণ ঃ

বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেটের বিয়োজন সম্ভব। এগুলি ভিন্ন বিক্রিয়ামূলক পথ ব'লে (pathways) পরিচিত। দেখা গেছে যে সমস্ত বিক্রিয়ামূলক পথেই পাইরুভেট (pyruvate) একটি বিদ্যমান অণু। কার্বোহাইড্রেটগুলি একাধিক বিক্রিয়া পথে পাইরুভেটে পর্যবসিত হয় এবং পাইরুভেট অণু নানা বিক্রিয়াপথে বিয়োজিত হ'য়ে শক্তি উৎপাদন করতে পারে।

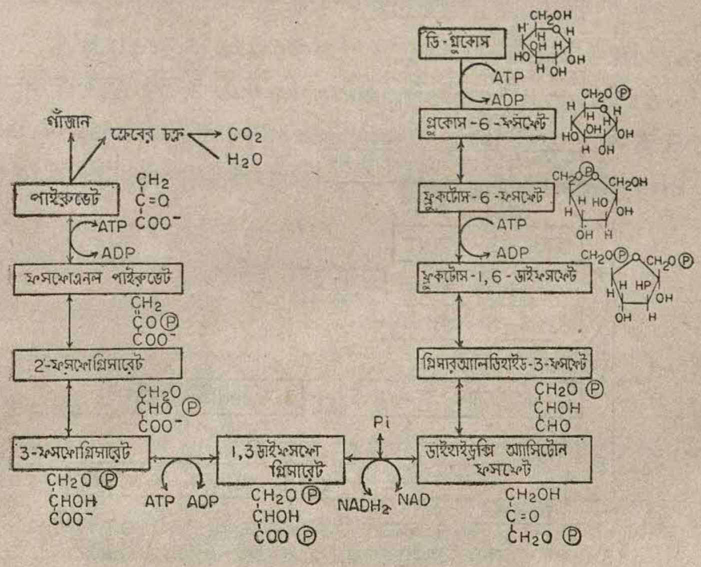
### (অ) কার্বোহাইড্রেট বিয়োজনের প্রাথমিক পথ ঃ

সাধারণতঃ অধিকাংশ জীবাণুতেই প্রথম দু'টি বিক্রিয়াপথ কার্যকরী হ'লেও চারটি বিক্রিয়াপথ পাওয়া যায়।

### (ক) এমব্‌ডেন মেয়ারহফ পারানাস বিক্রিয়াপথ বা ই. এম. পি ঃ (Embden Meyerhof Paranas Pathway ; E. M. P)

এই বিক্রিয়াপথকে হেক্সোস ডাইফসফেট পথও বলা হয়। এই বিক্রিয়াপথের বিশেষত্ব হিসাবে দেখা যায় fructose-1-6-diphosphate এর অ্যালডোলেস (aldolase) উৎসেচক দ্বারা বিয়োজন ও ট্রায়োস ফসফেট (triose-phosphate) এর মিশ্রণ তৈরী। পরবর্তী স্তরে প্রতিটি triose phosphate অণুই পাইরুভেটে (pyruvate) রূপান্তরিত হয়। এ পর্যন্ত দু'টি করে এ. টি. পি (ATP) অণু প্রত্যেকটি triose phosphate থেকে তৈরী হয়, যথাক্রমে 1, 3, diphosphoglycerate এর dephosphorylation ও phosphoenol pyruvate এর pyruvate এ পরিবর্তিত হওয়ার সময়। অন্যদিকে গ্লুকোস থেকে ফ্রুক্টোস ডাইফসফেট তৈরীর সময় দুটি এ. টি. পি অণু ব্যবহৃত হয় শক্তি জোগানর জন্য। ফলতঃ একটি গ্লুকোস অণু থেকে দুইটি পাইরুভেট অণু সৃষ্টিতে দুটি এ. টি. পি অণু উৎপাদিত হচ্ছে। Glucose→2 Pyruvate বিক্রিয়ার

$\Delta G^{\circ\prime}$ মান হচ্ছে -৪৭ কিলো ক্যালরি। দুই অণু ATP তৈরীতে ৭.৩ কিঃ ক্যালরি শক্তি সঞ্চিত হল। অর্থাৎ প্রায় শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ যোগ্যতা (efficiency)। এই শক্তিসৃষ্টি প্রক্রিয়াতে তিনটি বিক্রিয়া যথা গ্লুকোসের ফসফোরিলেশন যা হেক্সোকাইনেজ (hexokinase) দ্বারা সংঘটিত হয়, ফ্রুক্টোস ৬-ফসফেটের ফসফরিলেশন যা ফসফোফ্রুক্টোকাইনেস দ্বারা সংঘটিত হয় এবং ফসফোএনল পাইরুভেটকে পাইরুভেটে পরিণত করা যা পাইরুভেট কাইনেস দ্বারা সংঘঠিত হয়। অন্য সমস্ত বিক্রিয়াই বিপরীতমুখী (reversible) ও হতে পারে। বিভিন্ন জীবাণু বিভিন্ন পরিমাণে এই বিক্রিয়া পথ ব্যবহার করে। যেমন **স্যাকারোমাইসেস সেরেভিসি (Saccharomyces cerevisiae)** তার গ্লুকোস বিয়োজনের সমস্তটাই এই পথে সম্পন্ন করে। (চিত্র-৪৪)

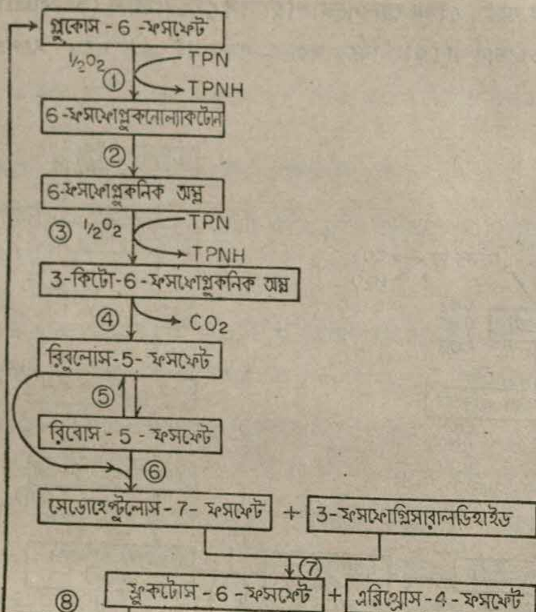



চিত্র ৪৪ : কার্বোহাইড্রেট বিয়োজনের প্রাথমিক বিক্রিয়া পথ ই. এম. পি.

**(খ) হেক্সোস মোনোফসফেট বিক্রিয়াপথ** (Hexose monophosphate pathway) :

মূলতঃ আর. এন. এ (RNA) তৈরীর জন্য যে রাইবোস (ribose)

প্রয়োজন হয় তার সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অন্বেষণে ই. এম. পি ব্যতীত অন্য বিক্রিয়াপথের সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীদের মনে উদয় হয়। নতুন যে বিক্রিয়াপথ আবিষ্কৃত হয় তা ই. এম. পির ই একটি বিকল্প পথ (shunt or loop)। এই বিক্রিয়া পথটি পেনটোস ফসফেট বিক্রিয়াপথ নামেও পরিচিত। এই পথের বিশেষত্ব হচ্ছে যে গ্লুকোস-৬ ফসফেট অণু প্রথমে একটি, গ্লিসার-অ্যালডিহাইড-৩-ফসফেট ও ৩টি কার্বনডাই অক্সাইড ($CO_2$) অণুতে পরিণত হয়। পরবর্তী স্তরে গ্লিসারঅ্যালডিহাইড-3-ফসফেটটি পূর্ব আলোচিত ই. এম. পি বিক্রিয়াপথে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে একটি গ্লুকোস অণু থেকে




উৎসেচক গুলি: (1) গ্লুকোস-6-ফসফেট ডিহাইড্রোজিনেস, (2) ফসফোগ্লুকনোল্যাকটনেস (3) 6-ফসফোগ্লুকনিক ডিহাইড্রোজিনেস, (4) জানা নেই, (5) ফসফোপেনটস আইসোমারেস, (6) ট্রান্সকেটোলেস, (7) ট্রান্স অ্যালডোলেস, (8) ফসফোহেক্সোস আইসোমারেস।

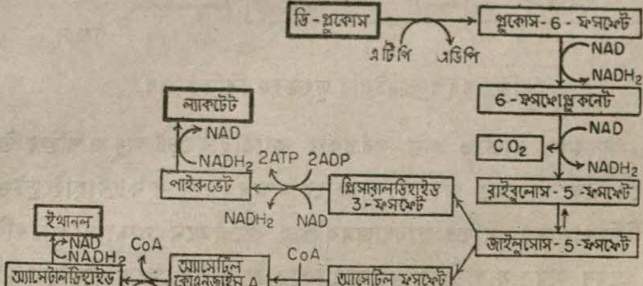
চিত্র ৪৫ : হেক্সোস মোনোফসফেট বিক্রিয়াপথ

একটি গ্লিসারআলডিহাইড-3-ফসফেট ও একটি মাত্র এ. টি. পি. অণু তৈরী হয়। এই বিক্রিয়াপথ মূলতঃ নিউক্লিওটাইড তৈরীর জন্য পেন্টোস ফসফেট অণু

সরবরাহ করে। শক্তি সরবরাহের কাজে এটি যথেষ্ট যোগ্য বিক্রিয়াপথ নয়। (চিত্র-৪৫) জীবাণু **পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম (Penicillium chrysogenum)** প্রায় ৩/৪ ভাগ গ্লুকোস এই বিক্রিয়াপথে বিয়োজন করে। **অ্যাসিটোব্যাক্টর ব্রুসেলা (Acetobacter brucella)** প্রভৃতি ব্যাক্টিরিয়াও এই পথ বেশী ব্যবহার করে।

(গ) **ফসফোকিটোলেস বিক্রিয়াপথ** (Phosphoketolase pathway) :

কতকগুলি জীবাণু গ্লুকোস বিয়োজনের কাজে ফসফোকিটলেস উৎসেচক ব্যবহার করে। এই উৎসেচক যে কোন ৫ বা ৬টি অঙ্গারযুক্ত ফসফোরাইলেট (phosphorylate) অণু থেকে অ্যাসেটিল ফসফেট (acetyl phosphate) বিচ্ছিন্ন করে নেয়। **লিউকোনস্টক মেসেনটেরয়েড (Leuconostoc mesenteroid)** জীবাণুতে এই বিক্রিয়াপথ অনুসৃত হয়। এই পথে জাইলুলোস-৫-ফসফেট (xylulose-5-phosphate) অণু ফসফোকিটোলেস উৎসেচক দ্বারা অ্যাসেটিল ফসফেট (acetyl phosphate) ও গ্লিসারালডিহাইড-৩-ফসফেট (glyceraldehyde-3-phosphate) অণুতে পর্যবসিত হয়। এ. টি. পি সৃষ্টির কাজে এই বিক্রিয়াপথ ই. এম. পি থেকে কম যোগ্য কারণ একটি গ্লুকোস



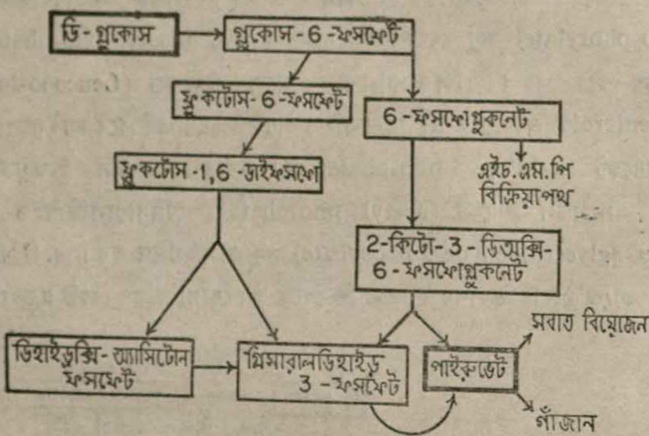

চিত্র ৪৬ : ফসফোকিটোলেস বিক্রিয়াপথ

অণু থেকে মাত্র একটি এ. টি. পি (ATP) অণু তৈরি হয় (**চিত্র-৪৬**)। অন্য একটি ব্যাক্টিরিয়া **বাইফিডোব্যাক্টিরিয়াম বাইফিডাসে (Bifidobacte-**

rium bifidus) ফসফোকিটোলেস ব্যবহারে ল্যাকটেট (lactate) ও অ্যাসিটেট (acetate) অণু তৈরি হয়।

**(খ) এনটনার-ডুওডরফ বিক্রিয়াপথ** (Entner-Doudoroff Pathway) :

এই বিক্রিয়াপথে কার্বোহাইড্রেট বিয়োজন প্রথম দেখা যায় **সিউডো-মোনাস স্যাকারোফিলা (Pseudomonas saccharophila)** ব্যাক্টিরিয়াতে। এক্ষেত্রেও একটি গ্লুকোস অণু থেকে মাত্র একটি এ. টি. পি অণু সৃষ্টি হয়। চিত্র-৪৭)

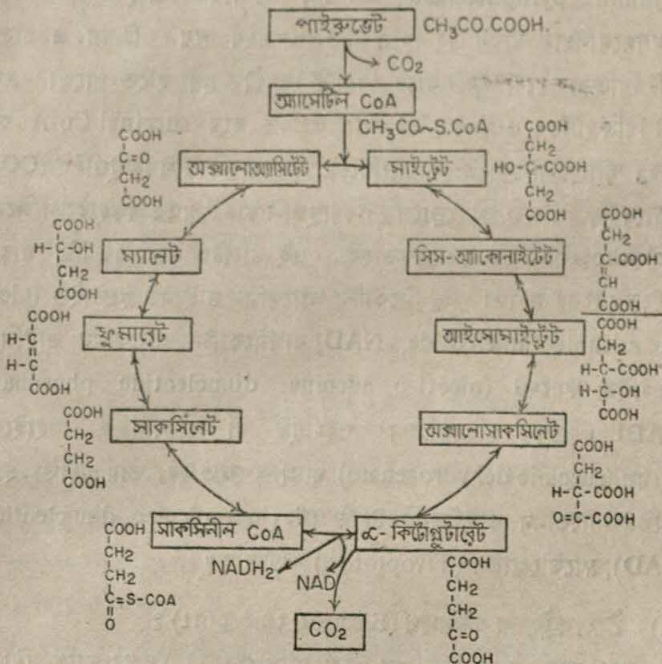



চিত্র ৪৭ : এনটনার ডুওডরফ বিক্রিয়াপথ

(আ) গ্লুকোস ব্যতীত অন্য সর্বপ্রকার কার্বোহাইড্রেট অণু ও শক্তির উৎস হিসাবে এক বা অন্য জীবাণু ব্যবহারে সক্ষম। অন্য কার্বোহাইড্রেটগুলি মূল বিক্রিয়াপথের বিভিন্ন সুবিধাজনক স্তরে প্রয়োজনে সামান্য পরিবর্তিত হ'য়ে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ মোনোস্যাকারাইডগুলির ক্ষেত্রে গ্লুকোসের মতই প্রথম স্তরে ফসফোরাইলেশন হয় এবং ব্যবহার্য কার্বোহাইড্রেটটির বিশেষ উৎসেচক (kinase) উৎপাদনের উপরই তার ব্যবহার নির্ভর করে। উদাহরণ-স্বরূপ ডি-গ্যালাকটোসের (D-galactose) জন্য গ্যালাকটোকাইনেস (galactokinase) ডি-ফ্রুকটোসের (D-fructose) জন্য ফ্রুকটোকাইনেস (fructokinase) ইত্যাদি।

৩·৩২ জীবাণুর সবাত শ্বসন প্রক্রিয়া (Aerobic respiration) :

গ্লুকোসের পাইরুভেট পর্যন্ত বিয়োজনে মাত্র ৪৭ কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। পরবর্তীকালে এই বিছিন্নকরণ যে বিক্রিয়াপথে সবাত পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ হয় তাকে প্রান্তিক শ্বসন (terminal respiration) বলা হয়। এই বিয়োজন কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) উৎপাদন স্তর পর্যন্ত পৌছালে -686 কিলোক্যালরি শক্তি উৎপন্ন হয়। সবাত শ্বসন প্রক্রিয়াতে পাইরুভেট অণু থেকে অ্যাসেটিল জাতীয় অণু তৈরী হয় এবং অ্যাসেটিল অবশিষ্ট (residue) গুলি জারিত হয় একটি চক্রবৎ বিক্রিয়াপথ মাধ্যমে যাকে বলা হয় ট্রাই-




চিত্র ৪৮ : ক্রেবের বিক্রিয়াচক্র

কার্বক্সিলিক অম্ল চক্র (tricarboxylic acid cycle or TCA cycle) বা ক্রেবের চক্র (Kreb's cycle)। এই চক্রবিক্রিয়াপথের বিভিন্ন স্তরে এ. টি. পি

হিসাবে শক্তির উৎপাদন ছাড়া বহু নূতন অণু সৃষ্টি হয় যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন জৈব অণু সংশ্লেষণের কাজে ব্যবহৃত হয় ( চিত্র-৪৮ )।

চক্রপথে প্রবেশের পূর্বে পাইরুভেট অণু অ্যাসেটিল-সহউৎসেচকে (Acetyl Co-A) তে জারিত হয় ; বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ :—

$$CH_3COCOOH + CoA - SH + NAD \rightarrow CH_3-CO-S-CoA + NADH_2 + CO_2$$

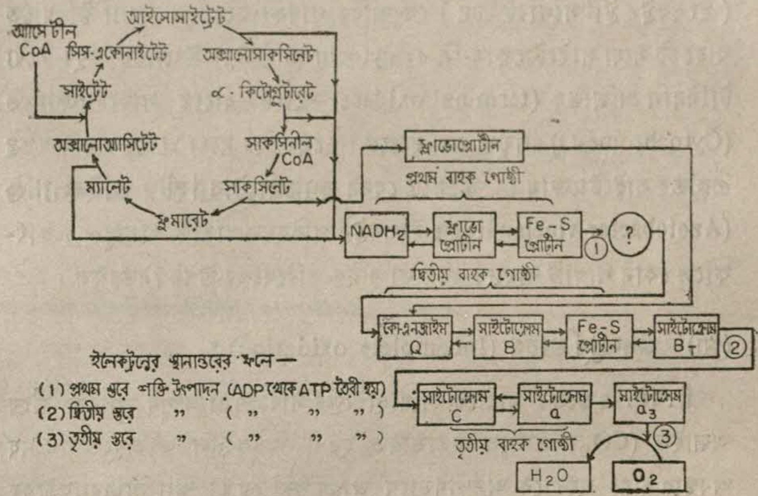
( পাইরুভেট ) (অ্যাসেটিল কো-এ)

আরও তিনটি সহযোগী অণু (co-factor) যথা থায়ামিন পাইরোফসফেট (thyamine pyrophosphate, T P P), লিপোয়িক অম্ল ( lipoic acid) ও ম্যাগনেসিয়াম আয়ন এই বিক্রিয়াতে অংশগ্রহণ করে। টি. সি. এ চক্রের ১১টি বিক্রিয়ার মধ্যে একটি বাদে সবকটিই বিপরীত মুখী হ'তে পারে। এক-মুখী বিক্রিয়াটিতে $\alpha$-Ketogluterate জারিত হয়ে succinyl Co-A সৃষ্টি করে। অ্যাসেটিল-কো-এ এর অ্যাসিটেট অংশের অঙ্গার পরমাণুগুলিই ($CO_2$) হিসাবে মুক্ত হয় এবং হাইড্রোজেন পরমাণুগুলি চারটি স্বতন্ত্র ডিহাইড্রোজিনেস (dehydrogenase) দ্বারা অপসৃত হয়। এই চারটির মধ্যে তিনটির জারণে হাইড্রোজেনের গ্রহীতা হচ্ছে নিকোটিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (nicotine adenine dinucleotide, NAD) বা নিকোটিন অ্যাডেনিন ডাইনিউ-ক্লিওটাইড ফসফেট (nicotine adenine dinucleotide phosphate, NADP)। চতুর্থ হাইড্রোজেন পরমাণুটি যা সাকসিনিক ডিহাইড্রো-জিনেস (succinic dehydrogenase) দ্বারা অপসৃত হয়, তার গ্রহীতা হচ্ছে ফ্লেভিন অ্যাডেনিন ডাইনিউক্লিওটাইড (flavine adenine dinucleotide) (FAD), ফ্লাভোপ্রোটিন (flavoprotein) প্রভৃতি অণু।

(অ) **ইলেকট্রনের গমনপথ** (Electron transport) ঃ

সবাত শ্বসনে আয়নগুলি শেষ পর্যন্ত অক্সিজেন ($O_2$) অণুর সাথে মিলিত হ'য়ে জল ($H_2O$) তৈরি করে। ফলে অ্যাসেটিল গ্রুপের সম্পূর্ণ জারণ হয়। তবে হাইড্রোজেন (H) আয়ন বাহক অণুর (carrier molecule) দ্বারা গঠিত অণু-ধারা (chain) মারফৎ বাহিত হয়। এই ধারাকে ইলেকট্রন পরিবহন ধারা (electron transport chain) বলা হয়। এই বিক্রিয়াপথে কিছুটা

শক্তি জীবাণুকোষের গ্রহণযোগ্য হয়। এই ইলেকট্রন পরিবহন ধারায় ইউক্যারিওট ও প্রোক্যারিওটদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। একজোড়া ইলেকট্রন তিনটি ধাপে বিজারিত এন. এ. ডি. ($NADH_2$) থেকে অক্সিজেন ($O_2$) অণুতে পৌছায়। তিনটি স্থানকে বলা হয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান (Sites I, II, ও III)। এই তিনটি স্থানে (চিত্র-৪৯) ইলেকট্রন-




চিত্র ৪৯ : ইলেকট্রন বাহক মাল্য : সম্পূর্ণকেন্দ্রী কোষ

গুলি যথেষ্ট শক্তি সৃষ্টি করে যাতে অ্যাডেনোসিন ডাই ফসফেট (ADP) থেকে অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেট (ATP) তৈরী হ'তে পারে। ইলেকট্রনের বাহক অণুগুলি তিনটি গোষ্ঠী যথা গ্রুপ—১, গ্রুপ—২ ও গ্রুপ—৩ (Group I, II, & III) তে বিভক্ত।

একটি গোষ্ঠীর স্টাণ্ডার্ড রেডক্স পোটেন্সিয়াল (standard redox potential) একই পরিমাণের হয়। এক গোষ্ঠী থেকে অপর গোষ্ঠীতে গমনকালে বা তৃতীয় গোষ্ঠী (Gr. III) থেকে অক্সিজেন অণুতে গমনকালে প্রায় ১৮০ মিলি-ভোল্ট (m.v) শক্তি উৎপাদিত হয়। এই উৎপাদিত শক্তি দ্বারা ADP থেকে ATP সংশ্লেষিত হয়। বর্তমানে জানা গেছে (মিচেল, ১৯৭০; Michell,

1970) যে মাইটোকণ্ড্রিয়ার আস্তরণের মধ্য দিয়ে একটি প্রোটন (proton) এর নতিমাত্রা (gradient) তৈরী হয়। এই নতিমাত্রার সহায়তায় শক্তির স্থানান্তর ঘটে। এ. টি. পি থেকে শক্তি ব্যবহার করার সময়ও হয়ত একই পদ্ধতি কার্যকরী হয়। ইউক্যারিওট জীবাণুদের মধ্যেই এই পদ্ধতি কার্যকরী। প্রোক্যারিওটদের ক্ষেত্রে বাহকগুলি ও উৎসেচক অণুগুলি প্লাসমা আস্তরণে অথবা মেসোসমে অবস্থিত। এছাড়া এদের ইলেকট্রন পরিবহন ধারা (ইলেকট্রন ট্রানসপোরট চেন) তে অধিক পার্থক্য রয়েছে। ব্যাক্টিরিয়াতে বাহকের মধ্যে সাইটোক্রোম-সি ৫ (cytochrome $C_5$) উৎসেচক অণুর মধ্যে টার্মিনাল অক্সিডেস (terminal oxidase) রয়েছে যাদের সাইটোক্রোম-ও (Cytochrome-O) দলভুক্ত করা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে রয়েছে একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির সাইটোক্রোম। বহুক্ষেত্রে যেমন **অ্যাজোটোব্যাকটর ভাইনল্যাণ্ডি** (**Azotobacter vinelandi**) তে ইলেকট্রন পরিবহন ধারাটি শাখাযুক্ত। কার্যকালে কোন শাখাটি ব্যবহৃত হবে তা বৃদ্ধির পরিবেশের উপর নির্ভরশীল।

### (আ) অসম্পূর্ণ জারণ (Incomplete oxidation):

টি. সি. এ চক্রের মাধ্যমে কার্বোহাইড্রেট সাধারণতঃ সম্পূর্ণ জারিত হ'য়ে অক্সাইড ($CO_2$) ও জলে রূপান্তরিত হয়। কতকগুলি জীবাণুতে বিশেষ অবস্থার দ্বারা শর্করাকে অসম্পূর্ণভাবে জারণ করা হয়। অ্যাসিটোব্যাক্টরের (**Acetobactor**) ক্ষেত্রে পরিবেশে কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ অধিক হলে অসম্পূর্ণ জারণ ঘটে। অন্য কিছু জীবাণুর যে আলোকদীপ্তি (luminesoence) দেখা যায় তাও শ্বসনক্রিয়ার এক প্রকার অসম্পূর্ণ জারণের ঘটনা। অবশ্য জীবাণুর এই অসম্পূর্ণ জারণের সাথে শক্তি (ATP) ক্ষয় সংযুক্ত হয়েছে।

### (ই) অবাত শ্বসন (Anaerobic respiration):

যে সমস্ত জীবাণুর অবাত অবস্থাতেও বৃদ্ধি হয় তারা অক্সিজেনের পরিবর্তে কোন অজৈব রাসায়নিককে সর্বশেষ ইলেকট্রন গ্রাহক (electron acceptor) হিসাবে ব্যবহার করে। **ব্যাসিলাস (Bacillus** sp.) বহু প্রকার $NO_3$ জাতীয় লবণকে ইলেকট্রন গ্রহীতা হিসাবে ব্যবহার করে এবং সেক্ষেত্রে

উৎপাদিত রাসায়নিকগুলি হচ্ছে $NO_2$ ও নাইট্রোজেন (N) এর অন্য আরও বিজারিত অবস্থা। উৎপাদিত রাসায়নিক বস্তু (product) নাইট্রিক (nitric) বা নাইট্রাস অক্সাইড (nitrous oxide) অর্থাৎ ডাইনাইট্রোজেন (dinitrogen) জাতীয় হলে তখন সেই শ্বসনকে বলা হয় ডিনাইট্রিফিকেশন (denitrification)। অবশ্য জীবাণু এক্ষেত্রে উৎপাদিত রাসায়নিকগুলি ব্যবহার না ক'রে পরিবেশে পরিত্যাগ করে। আর যেসব উৎপাদিত বস্তু জীবাণু নিজেই ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়াটিকে আত্তীকরণকারি নাইট্রেট বিজারণ (assimilatory nitrate reduction) বলা হয়। **মিথানোব্যাক্টিরিয়াম (Methanobacterium)** এভাবে $CO_2$কে ইলেকট্রন গ্রাহক হিসাবে ব্যবহার করে। অ্যাসেটিক অম্ল (acetic acid) উৎপাদন **ক্লস্ট্রিডিয়াম অ্যাসেটিকাম (Clostridium aceticum)** ও ($CO_2$) কে একইভাবে ব্যবহার করে অ্যাসেটিক অম্ল উৎপাদনে।

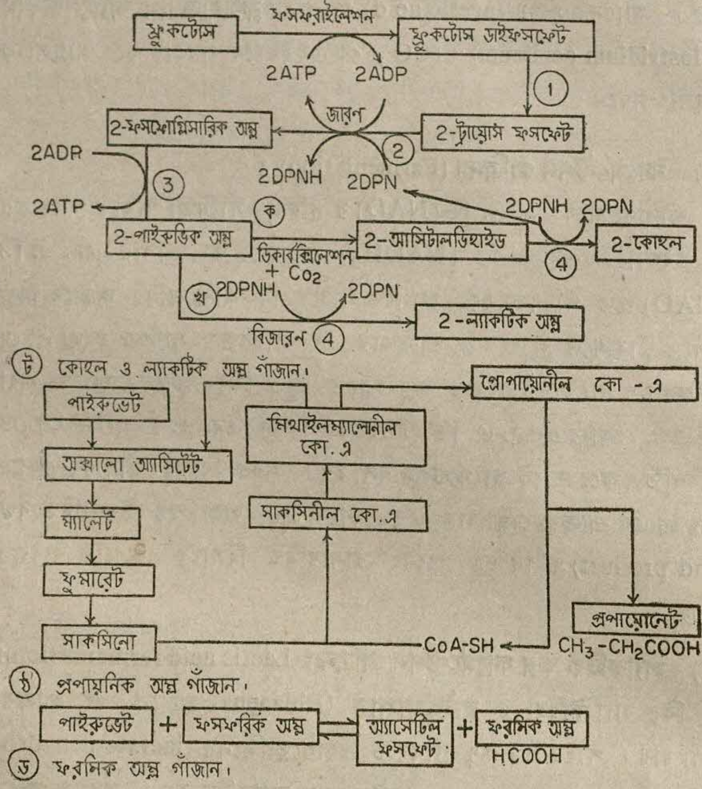
(ঈ) **ফার্মেণ্টেশন প্রক্রিয়া** (Fermentation) :

জীবাণুকোষে এন. এ. ডি (NAD) র পরিমাণ সীমিত। অবাত অবস্থাতে যে বিজারিত এন. এ. ডি ($NADH_2$) সৃষ্টি হচ্ছে তা আবার এন. এ. ডি (NAD) তে পরিণত হয়ে আসতে পারছেনা। অক্সিজেনের অভাবে কিছু অবাত জীবাণুতে অবশ্য অন্য প্রক্রিয়ায় এই পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। যে প্রক্রিয়াতে পাইরুভেট বা উক্ত অণু হইতে উদ্ভূত কিছু অণুকে জারিত করা হয় এবং বিজারিত এন. এ. ডি ($NADH_2$) অণু এন. এ. ডি (NAD) তে পরিবর্তিত করে তাকে ফার্মেণ্টেশন বলা হয়। অবশ্য বিভিন্ন জীবাণুর ক্ষেত্রে ভিন্নতর এই প্রক্রিয়া দেখা যায় এবং ফার্মেণ্টেশন দ্বারা সৃষ্ট উৎপাদিত বস্তু (end product) ও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক হিসাবে বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে।

(ক) **ল্যাকটিক অম্ল ফার্মেণ্টেশন প্রক্রিয়া** (Lactic acid fermentation):

কিছু ব্যাক্টিরিয়া ও **রাইজোপাস (Rhizopus)** ছত্রাকে এই প্রক্রিয়া দেখা যায়। পাইরুভেট অণু ল্যাক্টেট ডিহাইড্রোজিনেস (lactate dehydrogenase) উৎসেচকের মাধ্যমে ল্যাক্টিক অম্লে রূপান্তরিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে জীবাণুর ল্যাক্টেট রেসিমেস (lactate racemase) উৎসেচক থাকলে

উৎপাদিত ডি-ল্যাকটেট (D-lactate) অণু এল-ল্যাকটেট (L-lactate) অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। সাধারণতঃ যেসব জীবাণু ফার্মেণ্টেশনের ফলে শুধু লাক্‌টেট অণু তৈরি করে তাদের বলা হয় হোমোল্যাক্‌টিক ফার্মেণ্টর। (homolactic fermentors)। অন্য কিছু ব্যাক্টিরিয়া ল্যাক্‌টেট উৎপাদনের সাথে কিছু পরিমাণ অ্যাসিটেট, ইথানল প্রভৃতিও উৎপাদন করে ; এদেরকে হেটারোল্যাক্‌টিক ফারমেনটর (heterolactic fermentor) বলা হয়। এই সমস্ত ব্যাক্টিরিয়া সাধারণতঃ ফসফোকিটোলেস (phosphoketolase) প্রভৃতি বিক্রিয়া পথদ্বারা পাইরুভেট তৈরি করে। ( চিত্র-৫০ )




চিত্র ৫০ : বিভিন্ন গাঁজান বিক্রিয়া

(খ) **কোহল ফার্মেন্টেশন** (Alcoholic fermentation) ঃ

এই বিক্রিয়াপথে শর্করা বিয়োজনের ফলে অন্তিম উৎপাদন হিসাবে ইথাইল অ্যালকোহল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) উৎপাদিত হয়। পাইরুভেট থেকে এই কোহল ও $CO_2$ উৎপাদন করতে দুটি বিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।

(১) প্রথম স্তরে পাইরুভেট ডিকার্বক্সিলেস (pyruvate decarboxylase) উৎসেচকের সাহায্যে পাইরুভেট অণুর ডিকার্বক্সিলেশন সংঘটিত হয় এবং অ্যাসিটালডিহাইড উৎপন্ন (acetaldehyde) হয়।

(২) দ্বিতীয় স্তরে অ্যাসিটালডিহাইড বিজারিত হ'য়ে ইথানল তৈরী হয়। এই বিক্রিয়া সংঘটিত করে অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস (alcohol dehydrogenase) উৎসেচক। বহু ছত্রাক যথা ঈষ্ট, **ফুসেরিয়াম** বা মিউকরেলস বর্গভুক্ত ছত্রাকগুলিতে এ ধরনের ফার্মেন্টেশন দেখা গেছে। ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে এধরনের ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়া তুলনামূলক ভাবে সীমিত ( চিত্র ৪৫ )।

(গ) **প্রপিওনিক অম্ল ফার্মেন্টেশন** (Propionic acid fermentation) ঃ

**প্রপিওনিব্যাক্টিরিয়াম ( Propionibacterium sp)** কার্বোহাইড্রেট ফার্মেন্ট ক'রে প্রপিওনিক অম্লে পরিণত করে ; সঙ্গে অ্যাসিটেট, ($CO_2$) প্রভৃতি তৈরী হয়। এই প্রক্রিয়াতে পাইরুভেট এর দুটি অণু হয়। একটি প্রপিওনিক অম্ল অণুতে রূপান্তরিত পাইরুভেট অণু থেকে টি. সি. এ. চক্র পথে সাকসিনিল-কো-এ অণু তৈরী হয়। পরবর্তী স্তরে সাকসিনিল কো এনজাইম-এ (succinyl Co-A) অণু আইসোমেরাইজড (isomerised) হয়ে মিথাইল মালোনিলতে (Co-A) (methyl malonyl Co-A) পরিণত হয়। তৃতীয় স্তরে পাইরুভেট এর সাথে মিথাইল ম্যালোনিল কো এনজাইম কার্বক্সিল ট্রানসফারেস (methyl malonyl CoA carboxyl transferase) উৎসেচকের সাহায্যে বিক্রিয়া করে এবং প্রপিওনিল-কো-এ ও অক্সালো অ্যাসিটেট তৈরি করে। সর্বশেষে প্রপিওনিল-কো-এ থেকে প্রপিওনেট তৈরি হয়।

**(ঘ) ফরমিক অম্ল ফার্মেন্টেশন** (Formic acid fermentation) :

এন্টারোব্যাক্টিরিয়েসি (**Enterobacteriacea**) গোত্রের ব্যাক্টিরিয়াগুলি কার্বোহাইড্রেট ফার্মেন্টেশন মাধ্যমে ফরমিক অম্ল উৎপাদন করে। পরিবেশে ফরমিক হাইড্রোজেনলায়েস (formic hydrogenlyase) উৎসেচকের সাহায্যে পাইরুভেট অণু থেকে ফরমিক অম্ল তৈরি হয় কিন্তু পরবর্তী স্তরে ফরমিক অম্ল বিচ্ছিন্ন হ'য়ে ($H_2$) কার্বন ডাই অক্সাইডে ($CO_2$) পর্যবসিত হয়। সাধারণতঃ এই ফার্মেন্টেশনের ফলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে প্রতি চারটি পাইরুভেট অণু থেকে দু'টি ল্যাকটেট, একটি অ্যাসিটেট ও একটি ফরমেট অণু তৈরী হয়।

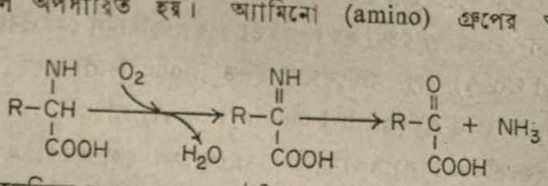
$$CH_3-CO-COOH+H_3PO_4 \rightleftharpoons CH_3CO-O-\overset{\overset{O}{\|}}{\underset{\underset{OH}{|}}{P}}-OH+H-COOH$$

## ৩·৩৩ নাইট্রোজেন যুক্ত রাসায়নিক অণুর জারণ :

জীবাণুর কোষে প্রায়শঃই যে সব নাইট্রোজেন যুক্ত অণু পাওয়া যায় তার মধ্যে অ্যামিনো অম্ল, পুরাইন (purine), পিরিমিডিন (pyrimidine) ইত্যাদি অন্যতম। এই রাসায়নিকগুলি শর্করার তুলনাতে নিম্ন জারণ-স্তরে (oxidation level) অবস্থান করে। ফলে এই সকল অণু সবাত ও অবাত সবরকম জীবাণুর পক্ষেই শক্তি উৎপাদক বিয়োজন বিক্রিয়াতে ব্যবহৃত হতে পারে।

**(ক) অ্যামিনো অম্লের জারণ** (Oxidation of amino acids) :

অ্যামিনো অম্লের জারণের প্রথম স্তরে অ্যামিনো ও কার্বক্সিল (COOH) গ্রুপগুলি অপসারিত হয়। অ্যামিনো (amino) গ্রুপের অপসারণে




আমিনো অম্ল ইমিনো অম্ল গ্লায়োক্সিলিক অম্ল

(deamination) অ্যামিনো অম্লটি প্রথমে ইমিনো অম্লে (imino) ও পরে যথাযথ কিটো (keto) অম্লে পরিবর্তিত হয়। গ্লাইসিনের (glycin)

অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণ এস্কেরিসিয়া কোলি (Escherichia coli) ব্যাক্টিরিয়াতে এইরূপে সংঘটিত হয়।

পরবর্তী স্তরে এই কিটো অম্লটির বিয়োজনেও শক্তি উৎপাদিত হয়। উপরি উক্ত বিক্রিয়া অ্যামিনো অক্সিডেস উৎসেচক সংযোগে সংঘটিত হয়। অবাত জীবাণুর ক্ষেত্রে অ্যামিনো গ্রুপ অপসারণ ঘটে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতিতে বিজারক ডিঅ্যামিনেস (reductive deaminase) অংশ গ্রহণ করে। অ্যামিনো অম্লের কার্বক্সিল (carboxyl) গ্রুপ ডিকার্বক্সিলেশন (decarboxylation) ও জীবাণুতে বহুল পরিমাণে দেখা যায়। এক্ষেত্রে উৎপাদিত রাসায়নিকটি একটি অ্যামাইন।

$$R-CH(NH_2)-COOH \rightarrow RCH_2-NH_2+CO_2$$

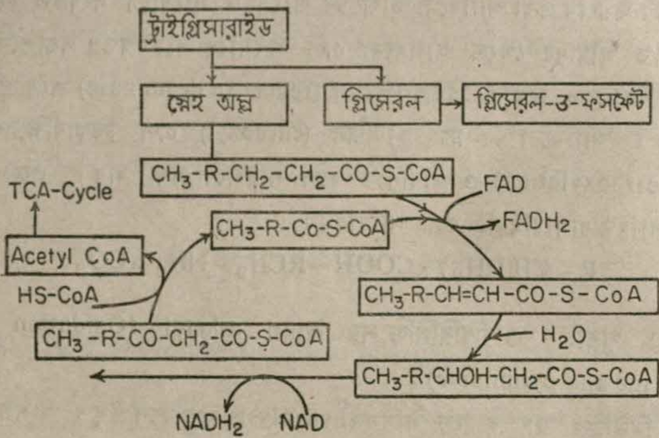
(আ) **পুরাইন ও পিরিমিডিনের জারণ প্রক্রিয়া** (Oxidation of purine and pyrimidine) :

নিউক্লিক অম্লের হাইড্রোলিসিস (hydrolysis) এর ফলে উদ্ভূত অংশগুলি অর্থাৎ জৈবক্ষারগুলি (organic base) জারণের জন্য পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এইগুলি জারিত হয়ে যে সব রাসায়নিক উৎপাদিত হয় সেগুলিই শক্তি উৎপাদনকারী বিক্রিয়া পথে চালিত হয়। **মাইকোব্যাক্টিরিয়াম (Mycobacterium)** কোষে এ ভাবে ইউরাসিল (uracil) পরিবর্তিত হয়ে বারবিটিউরিক অম্ল (barbituric acid) ও তৎপরে ইউরিয়া (urea) ও ম্যালোনিক (malonic) অম্ল তৈরী হয়। সর্বশেষে ম্যালোনিক অম্ল অ্যাসেটিল কোএনজাইম-এ হয়ে টি. সি. এ চক্র পথে জারিত হয়।

**৫·৩৪ ট্রাইগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি অম্লের জারণ** (Oxidation of triglycerides and fatty acids) :

দীর্ঘ ফ্যাটি (fatty) অম্লের গ্লিসেরল এষ্টার (glycerol ester) কে বলা হয় ট্রাইগ্লিসারাইড (triglyceride)। এগুলি সর্বাধিক বিজারিত অবস্থার রাসায়নিক এবং জীবাণুর পক্ষে ভালো শক্তি উৎস। প্রাথমিক স্তরে লাইপেস (lipase) উৎসেচকের সাহায্যে এই বস্তুগুলির হাইড্রোলিসিস হয়ে গ্লিসেরল ও ফ্যাটি অম্ল সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে গ্লিসেরলের ফসফোরিলেশন হলে যে রাসায়নিক দ্রব্য উৎপন্ন হয় তা ই. এম. পি. (E. M. P.) বিক্রিয়া পথে

ব্যবহার্য হয়ে ওঠে। কিছু ছত্রাক যেমন **অ্যাসপারজিলাস, পেনিসিলিয়াম** ইত্যাদি ফ্যাটি অম্লের অসম্পূর্ণ জারণ ক'রে মিথাইল কিটোন (methyl ketone) সৃষ্টি করে ( **চিত্র-৫১** )।




চিত্র ৫১ : স্নেহজাতীয় অম্লের জারণচক্র

**৩.৩৫ হাইড্রোকারবনের জারণ** (Oxidation of hydrocarbons) :

কিছু জীবাণু হাইড্রোকারবন জাতীয় অণুর জারণ সংঘটিত করে। যেসব জীবাণু হাইড্রোকারবনের (hydrocarbon) উপর বৃদ্ধি লাভ করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল **সিউডোমোনাস, করাইনেব্যাক্টিরিয়াম, মাইকোব্যাক্টিরিয়াম, কানডিডা, হানসেনুলা (Hansenula), ফুসেরিয়াম, হর্মড্রেনড্রাম (Hormodendrum)** ইত্যাদি। এরা এন-অ্যালকেন (n-alkane) গুলির ক্ষেত্রে প্রান্তবর্তী মিথাইল গ্রুপ (methyl group) কে জারিত ক'রে যথাযথ প্রাথমিক কোহল (primary alcohol) সৃষ্টি করে। পরবর্তীকালে কোহলটি জারিত হ'য়ে ফ্যাটি অম্ল তৈরী হয় ও পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে আরও জারিত হয়। এছাড়া অ্যালকিন (alkene), অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকারবন (alicyclic hydrocarbon) প্রভৃতিও জারণের ফলে জীবাণু শক্তি সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

**৩·৩৬ অ্যারোমাটিক যৌগের জারণ** (Oxidation of aromatic compounds) :

সাধারণতঃ সবাত অবস্থাতে এই ধরনের রাসায়নিকের জীবাণুজনিত জারণ দেখা যায়। এদের জারণের প্রথম স্তরে ক্যাটেকল (catechol), প্রোটো-ক্যাটেচুয়িক অম্ল (protocatechuic acid), ডাইফেনলিক (diphenolic) প্রভৃতি রাসায়নিক অণুর সৃষ্টি হয়। পরবর্তী স্তরে অক্সিজিনেস (oxygenase) জাতীয় উৎসেচক ডাইফেনলিক অণুর রিং-আকৃতি বিযোজিত করে। এই পদ্ধতিকে বলা হয় অর্থোফিসান (orthofission)। ফলতঃ ৩-কিটোগ্লুটারেট (3-ketogluterate) অ্যাসেটিল কো এনজাইম জাতীয় অণুর সৃষ্টি হয়। এই পদ্ধতিতেই অ্যারোমাটিক অণুর জারণক্রিয়া টি. সি. এ চক্রতে উপনীত হয় ও পরবর্তী স্তরে পূর্বালোচিত পথেই অগ্রসর হয়। দু'একটি ক্ষেত্রে এধরনের অবাত জারণও দেখা গেছে।

এক অঙ্গারযুক্ত ফরমেট (formate) ডিহাইড্রোজিনেস উৎসেচক দ্বারা জারিত হয়। ইদানীং অন্য আরও কিছু এরকম রাসায়নিক যেমন মিথেন, মিথানল প্রভৃতির জীবাণু-জনিত জারণ ও শক্তি-উৎস হিসাবে ব্যবহার খুবই চমকপ্রদ ঘটনা। **মিথাইলোকক্কাস (Methylococcus)** বা **মিথাইলো-ব্যাকটর (Methylobacter)** ব্যাক্টিরিয়া এই সমস্ত অণু জারিত করতে সমর্থ। নীচে ঐরূপ একটি বিক্রিয়া উপস্থাপিত করা হল।

$$CH_4 \rightarrow CH_3\text{-}OCH_3 \rightarrow CH_2\text{-}O\text{-}CH_2OH \rightarrow CH_3\text{-}O\text{-}CHO$$

(মিথেন) ↓

$$CO_2 + H_2 \leftarrow HCOOH \leftarrow HCHO \leftarrow CH_3OH$$

(ফরমিক অম্ল) (ফরমালডিহাইড) (মিথানল)

সর্বপরি CO এরও সবাত জারণের কথা ইদানীং জানাগেছে।

**৩·৩৭ অজৈব রাসায়নিকের জারণ :**

সীমিত কিছু সংখ্যক জীবাণু অজৈব রাসায়নিককে জারিত করে শক্তি সংগ্রহ করে। এই জীবাণুগুলিই কেমোলিথোট্রফিক (chemolithotrophic) ব্যাক্টিরিয়া। সাধারণতঃ এক একটি ব্যাক্টিরিয়া এক একটি বিশেষ বস্তুর

বিয়োজন ঘটাতে সক্ষম। নিম্নে **সারণী-১৮** তে এজাতীয় জীবাণুর শক্তি উৎপাদন প্রকৃতি একসাথে উপস্থাপিত হল।

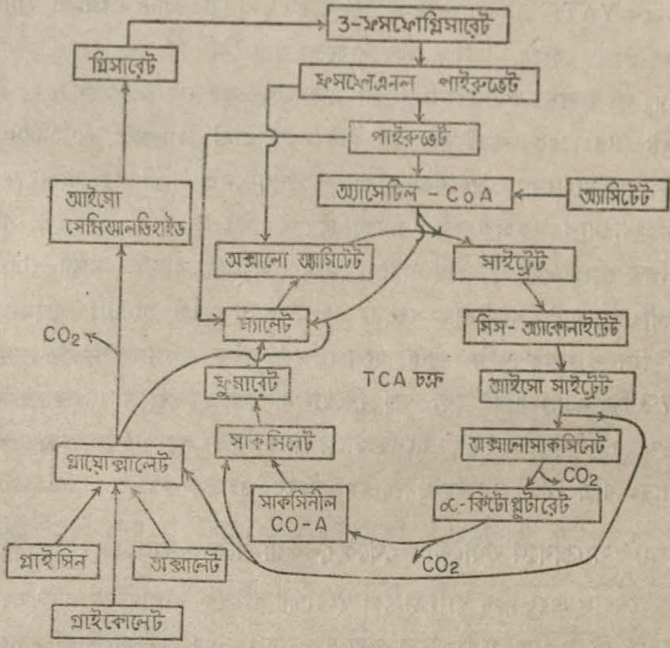
সারণী ১৮ : অজৈব রাসায়নিকের জীবাণুজনিত বিয়োজন

| জীবাণু | শক্তি উৎস (ইলেকট্রন দাতা) | ইলেকট্রন গ্রহীতা | উৎপাদিতবস্তু |
|---|---|---|---|
| বেগিয়টা (Beggiotoa) | $H_2S$ | $O_2$ | $S, H_2O$ |
| ডিসালফভিব্রিও (Desulfvibrio) | $H_2$ | $SO_4$ | $H_2O, H_2S$ |
| নাইট্রোব্যাকটর (Nitrobacter) | $NO_2$ | $O_2$ | $NO_3, H_2O$ |
| নাইট্রোসমোনাস (Nitrosomonas) | $NH_4$ | $O_2$ | $NO_2, H_2O$ |
| থায়োব্যাসিলাস (Thiobacillus) | S | $NO_3$ | $SO_4$, N |
| থা. ফেরো-অক্সিডানস (T. ferro-oxidans) | Ferrus ion, | $O_2$ | Ferric ion, $H_2O$ |

## ৩.৪০ জীবাণুকোষে ক্ষুদ্র অণুর জৈব সংশ্লেষণ :

জীবাণুকোষে সংশ্লেষণের কাজে শক্তির প্রয়োজন হয়। কোষের সংগৃহীত শক্তি বিভিন্ন নিউক্লিয়োটাইড ট্রাইফসফেট যেমন এ. টি. পি প্রভৃতি হিসাবে সঞ্চিত থাকে। সংশ্লেষণের কাজে সবসময় কিছু ক্ষুদ্র অণুর সরবরাহ প্রয়োজন হয়। পরিবেশ সবসময় এই সরবরাহ বজায় রাখতে পারে না। একাজে বিভিন্ন জৈব বিয়োজক পথ থেকে বিশেষতঃ টি. সি. এ চক্র থেকে ক্ষুদ্র অণুর সরবরাহ বজায় থাকে। এইভাবে পাইরুভেট, ফুমারেট, আলফা কিটো-গ্লুটারেট প্রভৃতি অ্যামিনো অম্ল সংশ্লেষণের জন্য, অ্যাসেটিল কো-এ, ফ্যাটি অম্ল সংশ্লেষণের জন্য বা সাকসিনিল কো-এ অণু, টেট্রাপাইরোল সংশ্লেষণের কাজে

অনবরত প্রয়োজন এবং কোষে যা সবসময়ই বজায় আছে। বিভিন্ন স্তরের এই অবিচ্ছিন্ন সরবরাহ ব্যবস্থাকে বলা হয় পরিপূর্ণকরন (filling up) পদ্ধতি বা আনাপ্লিউরটিক সিকোয়েন্সেস (anapleurotic sequences)। এই সরবরাহ ব্যবস্থার একটি চিত্রলেখ (**চিত্র-৫২**) দেওয়া হল।




চিত্র ৫২ : সরবরাহ ব্যবস্থা, TCA চক্রের অণুদের সরবরাহ

## (অ) সংশ্লেষণের কাজে শক্তির ব্যবস্থা :

কোষে জৈব সংশ্লেষণের কাজে প্রয়োজনীয় সমস্ত শক্তিটুকু কোষ মধ্যস্থ এ. টি. পি. অণু থেকে খরচ হয়। জীবাণুকোষে যে তৈরী এ. টি. পি. (free-ATP) থাকে তাকে এ. টি. পি. সঞ্চয় (ATP-pool) বলা হয়। এর পরিমাণ খুবই সামান্য। সাধারণতঃ ১০ মাইক্রোমোল (μ mole) প্রতি গ্রাম শুষ্ক ওজনে। প্রয়োজনের মূল অংশ অনবরত বিভিন্ন চলমান 'বিক্রিয়াপথ' থেকে আসে। নূতন অণু সংশ্লেষণ, কোষের সাধারণ ভরণপোষণ, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতির

বিশোষণ (uptake), চলন, উত্তাপ সৃষ্টি প্রভৃতি কোন্‌টিতে কত এ. টি. পি ব্যয় হচ্ছে তা নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। সংশ্লেষণের কাজে এ. টি. পি. ব্যয়ের পরিমাণ শুধু অবাত জীবাণুদের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। এর মান গড়ে ১০·৫ অর্থাৎ প্রতি এ. টি. পি. অণুতে ১০·৫ গ্রাম শুষ্ক কোষ বস্তু তৈরী হয়। এই মানকে YATP মান বা বাউকো এলসডেন মূল্য (Baucho Elsden Value) বলা হয়। কোষে নিয়মিত ভরণপোষণের জন্য বিশেষতঃ প্রোটিন ও নিউক্লিক অম্লর ক্ষয় পূরণের জন্য বেশকিছু এ. টি. পি. ক্ষয় হয় যার পরিমাপ করা গেছে পার্ট (Pirt) এর মেনটিনেন্স কো-ইফিসেণ্ট (maintenance co-efficient) নির্ণয়ের মাধ্যমে। দ্রবণের প্রবেশ ও নির্গমনের কাজে যে শক্তি ক্ষয় হয় তার পরিমাপ করাও শক্ত। প্রায়ই অনভিপ্রেতভাবে উত্তাপ সৃষ্টিতে শক্তির ব্যয় হয়। তার কারণ কোন অণুতে সাধারণ বন্ধন (bond) অর্থাৎ অ্যামাইড বা ঈষ্টার বন্ধনের (amide or ester bond) গঠনে মাত্র ৩ কি. ক্যালরি শক্তি ব্যয় হলেও সেকাজে একটি উচ্চশক্তি সম্পন্ন (7·3 কি. ক্যা.) এ. টি. পি. অণু বিয়োজন করতে হয়, যার উদবৃত্ত শক্তি উত্তাপে পর্যবসিত হয়। চলনের কাজে নিয়োজিত শুঙ্গ-ব্যবস্থার জন্যও সম্পূর্ণ ব্যয়ের মাত্র 10% ব্যয় হয় শুঙ্গ-ব্যবস্থা অদক্ষ হওয়ার জন্য।

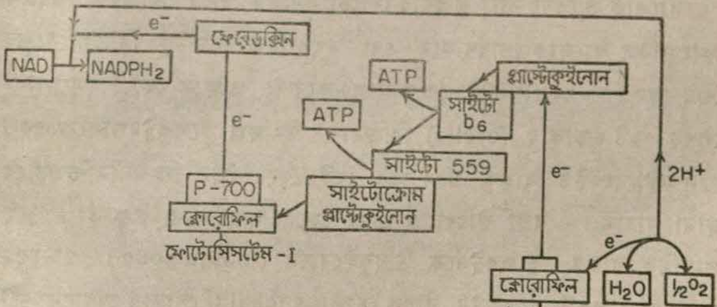
### (আ) সংশ্লেষণে সূর্যালোক থেকে নেওয়া শক্তির ব্যবহার ঃ

শৈবাল এবং কিছু ব্যাক্টিরিয়া সূর্যরশ্মির শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি সম্বলিত এ. টি. পি. অণুতে রূপান্তরিত করতে পারে। এই প্রক্রিয়াতে শক্তি সংগ্রহ, শর্করা জাতীয় জৈব অণু সংশ্লেষণের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং একে সালোক সংশ্লেষ বলা হয়। সালোক সংশ্লেষণে উৎপাদিত এ. টি. পি. অণু ফোটো-ফসফোরিলেসন (photophosphorylation) এর মাধ্যমে তৈরি হয়। সালোক সংশ্লেষণে এ. টি. পি. ব্যবহার করেই বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড ($CO_2$) থেকে কোষের প্রয়োজনীয় জৈব অণু সৃষ্টি হয়। এই কাজে একটি বিজারকের (reductant) প্রয়োজন হয় যা শৈবাল ও নীলসবুজ শৈবালদের ক্ষেত্রে জল ($H_2O$) থেকে উৎপাদিত হাইড্রোজেন (H)। জল জারিত হ'য়ে অক্সিজেনে ($O_2$) রূপান্তরিত হয়। ফোটোলিথোট্রফিক (photolithotrophic) ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে বিজারক হিসাবে কাজ করে $H_2S$ এবং অন্য

অর্গানোট্রফ (organotroph) দের ক্ষেত্রে অন্য জৈব রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়। সূর্যরশ্মি থেকে নির্গত শক্তি কোষের জৈব রঞ্জককে (pigment) শোষিত হবার পর জলকে জারিত করে অক্সিজেন ($O_2$) মুক্ত ক'রে এবং হাইড্রোজেন (H) কে বিজারক হিসাবে সংশ্লেষণের কাজে লাগানো হয়। শৈবালে ক্লোরোপ্লাস্ট (chloroplast) একাজ করে এবং অন্য জীবাণুতে রঞ্জক যুক্ত কোষ অঙ্গ একাজ করে।

## ৩·৪১ শৈবাল ও নীলসবুজ শৈবালে সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া ঃ

এই সব জীবাণুকোষে দুটি স্বতন্ত্র আলোক-শোষক ব্যবস্থা (light trapping system) রয়েছে যাহাদের নাম প্রথম সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া (photosystem-I), ও দ্বিতীয় সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া (photosystem-II)। দুটি ব্যবস্থাতেই বিক্রিয়াকেন্দ্র (reaction centre) নামক স্থানে ক্লোরোফিল অণুগুলি সূর্যরশ্মি শোষণ করে এবং আবেশক অনুরণনের (inductive resonance) মাধ্যমে স্বল্পসংখ্যক আলো-রাসায়নিক বিক্রিয়াক্ষম অণুতে সেটিকে স্থানান্তর করে। বিক্রিয়াকেন্দ্রটি এক ইলেকট্রন বহন ক্ষমতাযুক্ত যার স্টাণ্ডার্ড রিডাকসন পোটেনসিয়াল (standard reduction potential, SRP) হচ্ছে +450 মিলিভোল্ট এবং একে বলা হয় জৈবরঞ্জক পি 700 (P 700)। এক কোয়াণ্টাম (quantum) আলো এখানে




চিত্র ৫৩ ঃ সালোক সংশ্লেষ-প্রক্রিয়া ঃ নীলসবুজ শৈবাল

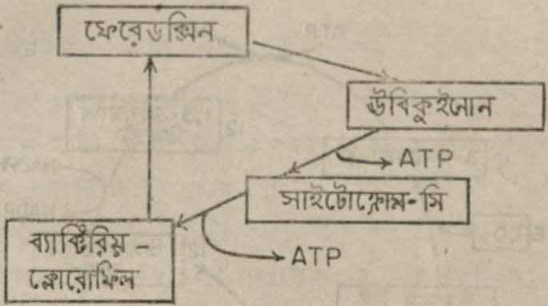
বিশোষিত হ'লে তার থেকে শক্তি সংগ্রহ ক'রে একটি ইলেকট্রন উচ্চশক্তিস্তরে (high energy potential) উপনীত হয়। ফলতঃ ফোটোসিসটেমে একটি

অণু ধনাত্মক আধানযুক্ত (charged) হয়। ফোটোসিসটেম-১ থেকে বহিস্কৃত ইলেকট্রনটি এক 'ইলেকট্রন বাহী' ফেরেডক্সিন (ferredoxin) অণুগুলি দ্বারা গৃহীত হয় ( চিত্র-৫৩ )। ফেরেডক্সিনের আণবিক ওজন 12000 ডালটন। এই অণুতে দু'টি লৌহ ও দুটি উদ্বায়ী গন্ধক পরমাণু থাকে। এর SRP —400 মি. ভো এর অধিক। ফলতঃ এই অণুগুলি যে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তারা যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি উৎপাদনে সক্ষম। ফোটোসিসটেম-2 থেকে বহিস্কৃত ইলেকট্রনটি গৃহীত হয় অনেক কম ( প্রায়-শূণ্য) এস. আর. পি (SRP) যুক্ত প্লাস্টোকুইনোন (plastoquinone) অণু দ্বারা। দুটি system কার্যকরী হওয়া দরকার। বিশেষতঃ $H_2O/O_2$ জুটীতে ইলেকট্রনের স্তর + 820 মি. ভো থেকে বিজারিত এন. এ. ডি. ( $NADPH_2$ )র স্তর —340 মিঃ ভো পর্যন্ত উত্তোলনে এটা প্রয়োজন। ফোটোসিসটেম-২ এর শোষিত কোয়ান্টাম যে ইলেকট্রনকে বহিস্কৃত করে এবং প্লাস্টোকুইনোন যাহাকে গ্রহণ করে তা একটি ইলেকট্রন বাহক সাইট্রোক্রোম সিসটেম (cytochrome system) দ্বারা প্রেরিত হয় যাতে দুই স্তরে দুটি ATP সংশ্লেষণ সম্ভব হয়। ( চিত্র-৫৩ ) সাইক্লিক (cyclic) ও ননসাইক্লিক-দুই প্রকার ফোটোফসফরিলেশনই ঘটে।

## (ই) ব্যাক্টিরিয়ার সালোক সংশ্লেষণ :

সালোক সংশ্লেষণ ব্যাক্টিরিয়ার ফোটোসিসটেম স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এখানে ক্লোরোফিল আলোক শোষণ করে এবং উৎপাদিত শক্তিটুকু বিক্রিয়াকেন্দ্রের জৈব রঞ্জক পি ৮৯০ (P 890) তে স্থানান্তর করে। এক্ষেত্রে ফোটোফসফোরিলেশন একটি চক্রাকার (cyclic) বিক্রিয়া। উৎক্ষিপ্ত ইলেকট্রনগুলিকে একটি ইলেকট্রোনেগেটিভ বাহক গ্রহণ করে যেটি ফেরেডক্সিন কি না নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ব্যাক্টিরিয়াতে প্রাপ্ত ফেরেডক্সিন স্বতন্ত্র প্রকৃতির। এই প্রাথমিক বাহক, ইলেকট্রনকে উবিকুইনোনে ( ubiquinone ) স্থানান্তর করে এবং একটি ইলেকট্রন বাহক মাল্যতে (chain) পৌছায় যেখানে দুটি ফসফোরাইলেশনের স্থান (site) রয়েছে ( চিত্র-৫৪ )। এক্ষেত্রে সাইটোক্রোমগুলির মধ্যে সাইটো-সি (cyt-C) রই আধিক্য বেশী। ইলেকট্রনবাহক মাল্যের শেষে ইলেকট্রনগুলি ফোটোসিসটেমেই ফিরে আসে যাতে ইলেকট্রোনিউট্রালিটি (electroneutrality) বজায় থাকে। উপরিউক্ত চক্রাকার (cyclic)

ফোটোফসফোরিলেশন ব্যতীত চক্রবিহীন (non-cyclic) প্রক্রিয়ার অস্তিত্বও প্রমাণিত হয়েছে।




চিত্র ৫৪ : চক্রাকার সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া : ব্যাক্টিরিয়া

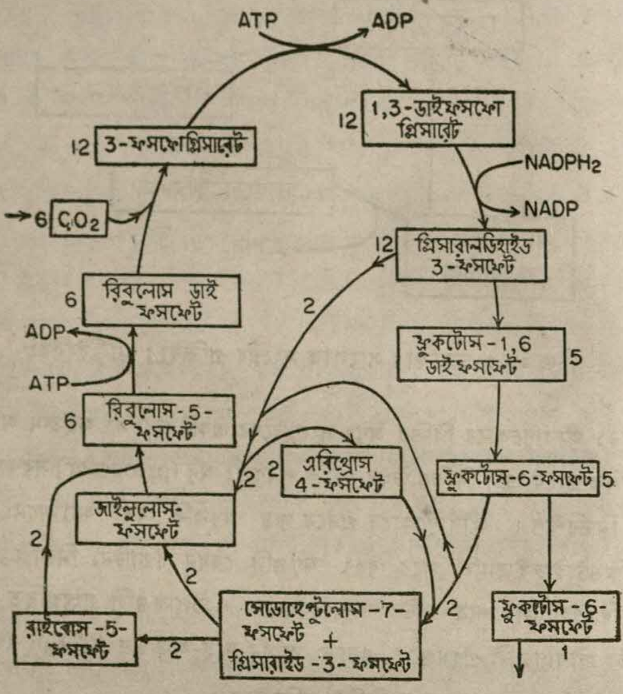
৩·৪১ জীবাণুকোষে বিভিন্ন অণুর সংশ্লেষণের একটি ধারা বা অনুক্রম আছে। প্রাথমিক ভাবে এটা বিভিন্ন উৎস থেকে পূর্ববর্তী অণু (precursor) সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। জীবাণুকোষে প্রথমে ক্ষুদ্র অণুগুলি যথা অ্যামিনো অম্ল, নিউক্লিওটাইড ইত্যাদি, পরে বৃহৎ অণুগুলি যেমন প্রোটিন, নিউক্লিক অম্ল ইত্যাদি এবং সবশেষে জটিল অণু,কোষ অঙ্গ ও উপাঙ্গগুলি সংশ্লেষিত হয়। স্বনির্ভর জীবাণুগুলি প্রথমস্তরে এছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) বন্ধনের মাধ্যমে শর্করা সংশ্লেষণও করে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াতে।

## (অ) কার্বন-ডাই-অক্সাইডের আত্তীকরণ বা কার্বোহাইড্রেট সংশ্লেষণ :

স্বভোজী জীবাণুরা বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) কে অঙ্গারের একমাত্র উৎস হিসাবে ব্যবহার ক'রে জীবনধারণে সক্ষম। কার্বন-ডাই-অক্সাইড যে বিক্রিয়াপথে জৈব পদার্থে পরিবর্তিত হয় তা মূলতঃ বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন (Melvin Calvin) এর শৈবাল সম্পর্কে গবেষণালব্ধ তথ্য এবং বিক্রিয়াপথটি কেলভিন-চক্র (Calvin cycle) নামে পরিচিত।

কেলভিন চক্রের বিশেষত্বের মধ্যে দেখা যায় হেক্সোস সংশ্লেষণ এই বিক্রিয়াপথে স্বয়ং সম্পূর্ণ। এতে দুটি উৎসেচক যথা ফসফোরিবিউলোকাইনেস (phosphoribulokinase) ও রিবুলেস ডাইফসফেট কার্বক্সিলেস (ribulase

diphosphate carboxylase) জীবাণুকোষে শুধুমাত্র এই চক্রেই কার্যেলিপ্ত। কেলভিন চক্রের চিত্রলেখটি নিম্নরূপ। ( চিত্র-৫৫ )




চিত্র ৫৫ : কেলভিন চক্র— সালোক সংশ্লেষ

কেলভিনচক্রে ৬টি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) অণু আত্তীকরণের মাধ্যমে অঙ্গীভূত হয় এবং একটি কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) অণু ফ্রুকটোস-৬-ফসফেট সংশ্লেষণে লাগে। অবশ্য চক্রটিকে গতিশীল রাখার জন্য আরো বেশী অণু অংশগ্রহণ করে। চক্রের মধ্যবর্তী বহু রাসায়নিক চক্র থেকে বাদ পড়ে এবং অন্য সংশ্লেষণের কাজে লিপ্ত হয়, যেমন 3-ফসফোগ্লিসারেট থেকে পাইরুভেট ; এরিথ্রোস-4-ফসফেট থেকে অ্যারোমাটিক অ্যামিনো অম্লগুলি ; রাইবোস 5-ফসফেট থেকে নিউক্লিওটাইডগুলি ইত্যাদি। তবে ঐ সমস্ত অণুর নিঃসৃত পরিমাণ চক্রটি বজায় রেখে যতটুকু উদ্বৃত্ত হয় ততটুকুই। পরবর্তী-কালে **ক্লোরোবিয়াম (Chlorobium)** বা ঐ জাতীয় কিছু ব্যাক্টিরিয়াতে

নতুন কার্বক্সিলেশন (carboxylation) বিক্রিয়া আবিষ্কৃত হবার পর জীবাণুতে কার্বন-ডাই অক্সাইডের ($CO_2$) আত্তীকরণের অন্য বিক্রিয়াপথের সম্ভাবনার কথাও ইদানীং চিন্তা করা হচ্ছে।

## ৩.৪২ অ্যামাইনো অম্লর সংশ্লেষণ :

জীবাণুরা প্রায়ই প্রয়োজনীয় ২০টি অ্যামাইনো অম্লর সবকটিই সরবরাহকৃত খাদ্যবস্তু (mediun) তে প্রত্যক্ষভাবে অথবা প্রোটিন জাতীয় পদার্থকে বহি-র্কোষীয় বা অন্তর্কোষীয় উৎসেচকের সাহায্যে বিয়োজিত ক'রে পরোক্ষভাবে পায়। এছাড়া জীবাণু নাইট্রোজেনের অজৈব লবণ থেকেও অ্যামাইনো অম্ল সংশ্লেষণ করতে হয়। জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধির ও অন্য জৈবনিক প্রয়োজনে অজৈব লবণ উৎসের নাইট্রোজেন দ্বারা অ্যামিনো অম্ল সৃষ্টির প্রয়োজন হয়। কিছু ক্ষেত্রে জীবাণুরা দু-একটি অ্যামিনো অম্লের সরবরাহ ব্যতীত অবশিষ্টগুলি কোষমধ্যেই সংশ্লেষণ করতে পারে। কারণ সমস্ত জীবের আসল (ultimate) নাইট্রোজেন উৎস হচ্ছে অজৈব নাইট্রোজেন।

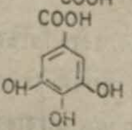
### (অ) অঙ্গারযুক্ত কাঠামোর সরবরাহ :

প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন যুক্ত অজৈব পদার্থ বিভিন্ন অবস্থাতে থাকে। জৈব অণুতে নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়াম আয়ন হিসাবেই প্রবেশ করে। পূর্ব আলোচনাতে দেখা গেছে গ্লুকোস বা অন্য কার্বোহাইড্রেট অণুর বিয়োজনের ফলে নানা ধরনের ও মাপের যে সমস্ত অঙ্গার কাঠামোযুক্ত অণু সৃষ্টি হয় সেগুলি পরে বিভিন্ন সংশ্লেষক বিক্রিয়াতে বিশেষতঃ অ্যামিনো অম্ল সংশ্লেষণে কাজে লাগে। জীবাণুকোষে যেসমস্ত বিভিন্ন মাপের অঙ্গার কাঠামো পাওয়া যায় তার একটি তালিকা দেওয়া হল ( **সারণী-১৯** )।

### (আ) অজৈব নাইট্রোজেনের সরবরাহ :

জীবনের সমস্ত অবস্থার জন্যই নাইট্রোজেনের প্রাথমিক উৎসগুলি হচ্ছে মূলতঃ জৈব নাইট্রোজেন। প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন বিভিন্ন স্তরে জারিত রাসায়নিক হিসাবে পাওয়া যায়। তবে জৈব অণুতে নাইট্রোজেন মূলতঃ অ্যামোনিয়াম ($NH_4^+$) আয়ন হিসাবে প্রবেশ করে। (ক) খাদ্যবস্তুতে অ্যামোনিয়াম বা অন্য অ্যামিনো অম্ল থাকলে তা জীবাণুকোষের জৈব

**সারণী ১৯ : জীবাণুকোষে সংশ্লেষণ কার্যে ব্যবহার্য অঙ্গার কাঠামো সমূহ**

| অণুর পরিচিতি | | অঙ্গার পরমাণুর সংখ্যা |
|---|---|---|
| নাম | রাসায়নিক পরিচিতি | |
| ১। অ্যাসেটিন | $CH_3-CHO$ | দুই অঙ্গার বা কার্বন |
| ২। পাইরুভেট | $CH_3-CO-COOH$ | তিন অঙ্গার |
| ট্রায়োসফসফেট | | তিন অঙ্গার |
| ৩। এরিথ্রোসফসফেট | | চার অঙ্গার |
| অক্সালো অ্যাসিটেট | $HOOC-CH_2-CO.COOH$ | চার অঙ্গার |
| ৪। রাইবোস-৫-ফসফেট | $OHC-CH(OH)-CH(OH)-CH(OH)-CH_2O-P$ | পাঁচ অঙ্গার |
| আলফা অক্সোগ্লুটারেট | $HOOC-CH_2-CH_2-C(=O)-COOH$ | পাঁচ অঙ্গার |
| অ্যাসিটোল্যাকটেট | $CH_3-C(=O)-C(=O)(COOH)-CH_3$ | পাঁচ অঙ্গার |
| ৫। সাইট্রেট | $HOOC-CH_2-C(OH)(COOH)-CH_2-COOH$ | ছয় অঙ্গার |
| ৬। সিকিমেট |  | সাত অঙ্গার |

রাসায়নিকে প্রবেশ করে। (খ) অ্যামিনো অম্ল থাকলে প্রথমে তা অ্যামোনিয়াম মুক্ত (deaminated) হয় এবং $NH_4^+$ আয়ন সৃষ্টি হলে তা উপরিউক্ত পদ্ধতিতেই জৈব অণুতে প্রবেশ করে। (গ) নাইট্রোজেন জারিত অবস্থাতে থাকলে তা প্রথমে বিজারিত হয় নাইট্রেট রিডাকটেস, নাইট্রাইট রিডাকটেস ইত্যাদি উৎসেচক দ্বারা এবং পরে কোষের জৈব রাসায়নিকে প্রবেশ করে।

### (ই) জৈব রাসায়নিক অণুতে অ্যামোনিয়ার প্রবেশ প্রক্রিয়া :

বিভিন্ন জীবাণুতে অ্যামিনো অম্ল সৃষ্টি কল্পে সম্ভাব্য চারটি প্রক্রিয়ায় জৈব রাসায়নিক অণুতে নাইট্রোজেনের প্রবেশ ঘটে। প্রক্রিয়াগুলি সহজভাবে নিম্নরূপ।

মুটামেট ডিহাইড্রোজিনেস

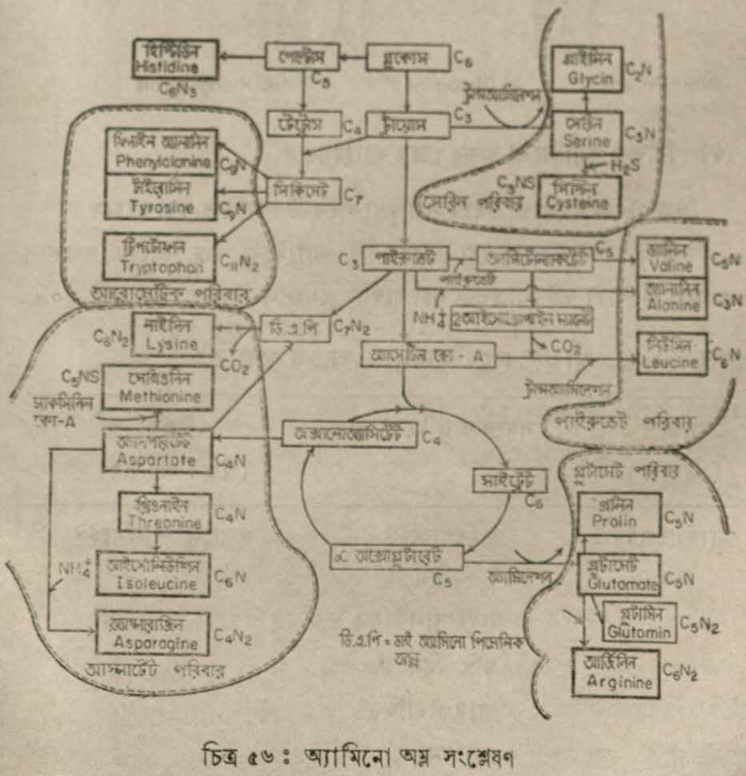
(ক) আলফা কিটোমুটারেট + $NH_4^+$ + $NADPH_2$ ⇌ L-মুটামেট + NADPH + $H_2O$ + $H^+$

বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়াও ছত্রাকে এই প্রক্রিয়া দেখা যায়। এই বিক্রিয়াটিতে মুটামেট সৃষ্টির মধ্যপথে ইমিনোমুটারেট তৈরী হয়।

(খ) ব্যাসিলাস জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া ও অ্যাক্টিনোমাইসিটদের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি অধিকতর প্রচলিত।

অ্যালানিন ডিহাইড্রোজিনেস

Pyruvate + $NADH_2$ + $NH_4^+$ ⇌ L-অ্যালানিন + NAD + $H_2O$ + $H^+$

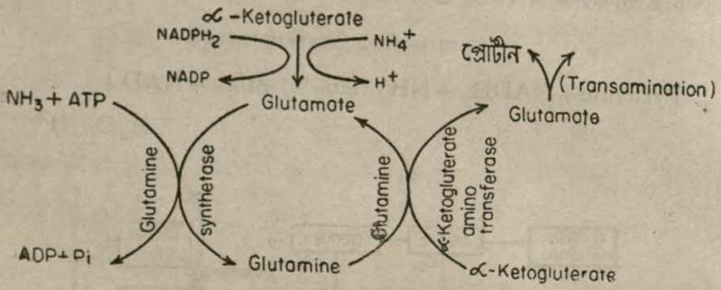


চিত্র ৫৬ : অ্যামিনো অম্ল সংশ্লেষণ

আস্পারটেট অ্যামোনিয়া লায়েস

(গ) Fumerate + $NH_4^+ \rightleftharpoons$ L-Aspartate + $H^+$ প্রক্রিয়াটি ফুমারেট তৈরীতেও কার্যকরী।

(ঘ) ইদানীং **অ্যাজোটোব্যাকটর এরোজিনস (Azotobacter aerogenes)** এ নিয়ন্ত্রিত অ্যামোনিয়া সরবরাহ ব্যবস্থাতে দেখা গেছে নীচের এই প্রক্রিয়া। ঈষ্ট এও দেখা যায়।




## (ঙ) বিভিন্ন অ্যামিনো অম্লর জৈব সংশ্লেষণ ঃ

**চিত্র-৫৬**তে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপিত করা হয়েছে। উল্লিখিত চিত্রলেখতে দেখা যাবে ২০টি অ্যামিনো অম্ল তাদের সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী ৬টি গোত্রভুক্ত করা যায়। সেগুলি নিম্নরূপ। **সারণী-২০।**

**সারণী ২০ ঃ জীবাণুকোষে অ্যামিনো অম্লের প্রকৃতি ঃ**

| গোত্র ( সংখ্যা ) | সদস্য অ্যামিনো অম্ল | উৎস ( জৈব অম্ল/লবণ ) |
|---|---|---|
| অ্যাসপারটেট ( ৬ ) | অ্যাসপারটেট<br>থ্রিওনাইন<br>আইসোলিউসিন<br>মেথিওনিন<br>অ্যাসপারাজিন<br>লাইসিন | অক্সালো অ্যাসিটেট |

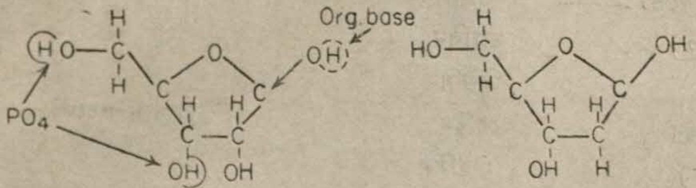
| গোত্র (সংখ্যা) | সদস্য অ্যামিনো অম্ল | উৎস জৈব অম্ল/লবণ |
|---|---|---|
| অ্যারোমাটিক (৩) | ফিনাইল অ্যালানিন | সিকিমেট |
| | টাইরোসিন | |
| | ট্রিপটোফান | |
| গ্লুটামেট (৪) | গ্লুটামেট | আলফা অক্সো গ্লুটারেট |
| | প্রোলিন | |
| | আর্জিনিন | |
| | গ্লুটামিন | |
| পাইরুভেট (৩) | অ্যালানিন | পাইরুভেট |
| | ভ্যালিন | |
| | লিউসিন | |
| সেরিন (৩) | সেরিন | ট্রায়োস ফসফেট |
| | গ্লাইসিন | |
| | সিসটাইন | |
| একক | হিস্টিডিন | পেন্টোস ফসফেট |

পূর্বে উল্লিখিত সমস্ত বিক্রিয়াগুলিই L-অ্যামিনো অম্ল সংশ্লেষণ করে। কিন্তু ব্যাক্টিরিয়ার কোষপ্রাচীরে বা আঠাল স্তরে কিছু D-অ্যামিনো অম্লও থাকে যা সংশ্লেষণ হয় সাধারণতঃ এল-অ্যামিনো অম্লগুলি থেকে বিভিন্ন racemase জাতীয় উৎসেচকের সাহায্যে racemisation এর মাধ্যমে। এছাড়া দু' একটি ক্ষেত্রে আলফা কিটোগ্লুটারেট থেকে ডি-গ্লুটামেট তৈরী করার ট্রান্সঅ্যামিনেসও পাওয়া গেছে।

### (উ) নিউক্লিওটাইড অণুগুলির জৈব প্রকৃতি ও সংশ্লেষণ :

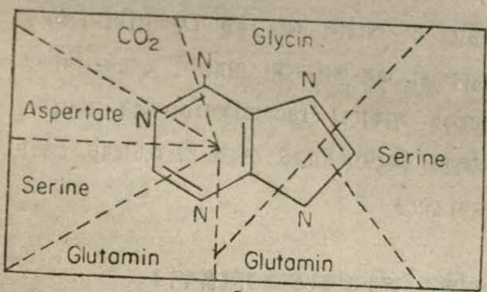
নিউক্লিওটাইড অণুগুলি এক একটি জটিল রাসায়নিক। একটি জৈবক্ষার, একটি রাইবোস (পেন্টোস) বা ডি-অক্সিরাইবোস জাতীয় শর্করা ও একটি ফসফেট অণুর সংযোগে একটি নিউক্লিওটাইড গঠিত। জৈবক্ষার (অ্যাডেনিন)

ও শর্করাযুক্ত অণুটিকে বলা হয় নিউক্লিওসাইড (অ্যাডেনোসাইন)। সাথে ফসফেটযুক্ত থাকলে বলা হয় নিউক্লিওটাইড (অ্যাডেনিলিক অম্ল, AMP)। জৈব ক্ষারের দু'টি পুরাইন জাতীয় যেমন গুয়ানিন (guanine) ও অ্যাডেনিন (adenine) এবং তিনটি পিরিমিডিন জাতীয় যেমন থাইমিন (thymin), সাইটোসিন (cytosin) ও ইউরাসিল (uracil)। পাঁচটি জৈবক্ষার দ্বারা ৫টি নিউক্লিওটাইড গঠিত হয়। জীবাণু কোষে দুই প্রকার অ্যামিনো অম্ল যথা ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিক অম্ল (DNA) ও রিবোস নিউক্লিক অম্ল (RNA) রয়েছে। প্রত্যেকটির মধ্যে চারটি করে নিউক্লিওটাইড থাকে। গ্লুকোস থেকে একটি অঙ্গার পরমাণু ($CO_2$) হিসাবে বার হয়ে গেলে একটি রাইবোস (চ) পরমাণু পাওয়া যায় যার রাসায়নিক গঠন নিম্নরূপ। রাইবোস অণু থেকে

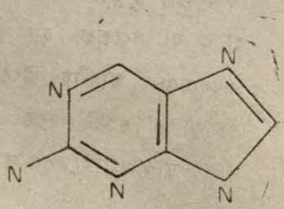



(চ) (ছ)

একটি ($O_2$) পরমাণু বিমুক্ত হলে উৎপাদিত অণুটি হয় ডি-অক্সিরাইবোস (ছ) হয়। পূর্বোক্ত পাঁচটি জৈবক্ষারের রাসায়নিক প্রকৃতি ও গঠন নিম্নরূপ। পুরাইন



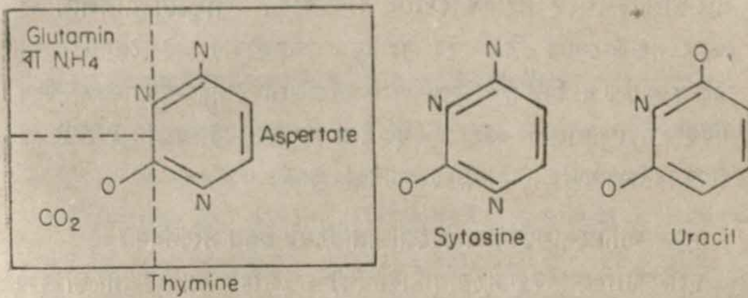

অ্যাডেনিন



গুয়ানিন

অণুগুলির গঠনে দেখা যায় ৫টি অঙ্গার ও ৪টি ক'রে নাইট্রোজেন রয়েছে। এগুলির মধ্যে C পরমাণু মূলতঃ $CO_2$, গ্লাইসিন ও সেরিন অণু থেকে এবং

নাইট্রোজেন গ্লুটামিন (২), অ্যাসপারটেট ও গ্লাইসিন থেকে ; পিরিমিডিন অণুগুলিতে ৪টি করে অঙ্গার ও ৩টি করে নাইট্রোজেন পরমাণু রয়েছে। সংশ্লেষণে কার্বন পরমাণুগুলির উৎস $CO_2$, অ্যাসপারটেট (৩) অণু থেকে এবং নাইট্রোজেন পরমাণু আসে অ্যাসপারটেট (১), গ্লুটামিন বা অ্যামোনিয়াম আয়ন ($NH^{4+}$)



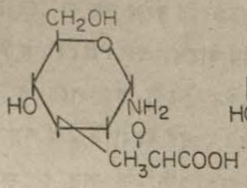

থেকে। পুরাইন ও পিরিমিডিন নিউক্লিওটাইডগুলি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিক্রিয়াপথে সংশ্লেষিত হয়।

জীবাণু কোষে সাধারণত: প্রথমে রাইবোনিউক্লিওটাইডগুলি সংশ্লেষিত হয়। পরে রাইবোনিওক্লিওটাইড থেকে ডি-অক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড সংশ্লেষিত হয়। নিউক্লিওটাইডগুলির তিনটি অংশ সংযুক্ত হ'য়ে নিউক্লিওটাইড তৈরীর প্রক্রিয়া নিম্নরূপ। প্রথমতঃ রাইবোস থেকে রাইবোস-৫-ফসফেট তৈরী হওয়ার পর উহা এ. টি. পির সাথে বিক্রিয়ার ফলে ফসফোরিবোসিল পাইরোফসফেট (PRPP) তৈরী হয়। তৃতীয় ধাপে এই PRPP গ্লুটামিনের সাথে বিক্রিয়ান্তে 50 ফসফোরিবোসিলামাইন তৈরী হয় পরে যা ইনোসিনিক অম্লে (inosinic acid) পরিবর্তিত হয়। এই ইনোসিনিক অম্ল অ্যাসপারটেট এর সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যাডেনিলোসাকসিনিক অম্ল বা জানথিলিক অম্ল সৃষ্টি করে। এই অণু দুটি পরে যথাক্রমে অ্যাডেনিলিক অম্ল (AMP) এবং গুয়ানিলিক অম্ল (GMP) নামক দুটি নিউক্লিওটাইডে পর্যবসিত হয়। এইভাবে কার্বামেয়েল ফসফেট ও অ্যাসপারটেটের বিক্রিয়া থেকে ইউরিডোসাকসিনেট পরিবর্তিত হ'য়ে অরোটেট (orotate), অরোটিডিন-৫ ফসফেট ও সবশেষে ইউরিডিলিক অম্ল (UMP) সৃষ্টি হয়। ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিওটাইডগুলির সংশ্লেষণ সম্পর্কে ধারণা এখনও অসচ্ছ। বিভিন্ন জীবাণুতে বিভিন্ন প্রক্রিয়া

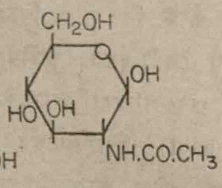
হ'তে পারে। ব্যাক্টিরিয়াতে দেখা গেছে রাইবোনিউক্লিওসাইড ডাইফসফাইড গুলি বিজারিত হ'য়ে রাইবো নিউক্লিওটাইডগুলি তৈরি হয়। চারটি ক্ষেত্রেই রাইবোনিউক্লিওটাইড ডাইফসফেট রিডাকটেস উৎসেচকের দ্বারা এইভাবে পরিবর্তিত হয়। বিক্রিয়াগুলিতে ম্যাগনেসিয়াম পরমাণু **ই. কোলি** ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে কাজ করে; **লাক্টোব্যাসিলাস** এর ক্ষেত্রে সহ-উৎসেচক বি-১২ হয় সহায়ক। বহু জীবাণু এই জৈবক্ষার, বা নিউক্লিওসাইড বা নিউক্লিওটাইড—সবই প্রয়োজনে তৈরি অবস্থাতেও গ্রহণ ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও মুক্ত জৈবক্ষারগুলি সোজাসুজি PRPP এর সাথে বিক্রিয়া ঘটায় ও নিউক্লিওটাইড তৈরি করে।

## ৩·৪৩ অ্যামিনোশর্করা বা হেক্সোসামাইনের জৈব সংশ্লেষণ:

দুইটি অ্যামিনোশর্করা গ্লুকোসামাইন (ক) ও মুরামিক অম্ল (খ) ব্যাক্টিরিয়ার কোষ প্রাচীরে এবং প্রথমটি কিছু ছত্রাকের কোষ প্রাচীরের গঠনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। এগুলি সবই ৬ অঙ্গারযুক্ত অণু। প্রথমে ট্রানস্অ্যামিনেশনের মাধ্যমে হেক্সোস অণুর মধ্যে গ্লুটামিন থেকে একটি অ্যামিনো গ্রুপ প্রবেশ করে। এইভাবে হেক্সোস্যামাইন গঠিত হয়। তবে কোষ প্রাচীরের গঠনে ওই অণুগুলি অংশগ্রহণ করে অ্যাসেটিলেটেড হবার পর।




(খ)




(ক)

## ৩·৪৪ ফ্যাটি অম্ল অণুর সংশ্লেষণ:

জীবাণু কোষের বহুবিধ লিপিডের মধ্যে অনেকগুলির সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। লিপিড সংশ্লেষণের প্রাথমিক স্তরে ফ্যাটি অম্লগুলির সহ-উৎসেচকে এষ্টার সংশ্লেষিত হয়। দীর্ঘ সূত্র যুক্ত সমসংখ্যক অঙ্গার পরমাণুযুক্ত ফ্যাটি অম্ল সংশ্লেষণের বিক্রিয়াপথটিকে

ম্যালোনিল-সহ-উৎসেচক এ (malonyl Co-enz. A) বিক্রিয়াপথ বলা হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ।

$$H.CH_2.CO.S.COA + CO_2 + ATP \xrightarrow{\text{acetyl co. A carboxylase}} HOOC.CH_2.CO.S.COA + ADP + P_2.$$

## ৩·৫০ জীবাণুকোষে বৃহদাণু ও কোষঅঙ্গের সংশ্লেষণ ঃ

জীবাণুকোষের বৃহৎ অণুগুলি যথা নিউক্লিক অম্ল, প্রোটিন, পলিসাকারাইড প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাতে স্বতন্ত্রভাবে অন্য অণুর সাথে সংশ্লিষ্ট ভাবে পাওয়া যায়। এই প্রাথমিক অণুগুলি যে বিভিন্ন অণুর সাথে জটিল অবস্থাতে পাওয়া যায় তার মধ্যে ব্যাক্টিরিয়া কোষের পেপটিডোগ্লাইকান বা "মিউরিন" (murein) অন্যতম, যাতে পলিসাকারাইড ও পলিপেপটাইড একই অণুর গঠনে সংশ্লিষ্ট থাকে।

অনেকগুলি ক্ষুদ্র একক অণু ঘনীভূত (condense) হয়ে বৃহৎ অণু গঠিত হয়। একক অণুগুলি (units) একই রাসায়নিক হলে সংগঠিত বৃহদাণুটিকে বলা হয় সমএককবৃহদাণু (homopolymer) যেমন সেলুলোস। যখন একাধিক ভিন্ন প্রকারের একক অণু দ্বারা সংগঠিত হয় তখন সেই বৃহদাণুকে বলা হয় বহু-একক বৃহদাণু (heteropolymer)। বহু-একক বৃহদাণুগুলির এককগুলি যখন নির্দিষ্ট ছন্দে পুনঃপুনঃ সাজানো থাকে তখন তাদের বলা হয় রিপিটিটিভ হেটারোপলিমার (repetitive heteropolymer) যেমন পেপাটিডোগ্লাইকান। বাকী বহু একক বৃহদাণুগুলিতে একক অণুগুলি কোন নির্দিষ্ট ছন্দে গ্রথিত থাকে না। এদের বলা হয় নন রিপিটিটিভ হেটারোপলিমার (non-repetitive heteropolymer) যেমন প্রোটিন বা নিউক্লিক অম্ল।

## ৩·৫১ বৃহদাণুর সমতা ও অসমতা ঃ

জীবাণুকোষে যে বৃহৎ অণুগুলি দেখা যায় তাদের যতগুলি অণু একটি কোষে থাকে তাদের প্রতিটি একই মাপের কোন কোন ক্ষেত্রে হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে হয় না। প্রোটিন বা নিউক্লিক অম্লের ক্ষেত্রে দেখা যায় একই প্রোটিন বা একই নিউক্লিক অম্লের প্রতিটি অণুই একই ছন্দে বাঁধা (sequence) এবং একই

আণবিক ভরযুক্ত। অন্য কিছু অণু যেমন পলিসাকারাইডের ক্ষেত্রে একই বৃহৎ পলিসাকারাইড রাসায়নিকের বিভিন্ন অণুগুলি একটি সীমারেখার মধ্যে বিভিন্ন মাপ ও ভরের হয়। এ জাতীয় রাসায়নিককে বলা হয় পলিডিস্‌পার্স (polydisperse)। এ ধরনের রাসায়নিকের আণবিক ভর ধরা হয় সমস্ত অণুগুলির ওজনের গড়।

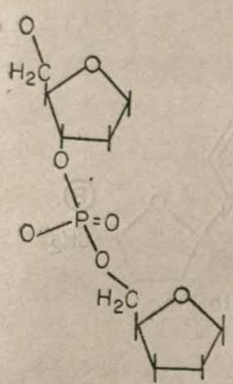
## ৩·৫২ নিউক্লিক অম্লগুলির গঠন :

(অ) জীবাণুকোষে নিউক্লিক অম্ল দুই প্রকারের, যথা ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অম্ল বা ডি. এন. এ. এবং রাইবোনিউক্লিক অম্ল বা আর. এন. এ। সাধারণতঃ প্রথমোক্ত অম্ল থাকে নিউক্লিয়াসের ও অন্য দু-একটি কোষঅঙ্গের মধ্যে আর. এন. এ. থাকে কোষবস্তুও দু'একটি কোষঅঙ্গে। দুই প্রকার নিউক্লিক অম্লের রাসায়নিক গঠনগত বিশেষত্ব নিম্নরূপ। ( **সারণী-২১** )

### সারণী ২১ : নিউক্লিক অম্লগুলির বিশেষত্ব

| রাসায়নিক অংশ | ডি. এন. এ. | আর. এন. এ. |
|---|---|---|
| ১। জৈবক্ষার (Organic base) : | | |
| (ক) পুরাইন (Purines) | অ্যাডেনিন | অ্যাডেনিন |
| | গুয়ানিন | গুয়ানিন |
| (খ) পিরিমিডিন (Pyrimidines) | সাইটোসিন | সাইটোসিন |
| | থাইমিন | ইউরাসিল |
| ২। শর্করা (Sugar) | ডিঅক্সিরাইবোস | রাইবোস |
| ৩। ফসফেট | ফসফেট | ফসফেট |
| ৪। নিউক্লিওসাইড : | অ্যাডেনোসাইন | — |
| ( শর্করা ও জৈবক্ষারের সমষ্টি ) | গুয়ানোসাইন | — |
| | সাইটোসিডিন | — |
| | থাইমিডিন | ইউরিডিন |

| রাসায়নিক অংশ | ডি. এন. এ. | আর. এন. এ. |
|---|---|---|
| ৫। নিউক্লিওটাইড (শর্করা, জৈবক্ষার ও ফসফেটের সমষ্টি) | অ্যাডেনিলিক অম্ল বা এ. এম. পি. | — |
| | গুয়ানিডিনোলিক অম্ল বা জি. এম. পি. | — |
| | সাইটাডিলিক অম্ল বা সি. এম. পি. | — |
| | থাইমিডিনিক অম্ল বা টি. এম. পি. | ইউরিডিলিক অম্ল বা ইউ. এম. পি. |




চিত্র ৫৭

**(অ) নিউক্লিওসাইড গ্রন্থনের দ্বারা সূত্র গঠন (Strand) :**

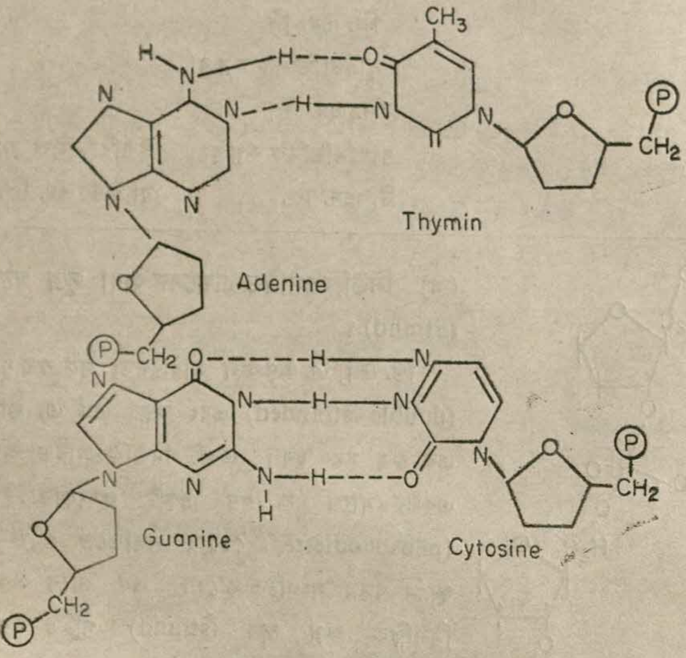
ডি. এন. এ. অণুগুলি সাধারণতঃ দুই সূত্র যুক্ত (double stranded) এবং আর. এন. এ. গুলি এক সূত্র যুক্ত হয়। একটি নিউক্লিওসাইড আর একটির সাথে যুক্ত হয় একটি ফসফোডাইষ্টার (phosphodiester) তৈরীর পদ্ধতিতে ৩ ও ৫ স্থানে বন্ধন সংগঠিত ক'রে। এই ভাবে একটি নিউক্লিক অম্ল সূত্র (strand) গঠিত হয়। (চিত্র-৫৭)।

**(ই) জৈবক্ষারের জোড়-বন্ধন ও দুটি সূত্রের সংযোগ সাধন :**

নিউক্লিক অম্লের সূত্র দু'টি পরস্পরের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে প্রত্যেকটি জৈবক্ষার জোড়ের মধ্যে। এই জোড় বন্ধন হয় শুধুমাত্র পরিপূরক (complementary) ক্ষারগুলির মধ্যে। ডি. এন. এর ক্ষেত্রে পরিপূরক জৈবক্ষার জোড়গুলি হচ্ছে অ্যাডেনিন (A) ও থাইমিন (T) এবং সাইটোসিন

(C) ও গুয়ানিন (G)। আর. এন. এ, তে সাইটোসিন ও গুয়ানিন এবং অ্যাডেনিন ও ইউরাসিল (U)।

জৈবক্ষারের মধ্যে জোড় বন্ধনগুলি রাসায়নিক হাইড্রোজেন বন্ধন (hydrogen bond); যার মধ্যে G ও C-র বন্ধনটা A ও T বা A ও U-র মধ্যবর্তী বন্ধনের চেয়ে দৃঢ়। (চিত্র-৫৮)।

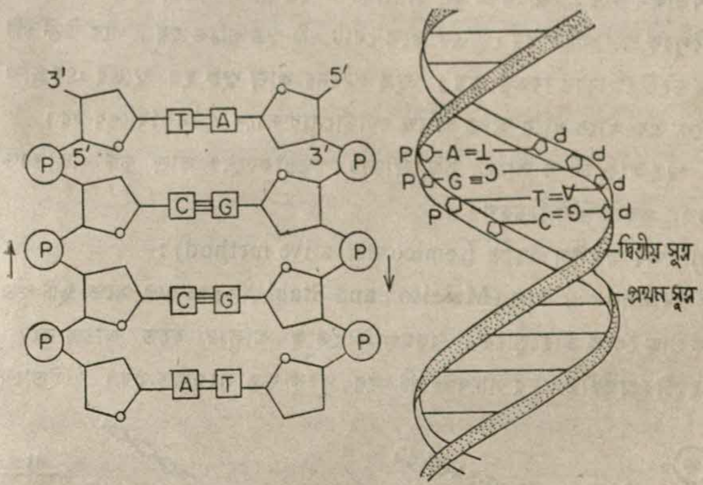



চিত্র ৫৮

(ঈ) ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অম্লর গঠন :

বিজ্ঞানী ওয়াটসন ও ক্রিক (Watson and Crieck), ১৯৫৩ ডি.এন. এর রঞ্জনরশ্মিভিত্তিক প্রতিসরণ (x-ray diffraction) প্রকৃতি প্রভৃতি পর্যালোচনা ক'রে ও পূর্বে সংগৃহীত রাসায়নিক প্রকৃতির ধারণা সংঘবদ্ধ করে ডি. এন. এর দ্বি-আবর্ত (double helix) গঠন প্রকৃতির কথা প্রস্তাব করেন। পরস্পর অসংখ্য হাইড্রোজেন বন্ধনের দ্বারা দৃঢ়সংবদ্ধ সূত্র দুটি আবর্তাকারে সাজানো।

একটি সূত্র তার নিউক্লিওটাইডের পর্যায়ক্রম (sequence) অনুযায়ী অপরটির ঠিক পরিপূরক। গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে এটি একটি দক্ষিণ-আবর্তযুক্ত অণু যার মেরুদণ্ড থাকে পরিধিতে এবং তৈরী হয় শর্করা ও ফসফেট অণু দ্বারা। হাইড্রোজেন-বন্ধনে আবদ্ধ জৈবক্ষার জোড়াগুলি অণুর ভিতর দিকে অবস্থিত। (চিত্র-৫৯)।




চিত্র ৫৯ : নিউক্লিক অম্লের গঠন-প্রকৃতি

দুটি সূত্রের বিন্যাস পরস্পরের মধ্যে বিপরীতমুখী সমান্তরাল (anti-parallel) হওয়ার ফলে অম্লটিকে 180° ডিগ্রী ঘোরালে তার আকৃতি একই রকম থাকে। নিউক্লিওটাইডগুলির জোড় বন্ধন রেখা সূত্র মেরুদণ্ডের রেখার সাথে উল্লম্ব হিসাবে দণ্ডায়মান। প্রতি আবর্তনে (turn) ১০ জোড়া করে নিউক্লিওটাইড থাকে। হাইড্রোজেন বন্ধনগুলি অণুটিকে যথেষ্ট স্থায়ী (stable) ক'রে তোলে। এছাড়া দুটি সূত্রের দুটি শর্করার অণু সবসময় সমদূরত্বে অবস্থান করে। এসমস্তই অণুটির সর্বমুখী সমতা বজায় রাখতে সহায়ক—যে বিশেষত্বটির জৈবনিক গুরুত্ব অসীম। এই অণু অতি বৃহৎ হওয়ার জন্য আণবিক ভর $5 \times 10^9$ (ই. কোলি) মত হয়। সাধারণতঃ ব্যাক্টিরিয়াদের ডি. এন. এর আণবিক ভর $5 \times 10^7$ ডালটন বা কমবেশী।

### ৩·৫৩ নিউক্লিক অম্লর সংশ্লেষণ :

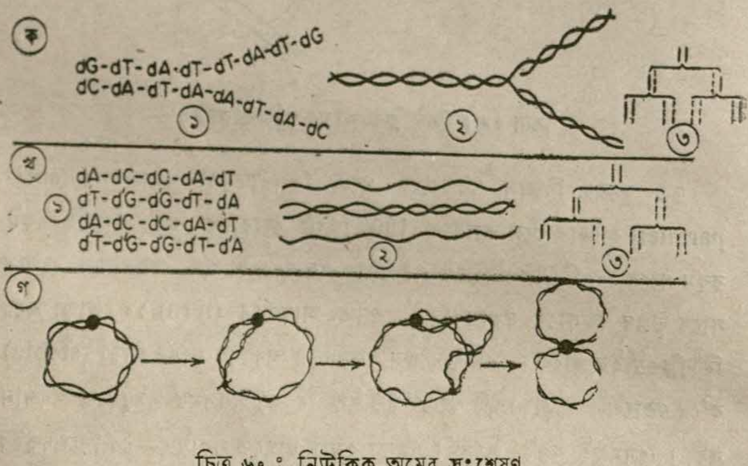
### (অ) ডি. এন. এর স্ববিভাজন বা সংশ্লেষণ :

ডি. এন. এ অণুর প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য স্ববিভাজন ক্ষমতা। এটাই এর সংশ্লেষণের মূলসূত্র। এই স্ববিভাজনের মাধ্যমে কোষের বংশগত বৈশিষ্ট্যাবলী পরবর্তী জাতকে পৌছায়। ডি. এন. এ. অণু ক্রমান্বয়ে আকারে বৃদ্ধি পায় ও স্ববিভাজন করে। প্রথমতঃ মূল শাখাবিহীন সূত্র দুটির প্রত্যেকটির একটি করে পরিপূরক সূত্র গঠিত হয়। এর ফলে মোট ৪টি সূত্র গঠিত হয়। পরে উক্ত ৪টি সূত্র দুইটি জোড়ায় বিভক্ত হয়। সূত্র গঠনের কাজ সুরু হয় সূত্রের একপ্রান্ত থেকে এবং ধীরে ধীরে অপর প্রান্তে পৌছানোর সাথে গঠনকার্য শেষ হয়।

সূত্র সংশ্লেষণ ও তাদের দুটি জোড়ায় স্বতন্ত্রীকরণের কাজ দুটি পদ্ধতিতে হয়। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ।

(ক) অর্ধরক্ষণশীল পদ্ধতি (semiconservative method) :

মেসেলসন ও স্টাল (Meselson and Stahl), ১৯৫৮ এর মতে দুটি সূত্র একপ্রান্ত থেকে হাইড্রোজেন বন্ধনগুলি ভেঙ্গে আলাদা হতে আরম্ভ করে। সূত্রজুটীর স্বতন্ত্রীভবনের সাথে একটি করে পূরক সূত্র সংগঠিত হয়। এইভাবে




চিত্র ৬০ : নিউক্লিক অম্লের সংশ্লেষণ

সূত্রজুটীর স্বতন্ত্রীকরণ সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে মোট দুটি সূত্রজুটী সৃষ্টি হয়। প্রকৃতিতে সাধারণতঃ এই ভাবেই ডি. এন. এ. সংশ্লেষিত হয়। (**চিত্র-৬০**)। এক্ষেত্রে

উদ্ভূত দুটি জুড়ির প্রত্যেকটিতেই একটি করে পুরাতন সূত্র ও একটি করে নূতন সূত্র থাকে। এজন্যই এই পদ্ধতিকে অর্ধরক্ষণশীল বলা হয়েছে।

(খ) রক্ষণশীল পদ্ধতি : (conservative method) :

মূলসূত্র জুড়ির দুই পৃষ্ঠে দুটি নূতন ও পরিপূরক সূত্র গঠিত হয়। পরে নূতন সংগঠিত সূত্র দুটি মূল সূত্র জোড়া থেকে আলাদা হয় ও পরে পরস্পরের সাথে হাইড্রোজেনবন্ধন দ্বারা আবদ্ধ হয়। এই পদ্ধতিতে কোষের পুরাতন ডি. এন. এ সূত্রজুড়ি একটি স্বতন্ত্র এবং একটি নূতন সূত্র জুড়ি বেঁধে আরেকটি সূত্রজুড়ি সৃষ্টি করে ( চিত্র-৬০ )।

(গ) ব্যাক্টিরিয়া বা অন্য প্রোকোরিওট জীবাণুর ডি. এন. এ বৃত্তাকার বলে তার দ্বিবিভাজন ও সংগঠনের বিশেষ বিশেষত্ব রয়েছে। ( চিত্র-৬০ )।

বৃত্তের যে স্থান থেকে দ্বিবিভাজন সুরু হয় তাকে বিভাজন উৎস বলা হয়। উৎস থেকে সূত্রের একদিকেই বিভাজন মুখটি (growing point) অগ্রসর হয়।

(ঘ) এই সংশ্লেষণ বা সংগঠনের কাজ সুরু হয় ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিওটাইড-গুলির পাইরোফসফেট (pyrophosphate derivative) গুলি থেকে। চারটি নিউক্লিওটাইড যথা অ্যাডেনিলিক অম্ল, সাইটিডিলিক অম্ল, গুয়ানিলিক অম্ল ও থায়মিনডিক অম্ল অণুর সংযুক্তিকরণ হয় (polymerisation), ডি. এন. এ পলিমারেস (DNA polymerase) উৎসেচক এবং মূল ডি. এন. এ. সূত্রাংশ বা ছাঁচের (template) উপস্থিতিতে।

বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী কর্নবার্গ (Kornberg) ১৯৫৬ সালে গবেষণাগারে এই সংশ্লেষণ পরীক্ষামূলকভাবে সফল করেন। ডি. এন. এ. পলিমারেস আসলে কয়েকটি উৎসেচকের সংঘবদ্ধ নাম। এর মধ্যে ডি. এন. এ পলিমারেস-১ শুধুমাত্র স্বল্প দৈর্ঘ্যযুক্ত কিছু সূত্র সংশ্লেষণে সক্ষম। ডি. এন. এ পলিমারেস-২ ও ৩ উক্ত ক্ষুদ্র সূত্রগুলি বা 'ওকাজাকি টুকরা' (Okazaki pieces), গুলিকে যুক্ত ক'রে দীর্ঘ সূত্রে পরিণত করে। এছাড়া সমগ্র সূত্রের একীকরণে লাগে আর একটি উৎসেচক যার নাম লাইগেস (ligase)।

**(অ) রাইবোনিউক্লিক অম্লর সংশ্লেষণ ঃ**

রাইবোনিউক্লিক অম্লর সংশ্লেষণ হচ্ছে ডি. এন. এ.র দ্বিতীয় জৈবনিক ক্রিয়া। এই ক্রিয়ার বিশেষ নাম হচ্ছে প্রতিলিখন (transcription)। যদিও

এই শব্দটি m RNA র ক্ষেত্রেই বহুল ব্যবহৃত কারণ ডি. এন. এ.র এক অংশে m RNA হিসাবে প্রতিলিখিত হয়। আর রাইবোসোমাল আর. এন. এ (rRNA) ও ট্রানসফার আর. এন. এ (t RNA) মাত্র ২'০% ও ০'২% থাকে। জীবাণুকোষে ডি. এন. এ সাধারণতঃ তিন প্রকার কার্যকরী আর. এন. এ অণু সংশ্লেষণ করে। (১) রাইবোজমের আর. এন. এ বা rRNA (২) অ্যামিনো অম্লবাহক আর. এন. এ বা t RNA (transfer RNA) ও (৩) নির্দেশবাহক আর. এন. এ বা m RNA (messanger RNA)। এই আর. এন. এ গুলির আকার, অবস্থান ও গঠন আলাদা ধরনের। তবে প্রত্যেকটি ডি. এন. এ সূত্রের যথাযথ অংশের প্রতিলিপি। এই সংশ্লেষণে ব্যবহৃত পূর্ব অণু (precursor) গুলি রাইবোনিউক্লিওটাইড এবং ডি. এন. র যে অংশ কাজ করাতে ইচ্ছুক সেই সূত্রাংশে একটি পরিপূরক আর. এন. এ সূত্রাংশ সংগঠিত হয়। আর. এন. এ তৈরী করার জন্য ব্যবহৃত নিউক্লিওটাইড গুলি ছাড়া আর. এন. এ পলিমারেস উৎসেচক (RNA nucleotidyl transferase) এবং ছাঁচ হিসাবে ডি. এন. এ সূত্রের অংশ বিশেষের উপস্থিতিতে সংশ্লেষণ হয়।

```
              dC—dA—dT—dA—dG
              |   |   |   |   |
ডি. এন. এ     dG—dT—dA—dT—dC →C—A—U—A—G
              |   |   |   |   |
আর. এন. এ    <C—A — U — A —G      ( আর. এন. এ )
```

দুই সূত্রযুক্ত আর. এন. এ অণু সংশ্লেষণকালে প্রথমে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে একটি সূত্র গঠিত হয় এবং পরে পরবর্তী সূত্রটি গঠিত হয়। অনেক t RNA র ক্ষেত্রে নূতন সূত্র সংশ্লেষণ ঘটে একই সূত্রের এক অংশের নিউক্লিওটাইডের সাথে অন্য অংশের নিউক্লিওটাইডের জোড়-বন্ধন মাধ্যমে যার ফলে সূত্রবৎ t RNA অণুটি ভাঁজ হ'য়ে থাকে ( চিত্র-২৩ )। RNA পরিমারেস উৎসেচকটি পাঁচটি উপাংশ দ্বারা গঠিত। দুটি আলফা সূত্রাংশ (α-chain), একটি বিটা সূত্রাংশ (β-chain), একটি বিটা-ডাস সূত্রাংশ (β'chain) এবং একটি ক্ষুদ্রাকার সিগমা সূত্রাংশ (δ-component)। সিগমা সূত্রাংশটি উৎসেচক অণু থেকে আলাদা হ'য়ে কাজ করতে পারে। এই উৎসেচকের ক্রিয়াকলাপ

কতকগুলি কোষমধ্যবর্তী কারণের (transcriptional factors) উপর নির্ভরশীল। কারণগুলি ও তাদের ক্রিয়াকলাপ নিম্নরূপ।

(১) রো-কারণ (*P*-factor) প্রোটিন অণু গঠনের সমাপ্তি ঘোষণা করে ;

(২) সাই-কারণ ($\psi$-factor) বিভিন্ন আর. এন. এর সংশ্লেষণের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

## ৩·৫৪ প্রোটিন সংশ্লেষণ ঃ

সমস্ত জীব ও জীবাণু কোষে প্রোটিন সংশ্লেষণের এক সাধারণ পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। দুটি অ্যামিনো অম্ল একটি উৎসেচকের প্রভাবে ঘনীভূত হ'য়ে একটি পেপটাইড অণু ও একটি জল সৃষ্টি করে। যদিও প্রায় ২০টি বিভিন্ন অ্যামিনো অম্ল জীবাণুকোষের প্রোটিনে রয়েছে তবে তাদের পরস্পরের মধ্যে জোড়বন্ধন (bond) একই প্রকৃতির যার নাম পেপটাইড বন্ধন (peptide bond)। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি পেপটাইড বন্ধনের জন্য একটি করে স্বতন্ত্র উৎসেচকের প্রয়োজন ধরলে একটি প্রোটিন তৈরির জন্য অসংখ্য উৎসেচকের প্রয়োজন। কিন্তু শারীরবৃত্তে তা হয় না।

$$H_2N.CH.COOH + H_2N.CH.COOH \rightleftharpoons H_2N.CH.CONH.$$

পেপটাইড

$$CHCOOH + H_2O$$

প্রোটিনে সমস্ত অ্যামিনো অম্লগুলি সাজানোর ও জোড়বন্ধনের অতি বিচিত্র প্রক্রিয়া জানা গেছে।

### (অ) প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রাথমিক স্তরের বিক্রিয়া ঃ

(ক) অ্যামিনো অম্লের সক্রিয়করণ ঃ

সংশ্লেষণের সুরুতেই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অম্ল অণুগুলির সক্রিয়করণ (activation) প্রয়োজন হয় ও ঘটে। অ্যামিনো অম্লের সাথে এ. টি. পির বিক্রিয়ার ফলে পাইরোফসফেট ও অ্যামিনো অম্লটির একটি এ. এম. পি সংশ্লিষ্ট অণু (AMP derivative) গঠিত হয়, যেটিই হচ্ছে সক্রিয় অ্যামিনো অম্ল। এই কাজে বেশীর ভাগ এল-অ্যামিনো অম্লই ব্যবহৃত হয়।

$$H_2N.CH.COOH + ATP \xrightarrow{\text{অ্যামিনো}} H_2N.CHCO{\sim}AMP$$

অ্যামিনো অম্ল এ.টি.পি. অ্যাসিল অ্যামিনো অম্ল এ.এম.পি জোট
সিনথেটেস

পরবর্তী বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয় শক্তি এইভাবে এই সক্রিয় অণুতে সঞ্চিত থাকে।

(খ) ত্রিবর্ণ সংকেত লিপি (triplet code) :

সমস্ত সক্রিয় অ্যামিনো অম্লগুলি একটি নির্দিষ্ট অনুক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়, কোন বিশেষ প্রোটিন তৈরীর উদ্দেশ্যে। বিড্‌ল ও টাটামের (১৯৪১) সূত্র অনুযায়ী একটি জীন বা বংশাণু (gene) বা ডি. এন. এর অংশ একটি উৎসেচক প্রোটিন তৈরী করে, যাতে সেই উৎসেচকের মাধ্যমে জীন তার করণীয়টুকু করতে পারে। সংশ্লেষিত প্রোটিনের প্রকৃতিও ঐ ডি. এন. এ সূত্রাংশের মধ্যে নিউক্লিওটাইড বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। এই সূত্রাংশে যে ভাষাতে জৈবনিক বিশেষত্ব লিখিত রয়েছে তার সংকেতলিপি পাঠানোর একটি পদ্ধতিও রয়েছে। ওয়াটসন ও ক্রিকের (১৯৫২) মতবাদ অনুযায়ী ডি. এন. এর চারটি জৈবক্ষার যুক্ত নিউক্লিওটাইড বিভিন্ন সংযুক্ত সংখ্যাতে (combination) সাজালে এবং বিন্যাস পদ্ধতিতে তিনটি ক'রে নিউক্লিওটাইড দ্বারা একটি 'সংকেত গোষ্ঠী' (code) ধরলে $৪^৩$ বা ৬৪টি সম্ভাব্য সংযুতি (combination) হ'তে পারে। যেহেতু প্রোটিন তৈরীতে অন্ততঃ ২০টি অ্যামিনো অম্ল প্রয়োজন তাই এই সংকেতগোষ্ঠীতে দুটি ক'রে নিউক্লিওটাইড ধরলে সম্ভাব্য সংযুক্তি সংখ্যা হয় মাত্র $৪^২ = ১৬$টি। এটি প্রয়োজনীয় অন্ততঃ কুড়িটি সংকেতগোষ্ঠীর সংস্থান করতে অক্ষম। এই তিন নিউক্লিওটাইড যুক্ত 'সংকেত গোষ্ঠী' ই তাই সর্বজনস্বীকৃত তিনবর্ণ সংকেতগোষ্ঠী (triplet code) নামে পরিচিত ও বিখ্যাত। একটি তিনবর্ণ সংকেত একটি বিশেষ অ্যামিনো অম্লর সংকেত বহন করে। সম্ভাব্য ৬৪টি তিনবর্ণ সংকেতের সংকেত বহনকারী অ্যামিনো অম্লর তালিকাও বর্তমানে সম্পূর্ণ ( চিত্র-৬১ ) জানা গেছে। পরীক্ষা নিরীক্ষাতে প্রমাণিত হয়েছে যে তিনবর্ণ সংকেতগুলি অপ্রাবরণ (non-overlapping) অর্থাৎ একে অপরের উপরিভূত নয়, ভঙ্গুর বা অস্থায়ী (degenerate) এবং সমস্ত জীব বা

জীবাণুকোষে একই অর্থ বহন করে। এদের সংকেতের নির্ণয়ে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে বিজ্ঞানী নিরেনবার্গ ও মাথাই, ১৯৬০ (Nirenberg & Mathai) এর পলি-ইউ (Poly-U বা UUU) তৈরী অত্যন্ত উচ্চমানের উল্লেখ্য গবেষণা। এই সংকেত ফিনাইল অ্যালানিন (phenylalanine) সংশ্লেষণের সংকেত বহন করে। এর থেকে অন্য সংকেতগুলি বুঝতে অনেক সুবিধা হয়েছে।

| | দ্বিতীয় অক্ষর | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| প্রথম অক্ষর | U | C | A | G | তৃতীয় অক্ষর |
| U | Phe | Ser | Tyr | Cys | U |
| | Phe | Ser | Tyr | Cys | C |
| | Leu | Ser | CT | CT | A |
| | Leu | Ser | CT | Tryp | G |
| C | Leu | Pro | His | Arg | U |
| | Leu | Pro | His | Arg | C |
| | Leu | Pro | Glu | Arg | A |
| | Leu | Pro | Glu | Arg | G |
| A | Ileu | Thr | Asn | Ser | U |
| | Ileu | Thr | Asn | Ser | C |
| | Ileu | Thr | Lys | Arg | A |
| | Met | Thr | Lys | Arg | G |
| G | Val | Ala | Asp | Gly | U |
| | Val | Ala | Asp | Gly | C |
| | Val | Ala | Glu | Gly | A |
| | Val | Ala | Glu | Gly | G |

চিত্র ৬১ : ত্রিবর্ণ সংকেতের তালিকা

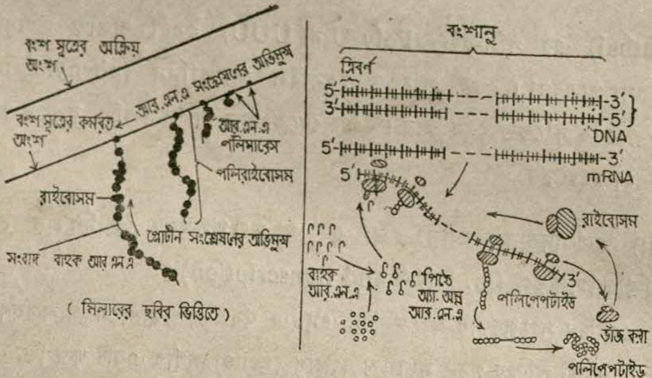
## (আ) সংবাদবাহক আর. এন. এ ও সংশ্লেষতব্য প্রোটিনের প্রকৃত প্রতিলিপিকরণ (m. RNA and transcription) :

প্রোটিন সংশ্লেষণের কাজে ডি. এন. এ স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না। একটি সক্রিয় গঠন সংক্রান্ত বংশাণু (gene) অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র ডি. এন. এ সূত্রাংশের যথার্থ প্রতিলিপি গঠিত হয় একটি আর. এন. এ সূত্রে পরিপূরক রাইবোনিউক্লিওটাইড বিন্যাস ক'রে। একটি বিশেষ প্রোটিনের জন্য একটি

বিশেষ বংশাণুর নিউক্লিওটাইড বিন্যাস অনুযায়ী একটি পরিপূরক রাইবোনিউক্লিওটাইড বিন্যাসযুক্ত বিশেষ আর. এন. এ প্রতিলিপি সূত্রের প্রয়োজন হয়। এই আর. এন. এ প্রতিলিপিটিকেই বলা হয় ডি. এন. এর সংবাদ বাহক আর. এন. এ (messenger RNA)।

(ই) **বাহক আর. এন. এ ও প্রোটিন সংশ্লেষণ** (transfer RNA and protein synthesis) :

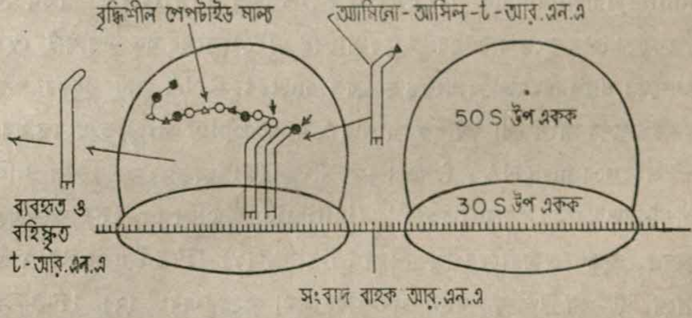
সক্রিয় অ্যামিনো অম্লগুলি এক একটি বিশেষ আর. এন. এ অম্লর সাথে যুক্ত হয়। এই আর. এন. এ অম্লগুলি ক্ষুদ্রতর এবং সক্রিয় অ্যামিনো অম্লগুলির বাহক। এদের বলা হয় বাহক আর. এন. এ (transfer RNA)। বা দ্রবণীয় আর. এন. এ (soluble RNA)। এই বাহক আর. এন. এ.র এক অংশে সক্রিয় অ্যামিনো অম্ল ও অন্য অংশ একটি সক্রিয় তিনবর্ণ নিউক্লিওটাইড সংকেত ধারণ ক'রে যা সংবাদবাহক আর. এন. এ অম্লর উপর পরিপূরক তিনবর্ণ সংকেতগোষ্ঠীতে উপনীত ও সংবদ্ধ হয়। এইভাবে সংবাদ বাহক আর. এন. এর সংকেত-ক্রম অনুযায়ী পরিপূরক সংকেত বাহক আর. এন. এ অণুগুলি কোষবস্তু থেকে সংগৃহীত সক্রিয় অ্যামিনো অম্লসহ ক্রমান্বয়ে নির্দিষ্ট স্থানে সারিবদ্ধ হয় অর্থাৎ অ্যামিনো অম্লগুলি ডি. এন. এ.র বিশেষ সূত্রাংশের (বংশাণু) নির্দেশ অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত হয়। (**চিত্র-৬২**)।




চিত্র ৬২ : প্রোটিন সংশ্লেষণ চিত্র—এম. আর. এন. এ., রাইবোসম মাল্য ইত্যাদি

**(ঈ) প্রোটিন সংশ্লেষণের নির্বাচিত স্থান : রাইবোসম :**

জীবাণুকোষে অতিক্ষুদ্র (২০×১৭ মিলি মাইক্রন, mμ) কতকগুলি কোষ-অঙ্গ বিপুল সংখ্যাতে দেখা যায়। এদের ক্ষুদ্রতার আর একটি পরিমাপ এদের মাত্র 70এস কণ সৃষ্টি ক্ষমতা (70S, sedimentation co-efficient)। এই কোষ অঙ্গগুলি দুটি অসম উপাঙ্গ দ্বারা গঠিত, যার একটি 30এস ও অন্যটি 50এস। এই কোষ অঙ্গগুলি মোটামুটি ৩৩% প্রোটিন ও ৬৭% আর. এন. এ (ribosomal RNA) দ্বারা গঠিত। বাহক আর. এন. এ সূত্রটি রাইবোসমের 30 এস অঙ্গে সংযোজিত থাকে এবং একটি বাহক আর. এন. এ সূত্রে এককালে বহুসংখ্যক রাইবোসম সংযুক্ত থাকে। এরকম রাইবোসম 'গ্রথিত' বাহক আর. এন. এ সূত্রকে বলা হয় 'রাইবোসম-মাল্য' (polyribosome)। কোষের বেশীর ভাগ (৮০%) রাইবোসমই এভাবে মালার আকারে অবস্থান করে (**চিত্র-৬৩**)।




চিত্র ৬৩ : রাইবোসম ও প্রোটিন সংশ্লেষণ

**(উ) বাহক আর. এন. এ.র সংকেতপঠন ও প্রোটিন সংশ্লেষণ** (translation):

(ক) রাইবোসমগুলি প্রকৃতপক্ষে সংবাদ বাহক আর. এন. এ সূত্রপরিলিখিত সংকেতগুলি যেন পাঠ ক'রে চলে। একটি তিনবর্ণ সংকেতের উপরে আসার সাথে সাথে তার পরিপূরক তিনবর্ণ সংকেতযুক্ত বাহক আর. এন. এ অণুর সাথে সংযুক্ত সক্রিয় অ্যামিনো অণুসহ এসে জুড়ে যায়। ফলে অ্যামিনো অণুগুলি যথাযথ ভাবে বিন্যস্ত হয়। পরবর্তী স্তরে উক্ত ক্রম

বিন্যস্ত অ্যামিনো অণুগুলি উৎসেচকের সহায়তায় পলিপেপটাইড অণুতে ঘনীভূত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অনেক ক্ষেত্রে ডি. এন. এ., আর. এন. এ., ও পলিপেপটাইডের সম-রৈখিকতা বলে। (colinearity of DNA, RNA and polypeptide chain)।

(খ) প্রোটিন সূত্রের সংশ্লেষণের পর তাহার গঠনের বিশেষ স্থানে স্থানে বিশেষ পদ্ধতিতে যে ভাঁজ হয় তার প্রকৃতিও জানা গেছে। মূলতঃ প্রোটিন সূত্রের সিসটিন (cysteine) অণুর মধ্যে—S—S—বন্ধনের ফলে সূত্রটি বিভিন্ন ভাবে ভাঁজ হ'য়ে একটি জৈবনিক ক্রিয়োপযোগী অণুতে পরিণত হয়। এই বিক্রিয়া মূলতঃ বিজারণ প্রকৃতির।

$$R_1SH + R_2SH = R_1 - S - S - R_2 + 2H$$

(গ) রসায়নগত ভাবে প্রোটিনের সংশ্লেষণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তিনটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার সমষ্টি। প্রথমতঃ সংশ্লেষণের সূত্রপাতে (initiation) সর্বক্ষেত্রে একটি n-formylmethionine (f. Met)-t RNA অণু m RNA র 'তিন বর্ণ-সংকেতে' এসে জুড়ে যায় এবং সাথে সাথেই রাইবোসমের বড় উপাঙ্গটি ছোট উপাঙ্গের সাথে এমনভাবে সংবদ্ধ হয় যে f. met t. RNA অণু বৃহত্তর অণুর একটি বিশেষ অংশ যথা 'গ্রাহক অংশ' (A বা acceptor site)তে সংবদ্ধ হয়। এই সংবন্ধনে m-RNA ; f. met-t-RNA, GTP ছাড়াও কতকগুলি পলি-পেপটাইড ধরনের 'সূত্রপাতকারী' (initiation factor or IF) অংশগ্রহণ করে। সূত্রপাতকারীদের ক্রিয়াকলাপ নিম্নরূপ, (১) 1F-2-f-met-RNA এর সাথে 50 এস উপাঙ্গের বন্ধন কার্য পরিচালনা করে এবং (২) 1F-3—m RNA অণুকে 30-এস উপাঙ্গের সাথে আবদ্ধ হ'তে সাহায্য করে। সূত্রপাতের শেষ স্তরে f-met-RNA 50 এস উপাঙ্গের গ্রাহক অংশ (site A) থেকে 50 এস এরই দাতা অংশ (donor site or P-site) তে স্থানান্তর ঘটে। পরবর্তী স্তরে সূত্রের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির (elongation) জন্য অ্যামিনো অ্যাসিল বাহক আর. এন. এ (amino acyl t RNA) গ্রাহক অংশে জুড়ে যায়। এভাবে GTP র GDP তে হাইড্রোলিসিস হওয়া কয়েকটি উৎপাদকের উপর নির্ভরশীল। এই বিশেষ উৎপাদকগুলিকে 'স্থানান্তর উৎপাদক' (transfer factors) বলা হয়। এদের একটি GTP র হাইড্রোলিসিসে উৎসেচক আর একটি GDP কে মুক্ত করে পূর্ববর্তী উৎপাদকের সাথে সংযুক্তি থেকে।

**(উ) প্রোটিন সংশ্লেষণের হার নিয়ন্ত্রণ :**

প্রোটিন সংশ্লেষণের হার মূলতঃ দুই পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভব। পদ্ধতি দুটি নিম্নরূপ

(ক) সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণের পশ্চাদযোগান বা ফীড ব্যাক পদ্ধতি (Feed back inhibition method) :

এটি আসলে সংশ্লেষণের পথে বাধা সৃষ্টিকারী (inhibition) বা সংশ্লেষণ দমন (repression) পদ্ধতি। প্রোটিন সংশ্লেষণের যে বিক্রিয়াপথ তার যে কোন স্তরে একটি বিক্রিয়াকে থামিয়ে সংশ্লেষণের পরিমাণ নির্ধারণ সম্ভব। সাধারণতঃ বিক্রিয়া পথের শেষ উৎসেচক জনিত অণু প্রথম উৎসেচককে অকেজো করে ততক্ষণই যতক্ষণ কোষে তার পরিমাণ যথেষ্ট। পরিমাণ কমে গেলে এই প্রভাব দূরীভূত হয় এবং উক্ত অণুর আবার সংশ্লেষণ হয়।

ক→খ→গ→ঘ→ঙ→চ→বস্তু
১ ২ ৩ ৪ ৫

ক, খ, গ ইত্যাদি—বিভিন্ন রাসায়নিক অম্ল ; ১, ২, ৩ ইত্যাদি—বিক্রিয়া-কারক উৎসেচকগুলি

হিষ্টিডিনের সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে কোষের ঘনত্ব ঠিক এইভাবে হিষ্টিডিনের সংশ্লেষণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে।

(খ) সংযতকরণ ও প্রবৃত্তকরণ বা রিপ্রেসন ও ইনডাকসন (Repression and Induction) কতকগুলি ক্ষেত্রে উৎপাদিত অণু (product) শুধুমাত্র একটির পরিবর্তে উৎপাদন-পথের সবকটি উৎসেচকের কাজ বন্ধ করে। সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সংযত-করণ বা রিপ্রেসন (repression)। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা পশ্চাদযোগান পদ্ধতির তুলনায় মন্থর কিন্তু স্থায়ী।

কদাচিৎ কোন জীবাণু কোষে প্রবৃত্তকরণ বা ইনডাকসন (induction) পদ্ধতিতে জৈবনিক ক্রিয়াকলাপের উপর প্রভাব বিস্তার হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ অতি অল্প আণবিক ওজন যুক্ত প্রবৃত্তকারক অণু ঐ সংশ্লেষণের পথে পূর্বগামী অণু (precursor) হিসাবে কাজ করে। এভাবে প্রবৃত্তকরণ ও সংশ্লেষণের হারে প্রভাব বিস্তার করে।

### ৩·৫৫ পলিস্যাকারাইডের জৈব সংশ্লেষণ :

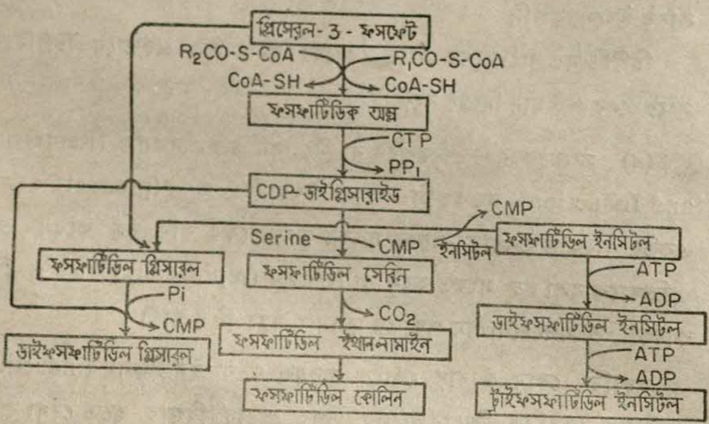
সমস্ত পলিস্যাকারাইডের সংশ্লেষণই অণুর সঙ্গে একটি একটি করে মনোস্যাকারাইড অণু যুক্ত হয়। প্রথমে মনোস্যাকারাইড অণুটি নিউক্লিওটাইডে পরিণত হয়, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইউরিডিন ডাইফসফেট হিসাবে (UDP-X)। কখনও কখনও অবশ্য অন্য পুরাইন বা পিরিমিডিন নিউক্লিওটাইড হিসাবেও পরিবর্তিত হয়। পরবর্তী স্তরে মনোস্যাকারাইডগুলি সংযুক্ত হয়ে পলিস্যাকারাইডে পরিণত হয়। বিক্রিয়াটি নিম্নরূপ।

(১) ম. ম. ম. ম. ম. ম. ম. ম + ইউরিডিন ডাইফসফেট ম =
ম. ম. ম. ম. ম. ম. ম. ম. ম + ইউরিডিন ডাইফসফেট

(২) (ক) ম. ন. ম. ন. ম. ন. ম. ন. + ইউরিডিন ডাইফসফেট ম =
ম. ন. ম. ন. ম. ন. ম. ন. ম + ই. ডাইফসফেট

(খ) ম. ন. ম. ন. ম. ন. ম. ন. ম + ই. ডাইফসফেট. ন =
ম. ন. ম. ন. ম. ন. ম. ন. ম. ন. + ই. ডাইফসফেট।

এ সমস্ত ক্ষেত্রে একই উৎসেচক ক্রমান্বয়ে মনোস্যাকারাইড সংযোগে অংশ গ্রহণ করে। শাখা-প্রশাখা যুক্ত পলিস্যাকারাইডের ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ পদ্ধতি




চিত্র ৬৪ : লিপিডের জৈব সংশ্লেষণ

সম্পূর্ণ জানা যায় নি। যদিও সূত্রের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি একই প্রক্রিয়াতে হয় কিন্তু কি ভাবে একটি বিশেষ স্থানে প্রশাখার উদ্ভব হয় তা এখনও সম্পূর্ণ বোঝা

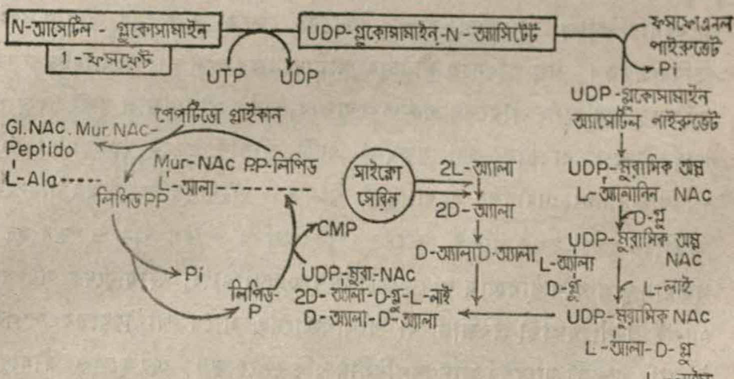
যায় নি। কিছু ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক ছাঁচ (primer)-অণুর উপস্থিতি এই শাখা প্রশাখার স্থান সম্ভবত ঠিক করে দেয় বলে ধারণা করা হচ্ছে।

### ৩·৫৬ লিপিডের জৈব সংশ্লেষণ :

লিপিডের জৈব সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া বর্তমানে সম্পূর্ণ ভাবে জানা গেছে। একটি অন্যতম প্রধান ধরনের লিপিড গ্লিসারোফসফেট লিপিডের সংশ্লেষণের বিক্রিয়া পথটি আগে দেওয়া হল। (চিত্র-৬৪)

### ৩·৫৭ মিউকোপেপটাইড সংশ্লেষণ :

মিউকোপেপটাইড (mucopeptide) সংশ্লেষণে শর্করার নিউক্লিওটাইড ডাইফসফেট অবস্থায় বিশেষত: ইউরিডিন ডাইফসফেট শর্করা হিসাবে বিক্রিয়া ঘটে। প্রথম স্তরে UDP-N-acetyl muramic acid pentapeptide ও UDP-N-acetyl glucosamine phosphate অণুগুলি সংশ্লেষিত হয়। উপরোক্ত অণুগুলি নিম্নলিখিত বিক্রিয়া পথে পেপটিডোগ্লাইকান বা মিউকোপেপটাইড সংশ্লেষণ করে। (চিত্র-৬৫)




চিত্র ৬৫ : মিউকোপেপটাইডের জৈব সংশ্লেষণ

### ৩·৬০ জীবাণুর বংশাণুতত্ত্ব (Genetics of microorganism) :

জীবাণুর মধ্যেও বহুল পরিমাণে পরিবর্তনশীলতা রয়েছে। তবে জীবাণু তার বংশগত (genetic) বিশেষত্ব পুরুষাণুক্রমে বজায় রাখে কোষ মধ্যবর্তী

ক্রোমোসমে অবস্থিত বংশাণু (gene) মাধ্যমে। জীবাণুর এই পরিবর্তনশীলতা (variability) ও বিশেষত্বর বংশানুক্রমিক ধারা বজায় রাখার ক্ষমতার বিভিন্ন দিক নিয়েই বংশাণুতত্ব গঠিত। বিভিন্ন জীবাণুর মধ্যে স্থায়ী পরিবর্তন আনয়নের পদ্ধতিগুলির মধ্যে পরিব্যক্তি বা মিউটেসন (mutation) ও পুনঃ সংযোজন বা রিকমবিনেসন (recombination) অন্যতম। জীবাণুর ক্ষেত্রে বংশগত বৈশিষ্ট্যের বাহক বা ভৌত সংবাদ হচ্ছে বংশাণু বা জীন (gene)। এই বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ (expression) বহুলাংশে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। জীবাণুর মধ্যে অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্তদের বংশবস্তু বা জীনোম (genome) খুবই সরল প্রকৃতির এবং সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্তদের মধ্যে এ'টি উন্নত জীবের মতই জটিল। অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত জীবাণুগুলির বংশাণুগুলি একটি জৈব-সূত্রে গ্রথিত থাকে। এই বংশাণু-সূত্রটিকে ক্রোমোসম-সম একটি কোষ-অঙ্গ হিসাবে ধরা যায়। একটি কোষে এই রকম ক্রোমোসম-সম বংশাণু সূত্র একাধিক দেখা যায়। সাধারণতঃ জীবাণুদের বিভাজনের সময় (generation time) লাগে অতি অল্প। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এ'টি কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা, ছত্রাকের ক্ষেত্রে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন ইত্যাদি। এর ফলে গবেষণার কাজে বিশেষতঃ বংশাণুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ ধরনের জীবাণু খুবই সুবিধাজনক। স্বল্প পরিসরে জীবাণুর আবাদ সম্ভব বলে বা সংখ্যাবৃদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে হয় বলে জীবনের প্রকৃতি বোঝার কাজে জীবাণুগুলি খুবই সহজ ও কার্যকরীভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। একটি জীবাণু-প্রজনে (population) পরিব্যক্ত (mutants) দের সংখ্যা খুবই সীমিত। জীবাণুর সংখ্যা স্বল্প পরিসরে অত্যধিক হওয়া সম্ভব বলেই তাদের পরিব্যক্তদের পরিসংখান ও সম্ভব হয়। বর্তমান যুগে বংশাণুবিজ্ঞান বা জেনেটীক্স (genetics) বা জীবাণুদের পরস্পর সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিজ্ঞান বা বংশবিজ্ঞানের সাথে শারীরবৃত্তের সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অপরিসীম বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মূলেও জীবাণু-দের এই বৈশিষ্ট্যগুলি অত্যন্ত মূল্যবান ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

### ৩·৬১ বংশাণুর প্রকৃতি ও সংখ্যাবৃদ্ধির পদ্ধতি ঃ

সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত জীবাণুদের বংশাণুসূত্রের প্রকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

(অ) **জীবাণুর বংশবস্তু (genome in microorganisms) :**

(ক) সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত জীবাণুর বংশাণুসূত্র বা কেন্দ্রের যে অংশটুকু কোষ বিভাজনের পরেও থাকে তাকে বলা হয় ক্রোমোসম বা বংশসূত্র। এই সমস্ত জীবাণুতে বংশসূত্রের মূল দু'টি অংশ রয়েছে, একটি ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অম্ল ( ডি. এন. এ ) এবং একটি জৈবক্ষার জাতীয় জটিল প্রোটিন যেমন হিস্‌টোন (histone)। নিউক্লিয়াসের বিভাজন মধ্যবর্তীস্তরে (interphase) কিছুটা রিবোনিউক্লিক অম্লও থাকে মূলতঃ নিউক্লিওলাস (nucleolus) এর সাথে এটি কেন্দ্র বিভাজনের পরই অন্তর্হিত হয়। বিভাজনে ডি. এন. এ এবং হিসটোন উভয়ই বিভাজিত হয়। তবে সর্বক্ষেত্রে বংশসূত্রে হিসটোন থাকেনা। এ থেকেও মনে হয় ডি. এন. এ.ই বংশসূত্রের মূলবস্তু বা সমস্ত বৈশিষ্ট্যাবলীর ধারক ও বাহক। ইদানীংকালে দূষণমুক্ত ডি. এন. এ কে নিশ্চিতভাবে বংশ বৈশিষ্ট্যের ধারক-বাহক হিসাবে প্রমাণ ও করা গেছে।

(খ) অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্তদের ক্ষেত্রে বংশাণুসূত্র বা ক্রোমোসমে শুধুমাত্র ডি. এন. এ.ই রয়েছে। কোন প্রকার প্রোটিন আদৌ আছে বলে মনে হয় না। ডি. এন. এ. ই বংশ বৈশিষ্ট্যের ধারক।

(গ) ভাইরাসদের ক্ষেত্রে বংশাণুসূত্র সম্পর্কে বিশেষ ধারণা হয় ফাজ বা ব্যাক্টিরিয়ার ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ফলাফল থেকে। এদের অতি সরল গঠনের বংশাণুসূত্রে শুধুমাত্র একটি নিউক্লিক অম্লের অণু থাকে। বহু ভাইরাস বা জীবাণুকণার ক্ষেত্রে এই নিউক্লিক অম্লটুকু আবার ডি. এন. এ. ও নয়—আর. এন. এ।

(আ) **বংশসূত্রের বিভাজন :**

(ক) সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত জীবাণুদের ক্ষেত্রে বংশাণুসূত্রের বিভাজন ও সংখ্যাবৃদ্ধি একটি অবিরাম (continuous) প্রক্রিয়া। তবে সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্তদের মধ্যে উন্নত জীবের ক্ষেত্রে যেখানে ডি. এন. এ. একটির অধিক ক্রোমোসম হিসাবে থাকে সেখানে সমবিভাজন (mitosis) একটি বিভাজনের নিয়মিত ছন্দ হিসাবে (sequence) কাজ করে। সেক্ষেত্রে এই চক্রকে বলা হয় সমবিভাজন চক্র (mitotic cycle)। প্রতিটি কেন্দ্র বিভাজনের পরই একটি ক'রে পর্যায় (period) থাকে যাকে অবকাশ (G-I) বলা হয়। এই সময় আর. এন. এ. ও প্রোটিন

সংশ্লেষিত হয়। তারপর সংশ্লেষণ পর্বে (S) আবার ডি. এন. এ ও হিসটোন দ্বিগুণ পরিমাণ হয়। পরবর্তী পর্বে (G-2) কোষের দ্বিতীয় বৃদ্ধিস্তর আসে ও পুনরায় সমবিভাজন হয়।

সমবিভাজনের প্রাথমিকস্তরে (prophase) ক্রোমোসমগুলি জোড়ায় (double strand) দৃশ্যমান হয়। এদের বলা হয় ক্রোমাটিড্স (chromatids)। সূত্র জোড়াটি একটি স্থানে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে যেটিকে বলা হয় সেণ্ট্রোমিয়ার (centromere)। এই স্তরের শেষে কেন্দ্র-আস্তরণ ভেঙ্গে যায় এবং বিভাজন-টাকু (spindle) তৈরী হয়। পরবর্তী বিন্যাসস্তরে (metaphase) ক্রোমোসমগুলি টাকুর মধ্যবর্তী (equator) অঞ্চলে বিন্যস্ত হয়। পরবর্তী স্বতন্ত্রীকরণ স্তরে (anaphase) সেণ্ট্রোমিয়ার (centromere) এর কাছে ক্রোমাটিড জোড়াগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে উভয় মেরু অভিমুখে গমন সুরু করে ও টাকুর মেরু অঞ্চলে (pole) পৌঁছায়। সর্বশেষে পুনর্গঠন (telophase) স্তরে বিভাজিত ক্রোমাটিডগুলি একাঙ্গীভূত (coalesce) হয় ও নূতন কেন্দ্র দুটির চারপাশে কেন্দ্র আস্তরণ গঠিত হয়। এইভাবে সমান বংশাণুসূত্র দ্বারা গঠিত দুটি নূতন কেন্দ্র (nucleus) সৃষ্টি হয় ও দুটি নূতন কোষে উপনীত হয়।

(খ) সমকেন্দ্রযুক্ত জীবাণুদের ক্ষেত্রে জীবনচক্রে (life cycle) দুটি মূল বিভাগ থাকে। জীবনচক্রের যে অংশে বংশবস্তু এক দফা (set) থাকে সেই অংশকে বলা হয় অর্ধাবস্থা বা হাপ্লয়েড (haploid) বা এক বংশাণুসূত্রযুক্ত। অন্য অংশে বংশবস্তু দুই দফা (set) থাকে। কোষের সেই অবস্থাকে বলা হয় পূর্ণাবস্থা বা ডিপ্লয়েড (diploid) বা দুই বংশাণুসূত্রযুক্ত। জীবনচক্রের যে অংশে কোষগুলির অবস্থা এইপ্রকার সেই অংশকেও বলা হয় পূর্ণাবস্থা-চক্র। এই সমস্ত জীবাণুর এই বৈশিষ্ট্যটি বজায় থাকে কেন্দ্রের অর্ধবিভাজন বা মায়োসিস (meiosis) পদ্ধতি দ্বারা। এই পদ্ধতিতে একটি দুই-বংশাণুসূত্রযুক্ত নিউক্লিয়াস বিভাজিত হ'য়ে এক বংশাণুসূত্রযুক্ত নিউক্লিয়াস ও পরে কোষে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে ডি. এন. এ. র অতিরিক্ত সংশ্লেষণ হ'য়ে দুবার পর পর নিউক্লিয়াস বিভাজন সংঘটিত হয়। এতে চারটি অর্ধাবস্থাযুক্ত হাপ্লয়েড কোষ সৃষ্টি হয়। চারটি নবউৎপাদিত কেন্দ্রের পরস্পরের মধ্যে বা পূরাতন কেন্দ্রের সাথে বংশাণুসূত্রের বংশাণু বিন্যাসের দিক থেকে সমতা থাকেনা। সমগ্র বিভাজন প্রক্রিয়াটি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত করে আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম পর্ব লেপ্টোটীন (leptotene) এ ক্রোমসোমগুলি দৃশ্যমান হয় এবং এক স্ত্রযুক্ত (single stranded) থাকে। পরবর্তী পর্ব জাইগোটীন (zygotene)এ দুটি সমান্তরাল ক্রোমোসম পাশাপাশি আসে এবং যখন স্ত্র দুটি পরস্পরকে পেঁচায় সেই অবস্থায় তাহাদের বলা হয় প্যাকিটীন (pachytene) পর্বভুক্ত। এই পর্বে স্ত্র দ্বয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধগম্য হয় না। এই ক্রোমোসম জোড়াকে বলা হয় জোড় (bivalent)। পরবর্তী পর্বে এই পেঁচান জোড় বিযুক্ত হয় এবং প্রতিটি ক্রোমোসমকে দুটি স্ত্রে (chromatids) পর্যবসিত হতে দেখা যায়। এই পর্বকে বলা হয় ডিপ্লোটীন (diplotene)। প্যাকিটীন অবস্থাতে বহুস্থানে ক্রোমোসম জোড়ার মধ্যে ভাঙ্গন ও অংশ পরিবর্তন (breakage and exchange) ঘটে যে প্রক্রিয়াকে বলা হয় কিয়াসমাটা (chiasmata)। এই অবস্থাতে প্রয়োজনে স্বল্প পরিমান ডি. এন. এ. সংশ্লেষণও ঘটে।

এরপর নিউক্লিয়াসের আস্তরণ বিচ্ছিন্ন হয় ও একটি টাকু (spindle) সংগঠিত হয় যাকে বলা হয় ডায়াকাইনেনসিস (diakinensis)। পরে জোড় গুলি (bivalents) তাদের কিয়াস্‌মাটা সহ টাকুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে (equator) অবস্থান করে যে অবস্থাকে মেটাফেস-১ বা প্রথম বিন্যাসস্তর (metaphase-I) বলে। এই অবস্থাতে সেণ্ট্রোমিয়ারগুলি বিভিন্ন দিকে বিন্যস্ত থাকে। পরবর্তী স্তরে ক্রোমাটিডগুলি সেণ্ট্রোমিয়ারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন ক'রে টাকুর দুই বিপরীত মেরু অভিমুখে যাত্রা করে। এই যাত্রাপর্বটিকেই বলা হয় অ্যানাফেস-১ বা প্রথম স্বতন্ত্রীকরণ পর্ব (anaphase-I)। পরবর্তীকালে যথারীতি উভয় মেরুতে একটি করে নিউক্লিয়াস পুনর্গঠিত হয় (telophase-I)। এই নিউক্লিয়াসগুলির ক্রোমোসম সংখ্যা সমবিভাজিত ক্রোমোসম সংখ্যার অর্ধেক (haploid) এবং ক্রোমোসমগুলি ভিন্ন বংশাণুক্রমে গঠিত হয় ভাঙ্গনও অংশ পরিবর্তন (breakage and reunion) বা ক্রসিং ওভার (crossing over) হবার ফলে। এই স্তরে কিছু ক্ষেত্রে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে (interphase) এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই নূতন স্বষ্ট নিউক্লিয়াস দুটি আবার বিন্যাস পর্ব-২, স্বতন্ত্রীকরণ পর্ব-২ ও পুনর্গঠন পর্ব-২ এর মধ্যদিয়ে পুনর্বিভাজিত হ'য়ে দুটি বিভাজন-টাকুর চারটি মেরুতে চারটি অর্ধাবস্থাযুক্ত (haploid) নিউক্লিয়াস স্বষ্টি করে। অনেক জীবাণুতে (অ্যাসকোমাইসিটস শ্রেণীর

হয়াকে ) চারটি কেন্দ্রের পুনরায় একবার করে সমবিভাজন হওয়ার ফলে ৮টি পর্যন্ত নিউক্লিয়াস এবং পরে কোষের সৃষ্টি হয়।

### ৩·৬২ জীবাণুর যৌনজনন ক্রিয়া (Reproduction in microorganisms) :

(অ) বিভিন্ন জীবাণু বিভিন্ন পদ্ধতিতে যৌন জনন ক্রিয়া সম্পন্ন করে, যদিও তারা একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। জীবাণুর মধ্যে উচ্চতর-গোষ্ঠী সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত ছত্রাক ইত্যাদিক্ষেত্রে উভয় লিঙ্গের প্রতিভূই সমপরিমাণ বংশসূত্র-বস্তু (chromosome complement) বংশধর কোষে (progeny) দেয়। অসম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত যেমন ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতিভূ কোষ অর্থাৎ গ্রহীতা (receipient) যদিও তার সম্পূর্ণ ক্রোমোসম বস্তু জনন ক্রিয়াতে দেয় কিন্তু দাতা (donor) বা পুরুষের প্রতিভু অনেক কম পরিমাণ ক্রোমোসম বস্তু দান করে।

(ক) ছত্রাকের যৌনজনন ক্রিয়া : পাঁচটি মূল প্রক্রিয়া যথা সাধারণ জিরাণস্পোর, উস্পোর, জাইগোস্পোর, অ্যাস্কোস্পোর ও বেসিডিওস্পোর গঠনের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসের সম্পূর্ণ অবস্থা যুক্ত ( প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে ) বা অর্ধাবস্থা যুক্ত ( শেষ দুটি ক্ষেত্রে ) স্পোর সৃষ্টি করে।

(খ) ব্যাক্টিরিয়ার যৌনজনন ক্রিয়া : ব্যাক্টিরিয়ার যৌনমিলন (conjugation) বহু ঘোষিত প্রক্রিয়া হলেও প্রকৃতিতে যৌনমিলনের প্রাচুর্য কতটুকু সেটা সম্পূর্ণ জানা নাই। ব্যাক্টিরিয়ার যৌনজননের ক্ষেত্রে প্রায়ই সম্পূর্ণ জাইগোট তৈরী হয় না। বংশসূত্রের অংশ বিশেষ দাতা কোষ থেকে গ্রহীতা কোষে পৌছাতে সক্ষম হওয়ায় যে অংশ জাইগোট তৈরী হয় তাকে মেরোজাইগোট (merozygote) বলা হয়।

ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে উপরোক্ত যৌনজনন প্রক্রিয়া ছাড়া অন্য আরও দুটি প্রক্রিয়া যথা ট্রানসডাক্শন বা বংশাণুর পর-নির্ভর কোষান্তরণ (transduction) ও ট্রানসফরমেশন বা বংশাণুর স্বনির্ভর কোষান্তরণ (transformation) ও কার্যতঃ যৌনজনন প্রক্রিয়ার মত ফল দিতে পারে। বংশাণুর এই কোষান্তরণ প্রক্রিয়াগুলি পরে আলোচিত হবে।

## (অ) জীবাণুর বংশ বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পরিস্থিতি :

(ক) আঠারোশ পঁয়ষট্টি সালে গ্রেগর মেনডেল (Gregor Mendel) সম্পূর্ণ কেন্দ্র যুক্ত মটরের (ডিপ্লয়েড) সংকরণের ফল পর্যালোচনা করে বলেছিলেন যে প্রথমতঃ জীবদেহের বৈশিষ্ট্যগুলি বংশগত এবং কতকগুলি বংশাণু এর বাহক। দ্বিতীয়ত সংকরণের পর নিউক্লিয়াসের ডিপ্লয়েড বা সম্পূর্ণ অবস্থাতে (diploid) বংশাণুজুটির (allele) বাহিত বৈশিষ্ট্য জোড়ের একটি প্রকট (dominat) হয় ও অন্যটি লুপ্ত বা অপ্রকট (recessive) থাকে; পরে অর্ধবিভাজনের বা মায়োসিসের ফলে তৈরী হাপ্লয়েড কোষে তারা আলাদা হয়ে (segregation) নিজ নিজ বিশেষত্ব আবার বিকশিত করে।

সম্পূর্ণকেন্দ্র যুক্ত জীবাণুর ডিপ্লয়েড কোষে মেনডেল এই উপাত্তর কথা প্রথম ঘোষণা করার বহু পরে সম্পূর্ণ কেন্দ্রযুক্ত হাপ্লয়েড ঈষ্ট কোষে এই উপাত্ত (theory) কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়। ঈষ্ট ক্রেমোসমে 'A' বংশাণু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নীচের বিক্রিয়াটিতে দেখা যাবে ঈষ্ট বংশাণু 'A' থাকলে, খাদ্য বস্তুতে আর্জিনিন ছাড়াও ঈষ্টের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু 'a' থাকলে ঘটে না। ঈষ্টের

---

বিক্রিয়া—অর্নিথিন (ornithine)→সিট্রুলিন (citrulline)→ আর্জিনিন (arginine)

---

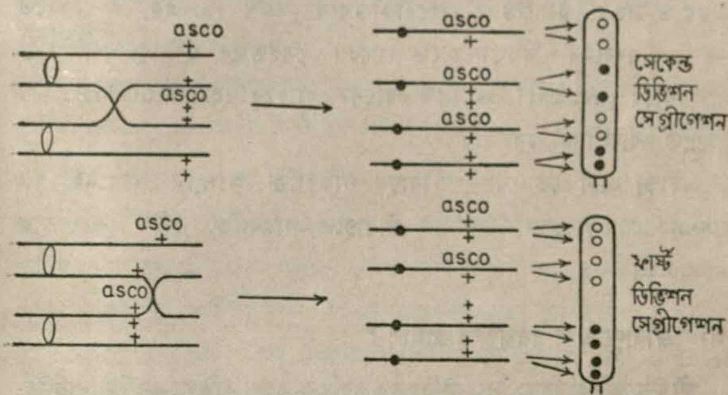
দুটি হাপ্লয়েড যৌনকোষের একটিতে 'A' ও অন্যটিতে 'a' রয়েছে। দুটি কোষের যৌনমিলনে উদ্ভূত ডিপ্লয়েড কোষটি (Aa) ও খাদ্য বস্তুতে আর্জিনিনের অভাবে ও সংখ্যা বৃদ্ধিতে সক্ষম। অর্থাৎ প্রকট বংশাণু 'A'-র উপস্থিতিতে অপ্রকট বংশাণুর 'a'-র উপস্থিতি বোঝা যায় না। মায়োসিসের পর যে চারটি কোষ সৃষ্টি হয় তার তিনটি (যথা AA, Aa ও Aa) খাদ্য বস্তুতে আর্জিনিন ছাড়াই সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে এবং চতুর্থটি (যথা a a) সক্ষম হয় না। জীবাণুর ক্ষেত্রে ও তাই দেখা যাচ্ছে বংশাণু 'A' ও 'a' মিলিত হ'লেও পরে স্বতন্ত্রীভূত (segregate) হ'য়ে নিজস্ব (independent) বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। এক্ষেত্রে বংশাণুগত (genotypic) অনুপাত (ratio) হয় ১ : ২ : ১ : এবং প্রকাশিত বৈশিষ্ট্যগত (phenotypic) অনুপাত হয় ৩ : ১।

উক্ত জীবাণুতে আর একটি বংশাণু জুটির হিসাব করা যায় যা কোষের

বায়োটিন (biotin) উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। সেটি দ্বিতীয় একজোড়া সমসংস্থিত (homologous) ক্রোমোসমের উপর অবস্থিত (Bb)। সেক্ষেত্রেও বংশাণুগত অনুপাত 1BB:2Bb:1bb এবং প্রকাশিত অনুপাত হয় ৩টি বায়োটিন উৎপাদনক্ষম ও একটি বায়োটিন উৎপাদনে অক্ষম। যখন এই দুই দফা (sets) বংশাণু জুটিরই বংশধারা (inheritance) পর্যালোচনা করা হয় তখন দেখা যায় AaBb সম্পূর্ণাবস্থার অর্ধাবস্থা যুক্ত বংশধর (haploid progeny) এর মধ্যে চার রকম কোষ পাওয়া যাবে যথা AB ( বায়োটিন ও আর্জিনিন ছাড়া বৃদ্ধি হয়), Ab ( বৃদ্ধিতে বায়োটিন লাগে ), aB ( বৃদ্ধিতে আর্জিনিন লাগে ) ab ( বৃদ্ধিতে দুইই লাগে )। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে দুটি বংশগত বৈশিষ্ট্য পরস্পর স্বাতন্ত্র বজায় রেখে অনির্দিষ্ট (random) পদ্ধতিতে বিন্যস্ত হ'তে পারে।

(খ) জীবাণুর মধ্যে বহু ছত্রাকের বংশাণুসূত্রে বংশাণুর বিন্যাস (mapping) সম্পর্কে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন ছত্রাকের স্পোরের বংশাণুর প্রকৃতি বিশ্লেষণ ক'রে বিভিন্ন বংশসূত্রে অবস্থিত বংশাণুগুলির সম্পর্ক বা লিংকেজের (linkage) ঘনিষ্টতা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে নবজোটবদ্ধ বা রিকমবিনানটস্ (recombinants) দের সংখ্যা নির্ণয় করা গেছে। একটি বংশাণুসূত্রের কিয়াসমাটা বিশ্লেষণ এবং নবজোটবদ্ধদের সংখ্যা নির্ণয় মাধ্যমে তাদের বংশাণুর ক্রম (gene order) দুটি ছত্রাক যথা **অ্যাসপারজিলাস নিডুলানস** (**Aspergillus nidulans**) **ও নিউরোস্পোরা ক্রাসা** (**Neurospora crassa**) তে নির্ণয় করা হয়েছে। একটি ক্রোমোসমের দুটি পাশাপাশি বংশাণুর দূরত্ব ও তাদের মধ্যে জোটবদ্ধ হবার সম্ভাবনা (probability of recombination) বার করা হয়েছে। থ্রি পয়েন্ট টেষ্টক্রস (three point test cross) পদ্ধতিতে এই দূরত্ব ও সম্ভাবনা নির্ধারণ করা হয়েছে। এই গবেষণাগুলিতে সম্পূর্ণকেন্দ্রযুক্ত কোষগুলির ক্ষেত্রে সময় সময় ডবল ক্রসওভারের (double cross over) ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। সবসময় একটি ক্রসওভারের উপস্থিতি, পাশাপাশি দ্বিতীয় আর একটির সম্ভাবনা অনেক কমিয়ে দেয়। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয়েছে প্রতিবন্ধকতা বা ইনটারফিয়ারেন্স (interference)। এখন বোঝা গেছে যে ক্রোমাটিডগুলির দৃঢ়তা এর মূল কারণ।

**নিউরোস্পোরা ও সরডারিয়া (Sordaria)** র ক্ষেত্রে যেখানে লিনিয়ার টেট্রাড (linear tetrad) তৈরী হয় সেখানে অ্যাসকোস্পোরের রঙ বিবেচনা ক'রে ক্রোমোসমে বংশাণুর ক্রম অবস্থান নির্ণয় করা হয়েছে। এটিকে বলা হয়েছে টেট্রাড বিশ্লেষণ (tetrad analysis)। এর চিত্ররূপ নিম্নে দেওয়া হল। (চিত্র-৬৬)




চিত্র ৬৬ : টেট্রাড বিশ্লেষণ—ছত্রাকে

(গ) **সমবিভাজনগত বা মাইটোটিক ক্রসিং ওভার** (mitotic crossing over) : **অ্যাসপারজিলাস নাইজার** (**Asp. niger**) ছত্রাকের অযৌন জীবনচক্রে বিজ্ঞানী পনটেকরভো (Pontecorvo) যে প্যারাসেকসুয়াল প্রক্রিয়া (parasexual system) আবিষ্কার করেছিলেন তাতে বংশাণুর নবজোটবদ্ধকরণ হয়। পরবর্তীকালে অ্যাসকোমাইসেটাস ছাড়া বেসিডিওমাইসেটাস ছত্রাকেও অনুরূপ প্রক্রিয়া ঘোষিত হয়েছে।

**৩·৬৩ পরিব্যক্তি ও জীবাণুর বংশবিজ্ঞান** (Mutation and microbial genetics) :

অন্য সমস্ত জীবের মত জীবাণুর ক্ষেত্রে পরিব্যক্তিই প্রকারণ (variation) ও বিবর্তনের (evolution) মূল উৎস। প্রক্রিয়া হিসাবে পরিব্যক্তি অপ্রতিরোধ্য (unpreventable)। এ প্রক্রিয়ার পূর্বাভাষও পাওয়া বা দেওয়া সম্ভব নয় (unpredictable)। কিন্তু ইহা নিয়ন্ত্রণহীন (uncontrollable) নহে।

পরিব্যক্তি হ'চ্ছে জীবকোষের বংশসূত্রে যে কোন বংশাণুর মধ্যে একটি স্থানে কোন গঠনগত পরিবর্তনের ফলে উক্ত জীবে সৃষ্ট স্থায়ী এবং বংশাণুক্রমে বাহিত পরিবর্তন। এর অন্যতম অবদান নূতন বংশাণু গঠন যার ফলে নূতন বিশেষত্ব-যুক্ত জীব বা জীবাণু সৃষ্টি। জীবাণুর মধ্যে পরিব্যক্তি অতি সাধারণ। অবশ্য এধরনের স্থায়ী পরিবর্তন আনয়নকারী পরিব্যক্তি শুধু কেন্দ্রস্থিত বংশসূত্রেই যে হয় তা নয়। প্লাসটিড ও মাইটোকণ্ড্রিয়ার নিজস্ব ডি. এন. এ থাকাতে সেখানেও এধরনের পরিবর্তন হ'তে পারে। সেইভাবে জীবাণুর পরিব্যক্তি নিউক্লিয়াসে (nuclear) ও নিউক্লিয়াসের বাহিরে (extra-nuclear) দুটি গোষ্ঠীতে পর্যালোচনা করা যায়।

এছাড়া প্রকৃতিতে যেমন জীবাণুর পরিব্যক্তি আপ্‌নি আপনিই হয় (spontaneous) তেমনি আবার জীবাণুতে পরিব্যক্তি সৃষ্টিও করা যায় (induced)।

## (অ) জীবাণুতে পরিব্যক্তির প্রমাণ :

জীবাণুতে বিশেষতঃ ব্যাক্টিরিয়াতে বহুদিন ধরে পরিবর্তনগুলির প্রকৃতি-পরিব্যক্তি জনিত অথবা অভিযোজন জনিত (adaptation) তা ঠিক করার সমস্যা ছিল। বিভিন্ন বিজ্ঞানী কতকগুলি সুচিন্তিত পরীক্ষা দিয়ে এই পরিবর্তনগুলিকে পরিব্যক্তিজনিত বলে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ ও প্রদর্শন করেছেন। এগুলির মধ্যে বিজ্ঞানী লুরিয়া ও ডেলব্রুকের, ১৯৪৩ (Luria and Delbruk) ফ্লাক্‌চুয়েশন টেষ্ট বা অস্থিরতা পরিমাপক পরীক্ষা (Fluctuation test), নিউকম্ব, ১৯৪৯ (Newcomb) এর স্প্রেডিং পরীক্ষা (spreading test) বা লেডেরবার্গ ও লেডেরবার্গ, ১৯৫২ (Lederberg and Lederberg) এর রেপ্লিকা প্লেটিং টেষ্ট বা প্রতিলিপি পরীক্ষা (Replica Plating Test) প্রভৃতি এই কারণে জগদ্বিখ্যাত হয়েছে এবং জীবাণুর ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিব্যক্তির প্রভাব সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করেছে।

## (আ) জীবাণুতে পরিব্যক্তির হার :

কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা বংশাণুকে ধরলে তার প্রাকৃতিক পরিব্যক্তির সম্ভাব্য হার অতি অল্প হয়। অর্থাৎ একবার কোষ বিভাজনের মধ্যে প্রতি

$10^{5}$—$10^{7}$ কোষে একটি ক্ষেত্রে মাত্র পরিব্যক্তি হতে পারে। তবে জীবাণুর সমস্ত বংশাণু ধরলে তাদের মধ্যে পরিব্যক্তির হার স্বভাবতঃই এত স্বল্প সংখ্যক নয়। সর্বপরি পরিব্যক্তি স্রষ্টা বা মিউটাজেন (mutagen) দের প্রভাবে এই হার আরও বাড়তে পারে।

(ই) **পরিব্যক্তির প্রকার ও প্রকৃতি** (Types and nature of mutation):

অতি সরল দৃষ্টিতে দেখা যায় পরিব্যক্তি সমগ্র বংশাণুসূত্র নির্ভর (chromosome mutation) অথবা নিউক্লিক অম্ল নির্ভর (nucleic acid mutation) হ'তে পারে।

(ক) যেহেতু বংশবস্তু (genome) টি জনক কোষের বিভাজনের পর সমপরিমাণে জাতক কোষ (daughter cells) গুলির মধ্যে ভাগ হয় তাই বংশাণুসূত্রের পরিব্যক্তি অর্ধবিভাজিত জাতক কোষগুলিতে সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যক্ত হয়। পরে ডিপ্লয়েড কোষে বিশেষ অনুপাতে আবির্ভূত হয়। জীবাণুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বংশাণুসূত্র ভিত্তিক পরিব্যক্তি ঘটে। এর মধ্যে সূত্রের অংশবিশেষের উৎক্রমণ (inversion), দ্বৈতকরণ (duplication), অপনোদন (deletion) এবং স্থানান্তরণের (translocation) ঘটনা দেখা গেছে। বংশাণুসূত্রের এই রকম পরিবর্তনগুলির অভিব্যক্তি শুধুমাত্র ঐ কোষের বিভাজনের পরই হয়। অভিব্যক্তিগুলি দুটি শ্রেণীভুক্ত যথা জাতকের জীবন সংশয়কারী (affecting viability of daughter cells) ও দূর বংশধরের প্রজনন ক্ষমতার উপর প্রভাব বিস্তারকারি (affecting fertility of future generations)। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যে ভগ্ন বংশসূত্রগুলিতে সেন্ট্রোমিয়ার থাকে না সেগুলি টেলোফেস পর্বে পৌছায় না ফলে ঐ নিউক্লিয়াস কিছু বিশেষত্ব হারায়। ডিপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে অন্য হোমোলোগ (homologue) টি উক্ত বিশেষত্ব খবর (information) জোগাতে পারে ব'লে কোন তাৎক্ষণিক অশুভ অভিব্যক্তি নাও হ'তে পারে কিন্তু হাপ্লয়েড নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রে এই অভাব তার সত্বর বিনাশ আনতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যেখানে বংশসূত্রের অংশবিশেষের স্থান পরিবর্তন ঘটে দু'টি ক্রোমোসমের মধ্যে অথবা একই ক্রোমোসমের দু'টি অংশের মধ্যে (exchange) সেখানে তার প্রভাব

তখনি কোষের শারীরবৃত্তে বা তার সমবিভাজন দ্বারা উৎপাদিত জাতক কোষের শারীরবৃত্তে অনুভূত হয়। তবে অর্ধবিভাজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত ক্রোমাটিড-গুলির মধ্যে ক্রসিংওভার হ'লে ভারসাম্যহীন বা অসম (unbalanced) গ্যামেটের (gamete) সৃষ্টি হয় যার ফল হয় প্রজননে অক্ষমতা।

(খ) নিউক্লিক অম্লে যে বংশাণু অংশের পরিব্যক্তি ঘটে সেই নিউক্লিওটাইড ক্রমের যে বিশেষ উৎসেচক-প্রোটিন সংশ্লেষণের সংবাদ প্রেরণ করার কথা তা বিঘ্নিত হয়। যে অঙ্গে ঐ উৎসেচকের কাজ রয়েছে সেখানেই পরিবর্তন দেখা যায়। জীবাণুতে এ পর্যন্ত নিউক্লিক অম্লভিত্তিক যত পরিব্যক্তি দেখা গেছে তারা মূলতঃ দুই শ্রেণীর।

(১) ক্ষুদ্র অণু সংশ্লেষক উৎসেচকের বিকৃতি (defective in enzymes for small molecule synthesis) জনিত পরিব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিব্যক্ত জীবাণুগুলি ক্ষুদ্র অণু সংশ্লেষণে অংশগ্রহণকারী এক বা একাধিক উৎসেচকের অভাবে (deficient) ভোগে। এধরনের পরিব্যক্ত জীবাণুদের বলা হয় অক্সোট্রফ (auxotroph)। সাধারণতঃ একটি অক্সোট্রফ জাতীয় পরিব্যক্ত জীবাণুর খাদ্যমাধ্যমে (ন্যূনতম বা অজৈব খাদ্যমাধ্যম, minimal medium) অন্ততঃ একটি উপরি খাদ্যবস্তু (nutrition) যথা অ্যামিনো অণু বা ভিটামিন ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত পরিব্যক্তদের জৈব রাসায়নিক পরিব্যক্ত (biochemical mutant) বলা হয়। যে সমস্ত জীবাণু ন্যূনতম খাদ্যমাধ্যমেই বৃদ্ধিতে সক্ষম তাদের প্রোটোট্রফ (Prototroph or wild type) বলা হয়। বিজ্ঞানী বিডল ও ট্যাটাম্, ১৯৫৩ (Beadle and Tatum) **নিউরোস্পোরা ক্রাসা (Neurospora crassa)** ছত্রাকে অত্যন্ত মূল্যবান পরীক্ষা দ্বারা এই তথ্য প্রমাণ করেন। পরবর্তীকালে ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রেও এটা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিডল ও ট্যাটামের এই গবেষণাই তাঁদের 'একটি বংশাণু থেকে একটি উৎসেচক' (one gene one enzyme) তত্ত্ব সর্ব-সমক্ষে উপস্থিত করতে সাহায্য করে। লেডেরবার্গ তাঁর প্রতিলিপি পরীক্ষার পদ্ধতির সাহায্যে ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই প্রকার পরিব্যক্তি ঘোষণা করেন।

(২) বিয়োজক উৎসেচক উৎপাদনের অক্ষমতা যুক্ত (defective in breakdown enzymes) পরিব্যক্তগুলিও জীবাণুদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়। এরা কতকগুলি খাদ্যবস্তু বিয়োজন করতে অক্ষম হওয়াতে

এগুলি সৃষ্টি হয়। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে হয়ত মূল ব্যাক্টিরিয়াটি গ্লুকোস বা ল্যাক্টোস বিয়োজনে সক্ষম কিন্তু পরিব্যক্তটি একটি প্রাথমিক উৎসেচক সৃষ্টি ক্ষমতা হারানর ফলে বিয়োজনে অক্ষম।

উপরোক্ত দুই প্রকার পরিব্যক্তি ব্যতীত জীবাণুতে আরও এক প্রকার পরিব্যক্তির সম্ভাবনার কথা বিজ্ঞানীরা বলেছেন, যদিও সেরকম পরিব্যক্তি সচরাচর দেখা যায় না। এই পরিব্যক্তির ক্ষেত্রে জীবাণুকোষে বৃহদাণু সংশ্লেষক উৎসেচক সৃষ্টি ব্যাহত হয় (defective in enzymes for synthesis of macromolecules)। কারণ ঐ বিশেষ বংশাণুর পরিবর্তন ঘটে। এজাতীয় পরিব্যক্তগুলি স্বভাবতই বাঁচে না, কারণ জীবাণুকোষে বৃহদাণুগুলি প্রত্যেকটি অপরিহার্য দায়িত্ব পালন করে। এদের নির্ণয় ও সংগ্রহ করাও নানা কারণে কঠিন। ব্যাক্টিরিয়াতে উষ্ণতা-পরিব্যক্ত (temperature mutant) পাওয়া গেছে যা মূল ব্যাক্টিরিয়ার প্রয়োজনীয় উষ্ণতা ৩৭° সে এ বাঁচেনা, বাঁচে ২৭° সে।

### (ঈ) পরিব্যক্তির রাসায়নিক প্রকৃতি:

নিউক্লিক অম্লভিত্তিক পরিব্যক্তি ডি. এন. এর একটি নিউক্লিওটাইড জুটির পরিবর্তন অথবা নিউক্লিওটাইড জুটিগুলির ক্রমবিন্যাসের পরিবর্তন দ্বারা ঘটতে পারে।

দুটি মূল পদ্ধতিতে পরিবর্তনগুলি ঘটে। সে দুটি প্রতিস্থাপন (substitution) এবং সংযোজন ও অপনোদন (addition and deletion)।

(ক) প্রতিস্থাপন জাতীয় পরিব্যক্তির ক্ষেত্রে জীবাণুতে ডি. এন. এ.র নিউক্লিওটাইডগুলি দুইভাবে প্রতিস্থাপিত হ'তে পারে।

(১) স্থানান্তরণের (transition) ক্ষেত্রে একটি পুরাইন জাতীয় নিউক্লিওটাইড আর একটি পুরাইন নিউক্লিওটাইড দ্বারা অথবা একটি পিরিমিডিন নিউক্লিওটাইড আর একটি পিরিমিডিন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। অর্থাৎ অ্যাডেনোসিন মনোফসফেট গুয়ানিডিন মনোফসফেট দ্বারা অথবা থাইমিডিন মনোফসফেট সাইটিডিন মনোফসফেট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। উনিশশো উনসত্তর সালে বিজ্ঞানী ফ্রিস (Freese) এই পদ্ধতির কথা ঘোষণা করেন।

(২) তির্যক্ স্থানান্তরণের (transversion) ক্ষেত্রে একটি পুরাইন নিউক্লিওটাইড একটি পিরিমিডিন নিউক্লিওটাইড দ্বারা বা তদ্বিপরীত (vice

versa) প্রতিস্থাপন ঘটে। স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে পরিবর্তনটি আমূল প্রকৃতির হয়। সাধারণতঃ উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদিত প্রোটিনে একটি অ্যামিনো অম্লর পরিবর্তন হয় বলে এগুলিকে ভুল-ক্রম (mis-sense) পরিব্যক্তি বলা হয়। যদি কখনও এর ফলে একটি অর্থহীন (nonsense) ত্রিবর্ণ (CAG বা UAG) সৃষ্টি হয় তবে RNA-র সম্পূর্ণ সংবাদ অনুযায়ী প্রোটিন তৈরি হয় না।

(খ) সংযোজন ও অপনোদন জাতীয় পরিব্যক্তির ক্ষেত্রে ডি. এন. এ.র নিউক্লিওটাইড ক্রমে একটি নিউক্লিওটাইড কোন জায়গাতে সংযোজিত হ'লে একটি সম্পূর্ণ নূতন m RNA তৈরী হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় বা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পলিপেপটাইড সংশ্লেষিত হয়। ফলে পরিবর্তন আরও আমূল ধরনের ঘটে। অন্য ক্ষেত্রে যখন এক বা একাধিক নিউক্লিওটাইড বিচ্ছিন্ন ও অপনোদিত হয় তখন পরিবর্তনটি হয় আরও প্রচণ্ড ও ব্যাপক।

(ঙ) **পরিব্যক্তির কৃত্রিম প্ররোচন** (artificial induction) :

জীবাণুদেহে বিভিন্নভাবে পরিব্যক্তি প্ররোচিত করা সম্ভব হয়েছে। ভৌত ও রাসায়নিক উভয় প্রক্রিয়াতেই এটা করা হয়েছে মূলতঃ বংশসূত্রের প্রকৃতি নির্ণয় ও জীবাণুদেহে অন্য বহু প্রক্রিয়ার যথাযথ অনুধাবনের প্রয়োজনে।

(ক) রাসায়নিক পরিব্যক্তি প্ররোচকদের সম্ভাব্য প্রভাব বহুলাংশে বোধগম্য এবং পূর্বনির্ধারিত। এদের মধ্যে নিউক্লিওটাইডের অ্যানালোগ বা অনুরূপ অণু (analogue) যথা 5-bromouracil (BU), 2-aminopurine (AP), নিউক্লিক অম্লর উপর প্রত্যক্ষ ক্রিয়াশীল (direct acting) যথা nitrous acid, proflavin ইত্যাদি এবং নিউক্লিক অম্লের উপর পরক্ষক্রিয়াশীল (indirect acting) যথা শ্বসনবিরোধী রাসায়নিক (respiratory inhibitors) বিভিন্ন হরমোন ও ঔষধাদি (drugs)। দেখা গেছে BU AT→GC স্থানান্তরণ ঘটাতে সক্ষম কারণ এটি স্বাভাবিক 'keto' অবস্থাতে অ্যাডেনিনের সাথে এবং বিরল 'enol' অবস্থাতে গুয়ানিনের সাথে জোটে আবদ্ধ হয়। AP সাধারণতঃ থাইমিনের সাথে জোটবদ্ধ হলেও বিরল ক্ষেত্রে সাইটোসিনের সাথেও হয়। নাইট্রাস অম্ল ও স্থানান্তরণ ঘটায় A, C এবং G কে ডিঅ্যামিনেট (deaminate) ক'রে। ফলে A র স্থানে হাইপোজানথিন (hypoxanthine) হয় যা T এর বদলে C এর সাথে আর C র স্থানে

uracil হয় যা G র বদলে A এর সাথে জোটবদ্ধ হয়। G র স্থানে xanthine তৈরী হয় যা G ও C উভয়ের সাথে জোটবদ্ধ হবার ফলে কোন ফল হয় না। আলকিলেটকারকরা (alkylating agent) ও স্থানান্তণর ঘটায় এবং জোটবদ্ধ সম্পর্কগুলি অদলবদল ক'রে। তবে এরা তির্যক স্থানান্তরণও ঘটায়। প্রোফ্লাভিন (proflavine) সংযোজন ও অপনোদন দুই ঘটাতে পারে।

(খ) ভৌত পরিব্যক্তিকারকগুলির মধ্যে আয়নায়নকারি বিকিরণ (ionizing radiation)এর রশ্মি ও কণাগুলি উপরোক্ত সমস্ত রকম পরিবর্তনই ঘটাতে সক্ষম। রশ্মিগুলির অনুপ্রবেশের ক্ষমতা ইত্যাদির উপর এদের কার্যকারিতা নির্ভর করে। এছাড়া অন্যান্য বিকিরণ যথা অতিবেগুনী, ইত্যাদির প্রভাবও যথেষ্ট। এদের সম্পর্কে পরবর্তী পর্বে আলোচনা করা হবে।

**(উ) ব্যাক্টিরিয়ার বংশবস্তু কোষান্তরণের প্রক্রিয়া ও বংশবিজ্ঞান** (Genetic transfer and genetics of bacteria) :

ইউক্যারিওটদের ক্ষেত্রে জাতককোষকে (progeny) জনক ও জননীকোষ সমপ্রকৃতির বংশবস্তু দান করে। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে সমস্তরকম বংশবস্তুর কোষান্তর প্রক্রিয়াই এই মূল সূত্র থেকে স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে জননীকোষ (recipient or female) তার সম্পূর্ণ বংশবস্তু দান করে কিন্তু জনককোষের দেওয়া বংশবস্তুর পরিমাণ স্বল্প। বংশবস্তুর কোষান্তরণ ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। পদ্ধতিগুলি নিম্নরূপ।

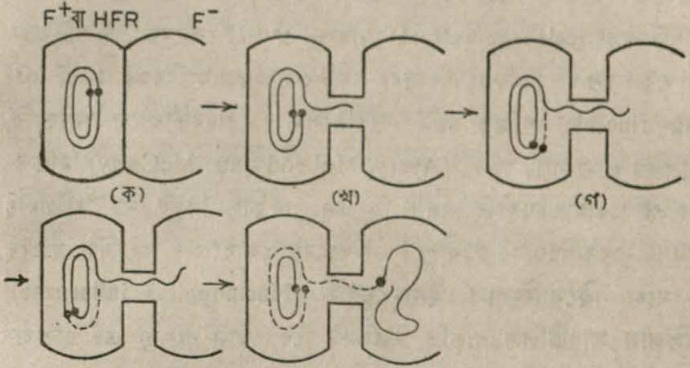
(ক) **যৌন প্রজনন বা কনজুগেশন** (Conjugation) :

জনক ও জননীকোষের মধ্যে একটি নালিকা গঠিত হয় যার মাধ্যমে জনক কোষের অর্ধপরিমাণ বংশবস্তু ধীরে ধীরে কোষান্তরিত হয়। বিজ্ঞানী লেডেরবার্গ ও ট্যাটাম ১৯৪৬ (Lederberg and Tatum) **ই. কোলি** ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই মিলনের অস্তিত্ব ঘোষণা ও প্রমাণ করেন, একটি সহজ অথচ অত্যন্ত মূল্যবান পরীক্ষা মাধ্যমে। তাঁরা **ই. কোলির** দুটি অক্সোট্রফ বর্ণ (strain) নির্বাচিত করেছিলেন। এদের একটির যে তিনটি অ্যামিনো অম্লের সংশ্লেষণের অক্ষমতা ছিল ($a^-b^-c^-d^+e^+f^+$) অন্যটির অন্য তিনটি অ্যামিনো অম্লসংশ্লেষণের অক্ষমতা ছিল

$(a^+b^+c^+d^-e^-f^-)$। দুটি বর্ণকে মিশ্রিত ক'রে কাঁচ পাত্রে খাদ্য মাধ্যমে আবাদ করা হল। কিছু সময় পরে মিশ্রনটিকে ন্যূনতম খাদ্যবস্তুতে আবাদ করা হ'লে সেখানে কিছু (১০⁷ কোষে ১টি) প্রোটোট্রফ $(a^+b^+c^+d^+e^+f^+)$ পাওয়া যায়। অক্সোট্রফদের পক্ষে ঐখাদ্য মাধ্যমে বৃদ্ধি সম্ভব ছিলনা। যেহেতু তিনটি বিশেষত্বেরই যুগপৎ পশ্চাদমুখী পরিব্যক্তি (simultaneous back mutation) সম্ভব ছিলনা তাই এটি যৌনমিলন উদ্ভুত একটি জাতক বলে ধরা যায়। বিজ্ঞানী হেস, ১৯৫৩ (Hayes) সালে বলেন যে জনক বা দাতা কোষে একটি নিমিত্ত (agent) রয়েছে যেটি এই বংশবস্তুর কোষান্তরণ ঘটায়। নিমিত্তটিকে বলা হয় যৌন-নিমিত্ত (sex factor or fertility factor or F-factor)। জনক বা দাতা কোষগুলির যৌননিমিত্তকে $F^+$ এবং গ্রহীতার যৌননিমিত্তকে $F^-$ বলা হয়। এছাড়া $F^-$ factor তার বংশাণু কোষান্তরণ করার ক্ষমতা ছাড়া একটি সংক্রামক-কণা হিসাবেও কার্যকরী। F বহনকারী কোষগুলি তাদের কোষের উপর একটি যৌন পিলাস (sen-pilus) গঠন করে। পিলাসটি গ্রাহক বা জননীকোষের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করে এবং বংশবস্তুর কোষান্তরণ ঘটায়। এছাড়া আরও একগোষ্ঠীর দাতা বা জনককোষ রয়েছে যারা $F^+$ এর চেয়ে অন্ততঃ ১০০০ গুণ বেশী নবজোটবদ্ধ (recombinants) সৃষ্টিতে সক্ষম। এদের উচ্চহারে কোষান্তরণের ক্ষমতার জন্য (high frequency) HFr বর্ণ বলা হয়। $F^+$ এর ক্ষেত্রে তার যৌননিমিত্তটিই কোষান্তরিত হয় কিন্তু H Fr এর ক্ষেত্রে এটি কদাচিৎ ঘটে। এফ্ ('F') কোন বিশেষ বংশাণুর সাথে যুক্ত নয়। বিভিন্ন HFr বর্ণতে যৌননিমিত্তটি বিভিন্ন দাতা বংশাণুর সাথে যুক্ত থাকে। সর্বপরি যৌননিমিত্তের HFr অবস্থা $F^+$ অবস্থাতে বা $F^+$ HFr অবস্থাতে পরিবর্তনে সক্ষম। দুটিই $F^-$ এ পর্যবসিত হতে পারে। তবে $F^-$ থেকে $F^+$ বা HFr এ আপনি আপনি প্রায়ই পর্যবসিত হয় না, $F^+$ বর্ণ থেকে সংক্রমণ পদ্ধতিতে এটি আসতে পারে। যৌননিমিত্তটি স্বভাবতই ডি. এন. এ এরই তৈরী। (**চিত্র-৬৭**)।

সময় বিশেষে এই যৌননিমিত্তটি বংশসূত্রের সাথে নবজোটবদ্ধ হয় (recombines), বংশসূত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ নিজের একটি ক্ষুদ্র অংশের পরিবর্তে গ্রহণ করে। এই যৌন নিমিত্তকে বলা হয় F' বা **F-prime** বা পরিবর্তিত যৌননিমিত্ত (**substituted F-factor**)। দাতা বা জনক কোষে

এই প্রকার যৌননিমিত্ত থাকার বিশেষত্ব হচ্ছে এরা দাতা বংশসূত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র কোষান্তরণ করে। এই কোষান্তর পদ্ধতিকে বলা হয় সেক্‌সডাক-




চিত্র ৬৭ : ব্যাক্টিরিয়ার যৌনমিলনে ডি. এন. এর কোষান্তরণ

সান (sexduction)। এর ফলে গ্রহীতা বা জননীকোষ তার বংশসূত্রের একটি অংশের জন্য শুধুমাত্র সম্পূর্ণকেন্দ্র (diploid) অবস্থাপ্রাপ্ত হয়।

পরবর্তী স্তরে ব্যাক্টিরিয়া জননী কোষে দাতা ও গ্রহীতা উভয় বংশসূত্রেরই ভাঙ্গন ঘটে, পরিপূরক (reciprocal) বংশসূত্রাংশের আদান-প্রদান হয় এবং সর্বশেষে অসম বংশসূত্রগুলির পুনর্বিন্যাস হয় (reassortment)।

(খ) **বংশবস্তুর স্বনির্ভর কোষান্তরণ বা টানস্‌ফরমেশন** (Transformation) ঃ

কোন জীবাণুর কোন বিশেষত্ব একটি কোষ থেকে অন্য জীবাণু কোষে যখন ডি. এন. এ কোষান্তরণের মাধ্যমে কোষান্তরণ ঘটে সেই প্রক্রিয়াকে (যৌনমিলন ব্যতীত) স্বনির্ভর কোষান্তরণ বলা হয়। বিজ্ঞানী গ্রিফিথ, ১৯২৮ (Griffith) যখন **নিউমোকক্কাস** বা **ডিপ্লোকক্কাস** এর দুটি স্বতন্ত্র ও বিপরীত বিশেষত্বযুক্ত বর্ণ যথা গ্রুপ-II ও গ্রুপ-III নিয়ে গবেষণা করছিলেন তখন লক্ষ্য করেন যে ইঁদুরে ইঞ্জেকশন করলে আঠাল স্তরযুক্ত, মসৃণ কলোনী সৃষ্টিকারী গ্রুপ-III বর্ণ নিমোনিয়া রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেও আঠাল স্তরহীন, অমসৃণ কলোনী সৃষ্টিকারী গ্রুপ-II বর্ণ রোগ সৃষ্টিতে অক্ষম। কিন্তু

বিস্ময়কর ভাবে গরম জলে মৃত গ্রুপ-III কোষ জীবিত গ্রুপ-II কোষের সাথে মিশ্রিত করে ইঞ্জেকশন দিলেও ইঁদুর রোগগ্রস্থ হচ্ছে এবং উক্ত রোগগ্রস্থ জীবদেহ থেকে জীবিত গ্রুপ-III কোষ পাওয়া যাচ্ছে। পরবর্তীকালে গ্রুপ-III এর কোষমুক্ত নিষ্কর্ষ (cell free extract) দ্বারাও গ্রুপ-II কোষের এই পরিবর্তন আনা সম্ভব হল। গ্রিফিথ এর জন্য একটি কোষান্তরণকারিবস্তুর (transforming principle) অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে অ্যাভারি, মাকলিওড ও মাকার্টি, ১৯৪৪ (Avery, McLeod and McCarty) নিশ্চিতভাবে এই 'কোষান্তরণকারি বস্তু'টি ডি. এন. এ ছাড়া কিছুই নয় তা প্রমাণ করেন। এখন পর্যন্ত বহু জীবাণুতে এই ধরনের কোষান্তরণ ঘোষিত হয়েছে যার মধ্যে **হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েন্জি (Haemophilus influenzae), ব্যাসিলাস সাবটিলিস** প্রভৃতি অন্যতম। যে কোন বংশাণু এই প্রক্রিয়ায় কোষান্তরিত হতে পারে।

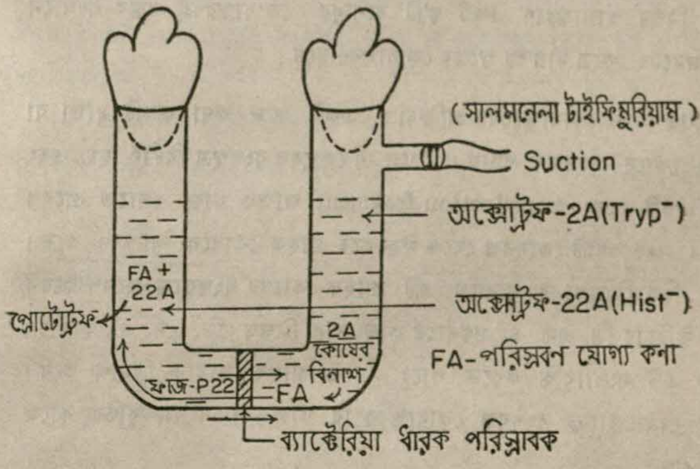
স্বনির্ভর স্থানান্তরণে কতটা ডি. এন. এ কোষান্তরিত হবে তা দাতার বংশসূত্র নিষ্কাষণের সময় কতটা বিদীর্ণ হবে তার উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ দাতার বংশসূত্রের দৈর্ঘ্যের ২০০ ভাগের ১ ভাগ কোষান্তরিত হয়। ঘনিষ্ঠ ভাবে সংস্থাপিত বংশাণুগুলি একসাথে কোষান্তরিত হতে পারে।

কোষন্তরণের বা ট্রানসফরমেশনের পদ্ধতি: বিজ্ঞানী অষ্ট্রিয়ান ১৯৫২ (Austrian) একটি পদ্ধতির প্রস্তাব করেন। তিনি এটিকে গ্রহীতা কোষের দাতা ডি. এন. এ দ্বারা সংক্রমণ বলে মনে করেন। ডি. এন. এ অণু প্রবিষ্ট হয় ও গ্রহীতার বংশসূত্রের একটি স্থায়ী অংশে পরিণত হয়। সাধারণতঃ ডি. এন. এ অংশ হিসাবেই (in fragments) অনুপ্রবেশ করে। একটি সূত্র গ্রহীতার বংশসূত্রের সাথে নবজোট বদ্ধ হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অবশ্য গ্রহীতা ব্যাক্টিরিয়ার ২-৩ পুরুষ পর্যন্ত স্বতন্ত্রই থেকে যায় এবং বিভাজিত হয় না। জুটি সূত্রদ্বয়ের বিদারণ ও পুনর্জোটবন্ধনের (breakage and reunion) মাধ্যমে গ্রহীতার নিউক্লিয়াসে প্রবেশ করে। নবলব্ধ বিশেষত্বের বহিঃপ্রকাশ (expression) ঘটে দু-এক পুরুষ পরে।

একটি জীবাণুর সমস্ত কোষই ডি. এন. এ গ্রহণ করতে পারে না। ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি চক্রের (growth cycle) একটি স্বল্পকাল স্থায়ী সময়ে এই কোষান্তরিত ডি. এন. এ গ্রহীতা কোষে গ্রহণ সম্ভব হয়।

**(গ) বংশ-বস্তুর ফাজ-নির্ভর কোষান্তরণ বা ট্রানসডাকশন** (Transduction) :

কোন জীবাণুর বিশেষত্ববাহক বংশাণুর বা বংশসূত্রাংশের যখন একটি কোষ থেকে অন্য কোষে কোষান্তরণ ঘটে একটি ব্যাক্টিরিয়া নাশক ভাইরাস বা 'ফাজের' মাধ্যমে তখন সেই কোষান্তরণকে বলা হয় পরনির্ভর বা ফাজনির্ভর কোষান্তরণ বা ট্রানসডাক্শন। জিনডার ও লেডেরবার্গ ১৯৫২ (Zinder and Lederberg) **সালমোনেলা টাইফিমুরিয়াম (Salmonella typhimurium)** ব্যাক্টিরিয়া সংক্রান্ত গবেষণা কালে ইংরাজী U-অক্ষরের আকৃতি যুক্ত (**চিত্র-৬৮**) একটি কাঁচনলের তলদেশে একটি ব্যাক্টিরিয়ারোধী পরিস্রাবক




চিত্র ৬৮ : বংশবস্তুর ফাজনির্ভর কোষান্তরণ

সংযুক্ত করে নলের দুটি অংশ স্বতন্ত্র করে নেন। ব্যাক্টিরিয়াটির অক্সোট্রফিক পরিব্যক্তগুলির মধ্যে ট্রিপটোফান সংশ্লেষণে অক্ষম ($T^-$) একটি বর্ণ 22A এবং হিস্টিডিন সংশ্লেষণে অক্ষম ($H^-$) আর একটি বর্ণ 2A—দুটি নিয়ে U-কাঁচনলের দুটি দণ্ড অংশে প্রতি সিসি ন্যূনতম খাদ্যমাধ্যমে ১০^৮টি কোষ হিসাবে স্বতন্ত্রভাবে দেওয়া হল (**চিত্র-৬৮**)। বেশ কিছু সময় পরে '$T^-$' ব্যাক্টিরিয়া দণ্ডে প্রতি দশ লক্ষ কোষে ১০টি হিসাবে প্রোটোট্রফ ($T^+H^+$) পাওয়া গেলে '2A' দণ্ডে কোন বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা গেল না।

পরীক্ষালব্ধ ফল বিশ্লেষণ করে বোঝা গেল যে 22A বর্ণটি একটি ফাজ (P-22) দ্বারা আক্রান্ত ও সহনশীল (lysogenised) অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। প্রক্রিয়াগত ভাবে ফাজ P-22, 2A কাঁচনলে উপস্থিত হয়, ঐ 2A কোষ থেকে $Trp^+$ বংশাণু সংগ্রহান্তে নিজ নলে ফিরে যায় ও পরে $T^-$ বর্ণকে $T^+$ বর্ণে পরিণত করে। ফাজ P-22 ঐ ব্যাক্টিরিয়ার যে কোন বিশেষত্ব ফাজ নির্ভর পদ্ধতিতে কোষান্তরিত করে। অবশ্য একাধিক ঘনিষ্ঠ ভাবে অবস্থিত বংশাণু এক সাথে যে একটি নবজোটবদ্ধ কোষে আসতে পারবে তার সম্ভাবনা খুবই কম। এক্ষেত্রে কোষগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ না হওয়া সত্ত্বে যে বংশসূত্রের কোষান্তরণ হচ্ছে সেটি যৌনজননের দ্বারা হতে পারে না। এছাড়া ফাজ নির্ভর স্থানান্তরণে একটি দু'টি বংশাণুর কোষান্তরণই সম্ভব যেখানে যৌনজননের ক্ষেত্রে দীর্ঘতর সূত্রের কোষান্তরণ ঘটে।

ফাজ নির্ভর কোষান্তরণের প্রক্রিয়া : একটি ফাজ কণা একটি দাতা বা জনক কোষে সংক্রমণ ঘটায়। ফলে ঐ কোষের বংশসূত্র বিদীর্ণ হয় এবং তার একটি অংশ (transduction fragment) জাতক ফাজ কণাতে প্রবেশ করে। এই কণাটি কোষবস্তু থেকে মুক্ত হয়ে গ্রাহক কোষকে আক্রমণ করে। পরে রিকমবিনেশনের মাধ্যমে এটি গ্রাহক কোষের বংশসূত্রে প্রবেশ করে। ব্যাক্টিরিয়ার ডি. এন. এ. গ্রহণার্থে ফাজ তার নিজস্ব ডি. এন. এ. হারায়। ফলে এটি সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে না ও গ্রাহক কোষকে বিনাশ করে। তাই দেখা যাচ্ছে বংশবস্তু কোষান্তরকারি ফাজগুলি সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে খুঁত-গ্রস্থ।

যে সমস্ত ফাজ ব্যাক্টিরিয়ার যে কোন বংশাণু কোষান্তর করতে সক্ষম তাদের অনিয়ন্ত্রিত কোষান্তরকারি ফাজ (unrestricted transducing phage) বলা হয় যথা P-22। **ই. কোলি** ব্যাক্টিরিয়াতে P-1 এ জাতীয় আর একটি ফাজ। তবে **ই. কোলি**-তেই দেখা যায় লামডা (λ) ফাজ কি ভাবে সীমিত কোষান্তরণ করে (restricted transduction)।

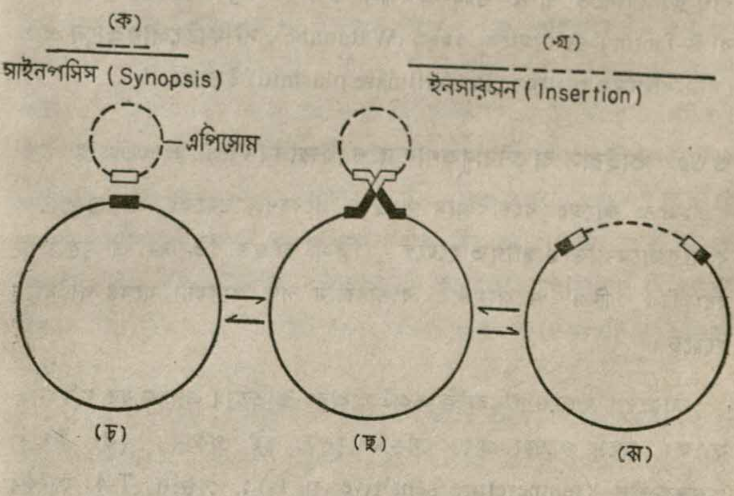
ফাজ নির্ভর কোষান্তরণ বহু ব্যাক্টিরিয়াতে দেখা গেছে। এটিকে ব্যাক্টিরিয়ার বংশাণুর মধ্যে স্বল্প পরিসরের বংশবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণে কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। দুটি পাশাপাশি অবস্থানকারি নিউক্লিওটাইডের

মধ্যে নবজোট বন্ধন (recombination) নির্ণয় করা এর সহযোগে সম্ভব হয়েছে।

(ঋ) **ব্যাক্টিরিয়া কোষে বংশসূত্র বহির্ভূত বংশবস্তু** (Extrachromosomal elements in bacteria) :

জীবাণুকোষে বংশসূত্র ছাড়া আরও কিছু বংশবস্তুর (genetic material) অস্তিত্ব নির্ণীত হ'য়েছে। জাকব ও ওলম্যান ১৯৫৮ (Jacob and Wollman) ই. কোলি ব্যাক্টিরিয়ার ফাজ সহনশীল (lysogeny) অবস্থায় দেখলেন ফাজের ডি. এন. এ ব্যাক্টিরিয়ার বংশসূত্রে সংবদ্ধ হ'য়ে বংশসূত্রের একটি অংশ হিসাবে কাজ করতে পারে। ড্রিসকেল ও জামেনফ (Driskell and Zamenhof) সমস্ত প্রকার বংশসূত্র বহির্ভূত বংশবস্তুগুলিকে দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ করলেন।

(ক) এপিসোম (Episomes) : যে সমস্ত বংশসূত্র বহির্ভূত বংশবস্তু বংশসূত্রের সাথে সংযোজিত থাকে তাদের জ্যাকব ও ওলম্যানের প্রস্তাব




চিত্র ৬৯ : এপিসোম—বিভিন্ন অবস্থা

অনুযায়ী এপিসোম বলা হয়। ব্যাক্টিরিয়া কোষে এপিসোম হিসাবে অবস্থান করে এফ-ফাক্টর বা যৌন নিমিত্ত (F-factor), টেমপারেট ফাজ বা

সহঅবস্থানকারীফাজ (temperate phage) ইত্যাদি। এই সকল বংশবস্তু মূল বংশসূত্রের মাত্র ১%। এপিসোমগুলি স্বনির্ভর (autonomous) অথবা সম্পূরিত (integrated) উভয় অবস্থাতেই থাকতে পারে (চিত্র-৬৯) যার উদাহরণ যথাক্রমে যৌননিমিত্তের $F^+$ ও HFr অবস্থা। সহঅবস্থানকারি ফাজ লামডা (λ)র ক্ষেত্রেও এই দুই অবস্থানই লক্ষ্য করা গেছে। এই দুই প্রকার এপিসোমই সংক্রমণের মাধ্যমে হারনো ও পুনরুদ্ধার হতে পারে। এরা বংশসূত্রাংশ গ্রহণ ক'রে কোষান্তরে নিয়ে যেতেও সক্ষম। বংশসূত্রের সাথে এদের সংযোগ প্রভৃতি কামপবেল মডেলে (Campbell Model) পরিস্ফুট। (চিত্র-৬৯)

(খ) প্লাসমিড (Plasmids): অন্য কোষ অঙ্গের মত কোষ বস্তুতে ভাসমান বংশবস্তুকে বলা হয় প্লাসমিড। এরা বংশসূত্রের সংশ্লিষ্ট হয় না। এর মধ্যে রয়েছে কিছু সহঅবস্থানকারি ফাজের বংশবস্তু, কলিসিন (colicin) নামক প্রোটিন উৎপাদনকারি কণা (**ই. কোলির** ক্ষেত্রে), এন্টারো-ব্যাক্টিরিয়েসিতে প্রাপ্ত ঔষধ-সহনশীল কণা (drug resistance factor) বা R-factor) ওয়াটানাবে, ১৯৬৯ (Watanabe), **স্টাফাইলোকক্কাসে** প্রাপ্ত পেনিসিলিনেস প্লাসমিড (Penicillinase plasmid) ইত্যাদি।

## ৩.৬৫ ভাইরাস বা জীবাণুকণার বংশ বিজ্ঞান (Viral genetics):

মূলতঃ ফাজের বংশবিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা থেকেই জীবাণুকণাদের বংশবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। তিনটি দুইসূত্র ডি. এন. এ যুক্ত ফাজ যথা টি-২, টি-৪ ও লামডার বংশবিজ্ঞান গত গবেষণা যথেষ্ট পরিমাণে হয়েছে।

ফাজদের ক্ষেত্রেও পরিব্যক্তি একটি সাধারণ প্রক্রিয়া। এপর্যন্ত যত পরিব্যক্তি ফাজের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে সেগুলি মূলতঃ দুই প্রকার। (ক) উষ্ণতা অনুভবনশীল (tempereture sensitive বা ts): যেগুলি T-4 ফাজের পরিব্যক্তি যা ২৫° ও ৪২° সে উভয় উষ্ণতাতে প্লেক সৃষ্টি ক্ষমতা হারিয়ে শুধুমাত্র ২৫° সে তে প্লেক সৃষ্টিতে সক্ষম। (খ) পীতাভ (Amber বা am) পরিব্যক্ত যারা **ই. কোলির** B.বর্ণতে প্লেক সৃষ্টিতে অক্ষম কিন্তু ই. কোলির অন্য

একটি পীতাভ পরিব্যক্তর সাপ্রেসর বংশাণু (suppressor gene) যুক্ত বর্ণ CR-63তে প্লেক সৃষ্টিতে সক্ষম।

ফাজদের ক্ষেত্রে সংকরণ (cross) করার পদ্ধতিতে দুটি চিহ্নিত বর্ণকে একই পোষক কোষে সংক্রমণ করান হয়। বিজ্ঞানী বেনজার (Benzer) ডিলিসন মাপিং (deletion mapping) পদ্ধতিতে ফাজের জেনেটিক মাপিং এ সমর্থ হয়েছেন। দেখা গেছে T-4 ফাজের বংশসূত্রে বংশাণুগুলি ক্রিয়া অনুযায়ী দলবদ্ধভাবে (in clusters) রয়েছে একটি বৃত্তাকার লিনকেজ গ্রুপে (circular linkage group)। অবশ্য বংশসূত্রের আচরণ থেকে মনে হয় যে উহা স্থানে স্থানে খণ্ডিত হওয়ার ফলে রৈখিক (linear) গঠনযুক্ত। এই বংশসূত্রে প্রায় ১০০০ ক্ষারজুটী এক প্রান্তে সুরু হ'য়ে অন্য প্রান্তে আবার আবির্ভূত হয় যেটিকে বলা হয় টার্মিনাল রেডানডেনসি (terminal redundancy)। সহ-অবস্থানকারি লাম্‌ডা ফাজেও বংশসূত্র টি-৪ এর মতই। তবে টার্মিনাল রেডানডেনসি এক্ষেত্রে থাকে না। বিভাজনকালে বৃত্তাকার হলেও ফাজের মাথায় অবস্থানকালে রৈখিক অবস্থায় থাকে। এছাড়া প্রতি সূত্রের ৫′ প্রান্তে ১৬ থেকে ১৮টি নিউক্লিওটাইড উঁচু হয়ে থাকে। বহু ভাইরাসে ডি. এন. এ. বৃত্তাকারে থাকে। আবার $T_2$, $T_4$, $T_6$ প্রভৃতি জোড় সংখ্যাযুক্ত (even) ফাজে সাইটোসিনের পরিবর্তে ৫-হাইড্রক্সিমিথাইল সাইটোসিন থাকে। আর. এন. এ ভাইরাসগুলির ক্ষেত্রে তাদের সমগ্র জৈবনিক ক্রিয়াকলাপ ও বিভাজন ক্রিয়া ডি. এন. এ ছাড়াই ঘটে। কিছু ক্ষেত্রে যেমন TMV বা পোলিও ভাইরাসে আর. এন. এ একটি সূত্র হিসাবে থাকে। অন্য অনেক ক্ষেত্রে যেমন রিওভাইরাস, ক্ষতস্থানের অর্বুদস্রষ্টা ভাইরাস (Wound tumor virus) বা ধানের বেঁটে হলুদ রোগের ভাইরাস (rice dwarf virus) প্রভৃতিতে জোড়া সূত্র থাকে।

ফাজের ক্ষেত্রেও নিউক্লিক অম্লের নবজোট বন্ধন (recombination) প্রমাণিত হয়েছে। ফাজের বৃদ্ধির সময় যে ডি. এন. এ পুল (pool) তৈরী হয় তার বিভিন্ন নিউক্লিক অম্লসূত্রগুলির মধ্যে নবজোট বন্ধন ঘটে। ভাইকন্‌টি ও ডেলব্রুক (Visconti and Delbruck) দেখিয়েছেন এই বংশ সূত্রগুলি অন্ততঃ ৫ দফা যৌনমিলন (mating) ঘটায়। এক্ষেত্রেও পদ্ধতি হিসাবে বিদারণ ও নবজোট বন্ধন (breakage and reunion) কার্যকরী।

সহঅবস্থানকারি ফাজগুলির ক্ষেত্রে লামডা ($\lambda$) ফাজ সম্পর্কে গবেষণালব্ধ ফল থেকে দেখা গেছে ফাজের নিউক্লিক অম্ল ব্যাক্টিরিয়ার নিউক্লিক অম্লের সাথে পাশাপাশি সংযুক্ত (synapsed) অথবা ভিতরে অন্তর্ভূ'ক্ত (inserted) থাকে।

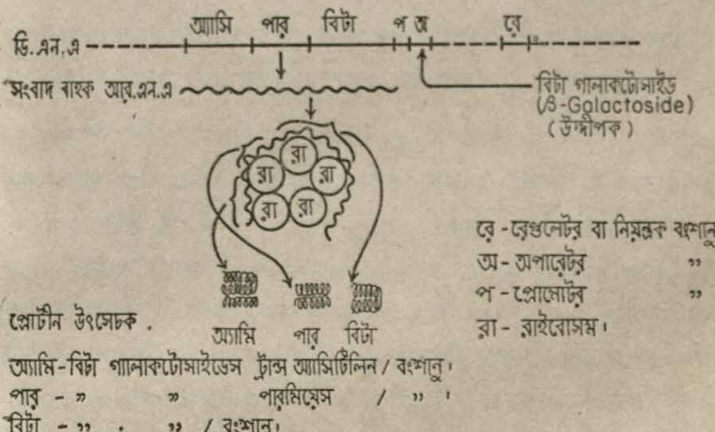
**৩·৬৬ বংশাণুর অভিব্যক্তি ও ক্রিয়াকলাপ** (Gene expression and function) :

বংশসূত্রে যতগুলি বংশাণু থাকে তার অধিকাংশই প্রোটিন বা উৎসেচক সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের অভিব্যক্তি ঘটায়। এই সূত্রে 'একটি বংশাণু একটি উৎসেচক' তত্ত্বের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু বংশাণু কোন প্রোটিন সৃষ্টিকার্যে লিপ্ত নহে।

আগে বংশাণুকে একটি অবিভাজ্য একক ভাবা হলেও বংশাণুভিত্তিক ক্রসিং ওভারের জন্যই এই ভুল হয়েছে এটা বোঝা গেছে। এখন জানা গেছে যে নবজোট বন্ধনযোগ্য ক্ষুদ্রতম একক—বংশাণু নয় একটি ক্ষারজুটি মাত্র। এ সম্পর্কে সিসট্রন বা 'ক্রিয়া একক' (cistron, the unit of function) এর ধারণা গ্রহণযোগ্য। বেনজার ও তাঁর সঙ্গীরা ১৯৫৭ সালে ইহা ব্যক্ত করেন। দুটি যৌন মিলনকারি (mating) বংশসূত্রের প্রত্যেকটির একটি ক'রে বংশাণু যে কোন কারণে যদি তাদের কোন অংশ হারায় (deletion) তাহলে একটির ক্ষতিগ্রস্থ বংশাণু (defective gene) নবজোটবন্ধন ভিত্তিক ক্রসিং ওভার দ্বারা অপরের ক্ষতিপূরণ করতে পারে। এক্ষেত্রে যদি দুটি ক্ষতিগ্রস্থ বিন্দুই সূত্রের যে কোন একটি অংশের একই দিকে অবস্থান করে (cis অবস্থান) তারা পরস্পরের পরিপূরক (complement) হতে পারে। যদি বিন্দুদ্বয় বিপরীত দিকে অবস্থান করে (trans অবস্থান) তারা পরস্পরের পরিপূরক হতে অসমর্থ হয়। যে বংশাণুর নিউক্লিওটাইডের ক্রমবিন্যাস এভাবে নির্ণীত হয় তার জৈবনিক ক্রিয়োপযোগী অংশকে বলা হয় সিসট্রন (cistron)। এই সূত্রের আলোকে পূর্বে আলোচিত 'একটি বংশাণু একটি উৎসেচক' তত্ত্বকে উন্নত করা হয়েছে 'একটি সিসট্রন একটি পলিপেপটাইড' তত্ত্বে।

সমস্ত সিস্ট্রনই শুধু পলিপেপটাইড সংশ্লেষণের দায়িত্বে লিপ্ত নয়। এদের মধ্যে যারা বিশেষ প্রোটিন সংশ্লেষণে লিপ্ত তাদের বলা হয় গঠনমূলক বংশাণু

(structural genes)। অন্যান্য বংশাণু বা সিসট্রনগুলি বিভিন্ন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের নিয়ন্ত্রক বংশাণু (structural gene) বলা হয়। এরা কিছুটা সুরু ও বন্ধ করার সুইচের (on-off swich) মত কাজ করে। বহু ব্যাক্টিরিয়াতে বিটা গ্যালাক্টোসাইডেস ($\beta$-galactosidase) উৎসেচক (লাকটোস গাঁজানতে লিপ্ত) লাক্টোস যোগানর মাধ্যমে সৃষ্টি করা সম্ভব। ব্যাক্টিরিয়ার বংশসূত্রে একটি অপসারণযোগ্য প্রতিবন্ধক (repressor) থাকে যেটি সাধারণ অবস্থাতে $\beta$ গালাকটোসাইডেস উৎপাদন প্রক্রিয়াকে অকর্মন্য করে রাখে। প্ররোচক (inducer) লাকটোস দিলে তা ঐ প্রতিবন্ধককে অপসারণ করে যার ফলে $\beta$ গালাকটোসাইডেস প্রক্রিয়া কর্মক্ষম হয়। এক্ষেত্রে প্ররোচক যাতে কোষে প্রবেশ করতে পারে তজ্জন্য পারমিয়েস উৎসেচক উৎপাদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিবন্ধক বস্তুটি উৎপন্ন হয় নিয়ন্ত্রক বংশাণুর (regulator gene) দ্বারা। যে গ্রাহক বিন্দুটির উপর প্রতিবন্ধক কাজ করে তাকে বলা হয় নিয়ন্ত্রক (operator)। নিয়ন্ত্রকটি গঠনমূলক বংশাণু




চিত্র ১০ঃ বংশাণুর অভিব্যক্তি

সৃষ্টিকারী সংবাদ বাহক আর. এন. এ সংশ্লেষণ বন্ধ করে। সমগ্র পদ্ধতিটি একটি নিয়ন্ত্রক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যার নাম অপেরন (operon) (চিত্র-১০)।

অনেকগুলি অপেরণ পরস্পর সংযুক্ত থাকে এবং পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আরও কিছু বংশাণুকে বলা হয় পরিবর্তন সাধক (modifiers)। এরা অন্যান্য বংশাণুর ক্রিয়াকলাপ হ্রাস-বৃদ্ধি করে। মোটামুটি এটুকু পরিস্কার যে বংশাণুরাও স্বনিয়ন্ত্রিত (autonomous) নয়। পরন্তু সকলেই পরস্পর নির্ভরশীল।

## চার

# জীবাণুর খাদ্য ও ক্রমবৃদ্ধি
(Nutrition and growth of microorganisms)

"...শ্রীমতি যা খান সবই শ্রীমতি হ'য়ে যায় ।"

—ডব্লু. মেয়ার

৪.০০ বৃদ্ধি বা ক্রমবৃদ্ধি শব্দগুলি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। জীবাণু-বিজ্ঞানে ক্রমবৃদ্ধি বলিতে জীবাণুর ভর (mass) বা পরিমাপের (size) ক্রমপর্যায়যুক্ত বৃদ্ধিকে বোঝায়। জীবাণুকোষে বৃহৎ অণু সংযোগে ক্রমবৃদ্ধি হয়। ক্রমবৃদ্ধি হ'চ্ছে কোষের সর্বঅঙ্গে ক্রমপর্যায়যুক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি। এ জন্য কোষের সমস্ত অঙ্গের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রয়োজন হয়। স্বভাবতঃই ক্ষুদ্র অণু, বৃহৎ অণু প্রভৃতির সংশ্লেষণ ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয় পর পর। পরবর্তীকালে অণুগুলি যথাযথভাবে সংযুক্ত হয়ে নতুন কোষ অঙ্গ সৃষ্টি করে।

কোষের অথবা কলার বৃদ্ধি একটি যথেষ্ট জটিল প্রক্রিয়া। অভিস্রবণ (osmosis) প্রক্রিয়াতে জলগ্রহণের জন্যও কোষের বৃদ্ধি ঘটতে পারে কিন্তু সেটিকে ক্রমবৃদ্ধি বলা যায়না কারণ সেক্ষেত্রে কোন নতুন সংশ্লেষণ হয় না। আবার ছত্রাক স্পোরের অঙ্কুরোদ্গমের সময় কোষে সঞ্চিত খাদ্যবস্তুর বিয়োজন হয় যার ফলে কোষের ওজনও হ্রাস পায়। কিন্তু প্রক্রিয়াটিকে ক্রমবৃদ্ধির মধ্যেই ধরতে হবে। জীবাণুর কলোনী তৈরী করুক বা না করুক এটিকে এদের বৃদ্ধি বলেই ধরা হয়। বহুকোষী জীবাণুর ক্ষেত্রে বিশেষতঃ উন্নত ছত্রাক বা শৈবালে বৃদ্ধির মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পৃথগীকরণ (differentiation) ও অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রকৃতিগতভাবে ক্রমবৃদ্ধি সর্বক্ষেত্রেই কোষের ক্রিয়াকলাপে একটা নিয়মতান্ত্রিকতা নিয়ে আসে।

সর্বোপরি বৃদ্ধি শব্দটি অনেকগুলি অনুরূপ জৈব প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে ব্যবহৃত হয় বলে এটির সাথে একটি করে পূর্ব উপসর্গ সহযোগে ব্যবহার করা

হয় বিভিন্নক্ষেত্রে যেমন সংখ্যাবৃদ্ধি (population growth), আয়তনবৃদ্ধি (volume growth), দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি (linear growth) স্থানিকবৃদ্ধি (localised growth) ইত্যাদি।

## ৪·১০ জীবাণুর খাদ্য ভিত্তিক জৈব প্রকৃতি ইত্যাদি :

৪·১১ বিভিন্ন প্রকার জীবাণু তাদের খাদ্যের প্রয়োজনে ও নির্বাচনে অসীম বিভিন্নতা দেখায়। তাদের জৈব প্রকৃতি বিশেষতঃ খাদ্য সম্পর্কে চাহিদা ও আচরণ অনুযায়ী কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়।

### (অ) খাদ্যে স্বাবলম্বী বা স্বভোজী (autotrophs) :

যে সমস্ত জীবাণু জৈব পদার্থ ব্যবহারে অক্ষমতার জন্য সাধারণতঃ অজৈব লবণাদি থেকে খাদ্য গ্রহণ ক'রে জটিল জৈবরাসায়নিক যৌগ সংশ্লেষণ করে, তাদের খাদ্যে স্বাবলম্বী বা স্বভোজী বলা হয়। এই জাতীয় জীবাণু সাধারণতঃ বাতাসের কার্বনডাই অক্সাইড থেকে কার্বন সংগ্রহ করে এবং বহু অজৈব রাসায়নিককে জারিত ক'রে শক্তি সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এই জীবাণুগুলি প্রাণী বা উদ্ভিদ নির্ভর নয়।

### (আ) খাদ্যে অবলম্বী বা পরভোজী (heterotrophs) :

এই সব জীবাণু সাধারণতঃ অজৈব রাসায়নিক থেকে জৈব রাসায়নিক বা কোষবস্তু (protoplasm) সংশ্লেষণ করতে পারে না এবং জীবন ধারণের জন্য সবসময়ই জৈবরাসায়নিক জাতীয় যৌগ যথা প্রোটিন, পেপ্‌টোন, অ্যামিনো অম্ল প্রভৃতি সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এজাতীয় জীবাণু সাধারণতঃ জীবনধারণের জন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল হয়।

### (ই) উভ-ক্ষমতাযুক্ত জীবাণু (Facultatives) :

যেসমস্ত জীবাণু জীবন ধারণের জন্য জৈব বা অজৈব, যেকোন প্রকার যৌগ ব্যবহারে সক্ষম তাদের উভয় ক্ষমতাযুক্ত জীবাণু বলা হয়। জীবাণুদের একটি বিরাট অংশ এই গোষ্ঠীভুক্ত।

## ৪·১২ মৃতজীবি ও পরজীবি (saprophytes and parasites) :

যে সমস্ত জীবাণু মৃত জৈব পদার্থের উপর জীবন ধারণ করে তাদের মৃতজীবি বলা হয়। যে সমস্ত জীবাণু অন্য জীবের উপরিভাগে বা মধ্যে জীবন-

ধারণ করে এবং ঐ ধারক (পোষক) জীবাণু থেকে খাদ্য গ্রহণ করে তাদের পরজীবি বলা হয়। পরজীবিদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী শুধুমাত্র জীবিত কোষে (পোষক) জীবনধারণে সক্ষম। তাদের বলা হয় সর্তাধীন বা বাধ্যতামূলক পরজীবি (obligate parasites)। বাকী জীবাণুগুলির বেশীর ভাগই জীবনধারণে এরকম কোন সর্তাধীন নয়। তাদের বলা যায় সাধারণ পরজীবি (non-obligate parasites)।

**৪.২০ খাদ্যমাধ্যমে জীবাণুর আবাদ** (Cultivation of microorganisms in medium) **:**

বহু সংখ্যক জীবাণুকে গবেষণাগারে বিভিন্ন ধরনের কৃত্রিম খাদ্যমাধ্যমে (medium) আবাদ করা যায়। খাদ্যমাধ্যম তার মধ্যেকার খাদ্যবস্তু বা উপাদান (ingredients) গুলির প্রকৃতি অনুযায়ী দুই প্রকার হতে পারে।

**৪.২১ জ্ঞাত সংযুতিযুক্ত খাদ্যমাধ্যম বা সিনথেটিক মিডিয়াম** (Synthetic medium) **:**

জীবাণুর যে সমস্ত খাদ্যমাধ্যম সম্পূর্ণভাবে জ্ঞাত সংযুতিযুক্ত উপাদান দ্বারা প্রস্তুত হয় তাদের বলা হয় জ্ঞাত সংযুতিযুক্ত খাদ্যমাধ্যম। এই খাদ্যমাধ্যমগুলি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অজৈব লবণ দ্বারা প্রস্তুত হয়। জৈব রাসায়নিক থাকলেও সেগুলি ক্ষুদ্র স্নেহজাতীয় অম্ল, অ্যামিনো অম্ল, কোহল, শর্করা জাতীয় রাসায়নিক, খাদ্যপ্রাণ ইত্যাদি জ্ঞাত সংযুতি (composition) যুক্ত রাসায়নিক দ্বারা জীবাণুর সমস্ত প্রয়োজন মেটায়। আবাদযোগ্য সমস্ত জীবাণু অবশ্য এধরনের খাদ্য মাধ্যমে আবাদ করা যায় না, যদিও ক্রমান্বয়ে আরও বেশী জীবাণুর এজাতীয় মাধ্যমে আবাদ সম্ভব হচ্ছে।

**৪.২২ অজ্ঞাত সংযুতিযুক্ত খাদ্য মাধ্যম** (Non-synthetic medium) **:**

এই সমস্ত খাদ্যমাধ্যমে এক বা একাধিক উপাদান থাকে যাদের সংযুতি অজ্ঞাত। জীবাণুর খাদ্যমাধ্যমে এই প্রকার অজ্ঞাত সংযুতিযুক্ত খাদ্য উপাদানগুলি যথেষ্ট ব্যবহার হয়। এর মধ্যে গোমাংস নিষ্কর্ষণ (beef extract), ঈষ্ট নিষ্কর্ষণ (yeast extract), পেপটোন (peptone), সাধারণ মাংস কাথন (meat infusion), রক্তরস (serum), কেসিন হাইড্রোলাইজেট (casein

hydrolysate), আলুর নির্ষ্কর্ষণ (potato extract) ইত্যাদি অন্যতম। অবশ্য এই উপাদানগুলির মধ্যে কতকগুলি ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে, অন্য কতকগুলি ছত্রাকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এসব ক্ষেত্রে খাদ্যমাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানগুলির পরিমাণের যথাযথ বা সম্পূর্ণ পরিমাপ কোন ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। বহু জীবাণুর বৃদ্ধির বা জীবনধারণের জন্য এমন কিছু উপাদান লাগে যেগুলির প্রকৃতি ও পরিমাণ নির্ণীত হয় নাই। সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান এই জাতীয় জৈব উপাদান মাধ্যমেই জীবাণুরা পেয়ে থাকে।

৪·২৩ খাদ্য মাধ্যমগুলি যে সমস্ত খাদ্যবস্তু মিশ্রিত ক'রে সৃষ্টি করা হয় তাদের মূল উদ্দেশ্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলি জোগান।

(অ) নাইট্রোজেন সরবরাহকারি খাদ্যবস্তু :

নিশ্চিত স্বাবলম্বী (strict autotrophs) জীবাণুরা অজৈব নাইট্রোজেন যুক্ত অ্যামোনিয়া লবণ ব্যবহারে সক্ষম। যারা নিশ্চিত অবলম্বী তারা আবার অজৈব অ্যামোনিয়া লবণ ব্যবহারে অক্ষম; ফলে জীবনধারণের জন্য এদের জৈব নাইট্রোজেনযুক্ত লবণ যথা অ্যামিনো অম্ল প্রভৃতির সরবরাহ অবশ্য প্রয়োজনীয়। তৃতীয় গোষ্ঠীভুক্ত জীবাণুগুলি অবশ্য জৈব ও অজৈব যে কোন প্রকার নাইট্রোজেনই ব্যবহার করতে সক্ষম।

জীবাণুর অ্যামিনো অম্লের প্রয়োজনীয়তা ও বিভিন্ন ধরনের হয়। একটি জীবাণুর অবশ্য প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অম্ল আরেকটির ক্ষেত্রে আদৌ প্রয়োজন না হতে পারে। নাইট্রোজেনযুক্ত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজনীয় পরিমাণও বিভিন্ন জীবাণুতে ভিন্নতর। যেমন **ই. কোলি** ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ কোষপ্রতি $১০^{-১৩}$ গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড।

(অ) কারবন সরবরাহকারী খাদ্যবস্তু :

জীবাণুদের মধ্যে কারবনের প্রয়োজনের বিভিন্নতা অসীম। নিশ্চিত স্বাবলম্বীরা প্রয়োজনীয় কারবন $CO_2$ বা কার্বনেট জাতীয় লবণ থেকে সংগ্রহ করে। অবলম্বীদের ক্ষেত্রে জৈব কারবন সরবরাহ অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরিবর্তনশীল খাদ্যাভ্যাস যুক্তরা যে কোনটিতেই সন্তুষ্ট। জীবাণুদের বিভিন্ন প্রকার কারবন যুক্ত খাদ্যবস্তুর প্রয়োজনীয়তা ও স্বতন্ত্র প্রকৃতির। সাধারণতঃ অবলম্বীরা বহুপ্রকার কার্বন উৎস ব্যবহারে সক্ষম যদিও একটি বহুল ব্যবহৃত

উৎস হচ্ছে শর্করা ও সমতুল যৌগ। জীবাণু জৈব অম্লগুলিও যথা সাইট্রিক, ল্যাক্টিক, ম্যালিক প্রভৃতি কার্বন উৎস হিসাবে ব্যবহার করে। এতদ্ব্যতীত স্নেহজাতীয় অম্ল বা মনোহাইড্রিক কোহল ও বহুক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

(ই) খাদ্যপ্রাণ (vitamins) সরবরাহকারি খাদ্যবস্তু :

কতকগুলি খাদ্য উপাদান রয়েছে যেগুলি জীবাণুর জীবনধারণে অবশ্য প্রয়োজনীয় কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পরিমাণে লাগে। এরা ক্রমবৃদ্ধির কালে উদ্দীপনা (stimulus) জোগায়। সাধারণভাবে এদের বৃদ্ধি সহায়ক (growth factors) বলা হয়। খাদ্যপ্রাণ এজাতীয় বৃদ্ধি সহায়কগুলির মধ্যে অন্যতম। দেখা গেছে স্বাবলম্বীরা সমস্ত প্রকার খাদ্যপ্রাণই সংশ্লেষণে সক্ষম, আর অবলম্বীরা সাধারণতঃ অক্ষম। খাদ্যপ্রাণ সংশ্লেষণে সক্ষমদের মধ্যেও নির্দিষ্ট পরিবেশই এজাতীয় খাদ্য উপাদান সংশ্লেষণের পূর্বসর্ত হয়ে দাঁড়ায়।

জীবাণুদের ক্রমবৃদ্ধিতে এজাতীয় খাদ্যপ্রাণের মধ্যে থায়মিন (thymin), বায়োটিন (biotin), প্যান্টোথেনিক অম্ল (pantothenic acid), নিকোটিনিক অম্ল (nicotinic acid), পাইরিডক্সিন (pyridoxin), রাইবোফ্লেভিন (riboflavin) প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয়। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফলিক অম্ল (folic acid), ইনোসিটল (inositol) নিকোটিনামাইড (nicotinamide) বা কিছু অ্যামিনো অম্ল অতি প্রয়োজনীয়।

## ৪·৩০ প্রতিস্বিক জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি (Growth of individual microorganisms) :

### ৪·৩১ এককোষী জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি :

এককোষী জীবাণু অর্থাৎ ব্যাক্টিরিয়া, ঈষ্টগোষ্ঠীর ছত্রাক ও বহু শৈবালের দ্বিবিভাজন হয় অঙ্গজ পদ্ধতিতে। এই সমস্ত জীবাণুর পূর্ণাঙ্গ কোষগুলি মোটামুটি সমান মাপের। তাই মনে হয় দ্বিবিভাজনের আগে কোষগুলি আকার বৃদ্ধির সাহায্যে প্রায় দ্বিগুণ হয়। তারপর কেন্দ্র বিভাজিত হয়। সর্বশেষে বিভাজন প্রাচীর (septum) দ্বারা দুটি কোষের সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রেই এই প্রক্রিয়াগুলির সময় ক্রম ঠিক বজায় থাকে না। ফলে বহুকেন্দ্রযুক্ত কোষের ও সৃষ্টি হয়। অনেকক্ষেত্রে বিভাজন অভাবে কোষগুলি দীর্ঘ হয়। এক একটি কোষের দ্বিবিভাজনের সময় এক এক রকম। একটি কোষ সমষ্টিতে

এক একটি কোষ বিভাজন সময়গুলির বিস্তারের প্রকৃতি অসম। ইষ্টের ক্ষেত্রে দেখা গেছে (fission yeast = **Saccharomyces pompe,** budding yeast = **S. cerevisiae**) এদের কোষবস্তুর বৃদ্ধির হার রৈখিক ও গুণোত্তর (linear and exponential) নয়। কোষের 'বৃদ্ধি' কোষবস্তু মধ্যস্থ কিছু কণা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যাদের সংখ্যা ও ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট থাকে কোষের জীবনভর। বিভাজনের সময়ই মাত্র কোষের সংখ্যা দ্বিবিভাজন মাধ্যমে দ্বিগুণ হয়।

কোষের বৃদ্ধির প্রকৃতি এক এক জীবাণুতে এক এক প্রকার। ডায়াটমদের ক্ষেত্রে নবজাতককোষ জননীকোষের চেয়ে ক্ষুদ্রতর হয়। পরে অক্সোস্পোর (auxospore) গঠনের মাধ্যমে বা নতুন কোষ সৃষ্টির সময় পরিমাপের সমতা আসে।

(ক) **সূত্রযুক্ত জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি** (Growth of filamentous micro-organisms) :

ছত্রাকের, **স্ট্রেপটোমাইসেস (Streptomyces)** দের এবং বহু শৈবালের সূত্রাণুর (hypha)র শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি হয়। সাধারণতঃ সূত্রাগ্রর অগ্রভাগের সামান্য একটু পিছনের অংশেই বৃদ্ধি সংঘটিত হয়। দেখা গেছে সূত্রাণুর ঐ অঞ্চল জুড়েই যাবতীয় কোষ সামগ্রী ক্রমাগত সৃষ্টি হয়। তবে বৃদ্ধি সূত্রাগ্রর অগ্রভাগে হলেও (apical) কোষবস্তু সংশ্লেষণ অনেকটা পরিসর জুড়ে হ'য়ে চলেছে। সূত্রাণুর দৈর্ঘ্যবৃদ্ধির হার মোটামুটি সমান। নূতন শাখা সৃষ্টির জন্য কোষ প্রাচীরের স্থানে স্থানে নমনীয়তা, শাখা উৎপাদনের স্থান নির্বাচনে সহায়তা করে। লৌহ ও গন্ধকনির্ভর ব্যাক্টিরিয়া, সবুজ শৈবাল যেমন **স্পাইরোগাইরা (Spirogyra)** বা কিছু নীল-সবুজ শৈবাল যথা **নস্টক (Nostoc)** এর ক্ষেত্রে জায়মান অংশ কিছুটা সূত্রাকার। কিন্তু সূত্রের যেকোন কোষই দ্বিবিভাজনে সক্ষম। এদের ক্ষেত্রে তাই দৈর্ঘ্যবৃদ্ধি প্রতিকোষের বৃদ্ধির যোগফল।

(খ) **কোষ বা জটিল-দেহ জীবাণুর দ্বিতীয় স্তরের বৃদ্ধি** (Secondary growth of cells or complex structures of microorganisms) :

নবসৃষ্ট কোষগুলি সাধারণতঃ রঙহীন, পাতলা আস্তরণযুক্ত ও শূন্যগর্ভহীন (vacuole) থাকে। পরে কোষের বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে শূন্যগর্ভ সৃষ্টি হয়

এবং জীবাণুর বিশেষত্ব স্বরূপ রঞ্জক সৃষ্টি হয়। সংগৃহীত খাদ্যকণা এবং তৈলবিন্দু কোষে ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়। কোষ প্রাচীর ক্রমান্বয়ে পুরু ও অনমনীয় হ'তে থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কোষ প্রাচীরগাত্রে অবক্ষেপনের (deposition) ফলে এই পরিবর্তন হয়। এটিকে বলা হয় দ্বিতীয় স্তরের বৃদ্ধি। এই দ্বিতীয় স্তরের বৃদ্ধি স্পোর এবং ছত্রাক ফলে (fruit body) বিভিন্ন কোষে বিভিন্ন হারে হতে দেখা যায়। ফলে এসব স্থানে কোষগুলি বিভিন্ন-দিকে বিভিন্ন মাপে বৃদ্ধি পায়। ঠিক এই কারণেই এই গঠনগুলি জটিল কাঠামো বা চেহারা ধারণ করে। পার্শ্ববর্তী কোষের চাপের তারতম্যের উপরও কোষের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আকৃতি নির্ভর করে। যেমন অ্যাসকোমাইসিট শ্রেণীর ছত্রাক অ্যাস্কি (asci) তৈরি করার সময় একসাথে বহু অ্যাসকি পাশাপাশি পরস্পরের উপর চাপের সৃষ্টি করে তারই ফলে তারা লম্বাটে ও গদাকৃতি (clavate) হ'য়ে পড়ে। বেসিডিওমাইসিট শ্রেণীতেও একই ধরনের পার্শ্বচাপযুক্ত পারিপার্শ্বিক লম্বাটে বেসিডিয়া (basidia) তৈরি করে। প্লেক্টাসকেলস (Plectascales) বর্গের ছত্রাকগুলি সবদিকে চাপমুক্ত অবস্থাতে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তাদের অ্যাস্কি হয় গোলকাকৃতি (globose)।

ছত্রাক কোষপ্রাচীরের দ্বিতীয় স্তরের বৃদ্ধি মূলতঃ একটি পুরুত্ববৃদ্ধি (thickening) প্রক্রিয়া এবং এটি স্পোরগুলির ক্ষেত্রেই বেশী দেখা যায়। স্ক্লেরোসিয়া, রাইজোমরফ ও বিভিন্ন ছত্রাক ফলের সীমান্তবর্তী কোষগুলিতেও এই প্রকার বৃদ্ধি হয়। প্রাচীরের পুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে এর মধ্যে মেলানিন (melanin) নামক কাল রঞ্জক (pigment) অবক্ষিপ্ত হয়। এই পুরুত্ব ও ঘন রঞ্জক অবক্ষেপন তাদের অক্রিয় থাকার ক্ষমতা (dormant) দান করে। অনেক ক্ষেত্রে কোষ প্রাচীরের ভিতর দিকে প্রাচীর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি স্তর তৈরি হয়। জাইগোস্পোর গঠনকারি ছত্রাকগুলি যথা **মিউকর, রাইজোপাস** ইত্যাদি তাদের উক্ত স্পোরের প্রাচীরটি পরিত্যাগ করে ও অন্য কতকগুলি প্রাচীর স্তর দ্বারা আবার ঢাকা হয়। এই সমস্ত কোষ প্রাচীর অনমনীয় ও অভেদ্য। এই সমস্ত স্পোরের অলঙ্করণটুকু সম্পূর্ণই দ্বিতীয়স্তরের বৃদ্ধির ফল।

ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রেও (**Bacillus ramosus**) বিভাজন মধ্যবর্তী সময়

পরিমাপে কোষগুলি অবিরাম বড় হয়। **বি. সিরিয়াসের** ক্ষেত্রেও কোষের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির হার সময়ের সাথে সাথে বাড়ে। তবে বৃদ্ধির হারের তারতম্য থাকলেও দ্বিতীয় স্তরের বৃদ্ধি এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক'রে উপলব্ধি করা বেশ দুরূহ।

**৪·৩২ এককোষী জীবাণুর গোষ্ঠীগত বৃদ্ধি** (Population growth of unicellular microorganisms) :

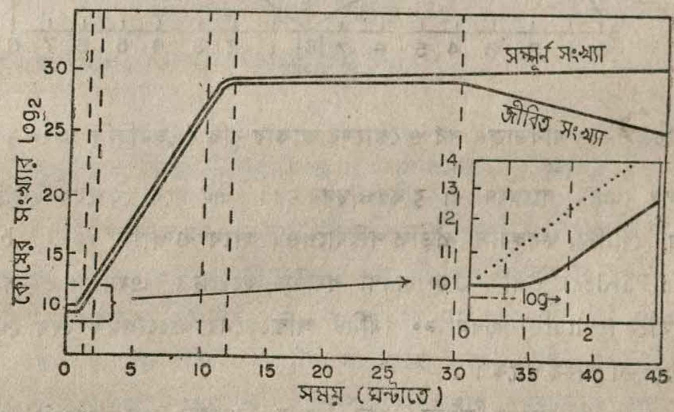
এককোষী জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কীয় বহু তথ্য ব্যাক্টিরিয়া সম্পর্কে গবেষণা থেকে জানা গেছে। তথ্যগুলি অন্য এককোষী জীবাণুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এককোষী জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি কয়েকটি পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। পদ্ধতিগুলি মূলতঃ দুই প্রকার। যথা (১) ঘনমান (volume) প্রতি কতগুলি কোষ রয়েছে ; ইহা সম্পূর্ণ গণনা পদ্ধতি (total count) বা জীবিত গণনা পদ্ধতি (viable count) দ্বারা জানা সম্ভব এবং (২) প্রতি একক ঘনমানে (volume) কত পরিমাণ ওজনের কোষ আছে।

সম্পূর্ণ গণনা দ্বারা বৃদ্ধির পরিমাপও বহু প্রকারে করা যায়। এতে মৃত ও জীবিত সমস্ত কোষই অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে বেশী হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রেখিত এলাকার মধ্যে কোষগুলির সংখ্যা গণনা ও একটি পদ্ধতি। এ ছাড়া কোল্টার গণক (Coulter) দ্বারা রঞ্জিত কোষও গণনা করা হয়। জলে জীবাণু কোষের অবলম্বন (suspension) তৈরি করে মাক্‌ফারলাণ্ড তালিকাতে (McFarland scale) তার টার্বিডিটি (turbidity) বা কলরিমিটারে (colorimeter) তার বিশোষণ (absorbance) পরিমাপ করেও এটা করা সম্ভব।

জীবিত গণনা (viable count) পদ্ধতিতে যে সমস্ত কোষ সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম তাদেরই সংখ্যা গণনা করা হয়। জীবাণুকোষের যথাযথ ঘনত্বের অবলম্বন পেট্রি থালাতে (Petri dish) খাদ্য মাধ্যমের সাথে মিশ্রিত করা হয় (dilution plating) এবং কলোনী গণনা করে প্রতি একক অবলম্বনে কতগুলি কোষ ছিল তার সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রকৃত সংখ্যার চেয়ে গণনাতে কম সংখ্যা আসার সম্ভাবনা থাকে কারণ একটি কলোনী একাধিক কোষ থেকেও তৈরী হতে পারে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলির নিজ নিজ সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এগুলিই সর্বাধিক কার্যকরী ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

(ক) **ক্রমবৃদ্ধির পর্বগুলি** (Phases of growth): এককোষী জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির প্রকৃতি নির্ভর করে পরিবেশের উপর। এর মধ্যে খাদ্য সরবরাহ অত্যন্ত প্রভাবশালী বিষয়। ক্রমবৃদ্ধির প্রকৃতি ও পর্বগুলি দুটি স্বতন্ত্র খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাতে মূলতঃ দুই প্রকার রূপ পরিগ্রহণ করে। (ক) সময়ের পরিধিতে সীমাবদ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থাতে (batch culture) জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি এবং (খ) অনিয়ত খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাতে (continuous culture) জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি ধারণ করে এবং স্বতন্ত্র ভাবেই আলোচনার যোগ্য।

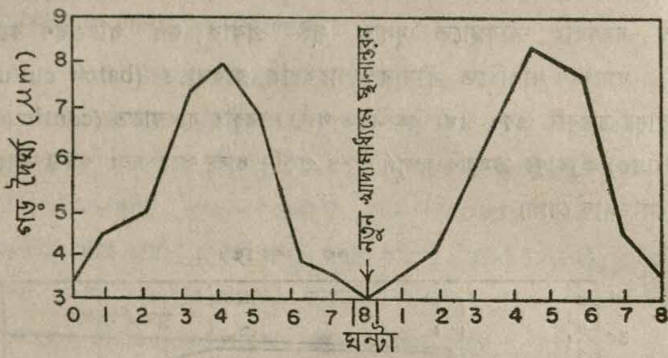



চিত্র ৭১: জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির রেখাচিত্র—ই. কোলি

সীমাবদ্ধ খাদ্য সরবরাহে জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি: সীমাবদ্ধ বা সীমিত খাদ্য সরবরাহ অবস্থাতে জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি **ই. কোলি** ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে (**চিত্র-৭১**) উপরের মত হয়।

১। **অবিভাজন পর্ব (Lag phase):** সাধারণতঃ নূতন খাদ্য মাধ্যমে উক্ত ব্যাক্টিরিয়া ইনকুলেট (inoculate) করা হলে প্রথম কিছুটা সময় ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না। কোষ বিভাজন হলেও বৃদ্ধির জন্য

প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রাথমিক জৈবনিক ক্রিয়া যথা কোষবস্তু সংশ্লেষণ, কোষের আয়তন বৃদ্ধি প্রভৃতি হয়। হেনরিসি, ১৯২৩ (Henrici) **বি. মেগাটেরিয়াম** ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে ক্রমবৃদ্ধির এই স্তরে কিভাবে কোষের গড় দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তা প্রদর্শন করেছেন ( **চিত্র-৭২** )। স্বভাবতঃই বিভাজনের এই স্থগন বা




চিত্র ৭২ : অবিভাজন পর্ব ও কোষের আকার বৃদ্ধি ( হেনরিসি ১৯২৩ )

বিলম্ব (lag), সংশ্লেষণ বা বৃদ্ধিরও স্থগন নয়। এই পর্বে কোষের নিউক্লিক অম্ল, প্রোটিন, ফসফরাস প্রভৃতি পরিমাপেও ( আবো ও পার্ডি, ১৯৬০ Abbo and Pardee) উপরি উক্ত ধারণা সমর্থিত হয়েছে। এমন কি এই সমস্ত আবাদে (culture) প্রথম ৯০ মিনিট অক্সিজেনের প্রয়োজনও দেখা গেছে সর্বাপেক্ষা অধিক থাকে।

কোষ বিভাজনের স্থগনে কোন বিশেষ বিভাজন সূত্র (special cell division factor) দায়ী কিনা তা পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে এই স্থগন হতে পারে। **ক্লস্ট্রীডিয়াম ওয়েলচির (Clostridium welchi)** ক্ষেত্রে দেখা গেছে ম্যাগনেসিয়াম (Mg) আয়ন কোষ বিভাজন উৎসাহিত করে এবং এর অভাবে উক্ত ব্যাক্টিরিয়ার কোষ সূত্রবৎ হয়। **এরোব্যাক্টরের (Aerobacter)** ক্ষেত্রে গ্লুটামিক বা সাক্সিনিক অম্ল অথবা **লাক্টোব্যাসিলাসের (Lactobacillus)** ক্ষেত্রে খাদ্য প্রাণগুলি—বিভাজন বৃদ্ধি করে, আর কোবাল্ট (Co) আয়ন ও পেনিসিলিন বিভাজন স্থগিত রাখে। খাদ্য মাধ্যমে গ্লুকোস ও ফসফেট একত্রে

অটোক্লেভ (autoclave) করার ফলে কিছু হাইড্রক্সি অম্ল তৈরী হয় যা অনেক ক্ষেত্রে বিভাজন স্থগনের জন্য দায়ী (সার্জেন্ট ও অন্যান্যরা ১৯৫৭ (Sargent etal)। সম্ভবতঃ এই অম্ল কিছু প্রয়োজনীয় ধাতু আবদ্ধ (chelate) করে রাখার ফলে কোষ উক্ত ধাতুর অভাবে বিভাজন বন্ধ রাখে। জাপানী বিজ্ঞানীরা আবার দেখলেন যে আবাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর কোষগুলির বিভাজন হতে ৩০-৪০ মিনিট সময় লাগে এবং বৃহত্তর কোষগুলির লাগে ৫০ মিনিট। পরবর্তীকালে আরও জানা গেল যে মাতৃ-আবাদের (mother culture) গুণোত্তর পর্ব (log phase) থেকে ইনকুলাম গ্রহণ করা হলে পরবর্তী আবাদে স্থগন হয় না। এ ছাড়াও প্রতি একক খাদ্য মাধ্যমে কোষের সংখ্যা অত্যধিক হলেও (প্রতি মিলিলিটারে $৫ \times ১০^{৯}$টি কোষ) বিভাজন স্থগিত থাকে, যদিও ডি. এন. এ. বা প্রোটিন সংশ্লেষণ চলে। এ রকম অবস্থায় আবাদটিকে শুধু জল দ্বারা ১০০ গুণ তরল করলেও বিভাজন সুরু হয়। (ইয়ানাগিতা ও কানেকো ১৯৬১, Yanagita and Kaneko)।

## ২। গুণোত্তর বিভাজন পর্ব (Log or exponential phase):

বিভাজন স্থগন পর্বের পরে ব্যাক্টিরিয়া অত্যন্ত উচ্চহারে সংখ্যাবৃদ্ধি করে। এই পর্বে বিভাজনের হার গুণোত্তর ক্রম অনুযায়ী অত্যন্ত উচ্চহারে হয় বলেই এই পর্বকে গুণোত্তর বিভাজন পর্ব (Log phase or exponential phase) বলা হয়। উপযুক্ত পরিবেশ ও খাদ্য সরবরাহে একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা দ্বিগুণ হয় এবং দ্বিগুণ হবার সময়টুকুকে বলা হয় ডাবলিং টাইম (doubling time বা Td) যাকে আগে বলা হত জেনারেসন টাইম (generation time)। এই ধরনের প্রজনে (population) প্রত্যেকটি কোষ দ্বিবিভাজিত হতে সমান সময় নেয় না। প্রত্যেক কোষের ক্ষেত্রেই এই সময়কে বলা হয় কোষ সংখ্যা দ্বিগুণ করিবার সময় (interdivision time)। এই সময়গুলির গড় প্রায়ই ডাবলিং টাইমের চেয়ে বেশী হ'তে পারে, কারণ কিছু কোষ সবসময়ই অত্যন্ত ধীরে দ্বিবিভাজন করে। শুধুমাত্র এই গুণোত্তর পর্বে ডাবলিং টাইম স্থায়ী থাকে। মোটসংখ্যা অবশ্য গুণোত্তর হারে বৃদ্ধি পায়।

৩। **বৃদ্ধির ত্বরণ ও হ্রাসভবন পর্ব** (Phases of acceleration and retardation) :

গুণোত্তর পর্বের সুরু ও শেষে যথাক্রমে অবস্থিত বৃদ্ধির ত্বরণ ও হ্রাসভবন পর্বগুলি ক্রমবৃদ্ধির পরিবর্তনশীল পর্ব। প্রথম পর্বটি সাধারণতঃ স্থগন ও গুণোত্তর পর্ব দুটির মধ্যে অবস্থিত। দ্বিতীয়টি গুণোত্তর ও অপরিবর্তিত সংখ্যাপর্ব দুটির মধ্যে অবস্থিত। পর্বদুটিতে ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির হারের যথাক্রমে ঊর্দ্ধ ও নিম্নমুখী ঝোঁক দেখা যায়। প্রথমোক্তটিতে সংখ্যাবৃদ্ধির হারের ঊর্দ্ধগতির কারণ হিসাবে মূলতঃ কোষের মৃত্যুহারের অনুপস্থিতি বা বা নিম্নস্তর বোঝায় দ্বিতীয়টিতে তেমন ঐ হারের উচ্চ বা বৃদ্ধিমান স্তরকে বোঝায়।

৪। **অপরিবর্তিত সংখ্যাপর্ব ও সংখ্যাহ্রাস পর্ব** (Stationary phase and phase of decline) :

সীমিত খাদ্য সরবরাহের মধ্যে ব্যাক্টিরিয়ার কোষসংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় ততই অবশিষ্ট খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং ব্যাক্টিরিয়ার শারীরবৃত্তিয় কার্য-জনিত রেচন পদার্থের পরিমাণ খাদ্যমাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। ফলে খাদ্যাভাব ও অত্যধিক রেচিত বস্তুর সংস্পর্শে কোষের উপর বিষক্রিয়া হয় ও কোষের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। প্রথমে ক্রমবৃদ্ধি ব্যহত হলেও পরে কোষের বিনাশ হয়। যে সময় পর্যন্ত সংখ্যাবৃদ্ধির পরিমাণ কোষমৃত্যুর পরিমাণের সমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্রলেখ সমতল থাকে। পরে মৃত্যুর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে রেখাচিত্রটি নিম্নমুখী হয়। সংখ্যাবৃদ্ধিকালীন অবস্থাতে ব্যাক্টিরিয়ার সর্বোচ্চ সংখ্যা এই সমতল রেখান্তরে অপরিবর্তিত ভাবেই দেখা যায়। এই পর্বের অবস্থা ব্যাক্টি-রিয়ার বিশেষত্ব ও সূচিত করে। সঙ্গতভাবেই জীবিত সংখ্যার রেখাচিত্র সম্পূর্ণ সংখ্যার রেখাচিত্রর তুলনাতে বেশী নিম্নমুখী দেখায়।

(খ) **ক্রমবৃদ্ধির পরিমাপ** (Calculation of growth rate) :

জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির পরিমাপে মূলতঃ বৃদ্ধির হার পরিমাপ করা হয়। ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধিচক্রে কোষমৃত্যু অনুপস্থিত হলে ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধি গুণোত্তর প্রগতি (geometric progression) পদ্ধতিতে হওয়ার জন্য নিম্নরূপ হবে। সংখ্যাদ্বারা বোঝাতে গেলে

১———২———৪———৮———১৬———৩২

অথবা $2^0$——— $2^1$——— $2^2$——— $2^3$———$2^4$——— $2^5$......

$2^n$ সংখ্যক কোষ 'n' সংখ্যক দ্বিগুণের পর $2^n$ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা। ক্রমবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সূত্রপাতে ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা $B_0$ হ'লে 't' পরিমাণ সময় অতিবাহিত হবার পর সংখ্যা Bt এবং উক্ত সময়ের মধ্যে সম্পাদিত প্রজন্মের সংখ্যা 'n' হ'লে $Bt = B_0 2^n$ হবে। সেক্ষেত্রে গড়ে সৃজন সময় (generation time) হবে $g = \frac{t}{n}$। উক্ত সময়ে সম্পাদিত প্রজন্মের সংখ্যা $Bt = B_0 2^{\frac{t}{g}}$ সম্পর্কটি lcg a পর্যবসিত করিলে

$$\log Bt = \log B_0 + \frac{t}{g} \log_2 \text{ অর্থাৎ } \frac{t}{g} = \frac{\log Bt - \log B_0}{\log_2}$$

$$\text{অর্থাৎ } g = \frac{t \log_2}{\log Bt - \log B_0}$$

এক একটি অন্তর্বিভাজন সময় (interdivision time) ও একটি ব্যাক্টিরিয়ার বিশেষত্ব।

$$tao = (\log c^2)/k + (k\sigma^2)/2$$

যেখানে tao = IT $\sigma$ – sigma = standard deviation for IT. এক্ষেত্রে $(\log e^2)/k$ কে ধরা হচ্ছে ডাবলিং টাইম (Td) হিসাবে। যদি সমস্ত কোষে আন্তর্বিভাজন সময় সমান হয় তবে tao ($tao_o$), Td এর সমান হবে, যেক্ষেত্রে $\sigma^2 = 0$।

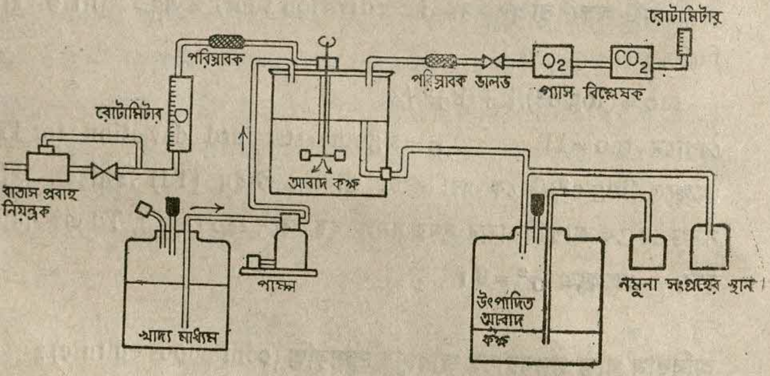
**অবিরাম খাদ্য সরবরাহে জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি (continuous culture):**

এসমস্ত ক্ষেত্রে ব্যাক্টিরিয়ার খাদ্যাদি অবিরাম সরবরাহের এবং ব্যবহৃত খাদ্যমাধ্যম অবিরাম নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থাটিতে যথাযথ-ভাবে নিয়ন্ত্রণ ক'রে, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কোষ প্রজন নিষ্কাশন ক'রে এবং একটি নির্দিষ্ট হারে নূতন কোষ সৃষ্টি ক'রে খাদ্যমাধ্যমে কোষ সংখ্যা স্থায়ী রাখার একটি ব্যবস্থা করা হয়। প্রকৃতিতেও এ ধরনের ব্যবস্থা বহু ক্ষেত্রে দেখা যায়। উন্মুক্ত জলাভূমি, নদী ইত্যাদিতে বা মানুষ বা অন্য জীবজন্তুর পৌষ্টিকতন্ত্রে অথবা রোগাক্রান্ত শরীরের দেহ-গহ্বরে (body cavity) এ রকম ব্যবস্থাপনায়

অবিরাম সরবরাহে জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে। এসব ক্ষেত্রে ব্যাক্টিরিয়ার খাদ্য সরবরাহ ও ব্যবহৃত দ্রব্য এবং সৃষ্ট প্রজন নিষ্কাশনের স্বাভাবিক ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমানে গবেষণাগারে ও বহু জীবাণু ভিত্তিক শিল্পে এরকম ব্যবস্থা অত্যন্ত সফল ভাবে করা হচ্ছে। বিভিন্ন রাসায়নিক উৎপাদক শিল্প যেমন ভিনেগার (vinegar), কোহল (alcohol) প্রভৃতিতে এই পদ্ধতি অনুযায়ী জীবাণুর খাদ্য সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে আবাদ করা হচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে খাদ্যের বহমান গতির (flow, 'f') সাথে খাদ্য মাধ্যমের ঘনমানের (culture volume, 'V') অনুপাত বলা হয় তরলীভবনের হার (dilution rate)। অর্থাৎ $D = f/v$

যে সমস্ত অবিরাম আবাদে বহমানগতি, খাদ্যের ঘনত্বের সাথে সম্পর্কিত সে রকম ব্যবস্থাপক যন্ত্রকে বলা হয় কেমোস্টাট (chemostat)। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি জীবাণু প্রজনের ঘোলাত্বের (turbidity) সাথে সম্পর্কিত হয়




চিত্র ৭৩ : কেমোস্টাট ( হাবার্ট ১৯৫৮-র ভিত্তিতে )

তবে সেই ব্যবস্থা বা যন্ত্রকে বলা হয় টারবিডোস্টাট (turbidostat)। ক্রমবৃদ্ধির দিক থেকে সীমাবদ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে $Td = loge^2/k$ কিন্তু অবিরাম সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে $K = Km\left(\frac{\cdot S}{Sk+S}\right)$। উপরে বলা কেমোস্টাটের একটি চিত্র (**চিত্র-৭৩**) দেওয়া হল।

(অ) **তরল খাদ্য মাধ্যমে জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি :**

ছত্রাকের বৃদ্ধির পরিমাপ তরল খাদ্যের উপর মাদুরের মত বৃদ্ধিটুকু পরিস্রবণের সাহায্যে আলাদা করে ওজন নিলে পাওয়া সম্ভব। বহু ছত্রাকেরই জলীয় পরিবেশে বৃদ্ধি হয় না। এ জন্য ঝাঁকানো-আবাদ (shake-culture) ইত্যাদি পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে। বিভিন্ন ছত্রাকের এই সব অবস্থাতে বৃদ্ধির প্রকৃতি ভিন্নতর। যেমন পেনিসিলিন সংগ্রহার্থে **পেনিসিলিয়াম** ছত্রাকের তরল আবাদে ছত্রাকটির বৃদ্ধি একটি গোলাকৃতি, শক্ত পেলেট (pellet) তৈরি করে। তরলমাধ্যমে এই বিশেষ প্রকৃতির বৃদ্ধি কেন হয় তাও যথেষ্ট বোঝা যায় না।

(আ) **কঠিন খাদ্যমাধ্যমে জীবাণুর কলোনীর ক্রমবৃদ্ধি** (growth in colonies on solid substrate) :

ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক ও অন্য আরও কিছু জীবাণুর ক্ষেত্রে আগার আগার মিশ্রিত শক্ত খাদ্য মাধ্যমে এরকম বৃদ্ধির প্রকৃতি বহুল পরিমাণে নির্ণয় করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাতে খাদ্যের সরবরাহ যথেষ্ট নিয়ন্ত্রিত, কারণ খাদ্য বস্তুর যতটুকু পরিব্যাপন (diffusion) হয় ততটুকুই জীবাণু এককালে পায়। এসব ক্ষেত্রে বৃদ্ধির পরিমাণ ও প্রকৃতি নির্ভর করে কলোনীগুলির পরস্পর নৈকট্য, খাদ্য মাধ্যমের পুরুত্ব, পরিবেশে $O_2$ ও $CO_2$ এর পরিমাণ প্রভৃতির উপর। পুরাতন কলোনীর কেন্দ্রে বা অন্যত্র মৃতকোষের সংখ্যা, পরিবেশের উষ্ণতা, অভিস্রাবক অবস্থা (osmotic) এবং খাদ্যমাধ্যমের অম্ল-ক্ষারত্ব (pH) প্রভৃতি ও ক্রমবৃদ্ধির উপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণতঃ জীবাণুর বৃদ্ধির পরিমাপ কলোনীর ব্যাস দ্বারা করা হয়।

সূত্রযুক্ত জীবাণুর কলোনীর ক্রমবৃদ্ধি (growth of colonies of filamentous organisms) :

কঠিন খাদ্য মাধ্যমে ছত্রাকের বৃদ্ধিঃ একটি খাদ্যমাধ্যমপূর্ণ পেট্রিপ্লেটের কেন্দ্রে ছত্রাক দ্বারা ইনকুলেট করা হলে ছত্রাকটি সাধারণতঃ গোলাকৃতি কলোনী ক'রে বৃদ্ধি পায়। গোলাকৃতি কলোনীটি ক্রমান্বয়ে বড় হয়। এক্ষেত্রেও এই ক্রমবৃদ্ধি কয়েকটি স্বতন্ত্র পর্বের মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়।

রৈখিক বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্ব (Phases of linear growth) :

এজাতীয় কলোনী-বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রমবৃদ্ধিটি তিনটি পর্বে সম্পাদিত হয়, যথা

স্থগনপর্ব (lag phase), রৈখিক বৃদ্ধিপর্ব (linear growth phase) ও জরাজীর্ণ পর্ব (staling phase)। এরকম ক্রমবৃদ্ধির পরিমাপ প্রায় অসম্ভব।

(ক) স্থগনপর্ব (lag phase) :

খাদ্যমাধ্যমে স্পোর দ্বারা বা সূত্রাণু দ্বারা ইনকুলেট করার পর স্পোরের অঙ্কুরোদ্গমে বা ছিন্নসূত্রাণুর আঘাত কাটিয়ে উঠতে কয়েকঘণ্টা সময় লাগে। এই সময় স্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি সেই অর্থে হয় না। এটাই স্থগন পর্ব। এই স্থগনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন কারণ যথা ইনকুলামের (inoculum) বয়স, পরিমাণ প্রভৃতির উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল।

(খ) রৈখিক বৃদ্ধি পর্ব (linear growth phase) :

কলোনীর ব্যাস সময়ের সাথে রৈখিক হারে বৃদ্ধি পায়। যদিও এই পরিমাপ এক্ষেত্রে ছত্রাক বৃদ্ধির সম্পূর্ণ পরিমাপ নয় তবু এই পদ্ধতির সুবিধা-জনক দিক হ'চ্ছে একই ছত্রাকের আবাদ কালীন বৃদ্ধির পরিমাপ বারংবার করা সম্ভব। এসব ক্ষেত্রে বৃদ্ধির উপর উষ্ণতা ইত্যাদির প্রভাব পরীক্ষা করা সহজেই সম্ভব। বৃদ্ধির এই হার খাদ্য মাধ্যমে প্রাপ্ত খাদ্য উপাদান, অম্লক্ষারত্ব পরিবেশের উষ্ণতা, অক্সিজেন, $CO_2$ প্রভৃতির ঘনত্ব, আদ্র্তা প্রভৃতির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধিতে সক্ষম কিছু ছত্রাকের বৃদ্ধি লম্বা কাচনলে আবাদ করে পরিমাপ করা হয়।

(গ) জরাজীর্ণ পর্ব (staling phase) :

এই পর্বে ছত্রাকের বৃদ্ধির হার দ্রুত কমতে থাকে। ছত্রাকের বৃদ্ধিজনিত বিষাক্ত পদার্থ উৎপাদনের ফলে এই হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে বলেই একে জরাজীর্ণ হওয়া বলা হয়। এই পর্ব উচ্চহারে উপাদান সরবরাহকারী খাদ্য মাধ্যমে দ্রুত দেখাদেয়। এছাড়া ছত্রাকের বৃদ্ধির ফলে মাধ্যমের অম্লক্ষারত্বে যে পরিবর্তন হয় তাও বহুলাংশে এর জন্য দায়ী।

বহু ছত্রাকের কলোনীতে একটি অসম বৃদ্ধি দেখা যায়, যা লতিযুক্ত (lobed) কলোনীর সৃষ্টি করে।

## ৪.৪০ জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর বিভিন্ন কারণের প্রভাব (Factors affecting growth of microorganisms) :

জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি অনেক বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। জীবাণুর একটি কোষ

অথবা সমষ্টি তাদের বৃদ্ধির জন্য সমভাবে তাদের বংশগত প্রকৃতির (genetic constitution) উপর নির্ভরশীল কোষের বয়স, তার বৃদ্ধির হার ও প্রকৃতি অনেকাংশে নির্ণয় করে। এছাড়া কিছু বহিস্থঃ কারণ—ভৌত এবং রাসায়নিক জীবাণুর বৃদ্ধির উপর সবিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

## ৪.৪১ বংশগত প্রকৃতি ও জীবাণুর বৃদ্ধি :

জীবাণুর বিভিন্ন গণ, প্রজাতি বা প্রকারে বৃদ্ধির হার ও প্রকৃতি ভিন্নতর, বংশগত পার্থক্যের জন্যই। নিম্নোক্ত তালিকাতে (সারণী-২২) বংশগত প্রকৃতির সাথে জীবাণুর বৃদ্ধির সম্পর্ক পরিস্ফুট হবে।

**সারণী ২২ : জীবাণুর ডাবলিং টাইম**

| জীবাণু | ডাবলিং টাইম (doubling time) |
|---|---|
| ই. কোলি (E. coli) | 20 মিনিট |
| স্যা. সেরেভিসি (S. cerevisiae) | 2 ঘণ্টা |
| মা. টিউবারকুলোসিস (M. tuberculosis) | 18 ,, |
| অ্যা. প্রোটীয়াস (Amoeba proteus) | 24 ,, |

## ৪.৪২ কোষের বয়স ও জীবাণুর বৃদ্ধি :

যে সব জীবাণুর দ্বিবিভাজন হয় তাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ খাদ্য সরবরাহে আবাদ করা জীবাণুর পুরাতন ও নূতন আবাদের কোষগুলির মধ্যে বৃদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। অবশ্য সর্বক্ষেত্রে পুরাতন আবাদের কোষ মাত্রই বয়স্ক নহে। নূতন খাদ্যমাধ্যমে পুরাতন আবাদের ইনকুলাম দিলে দীর্ঘ সময় ধ'রে স্থগন (lag) হয়, সেটা নূতন আবাদের ইনকুলামে হয় না।

## ৪.৪৩ জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর প্রভাবশালী কারণগুলি (Physical agents affecting microbial growth) :

প্রকৃতিতে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে বিভিন্ন ভৌত অবস্থার মধ্যে। প্রকৃতির ভৌত কারণের (factors) পরিবর্তনশীলতা জীবাণুদের প্রভাবান্বিত করে। অনেকক্ষেত্রে এই প্রভাবগুলি দৃষ্টিগ্রাহ্য ও সুদূরপ্রসারী। বিভিন্ন কারণগুলির প্রভাব নিম্নে আলোচনা করা হল।

(ক) উষ্ণতা (Temperature) :

বেশীর ভাগ জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ে। এই সম্পর্কটি একটি উষ্ণতাসীমা পর্যন্ত কার্যকরী। যার পর উষ্ণতা বিক্রিয়াকারক উৎসেচক অণুগুলিকে অক্রিয় বা বিনষ্ট করে। উষ্ণতর পরিস্থিতিতে সমগ্র জীবাণুটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। একটি জীবাণুর পক্ষে কোন উষ্ণতা মৃত্যুদায়ী (lethal) হ'তে কত সময় ঐ উষ্ণতাতে জীবাণুটি থাকছে (exposure) তার উপর নির্ভর করে।

স্পোর উৎপাদনে অক্ষম ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে ৪৭° সে. উষ্ণতাতে বেশ কয়েক ঘণ্টা অথবা 60° সে. এ 1 ঘণ্টাতে অথবা 70° সে. এ ৫ মিনিটে এবং 80° সে. এ 1-2 মিনিট রাখলেই তাদের মৃত্যু ঘটে। উষ্ণতার প্রভাব ব্যাক্টিরিয়ার বৃদ্ধির গুণোত্তর পর্বের উপর বিশেষভাবে পরীক্ষিত হয়েছে। বিজ্ঞানী জেনিসনের (Jennison) ১৯৩৫, ই. কোলি ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা পরীক্ষাতে দেখা গেছে উষ্ণতার ক্রমান্বয় হ্রাসের সাথে সাথে গুণোত্তর পর্বের সময়-সীমা প্রলম্বিত হচ্ছে ; অর্থাৎ 37· সেতে 6-7·5 ঘণ্টা, 30 °সে তে 8-8·5 ঘণ্টা ; 25° সে. তে 11-15 ঘণ্টা, ও 20° সে. তে 14-24 ঘণ্টা।

১। উষ্ণতার ভাগফল (Temperature Quotient) :

উষ্ণতার প্রভাবে ব্যাক্টিরিয়ার ক্রমবৃদ্ধির হারের যে পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তন হারকে বলা হয় উষ্ণতার ভাগফল (temperature quotient বা Q 10)। এতে প্রতি 10° সে উষ্ণতার পরিবর্তনের সাথে ক্রমবৃদ্ধির হারের পরিবর্তন পরিমাপ করা হয়। বিশ্ববিশ্রুত ফরাসী বিজ্ঞানী মনো (Monod), ১৯৪২ ই. কোলি নিয়ে গ্লুকোসযুক্ত খাদ্যমাধ্যমে যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে 30° সে থেকে 40° সে উষ্ণতার পরিবর্তনে বৃদ্ধির পরিবর্তনের হার সর্বাপেক্ষা অধিক ছিল। তারপর যথাক্রমে 0° সে থেকে 10° সে, 10-20° সে, ও 20° সে-30° সে এর পরিবর্তনের প্রভাব হয়। সাধারণ উচ্চ উষ্ণতাতে জীবাণুর বিনাশ হওয়ার জন্যই বিভিন্ন প্রকার নির্বীজন (sterilization) পদ্ধতিতে উষ্ণতার ব্যবহারের চল রয়েছে। এছাড়া নির্বীজনের কাজে আর্দ্র-উষ্ণতা (moist heat বা steam sterilization) তার অধিক ভেদ্যতার (penetration) জন্য বেশী কার্যকরী। সাধারণতঃ গবেষণাগারে 121° সে আর্দ্র-উষ্ণতাতে 10-15°

মিনিট সময় ধরে নির্বীজন করা হয়। শুষ্ক উষ্ণতার ক্ষেত্রে এই কাজে 160° সে এ 1 ঘণ্টা বা 120° সে এ 8 ঘণ্টা লাগে।

২। শীতলতা : শৈত্য ও হিমায়ন (cold : chilling and freezing) : বহুক্ষেত্রে নির্বীজনের কাজে কার্যকরী। দ্রুত হিমায়ন জীবাণুকে অক্রিয় (hypobiosis) করে। এর ফলে জীবাণুকোষ বহুদিন জীবিত থেকে যায়। যেমন বি. আনথ্রাসিস এ অবস্থাতে 30 বৎসরের অধিক জীবিত থাকে। অক্রিয়জীবন অবস্থাতে জীবাণুর শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকলাপ যখন সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, যখন তাকে বিশেষভাবে অক্রিয় জীবন (cryptobiosis) বলা হয়। অবচেতন (dormancy) অবস্থা এটা থেকে আলাদা।

প্রকৃতিতে পছন্দমত উষ্ণতা অনুযায়ী বিভিন্ন উষ্ণতা অঞ্চলে বিভিন্ন জীবাণুর প্রাদুর্ভাবের তারতম্য দেখা যায়। চল্লিশ ডিগ্রীর অধিক উষ্ণতা পছন্দকারীদের উষ্ণ পরিবেশের জীবাণু (thermophilic) বলা হয়। বিস্ময়কর ভাবে অতি উচ্চ উষ্ণতাতে বসবাসকারী দু-একটি ব্যাক্টিরিয়ার নাম **মাষ্টিগোক্লাডাস (Mastigocladus)** 82-89° সে, বা **থায়োবাসিলাস (Thiobacillus)** 76° সে এ উষ্ণ গন্ধক প্রস্রবণে বসবাস করে। **সাইনেচো-কক্কাস (Synechococcus)**, নীল-সবুজ শৈবাল 73-75° সে এ কর্মক্ষম। **বি. কালফাক্‌টর (B. calfactor)** খড়ের গাদায় মাত্র 35° সে উষ্ণতায় বৃদ্ধি সুরু করে উষ্ণতাকে 75° সে পর্যন্ত বাড়িয়ে তোলে। আবার যে সমস্ত জীবাণু 50° সে থেকে 0° সে উষ্ণতায় বসবাস পছন্দ করে তাদের শীতল পরিবেশের জীবাণু (psychrophilic) বলা হয়। অন্য সমস্ত জীবাণুদের মাধ্যমিক পরিবেশের জীবাণু (mesophilic) বলা হয়।

(খ) বাতান্বয়ন (Aeration) :

অবাত ও স্বল্প বায়ুনির্ভর (microaerophilic) জীবাণু ব্যতীত অন্য সমস্ত জীবাণুরই বৃদ্ধি বাতাসের বা অক্সিজেনের সরবরাহের উপর নির্ভরশীল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাতান্বয়ন (aeration) জীবাণুর বৃদ্ধির হার বাড়ায়। তরল খাদ্যমাধ্যমে **ই. কোলির** আবাদে দেখা গেছে বুদ্‌বুদাকারে নাইট্রোজেন প্রবেশ করালে (bubbling) ক্রমবৃদ্ধির হার 3·5 গুণ আর অক্সিজেন প্রবেশ করালে 41 গুণ বৃদ্ধি পায়।

অক্সিজেনের উপর নির্ভরশীলতা অনুযায়ী জীবাণুর মূল দুটি গোষ্ঠী অবাত-

ও সবাত ব্যতীত তৃতীয় গোষ্ঠীর জীবাণুগুলি উভয় অবস্থাতে সমন্বয়বিধায়ক (facultatives)। স্বল্পবায়ু নির্ভর (microaerophils) জীবাণুগুলি অতিঅল্প অক্সিজেনেও জীবন ধারণ করতে সক্ষম। আরও এক গোষ্ঠীর জীবাণুগুলির মধ্যে **স্ট্রেপটোকক্কাস** (**Streptococcus**) বা (**Lactobacillus**) **ল্যাক্টোব্যাসিলাস** রয়েছে যাদের উপর বাতান্বয়নের প্রভাব সম্পূর্ণ অবর্তমান। মৃত্তিকামধ্যে অবস্থানকারি কিছু ছত্রাকের (**এস. রলফসি**) বাতান্বয়ন প্রয়োজন হয়।

(গ) শুকানোর প্রভাব (Dessication) :

প্রায় সব জীবাণুরই শুকানোর ফলে জীবনীশক্তির কমবেশী হানি ঘটে। যে সব জীবাণু অন্তঃস্পোর বা ছত্রাকগুটী গঠনে সক্ষম তারা শুকানোর ফলে সবচেয়ে কম ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অন্যেরা কয়েকমিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত শুষ্ক পরিস্থিতি সহনশীল হয়। বাতাসশূন্য পরিস্থিতিতে অবশ্য শুকানো স্বল্প ক্ষতিকারক হয়। ইদানীং ব্যাক্টিরিয়ার কোষের আঠালস্তরের শুকানো-সহনশীলতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে জানা গেছে।

(ঘ) অম্ল-ক্ষারত্ব (pH) :

সাধারণতঃ কোষের মধ্যের অম্লক্ষারত্বের অবস্থা ধরা হয় প্রশমিত (neutral)। বেশীরভাগ জীবাণুই পরিবেশের 7·0—9·0 অম্লক্ষারত্বে প্রভাব-মুক্তভাবে বৃদ্ধি পায়, কারণ জীবিত কোষে $H^+$ ও $OH^-$ আয়নের জীবাণু কোষে ভেদ্যতা খুবই সীমিত। অম্ল বা ক্ষার পরিবেশে বৃদ্ধিতে সক্ষম কিছু জীবাণুর মধ্যে **থায়োব্যাসিলাস** (0·0 অম্লক্ষারত্ব), **আকোনাইটাম ভ্যালেটাম** (1·0 এর কম) অম্ল অবস্থাতে বা **সারসিনা ইউরি** (**Sarcina ureae**) (8·0 অম্লক্ষারত্ব), **প্লেকেটানেমা** (13·0) ক্ষার অবস্থাতে স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধি পায়। অসহযোগী অম্ল-ক্ষারত্ব যে জীবাণুর উপর বিরোধী বা বিনাশী ক্রিয়া ঘটায় তা ডিসোসিয়েটড (dissociated) $H^+$ বা $OH^-$ আয়নের জন্য নয়; তা মূলতঃ উক্ত অম্ল বা ক্ষারের পূর্ণাঙ্গ অণুরই প্রভাবে। এজন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যেমন স্বল্প অম্লত্বযুক্ত অ্যাসেটিক অম্ল, হাইড্রোক্লোরিক অম্ল অপেক্ষা অধিক বিনাশশীল।

(ঙ) তড়িৎ-চুম্বকিয় রশ্মি বিচ্ছুরণ (Radiation) :

যে কোন বস্তু থেকে আণবিক বিভাজন (fission) বা কেন্দ্রীয় মিলন

(nuclear fusion) এর ফলে তেজস্ক্রিয়তা বিচ্ছুরিত হতে পারে। সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত যে সমস্ত তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়ে সেগুলি মূলতঃ অতিবেগুনীর নিকটবর্তী দৃশ্যরশ্মি ও অবলোহিত রশ্মিজাতীয়। তড়িৎ চুম্বকিয় রশ্মির তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য যত বড় হবে তার অন্তর্নিহিত শক্তি তত কম হবে। দীর্ঘ তরঙ্গগুলির প্রভাব শুধুমাত্র বিশেষ কিছু জীবাণুর উপরই দেখা যায়। মহাজাগতিক রশ্মি (cosmic ray) বা রঞ্জনরশ্মি (x-ray) গুলির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 10 nm এর ও কম এবং এদের শক্তিও অত্যধিক। যেসব পরমাণু এদের সংস্পর্শে আসে তাদের ইলেকট্রন ছিটকে পড়ে এবং উক্ত পরমাণু যুক্ত অণু আয়নিত হয়ে পড়ে। জীবাণু কোষে এদের প্রভাব মৃত্যুদায়ক (lethal) বা পরিব্যক্তি সৃষ্টিকারী (mutagenic)। দশ থেকে 300 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত অতিবেগুনী UV রশ্মির সংস্পর্শেও পরমাণুর ইলেকট্রন উত্তেজিত হয় ও উচ্চতর শক্তি পর্যায়ে উপনীত হয়। (১) অতিবেগুনী রশ্মি (ultraviolet) জীবাণুর পক্ষে মৃত্যুদায়ী অথবা পরিব্যক্তি সৃষ্টিকারী হয়। যদিও এটি নির্ভর করে তার মাত্রা ও জীবাণুটির উপর। জীবাণুর উপর 280nm অপেক্ষা ছোট তরঙ্গগুলি সর্বাপেক্ষা অধিক মৃত্যুদায়ী কারণ এই তরঙ্গ নিউক্লিক অম্লর পুরাইন ও পিরিমিডিন অণুতে সর্বাপেক্ষা অধিক শোষিত হয় যার ফলে নিউক্লিক অম্ল, বৃহৎ অণুর সূত্র ভাঙ্গা ইত্যাদি ঘটে। (২) দৃষ্টিগ্রাহ্য বিচ্ছুরণ (visible radiation) 300 থেকে 1000 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের এই বিচ্ছুরণগুলি জীবাণুকোষের শুধুমাত্র কয়েকটি অণুতেই শোষিত হয়, যার ফলে শোষক অণুগুলি রঙীন দেখায়। জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর এই রশ্মিগুলির এ জাতীয় প্রভাব নাই। (৩) অবলোহিত বিচ্ছুরণ যেগুলি 1000—100,000 nm তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত তারা যেকোন বস্তুতে বিশোষিত হয়ে শুধুমাত্র উত্তাপে পর্যবসিত হয়। (৪) বেতার তরঙ্গগুলির (Hertzian waves) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 100,000 nm এর ও উর্দ্ধে। জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর এর প্রভাব নেই।

(চ) কিছু বস্তুর তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের (radioactive decay) ফলে যে সমস্ত পারমাণবিক (sub–atomic), উচ্চ গতি সম্পন্ন কণা (particles) নিষ্ক্রান্ত হয় যেমন বিটারে ($\beta$-ray) (উচ্চগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন), আলফা কণা ($\alpha$-particle) (হিলিয়াম নিউক্লিয়াস), গামা-রে ($\gamma$-ray) (ধাতুর radio-

active স্তর থেকে সৃষ্ট ) ইত্যাদির আয়নায়ন প্রভাব থাকার ফলে জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর আয়নায়িত করা বিচ্ছুরণের মত প্রভাব বিস্তার করে।

(ছ) স্থিতজলশক্তি জনিত চাপ (hydrostatic pressure) :

যে সমস্ত জীবাণু গভীর জলে বসবাস করে তাদের ওপর স্বাভাবিক আবহ চাপ ছাড়া জলের জন্য অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়, প্রায় $300—400 \times 10^5$ Pa বা 300 – 400 atm. চাপ। সাধারণতঃ $10^8$Pa এর অধিক চাপ হওয়া মাত্র জীবাণুকোষের কাজকর্ম বন্ধ হয়। তবে অন্তঃস্পোরগুলি $12 \times 10^8$ Pa চাপও সহ্য করে। দেখা গেছে $1 - 5 \times 10^7$Pa বা অধিক চাপ ক্রমবৃদ্ধিকে বাধা দান করে। উচ্চ চাপ সহনশীল জীবাণুগুলিকে বলা হয় চাপ সহনশীল ব্যাক্টিরিয়া (barophilic bacteria)।

(জ) লবণাক্ততা (Salinity) :

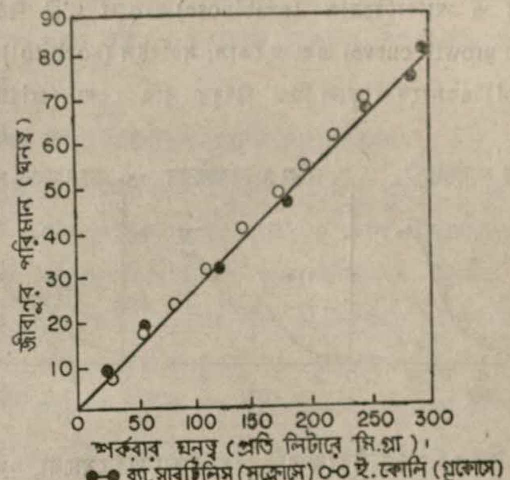
সাধারণতঃ জীবাণুর বৃদ্ধির পক্ষে অত্যধিক লবণাক্ততা ক্ষতিকারক। যদিও সামুদ্রিক বেশকিছু জীবাণুর লবণাক্ত অবস্থাতেই ক্রমবৃদ্ধি হয়। উদাহরণ স্বরূপ **ডুনালিয়েলা** (**Dunaliella**) শৈবালের কথা বলা যায় যা লবণাক্ত অবস্থাতেও সম্পূর্ণ কর্মক্ষম।

## ৪.৪৪ জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর রাসায়নিক কারণের প্রভাব (Chemical factors affecting growth of microorganisms) :

খাদ্যবস্তুগুলির জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর প্রভাব : যে সমস্ত রাসায়নিক জীবাণু খাদ্য হিসাবে ব্যবহার হয় তাদের প্রভাব জীবাণুর বৃদ্ধির উপর স্বভাবতঃই যথেষ্ট।

(অ) সাধারণ খাদ্যবস্তুর প্রভাব (General nutrients) :

যে সমস্ত খাদ্যবস্তু জীবাণুকে বিভিন্ন সংশ্লেষণ ক্রিয়ার জন্য শক্তি ও কারবন জোগায় তাদের বলা হয় সাধারণ খাদ্য, যেমন শর্করা জাতীয় খাদ্যবস্তু। শর্করার পরিমাণ একটি উর্দ্ধ সীমার মধ্যে (সাধারণতঃ M/1000) বৃদ্ধি করলে জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি রৈখিক হারে বৃদ্ধি পায়। নিম্নে উপস্থাপিত চিত্রলেখটিতে (**চিত্র-৭৪**) দুটি ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক পরিস্ফুট হয়েছে। এই খাদ্যবস্তুগুলি পরস্পর পরিবর্তনযোগ্য (replaceable) এবং ক্রমবৃদ্ধির উপর এদের প্রভাব মূলতঃ পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়।




চিত্র ৭৪ : শর্করার পরিমাণ ও ক্রমবৃদ্ধির উপর তার প্রভাব (মোনো ১৯৪২)

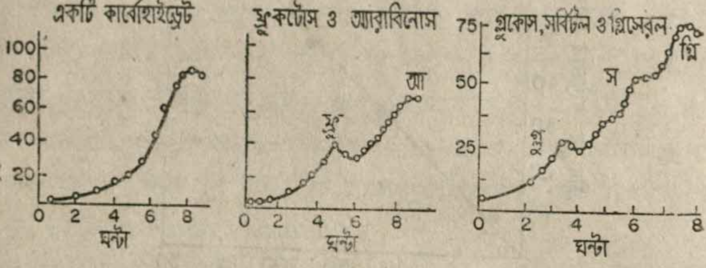
(আ) বিশেষ খাদ্যবস্তুর প্রভাব (specific nutrients) :

জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিবর্তনযোগ্য খাদ্যবস্তু-গুলিকে বলা হয় আবশ্যিক খাদ্যবস্তু। বিভিন্ন জীবাণুর স্বতন্ত্র আবশ্যিক খাদ্যবস্তু থাকতে পারে। সাধারণতঃ খাদ্যপ্রাণ ও অ্যামিনো অম্ল জাতীয় খাদ্যবস্তুই এরকম আবশ্যিক ভূমিকা গ্রহণ করে। জীবাণু জগতে এজাতীয় জীবাণুর সংখ্যা বহু। উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু **জান্থোমোনাস অরাইজী (Xanthomonas oryzae)** র ক্ষেত্রে যে কোন একটি গন্ধকযুক্ত অ্যামিনো অম্ল আবশ্যিক। স্বভাবতঃই এই ধরনের আবশ্যিক খাদ্যগুলির জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর প্রভাব অসীম। এজাতীয় জীবাণু ও তাদের এই খাদ্য-আবশ্যিকতা বিভিন্ন প্রয়োগক্ষেত্রে ও শিল্পে কাজে লাগানো হয়েছে, যাদের মূলতঃ বলা হয় কেমোস্টাট।

জীবাণুর বৃদ্ধিতে খাদ্যবস্তুর প্রভাব সম্পর্কে আরও বহু কৌতুহলদ্দীপক তথ্য জানা গেছে। ক্রমবৃদ্ধি রেখাকে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে।

(ক) **ই. কোলি** ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে খাদ্য মাধ্যমে কারবনের উৎস হিসাবে শুধু ফ্রুকটোস থাকলে বৃদ্ধি-রেখায় একটি শীর্ষ পাওয়া যায় কিন্তু

ফ্রুকটোস ও অ্যারাবিনোস (arabinose) থাকলে দু'টি শীর্ষযুক্ত বৃদ্ধিরেখা (diauxic growth curve) এবং গ্লুকোস, সরবিটল (sorbitol) ও গ্লিসেরল (glycerol) একসাথে থাকলে তিন শীর্ষযুক্ত বৃদ্ধি রেখা (triauxic growth




চিত্র ১৫ : দুই শীর্ষযুক্ত বৃদ্ধি রেখা ইত্যাদি ( মোনো, ১৯৪১ )

curve) পাওয়া যায় ( চিত্র-১৫ )। এটা বোঝা গেছে যে বিভিন্ন জীবাণুর খাদ্য মাধ্যমে একাধিক শক্তি উৎস থাকলে জীবাণুর শক্তি উৎস ব্যবহারের একটি নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার বোধ (preference) রয়েছে। প্রথম পছন্দ শর্করার সম্পূর্ণ ব্যবহার শেষে দ্বিতীয় উৎস ব্যবহারের উৎসেচক সৃষ্টি হয়। ফলে একটি উৎস ব্যবহার শেষে দ্বিতীয়টি ব্যবহারের মধ্যে যে ছেদ পড়ে তার জন্যই একটি শীর্ষের পরে রেখাতে কিছুটা নিম্নমুখী ঝোঁক দেখা যায়। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শর্করার ব্যবহার ও বহু শীর্ষযুক্ত বৃদ্ধিচিত্র সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা হয় দ্বিশীর্ষতা (diauxie)। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী মোনো ই. কোলির ক্ষেত্রে শর্করাগুলিকে যথাক্রমে তিনটি গোষ্ঠীতে বিভাজন করেছিলেন যা নিম্নরূপ। প্রথম ব্যবহার্য শর্করাগোষ্ঠী যথা গ্লুকোস, মানোস ফ্রুকটোস, সুক্রোস ও ম্যানিটল, দ্বিতীয় স্তরে ব্যবহার্য শর্করা-মালটোস (maltose), অ্যারাবিনোস (arabinose) সর্বিটল (sorbitol) এবং ইনসিটল (inositol)

(খ) জীবাণুর বৃদ্ধিকালীন অবস্থাতে খাদ্যমাধ্যমের মধ্যে খাদ্য সরবরাহ হঠাৎ পরিবর্তন করলেও জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি প্রভাবিত হয়। নূনতম খাদ্য-মাধ্যমকে (minimal medium) জীবাণুর বৃদ্ধিকালীন অবস্থায় হঠাৎ খাদ্যে ভরপুর (richer) মাধ্যমে পরিবর্তিত করা হলে আর. এন. এ. সংশ্লেষণের রেখা প্রথমেই উন্নীত হয় এবং পরে প্রোটিন ও ডি. এন. এ. রেখাও উন্নীত হয়।

অপরদিকে খাদ্যে ভরপুর মাধ্যমে বৃদ্ধিকালে জীবাণুকে হঠাৎ নূন্যতম খাদ্য মাধ্যমে স্থানান্তর করলে বৃদ্ধির ও উপরোক্ত অণুগুলির সংশ্লেষণের হার যথেষ্ট নিম্নমুখী হয়।

## (ই) ক্রমবৃদ্ধির উপর অন্যান্য রাসায়নিকের প্রভাব :

জীবাণুর বৃদ্ধির উপর অন্য যে সমস্ত রাসায়নিকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তারা মূলতঃ অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) ও অন্য জীবাণুনাশক। এরা যদিও প্রধানত জীবাণু বিরোধী তবু এদের প্রভাব বিভিন্ন ধরনের। জীবাণুর প্রতি এই সমস্ত জীবাণু বিরোধীর (inhib.tors) নাশকর্মের প্রক্রিয়া অনুযায়ী এদের দু'টি গোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়, যথা সাধারণভাবে বিষক্রিয়াক্ষম (general poisons) এবং নির্দিষ্ট ধরনের বিষক্রিয়াক্ষম (specific poisons) ও অ্যান্টিবায়োটিক। জীবাণু বিরোধীগুলির মধ্যে কিছু জীবাণুনাশক (cidal) ও কিছু বৃদ্ধি রোধক (static) হ'তে পারে। এই সমস্ত রাসায়নিকগুলির প্রভাব অবশ্য তাদের ব্যবহৃত মাত্রার উপর নির্ভরশীল। ক্ষেত্রবিশেষে মাত্রার পরিবর্তন সাধারণ বিষক্রিয়াক্ষমকে নির্দিষ্ট বিষক্রিয়াক্ষম বা তদ্বিপরীত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পারদ আয়নের ক্ষেত্রে দেখা যায় অত্যন্ত নিম্নমাত্রায়—SHর সাথে দৃঢ় সংবদ্ধ হ'য়ে—SH যুক্ত উৎসেচকের ক্রিয়াকলাপ ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং উচ্চ মাত্রায় কোষের যে কোন প্রোটিনকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে।

সাধারণ জীবাণু নাশকগুলির মধ্যে কতকগুলি মোটামুটি নির্বীজনের কাজে লাগে এবং তাদের বলা হয় সংক্রমণনাশী (disinfectant)। এরা সম্পূর্ণ নির্বীজনকারী নয়। যে সমস্ত জীবাণুনাশক স্তন্যপায়ী (mammal) জীবের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করেনা তাদের বলা হয় জীবাণু দূষণরোধী (antiseptics)।

### সাধারণ বিষক্রিয়াক্ষম জীবাণু বিরোধী :

(ক) হ্যালোজেন (halogen) অথবা হ্যালোজেন উৎপাদক রাসায়নিকগুলি যথা হাইপোক্লোরাইট (hypochlorite), ক্লোরামাইন (chloramine), হাইপোব্রোমাইট (hypobromite) ইত্যাদি অত্যন্ত উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন জীবাণুনাশক। প্রধানতঃ প্রোটিন ও সমতুল রাসায়নিকের জারণ ঘটায়। বহু জৈবরসায়নের সাথেও বিক্রিয়া ঘটায়। এজন্য এরকম রাসায়নিক যেমন

আয়োডিন এর 1% কোহল-দ্রবণ ত্বকের জীবাণুদূষণ মুক্তিতে ব্যবহৃতও হয়।

(খ) অ্যালকিলেটিং এজেন্ট (alkylating agent) যথা এথিলিন অক্সাইড (elthylene oxide), এথিলিন ইমাইড, এথিলিন সালফাইড বা মিথাইল ব্রোমাইড বা লাক্টোন (lactone) ইত্যাদি জীবাণুর বিভিন্ন কোষ অঙ্গ অ্যালকিলেট করতে পারে। এথিলিন অক্সাইড ব্যাক্টিরিয়ার স্পোরকেও বিনষ্ট করে। সাধারণতঃ যেসব বস্তুর নির্বীজন উচ্চতাপে সম্ভব নয় তাদের ক্ষেত্রে এজাতীয় রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারিক কাজে বিস্ফোরণ সম্ভাবনা হ্রাসের জন্য এই রাসায়নিকগুলি $CO_2$ মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। আর একটি রাসায়নিক বিটা প্রোপায়োল্যাকটোন ($\beta$-propiolactone) যা স্পোর নাশেও সক্ষম তা জলস্পর্শে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্তিত ও অক্রিয় হয় বলে রক্তরসে (serum) নির্বীজক হিসাবে মিশ্রিত করা হয়।

(গ) ফেনলিক (phenolic) জাতীয় রাসায়নিকগুলি প্রোটিন বিকৃত (denature) করার কাজে অত্যন্ত সফল হলেও স্পোরনাশক নয়। সাধারণ জীবাণু ফেনলিকের 1% দ্রবণে 5-10 মিনিটেই বিনষ্ট হয়। বিভিন্নক্ষেত্রে এগুলি স্থানিক (topical) নির্বীজক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এরকম দু'একটি জীবাণু দূষণরোধীর মধ্যে ডেটল (chloroxylenol) বা লাইসল (cresols) অন্যতম।

(ঘ) অ্যালডিহাইড (aldehyde) যথা ফরম্যালডিহাইড (formaldehyde) ইত্যাদি অত্যন্ত উচ্চক্ষমতাযুক্ত জীবাণুনাশক এবং ব্যাক্টিরিয়ার স্পোর বিনষ্ট করতে সক্ষম।

(ঙ) কোহল (alcohols) গুলি বিভিন্ন স্তরের জীবাণুনাশক ক্ষমতা প্রদর্শন করে। আইসোপ্রোপাইল কোহল (isopropyl) ইথাইল (ethyl) অপেক্ষা অধিক কর্মক্ষম, তবে কোন কোহলই জীবাণুর স্পোর নাশে সক্ষম নয়।

(চ) অম্ল ও ক্ষার (acids and alkalis) জাতীয় রাসায়নিকগুলির মধ্যে $H^+$ ও $OH^-$ আয়নগুলিই মূলতঃ কার্যকরী জীবাণু বিরোধী হিসাবে কাজ করে। $H^+$ আয়ন $OH^-$ আয়নের অপেক্ষা অধিকতর কর্মক্ষম। কিছু জৈব অম্ল অবশ্য সম্পূর্ণ অণু হিসাবেই কার্যকরী।

(ছ) ভারী পদার্থযুক্ত রাসায়নিকগুলিও উচ্চস্তরের জীবাণুনাশক। এদের

মধ্যে পারদ, টিন, রৌপ্য, ক্যাডমিয়াম, তামা প্রভৃতি খুবই কার্যকরী। এরাও প্রোটিন বিনষ্টকারী রাসায়নিক।

(জ) বহিস্তরে ক্রিয়াক্ষম রাসায়নিক (surface active agents) গুলির মধ্যে অ্যানায়নিক (anionic), ক্যাটায়নিক (cataionic) বা নন-আয়নিক (non ionic) রাসায়নিক যেমন কোয়াটারনারি অ্যামোনিয়াম কম্পাউণ্ড (quarternary ammonium compounds), অ্যালকিল এরিল সালফোনেট (alkyl aryl sulfonates) ইত্যাদি অন্যতম। (ঝ) রঞ্জক (dye) গুলির মধ্যেও অনেকের জীবাণুনাশক ক্ষমতা দেখা গেছে। এদের মধ্যে ট্রাইফিনাইলমিথেন জাতীয় মিথাইল ভায়োলেট বা ব্রিলিয়ান্ট গ্রীন, অ্যাক্রিডিন গোষ্ঠীর মধ্যে অ্যাক্রিফ্লাভিন ও প্রোফ্লাভিন রয়েছে যেগুলি সাধারণতঃ গ্রাম ধনাত্মক জীবাণু-নাশক। ক্রিষ্টাল ভায়োলেট অবশ্য ছত্রাকনাশক।

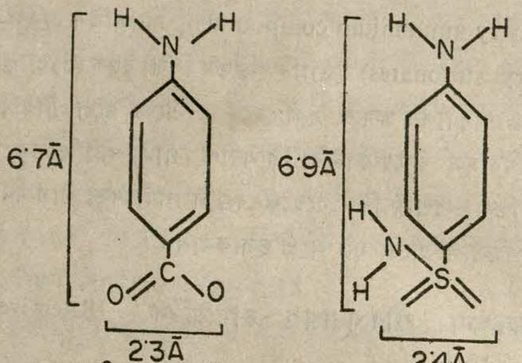
**নির্ধারণক্ষম জীবাণুনাশক রাসায়নিক** (Selectively toxic compounds) :

এই রাসায়নিকগুলি যেকোন পরিবেশে শুধুমাত্র দু'একটি জীবাণুরই বিনাশ সাধন করে। অন্য সমস্ত জীব কোষ ও এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। জীবাণুর মধ্যে কয়েকটি নির্ধারিত জীবাণু এরা ধ্বংস করে।

যদিও এজাতীয় রাসায়নিকের মধ্যে কুইনাইন (quinine)ই একটি অতি প্রাচীন প্রোটোজোয়ানাশক তবু বিজ্ঞানী এরলিচের (Ehrlich) গবেষণা ও অবদান এই নিরাময় (therapy) বিজ্ঞানের ভিত্তি স্বরূপ। প্রথমে কিছু 'জৈবনিক সদৃশ-অণু' (metabolic analogue) একাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

(ক) জীবাণুর শারীরবৃত্তিয় কাজে প্রয়োজনীয় একটি রাসায়নিক অণুর সদৃশ আকৃতির জীবাণুনাশক অণুর কার্যকারীতা প্রথম ১৯৩৫ সালে ডমাক (Domach) আবিষ্কার করেন। ইনি অ্যারোমাটিক সালফোন্যামাইড (aromatic sulfonamide) যুক্ত একটি অ্যাজো-ডাই (azo dye) এর জীবাণুনাশ ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেন। ইদুরের স্ট্রেপটোকক্কাল সেপ্‌টিসিমিয়া (streptococcal septaecimia) রোগে এই রাসায়নিকটি সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তী কালে এর বিজারিত যৌগ প্যারা অ্যামিনো বেনজিল সালফোনামাইড

(p-amino sulfonamide) ও এক্ষেত্রে কার্যকরী দেখা গেছে। জীবাণু তার অতি প্রয়োজনীয় প্যারা অ্যামিনো বেনজয়িক অম্ল (p-amino benzoic acid) কে ফলিক (folic) অম্ল সৃষ্টির কাজে ব্যবহারের সময় ভুলক্রমে এই অণু ব্যবহার করে। ফলে এই বিষক্রিয়া ঘটে। **(চিত্র-৭৬)**




চিত্র ৭৬ : সালফোনামাইডের জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধির উপর প্রভাব : দুই অণুর সমতা

যে সমস্ত জীবাণু পরিবেশ থেকে ফলিক অম্ল গ্রহণে অক্ষম তাদের ক্ষেত্রে এই জৈবনিক সাদৃশ্য যুক্ত অণু নির্ধারক-বিনাশকারী হিসাবে কর্মক্ষম।

(খ) অ্যান্টিবায়োটিকস (antibiotics) :

যে সমস্ত জীবাণু-সৃষ্ট রাসায়নিক যৌগ স্বল্প মাত্রাতে অন্য এক বা একাধিক জীবাণুর বিনাশে সক্ষম তাহাদের অ্যান্টিবায়োটিক্স বলা হয়। ছত্রাক বা অন্য ব্যাক্টিরিয়া থেকে উৎপাদিত হলেও বেশীর ভাগ অ্যান্টিবায়োটিকস **স্ট্রেপটোমাইসেস (Streptomyces)** জাতীয় ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা সৃষ্ট। বর্তমান যুগের ঔষধ শিল্পে এই রাসায়নিকগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ১৯২৯ সালে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Flemming) প্রথম অ্যান্টি-বায়োটিক পেনিসিলিন আবিস্কার করেন **পেনিসিলিয়াম নোটেটাম (Penicillium notatum)** ছত্রাক থেকে।

অ্যান্টিবায়োটিকগুলি বিভিন্ন জীবাণুর বৃদ্ধিতে বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নিম্নলিখিত তালিকাতে কিছু অতি পরিচিত অ্যান্টিবায়োটিকের জীবাণুর বৃদ্ধির উপর প্রভাবের প্রকৃতি উপস্থাপিত করা হল ( সারণী-২৩ )।

**সারণী ২৩ ঃ অ্যান্টিবায়োটিকের জীবাণুর উপর প্রভাব**

| অ্যান্টিবায়োটিকস ও উৎপাদক জীবাণু | কি ধরনের জীবাণুর উপর প্রভাব বিস্তার করে | কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে |
|---|---|---|
| ১। পলিমিক্সিন ( বি সাবটিলিস ) | গ্রাম ঋণাত্মক | কোষের আস্তরণ বিচ্ছিন্ন করে |
| ২। ক্লোরামফেনিকল ( স্ট্রেপটোমাইসেস ভেনিজুয়েলি ) | আন্ত্রিক ও অন্য বহু ব্যাক্টিরিয়া | প্রোটিন সংশ্লেষণে বাধা দেয় |
| ৩। স্ট্রেপটোমাইসিন ( স্ট্রে. গ্রিসিয়াস ) | গ্রাম ঋণাত্মক ও মাইকোব্যাক্টিরিয়াম টুবারকুলোসিস | ১। জারক উৎসেচক বিনষ্ট করে<br>২। প্রোটিন অণুতে টাইরোসিন প্রবেশে বাধা দেয়<br>৩। অ্যামাইনো অম্ল গ্রহণে বাধা দেয়<br>৪। কোষপ্রাচীর বিনষ্ট করে। |
| ৪। পেনিসিলিন ( পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম ) | গ্রাম ধনাত্মক | মিউরিন সংশ্লেষণে বাধা দেয় |
| ৫। টেট্রাসাইক্লিন ( স্ট্রে. অরিওফা-সিয়েনস ) অক্সিটেট্রাসাইক্লিন ( স্ট্রে. রিমোসাস ) | বহু ব্যাক্টিরিয়া ও এন্টামিবা | প্রোটিন সংশ্লেষণে বাধা দেয় |

| অ্যান্টিবায়োটিকস ও উৎপাদক জীবাণু | কি ধরনের জীবাণুর উপর প্রভাব বিস্তার করে | কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে |
|---|---|---|
| ৬। অ্যাক্টিনোমাইসিন-ডি (স্ট্রে. অ্যান্টিবায়োটিকাস) | স্পোর উৎপাদক ব্যাক্টিরিয়া | সংবাদ বাহক আর. এন. এ. সংশ্লেষণে বাধা দেয়। |
| ৭। এরিথ্রোমাইসিন (স্ট্রে. এরিথ্রিয়াস) | বহু ব্যাক্টিরিয়া | প্রোটিন সংশ্লেষণে বাধা দেয় |

# পাঁচ

## জীবাণুর পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান
## (Environment and ecology of microorganisms)

"প্রকৃতপক্ষে গবেষণাগারের বিশ্লেষণধর্মী ও পরীক্ষামূলক পদ্ধতির বিরুদ্ধে এটা একটা বিদ্রোহ।"
—এ. টি. হেনরিসি

৫·০০ জীবাণুর শরীর গঠনে সাধারণতঃ ১-৩০ শতাংশ শর্করা, ১-৪০% লিপিড এবং ৪০-৮০% প্রোটিন রয়েছে। এই সমগ্র বস্তু সম্ভারের ৫০% কারবন, ২০% অক্সিজেন, ১৫% নাইট্রোজেন, ৮% হাইড্রোজেন, ৩% গন্ধক, ১% ফসফরাস ইত্যাদি। বিস্ময়করভাবে জীবাণুর বস্তুসম্ভারের সাথে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু বিন্যাসের কিছুটা মিল রয়েছে, নেই পৃথিবীর বস্তুবিন্যাসের সাথে। জীবাণুতে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রধান বস্তু বলতে কারবন, অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন কিন্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু পৃথিবীতে জীবাণুর এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা রয়েছে। জীবজগতে অবশিষ্ট (residue) অবলোপ সাধনে এরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। বস্তুর অপচিতি (decomposition) ও পুণর্নবীকরণে (renewal) এদের দায়িত্ব অশেষ। জল ও মৃত্তিকাতে এরা বহু বস্তুর পরিবর্তন সাধন করে। বিভিন্ন জটিল রাসায়নিক যৌগ যথা ফেনল, ফরমাল-ডিহাইড, কোহল, বেনজিন (benzene), ন্যাপথালিন, কেরোসিন, প্যারাফিন, মিথেন (methane), নিকোটিন, কাইটিন, রাবার, সেলুলোস, হেমিসেলুলোস, লিগনোসেলুলোস ও বহু কীট, ছত্রাক ও আগাছা নাশকের অব্যবহৃত অংশকে বিয়োজিত ক'রে নূতন ও ব্যবহার্য বস্তুতে পরিণত করে।

প্রকৃতিতে রাসায়নিক বা জৈবিক সমস্ত বস্তুই পরস্পর নির্ভরশীল এবং

পরস্পরের মধ্যে একটি সক্রিয় ভারসাম্য (dynamic equilibrium) বজায় রাখে। এর যে কোন একটিকে বিচলিত করলে অন্য অংশও বিচলিত হয়।

প্রকৃতিতে জীবাণু বহু বিষাক্ত বস্তুও সৃষ্টি করে। যেমন বিভিন্ন অম্ল ও ক্ষার, অ্যান্টিবায়োটিক বা টকসিন (toxin) যার দ্বারা অন্য বহু জীবের বা জীবাণুর বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রয়োজনীয় বহু বস্তু যেমন খাদ্যপ্রাণ, অ্যামিনো অম্ল, নিউক্লিওটাইড প্রভৃতিও বহুল পরিমাণে জীবাণুরা প্রকৃতিতে সরবরাহ করছে যা অনেক জীবের প্রয়োজনীয়। জীবাণু বহু জটিল জৈববস্তুকে সরল পদার্থে পরিণত করে (mineralization)।

পৃথিবীর জলভাগেও জীবাণুর প্রভাব অপরিসীম। ইদানীংকালে ইউট্রফিকেশন (eutrophication) জনিত সমস্যাই এর প্রমাণ।

জীবাণু বহু জীবের খাদ্য হিসাবেও খাদ্যচক্রে অংশ গ্রহণ করে। প্রোটোজোয়ারা অনেকেই তাদের খাদ্যের জন্য ব্যাক্টিরিয়ার উপর নির্ভরশীল। আন্ত্রিক জীবাণু **এন্টামিবা হিস্টলিটিকার** আবাদ করতে গিয়ে বোঝা গেছে যে এই প্রোটোজোয়াটি একটি ব্যাক্টিরিয়া-খাদ্যের উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকাতে বহু ব্যাক্টিরিয়া প্রোটোজোয়ার উপর জীবন ধারণ করে।

## ৫·১০ জীবাণু ও পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক :

জীবাণুদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক এবং পরিবেশের সাথে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কের সামগ্রিক রূপটিকে বলা যায় জীবাণুর বাস্তুসংস্থান বিজ্ঞান (ecology)। বিভিন্ন ধরনের সম্পর্কগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে (locale) কার্যকরী থাকে। একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে পরিবেশ ও জীবাণুর সম্পর্ককে বলা হয় সিন্ইকলজি (synecology) আবার জীবাণুর একটিমাত্র প্রজাতির (species) সাথে পরিবেশের সম্পর্ককে বলা হয় অটোইকলজি (autoecology) জীবাণুদের ক্ষেত্রে অবশ্য গোষ্ঠীবদ্ধতা অতি পরিচিত রীতি। একটি বিশেষ স্থানে (site) বসবাসকারী জীবাণুদের বলা হয় জীবাণুগোষ্ঠী (community)। সামগ্রিকভাবে একটি বিশেষ আবহাওয়াতে ও অজৈব পারিপার্শ্বিকে (surroundings) বসবাসকারি এবং ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট জীবাণুগোষ্ঠীকে বলা হয় **বাস্তু-প্রক্রিয়া** (ecosystem)।

জীবাণুদের উন্মুক্ত জৈব-প্রণালী বা পরিস্থিতি (open system) ধরা হয়। তারা সচল পরিবেশ থেকে পছন্দমত বিভিন্ন দ্রব্য কোষমধ্যে গ্রহণ করে এবং পরিবর্তে অন্য কিছু বস্তুকে পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়। এই গ্রহণ ও বর্জন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে একটি স্থিত মাত্রায় (steady) থাকলে সেই অবস্থাকে স্থিতাবস্থা (equilibrium) বলা হয়। সচল প্রকৃতিতে জীবাণুরা ক্রমান্বয়ে পরিবেশের জটিলতা হ্রাস ক'রে কোষ মধ্যেকার জটিলতা বৃদ্ধি করে। এক বদ্ধ পরিবেশে বা প্রণালীতে জীবাণু ও পরিবেশের মধ্যে অস্থির বা স্থির যে কোন অবস্থা বিদ্যমান হলে প্রণালীর মোট শক্তির পরিমান সমানই থাকে। অর্থাৎ জীবাণুরা প্রথম তাপগতি সূত্র (first law of thermodynamics) মেনে চলে। বদ্ধ প্রণালীর স্বাভাবিক প্রবণতা সবসময়ই অধিকতর অস্থির (random) হতে চাওয়া। এরকম পরিস্থিতিতে অস্থিরতার যে পরিমাপ তাকেই বলা হয় এনট্রপি (entropy)। এসব পরিস্থিতিতে যতক্ষণ অস্থির অবস্থা বজায় থাকে ততক্ষণই বিক্রিয়া চলে। অন্যভাবে বলা যায় বিক্রিয়াকারীদের মুক্ত-শক্তির (free energy) তফাৎ থাকলে ততক্ষণ পর্যন্তই বিক্রিয়া চলে; মুক্তশক্তির সমতা এলে বিক্রিয়া বন্ধ হয় ও স্থিরতা বা ভারসাম্য (equilibrium) আসে। জীবাণুরা সংখ্যাবৃদ্ধির সাথে পরিবেশ থেকে শক্তি সংগ্রহ করে যার ফলে পরিবেশের অস্থিরতাও বাড়ে, যেটা আবার জীবাণুর অস্থিরতা বজায় রাখতে সহায়ক হয়।

প্রতিটি নির্ণয়যোগ্য (distinguishable) বাস্ত-প্রণালীতে কতকগুলি ক'রে ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব নির্ণায়ক (determinants) থাকে। এরাই উক্ত প্রণালীর জীবাণুগোষ্ঠীর সংযুতি (composition) নির্ণয় ক'রে। কোন হানাদার (invador) জীবাণু ঐ প্রণালীতে প্রবেশ করে অবস্থান করতে সফল হবে কিনা তাহাও নির্ণয় করে। প্রত্যেকটি পরিস্থিতির নিজস্ব জীবাণুগোষ্ঠী থাকে। মৃত্তিকা, মহাসাগর, মিষ্ট জলাশয়, উদ্ভিদ ও প্রাণীর বহিস্তর (surfaces), উদ্ভিদমূল, আক্রান্ত উদ্ভিদ বা প্রাণী কলা, জীবের মল, মুখগহ্বর, পৌষ্টিকতন্ত্র, বিভিন্ন পচনশীল জৈবপদার্থ, গাঁজানপ্রক্রিয়া নির্ভর খাদ্য সামগ্রী, পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতির নিজস্ব বিশেষ বিশেষ জীবাণুগোষ্ঠী রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বিজ্ঞানী রোসবেরী, ১৯৬২ (Rosebury) সংগৃহীত মানুষের মুখবিহ্বরের জীবাণুগোষ্ঠী একটি সারণীতে উপস্থাপিত করা হল।

সারণী ২৪ : মানুষের মুখবিহ্বরের জীবাণুগোষ্ঠী

| জীবাণু | জীবাণুর সংখ্যা × ১০৬ | |
|---|---|---|
| | প্রতি সি.সি. লালাতে | প্রতি মি.গ্রা. মাড়ীর অবক্ষেপ |
| মোট অবাত | ১১০·০ | ৩৬·০ |
| মোট সবাত | ৪০·০ | ১৫·০ |
| স্টাফাইলোকক্কাস | ০·০০৫ | — |
| স্ট্রেপটোকক্কাস | ২৯·০ | ৫·৫ |
| ভিলোনেলা | ১৭·০ | — |
| নাইসেরিয়া | ২·০ | — |
| ফুসোব্যাক্টিরিয়া | ০·০৫৬ | ০·০৪৩ |
| ব্যাকটেরয়েড | — | ০·৯৫ |
| স্পাইরোকিটি | — | ০·৪ |
| অন্যান্য | ৭·০ | — |

কোন একটি পরিস্থিতিতে যে জীবাণুগোষ্ঠী পাওয়া যায় তারা দেশী বা স্থানীয় (indigenous or autochthonous) বা বহিরাগত (invadors or allochthonus) হ'তে পারে। একটি পরিস্থিতি বা প্রণালী থেকে অন্য আর একটির জীবাণুর প্রজাতি বৈসাদৃশী (species diversity) স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়। একটি গোষ্ঠীর মধ্যে সর্ববৃহৎ সংখ্যাযুক্ত প্রজাতিটিই প্রকট (dominant)। এছাড়া অবশ্য একাধিক জীবাণু প্রজাতি থাকে যাদের বলা হয় সহ-প্রকট (co-dominant)। তবে গোষ্ঠীগুলির কোন নির্দিষ্ট সীমানা থাকে না। একে অপরকে অধিক্রমণ (overlap) করে।

## ৫·২০ জীবাণুর সুপ্তি বা অক্রিয় অবস্থা ও তার গুরুত্ব :

জীবাণু জীবনচক্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সাময়িক সুপ্ত (dormant) অবস্থাতে উপনীত হয়। এই অবস্থায় কোষের জৈবনিক ক্রিয়া বন্ধ হয়। বিভিন্ন জীবাণু সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় মূলতঃ পরিবেশের অসহ অবস্থা কাটিয়ে ওঠার

জন্য। যে সমস্ত অতি পরিচিত নিষ্ক্রিয় অবস্থা জীবাণুদের মধ্যে দেখা যায় সেগুলি হচ্ছে ব্যাক্টিরিয়ার অন্তঃস্পোর (endospore), ছত্রাক ও শৈবালের রেষ্টিং স্পোর (resting spores), প্রোটোজোয়ার আবদ্বিতকোষ বা সিস্ট (cyst) ইত্যাদি। নিম্নে লিখিত তালিকাটিতে বিভিন্ন জীবাণুর অক্রিয় অবস্থাগুলির একটি পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

**সারণী ২৫ : জীবাণুর সুপ্তি বা অক্রিয় অবস্থা**

| অক্রিয় অবস্থা | বিশেষত্ব | জীবাণু |
|---|---|---|
| অন্তঃস্পোর | শুষ্কতা, খরা ও উচ্চতাপ সহনশীল দীর্ঘসুপ্তি ; সংখ্যাবৃদ্ধি করে না | ব্যাসিলাস ; স্পাইরিলাম ক্লস্ট্রিডিয়াম, স্পোরো-সারসিনি। |
| আবদ্বিতকোষ বা সিষ্ট | শুষ্কতা সহনশীল, মাঝামাঝি সুপ্তি সংখ্যাবৃদ্ধি করে না। | প্রোটোজোয়া, অ্যাজোটোব্যাক্টর |
| রেষ্টিংস্পোর, স্কেলেরোসিয়া | শুষ্কতাসহনশীল, দীর্ঘঅক্রিয়তা। | বিভিন্ন ছত্রাক |
| ক্লামাইডোস্পোর | স্বল্পদীর্ঘ অক্রিয়তা ; সংখ্যাবৃদ্ধিও করে। | " " |
| কনিডিয়া | সামান্য উচ্চতাপ সহনশীল ; স্বল্পদীর্ঘ অক্রিয়তা, সংখ্যাবৃদ্ধিও করে। | স্ট্রেপটোমাইসেস |
| মিক্সোস্পোর ও মাইক্রোস্পোর | শুষ্কতাসহনশীল ; দীর্ঘ অক্রিয়তা। | মিক্সোকক্কাস |

এই গঠনগত প্রক্রিয়াগুলি ছাড়া আরও বহু পদ্ধতিতে জীবাণু প্রকৃতির মাঝে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। সাধারণভাবে দেখা যায় অন্য সমস্ত জীবের মত জীবাণুরাও হ্রস্বীকৃত জৈবনিক ক্রিয়া (reduced metabolic activity) পদ্ধতির সাহায্যে প্রায়ই এই উদ্দেশ্য সফল করে। জীবাণুর ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াই হাইপোবায়োসিস বলে পরিচিত। প্রকৃতিতে শীতলতা, অক্সিজেনের অভাব, জল বা আর্দ্রতার অভাব, অত্যধিক লবণাক্ততা প্রভৃতি অবস্থাতে জীবাণু

প্রায়ই এই অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। দেখা গেছে প্রোটোজোয়া কোষ মাত্র 15 সেকেণ্ড অনাদ্র´তাতে, বা 2 মিনিট সময় $50^0$ সে উষ্ণতাতে বা 45 মিনিট সময় 30° সেঃ এ বিনষ্ট হয়। কিন্তু সিস্ট অবস্থাতে প্রায় 23 মাস অনাদ্র´তা, 3·5 মাস শীতলতা, 30 মিনিট 50° সে উষ্ণতা সহ্য করে বেঁচে থাকে। **ব্যাসিলাস** গণ এর ব্যাক্টিরিয়াকে স্পোর অবস্থাতে 31 বছর পর্যন্ত জীবিত থাকতে দেখা গেছে। আবার **ক্লস্ট্রিডিয়াম** স্পোর হিসাবে কোহলের মধ্যেও 46 বছর বেঁচে থাকে।

অন্য অসহ অবস্থা ছাড়া এই জিরান অবস্থা বা সুপ্তি সাধারণতঃ খাদ্যাভাবের সময় সৃষ্টি হয়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জীবাণুতে দুই প্রকারের হাইপোবায়োসিস হয় যথা নিষ্ক্রিয় জীবন (cryptobiosis) ও অবচেতন অবস্থা (dormancy) (৪·৪৩)। সাধারণতঃ জীবাণুরা অতি নিম্ন উষ্ণতায় নিষ্ক্রিয় জীবনযাপনে সক্ষম। জীবাণুর এই ক্ষমতা তার বাস্তসংস্থান ও প্রকৃতিতে স্থায়ী স্থান দখলের কাজে সহায়তা করে। ধীরগতিতে দীর্ঘ সময় ধরে জৈবনিক ক্রিয়া স্তব্ধ হওয়ার পদ্ধতি (senescence) জীবাণু জীবনে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। পরন্তু জননী কোষই দ্বিবিভাজিত হয়ে নূতন কোষের সৃষ্টি হয়। অবশ্য দু'একটি প্রোটোজোয়া ও ছত্রাকে কিছুটা এই ধরনের প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে।

## ৫.৩০ জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধির হার ও তার গুরুত্ব :

সংখ্যাবৃদ্ধির হার সাধারণভাবে ব্যাক্টিরিয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উচ্চ। বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে **সিউডোমোনাস (Pseudomonas)** গণের সংখ্যাবৃদ্ধির হার সর্বাপেক্ষা দ্রুত। আবার **মাইকোব্যাক্টিরিয়াম, রাইজোবিয়াম** প্রভৃতির ক্ষেত্রে এই হার অত্যন্ত ধীর। নিম্নলিখিত সারণীতে বিভিন্ন জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধির একটি তুলনামূলক হার উপস্থাপিত করা হল ( **সারণী-২৬** )।

দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ক্ষমতাসম্পন্ন জীবাণুগুলি যেমন একটি সহযোগী পরিস্থিতি দ্রুততার সঙ্গে নিজেদের দখলে আনতে সক্ষম তেমনি তাদের সেই পরিস্থিতিতে দীর্ঘ সময় টিকে থাকার সম্ভাবনাও অনেক হ্রাস পায় কারণ প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তুর সম্ভাব্য অভাব। স্বল্প খাদ্যবস্তুর সরবরাহে ধীর গতিতে সংখ্যাবৃদ্ধিকারি

জীবাণুর প্রজনন সীমিত থাকে বলেই তাদের দীর্ঘতর সময় বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে।

**সারণী-২৬ : জীবাণুর দ্বিবিভাজনের সময় (generation time)**

| জীবাণু | দ্বিবিভাজনের সময় ( মিনিট ) |
|---|---|
| সিউডোমোনাস নাট্রিজেনস | ১০ |
| ব্যাসিলাস স্টিয়ারোথার্মোফিলাস | ১১ |
| " থার্মোফিলাস | ১৬ |
| " সাবটিলিস | ২৬ |
| স্টাফাইলোকক্কাস অরিয়াস | ২৭ |
| ক্লস্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম | ৩৫ |
| রাইজোবিয়াম মেলিলোটি | ৭৫ |
| ভিব্রিও মারিনাস | ৮১ |
| মাইকোব্যাক্টিরিয়াম টিউবারকিউলোসিস | ১০৮০ |
| অ্যামিবা প্রোটিয়াস | ১৪৪০ |

## ৫.৪০ জীবাণুর বাস্তসংস্থান, প্রকৃতি ও পরিবেশ :

একটি পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জীবাণু থাক্‌লেও একটি-দু'টি জীবাণুই প্রকট হয় (dominates)। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে যে জীবাণু প্রজাতি প্রথম বসবাস সুরু করে তাহাকে পথপ্রদর্শক (pioneer) জীবাণু বলা হয়।

পরিবেশে জীবাণুর সাথে অন্য সমস্ত ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব বস্তুর উপস্থিতি ও বিক্রিয়াই সামগ্রিকভাবে জীবাণুর বাস্ত বণ্টনের নির্ণায়ক। বস্তুর তিন অবস্থা—কঠিন, তরল ও বায়বীয় সবার সাথেই জীবাণুর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে প্রকৃতিতে। জীবাণু বিশেষতঃ ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাকস্পোর প্রভৃতির ওজন অত্যন্ত অল্প হওয়াতে ($10^{-11}-10^{-15}$ গ্রাম শুষ্ক ওজন) তারা বাতাসে অনিয়ত সময় ধরে ভেসে থাকতে পারে। তাদের উপর মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব অত্যন্ত অল্প। স্বভাবতই তাদের বাস্তবণ্টনেও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাব দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। সচল জীবাণু বা স্পোর বস্তুর তরল অবস্থার মধ্যেও স্বচ্ছন্দে ভ্রমণে

সক্ষম। অনেক ক্ষেত্রে জীবাণুর শারীরিক গঠনের কিছু কিছু বিশেষত্ব যেমন **কলোব্যাকটরের** (Caulobacter) দণ্ড (stalk) বা **গ্যালিওনেলা** (Gallionella) র রিবন কঠিন বস্তুতে তাদের লেগে থাকতে সাহায্য করে। সাধারণভাবে অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির জন্য জীবাণুর কঠিন বস্তুপরি সংশ্লিষ্ট থাকাটা সহজসাধ্য ও প্রচলিত।

৫.৪১ জীবাণুর ভৌগলিক বিস্তার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নেই। যেটুকু জানা গেছে তাতে কতকগুলি বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। মেরু অঞ্চলের জলাশয়ে মূলতঃ কিছু শৈবাল যথা **থালাসিওসিরা আন্টার্কটিকা** (Thalassiosira antarctica) বা **থা. হায়ালিনা** (T. hyalina)র প্রাধান্য দেখা যায়। নাতিশীতোষ্ণ, ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় মণ্ডলগুলিতে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জীবাণুর প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। তবু নাতিশীতোষ্ণ জলাশয়ে ফুকয়েড শৈবাল (Fucoid algae) এর প্রাধান্য অনস্বীকার্য। ক্রান্তীয় অঞ্চলের মাটিতে যেমন **বাইজারিঙ্কিয়া** (Beijerinckia) যথেষ্ট পাওয়া যায় তেমন ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে ডায়াটম বা **প্লাঙ্কটনিয়েলা** (Planktoniella) জন্মায়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবশ্য বহু রোগজীবাণু যেমন **মাইকোব্যাক্টিরিয়াম লেপ্রি** বা **প্লাসমোডিয়াম** এর যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব রয়েছে।

৫.৪২ মৃত্তিকাতে জীবাণুর বাস্তুসংস্থানেও যথেষ্ট অঞ্চলভিত্তিক বিশেষত্ব রয়েছে। পরবর্তী অংশে বিস্তারিত আলোচনা করা হলেও এস্থানে বিভিন্ন ধরনের ও অঞ্চলের মৃত্তিকায় জীবাণুর বাস্তুসংস্থানের একটি চিত্র দেওয়া হচ্ছে।

**সারণী ২৭ঃ মৃত্তিকাতে জীবাণুর বাস্তু সংস্থান ঃ**

| মৃত্তিকার প্রকার | প্রধান জীবাণু প্রজাতি |
|---|---|
| মৃত্তিকা ( সাধারণভাবে ) | **সিউডোমোনাস, মাইক্রোকক্কাস, ক্লস্ট্রিডিয়াম, অ্যাক্রোমোব্যাকটর, ব্যাসিলাস, ফ্লাভোব্যাক্টিরিয়াম, আর্থ্রোব্যাকটর, অ্যাক্টিনোমাইসিটগোষ্ঠী, অ্যাসপারজিলাস, পেনিসিলিয়াম, স্কেলেরোসিয়া ও ক্লামাইডোস্পোর** উৎপাদক ছত্রাক। |

| মৃত্তিকার প্রকার | প্রধান জীবাণু প্রজাতি |
|---|---|
| উষ্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকা | অ্যাক্টিনোমাইসিটস |
| জলা ও বিল অঞ্চলের মৃত্তিকা | অবাত জীবাণুগুলি |
| শুষ্ক অঞ্চলের মৃত্তিকা | স্পোর উৎপাদক জীবাণু |
| লবণাক্ত অঞ্চলের মৃত্তিকা | লবণ সহনশীল জীবাণু |

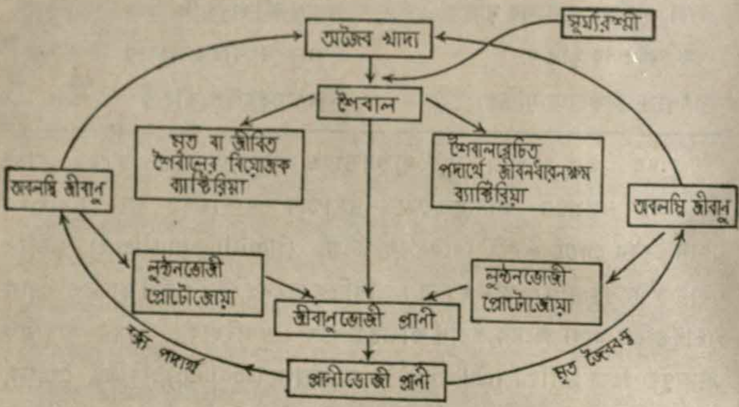
৫.৪৩ প্রকৃতিতে জীবাণুর খাদ্যসম্ভারও জীবাণুর বাস্তসংস্থানের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। জীবাণুর ক্ষেত্রে বাসস্থান ও খাদ্যবস্তু প্রায় সমার্থক। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ খাদ্যবস্তুর (limiting nutrient) অভাবে কোন জীবাণুর বাস্তসংস্থান হয় না। বিভিন্ন ধরনের জৈব পদার্থ ছাড়াও মৌল পদার্থগুলির মধ্যে অনেক পদার্থ জীবাণুর পক্ষে অপরিহার্য। যেমন সামুদ্রিক জীবাণুর পক্ষে ক্লোরিন (chlorine) ও সোডিয়াম (sodium), বিভিন্ন শৈবাল, ব্যাক্টিরিয়া ও প্রোটোজোয়ার পক্ষে ম্যাঙ্গানিজ (manganese) ও কেলসিয়াম (calcium), ডায়াটমদের পক্ষে সিলিকন (silicon), নীলসবুজ শৈবাল ও কিছু ব্যাক্টিরিয়ার জন্য মলিবডেনাম (molybdenum) বা কিছু শৈবালের জন্য ভ্যানাডিয়াম (vanadium) অপরিহার্য।

স্বভাবতই একটি পরিস্থিতিতে এদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সেই পরিস্থিতির জীবাণু-সংবৃতি নির্ণয় করে।

যে সমস্ত জীবাণু প্রকৃতির শক্তি উৎসের মূল উপাদান ব্যবহারে সক্ষম তাদের বলা হয় মৌলবিয়োজক (primary feeders)। এই জীবাণুগোষ্ঠী খাদ্যসংগ্রহ পদ্ধতির (trophic level) প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। বাকী জীবাণুগুলি এই মৌল বিয়োজকদের উৎপাদিত বস্তু সামগ্রীই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এই দ্বিতীয়গোষ্ঠীর জীবাণুগুলিকে বলা হয় গৌণ বিয়োজক (secondary feeders)। এরা খাদ্যসংগ্রহ পদ্ধতির দ্বিতীয় স্তরে অবস্থান করে।

সাধারণত জলজ জীবাণুগুলি মৌল বিয়োজক। এরা সূর্যালোক থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে সক্ষম এবং সেই শক্তি সহযোগে প্রাথমিক শর্করা সংশ্লেষণ করে। এই প্রাথমিক খাদ্যসংশ্লেষকদের ভিত্তি করে প্রকৃতিতে খাদ্যবস্তুর ব্যবহার হ'চ্ছে চক্রাকারে। অর্থাৎ এক জীবাণুগোষ্ঠী উৎপাদিত দ্রব্য অন্য

আরেক গোষ্ঠী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার বা বিয়োজন করছে। জীব ও জীবাণুর খাদ্যচক্র নীচে চিত্রে দেওয়া হল ( **চিত্র-৭৭** )।




চিত্র ৭৭ : জীব ও জীবাণুর খাদ্যচক্র

## ৫·৪৪ জীবাণুর বাস্তসংস্থানে বিভিন্ন বাধাবিপত্তি ও তার উত্তরণ :

অন্য জীবের মত জীবাণুর বাস্তসংস্থানেও বিভিন্ন প্রকার বাধাবিপত্তি রয়েছে। দু'একটি বিশেষ ধরনের বাধাবিপত্তির কথা উল্লেখ করা হচ্ছে। জীবাণুর বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উষ্ণতা, লবণাক্ততা প্রভৃতি অত্যন্ত প্রভাবশালী কারণ। এগুলি বাস্তসংস্থানের ক্ষেত্রে স্থায়ী বা অস্থায়ী বাধা হিসাবে দেখা দিতে পারে। গোষ্ঠী হিসাবে ছত্রাক 56-60° সে বা প্রোটোজোয়া 51° সে এর অধিক উষ্ণতা সহ্য করতে পারেনা। আবার অম্ল-ক্ষারত্বের কথা ভাবলে, ছত্রাক যদিও কিছুটা অম্ল পরিবেশে বাস্ত-সংস্থানে সক্ষম, ব্যাক্টিরিয়ার পক্ষে গোষ্ঠীগতভাবে এটি সম্ভব নহে। **স্ট্রে. স্ক্যাবিস** ও **অ্যাজটোবাক্টর** মৃত্তিকাতে এবং **ক্ল. বটুলিনাম** মনুষ্যখাদ্যে অম্লের আধিক্যে বসবাস করতে অক্ষম। পরিবেশের লবণাক্ততা ডায়াটমদের বৃদ্ধি খর্ব করে। উষ্ণ প্রস্রবণগুলিতে জলের উষ্ণতা 43° র অধিক হ'লে **প্রোটোজোয়া** বসবাসে অক্ষম হয়, 54° এর অধিক হ'লে **অসিলেটরিয়া (Oscillatoria)** এবং 54° এর কম হলে **সাইনেচেকক্কাস (Sinechecoccus)** বাঁচেনা।

বহু জীবের অঙ্গ বা নিঃসৃত বস্তুগুলি তাদের উপর জীবাণুর বাস্তুসংস্থানে বাধা সৃষ্টি করে। মনুষ্যদেহের ফুসফুসের শ্লেষ্মা (mucosa), নাসিকার লাইসো-জাইম, রক্তের অ্যান্টিবডি প্রভৃতি, দুধের পেরক্সিডেস (peroxidase) উৎসেচক ও অ্যাম্‌টিনিন, উদ্ভিদমূলের কর্কস্তর (cork layer), ফলের বহিঃত্বক (cuticle) বা অম্ল, উদ্ভিদ কাণ্ডের আঠা (gum), রজন (resin) ও ট্যানিন (tannin) প্রভৃতি জীবদেহে বহু জীবাণুর বাস্তুব্যবস্থার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

জীবাণুর ক্রমবৃদ্ধি, সংখ্যাবৃদ্ধি ও জীবনরক্ষার জন্য প্রত্যেকটি বহিঃসর্তের একটি গ্রাহ্য এলাকা রয়েছে। সময় বিশেষে জীবাণু এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলের বা পরিধির উর্দ্ধে যাওয়ার সামর্থ নানাভাবে অর্জনও ক'রে। এই ক্ষমতাও জীবাণুর বাস্তুসংস্থানে সাফল্য আনার অন্যতম কারণ। দেখা গেছে বিভিন্ন জীবাণু যেমন **নিউরোস্পোরা, ডিসালফভিব্রিও** ও **মাস্টিগোক্লাডাস** (Mastigocladus) দের গ্রাহ্য উষ্ণতার অঞ্চল বা পরিধি পরিবর্তন হয়েছে যথাক্রমে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ($CO_2$) প্রভাবে, জলের উচ্চচাপে ও অম্লত্বর পরিবর্তনে। আবার **আনসিনুলা** (Uncinula) ছত্রাক উষ্ণতার প্রভাবে তার গ্রাহ্য আর্দ্রতার পরিধি পরিবর্তন করেছে। **মিউকর** তার অক্সিজেন ($O_2$) চাহিদাও পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে থায়ামিনের সরবরাহে।

## ৫.৫০ জীব ও জীবাণুর বিভিন্ন পারস্পরিক সম্পর্ক ও জীবাণুর বাস্তুসংস্থান :

৫.৫১ পরিবর্তনশীল পরিবেশে জীবাণু গোষ্ঠীর গোষ্ঠী-বিশেষত্ব বজায় রাখার ক্ষমতাকে বলা হয় স্থিতিশীলতা (homeostasis)। জীবাণু সাধারণতঃ তাদের স্বনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা দ্বারা (self-regulatory mechanism) তুলনামূলক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে। এই স্থিতিশীলতা অতিক্রম করা বা বিনষ্ট করা প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। মৃত্তিকাতে **অ্যাজটোব্যাকটর** আবাদ মিশ্রিত করে তার তুলনামূলক সংখ্যাবৃদ্ধির প্রচেষ্টা, **ল্যাক্টোব্যাসিলাস** পূর্ণ দুগ্ধ দ্বারা অন্ত্রের জীবাণু গোষ্ঠীর পরিবর্তন প্রচেষ্টা, যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদক জীবাণুর আবাদ মাটিতে মিশ্রিত ক'রে উদ্ভিদ রোগ দমন প্রচেষ্টা প্রভৃতি মোটামুটি ব্যর্থ হওয়াতে স্থিতিশীলতার অনতিক্রম্যতা প্রমাণিত হয়েছে।

এ সমস্ত সত্ত্বেও প্রকৃতিতে যে সব জীবাণুর বাস্তুসংস্থানগত বিস্ফোরণ

(ecological explosion) ঘটেছে তার কারণ কিছু কিছু নির্ণীত হ'লেও একই পদ্ধতিতে উক্ত বিস্ফোরণ কৃত্রিমভাবে ঘটানো যায়নি। মৃত্তিকায় বিভিন্ন জৈব পদার্থ ব্যবহারে বা অন্নে বিভিন্ন ঔষধাদি ব্যবহারে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। জীবাণু গোষ্ঠীর স্থিতিশীলতা জীবাণুদের বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সম্পর্কের সামগ্রিক ফল। পারস্পরিক সম্পর্কগুলি স্বতন্ত্রভাবেও আলোচনা করা হচ্ছে।

৫.৫২ গোষ্ঠীবদ্ধ বিভিন্ন জীবাণুর মধ্যে মোটামুটি নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার সম্পর্কের কথা জানাগেছে।

(অ) পারস্পরিক সাহচর্য বা প্রোটোকোঅপারেশন (Protoco-operation) : এটিকে জীবাণুদের মধ্যে এক ধরনের বাধ্যতাবিহীন (non-obligatory) পারস্পরিক সম্পর্ক বলে ধরা হয়। এই সম্পর্কে দুটি জীবাণু পরস্পর সুবিধার সৃষ্টি করে। সম্পর্কটি বিশেষ ঘনিষ্ঠ শ্রেণীর নয়। নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণুর একাধিক বর্গের মিশ্রচাষ অনেক ক্ষেত্রে যে অধিকতর সফল হয় তা এই কারণে। ম্যাঙ্গানাস (manganous) আয়নকে জারিত করতে **করাইনেব্যাক্টিরিয়াম** ও **ক্রোমোব্যাক্টিরিয়াম** পরস্পর সাহচর্য গ্রহণ করে। সাহচর্যের যে বিশেষ ক্ষেত্রে দুটি জীবাণু খাদ্যপ্রাণ বিনিময় করে তাকে বিশেষ ভাবে বলা হয় **সিনট্রফিসম** (syntrophism)। **প্রোটীয়াস ভালগারিস** ও **ব্যাসিলাস পলিমিক্সার** মধ্যে এজাতীয় সম্পর্ক দেখা যায় যথাক্রমে বায়োটিন ও নিকোটিনিক অম্ল বিনিময়ের মধ্যে।

(আ) একতরফা সাহচর্য বা কমেন্সালিসম্ (Commensalism) : এর ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক জীবাণুর সাহচর্যের মধ্যে একজন মাত্র সুবিধা ভোগ করে। এক্ষেত্রে সুবিধাভোগী জীবাণুটিকেই বলা হয় **কমেনসাল**। এই রকম একতরফা সাহচর্যের ঘটনা জীবাণু জগতে প্রচুর রয়েছে। ইঁদুরের দেহে **প্রোটীয়াস ভালগারিস** এর রোগ সৃষ্টি ক্ষমতার প্রবাল্য (virulence), **স্টাফ. অরিয়াসের** সাহচর্যে যথেষ্ট বাড়ে। একই ভাবে উদ্ভিদের ফল পচনে **পেনিসিলিয়াম ডিজিটেটাম, ডিপ্লোডিয়া নাটালেনসিসকে** সাহচর্য দেয়। **ব্যাসিলাস সারকুলানস** এভাবে **ক্ল. পাস্তুরিয়েনামের** নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ বাড়ায়, **রাইজোপাস** বাড়ায় **ট্রাইকোডার্মার** সেলুলোস বিয়োজন।

(ই) প্রতিযোগিতা বা কমপিটিশন (Competetion) :

জীবাণুর মধ্যে সব সময়ই আলো, বাতাস, জল, খাদ্য ও স্থান নিয়ে যে প্রতিযোগিতাগুলি চলে সেইগুলিকেই বলা হয় 'প্রতিযোগিতা'। বিশেষতঃ উচ্চ প্রজন যুক্ত জীবাণু গোষ্ঠীতে এই ধরনের পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই দেখা যায়। **স্টাফ. অরিয়াস** ও **ই. কোলির** ক্রমবৃদ্ধির হারের মধ্যে এজাতীয় প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায়।

(ঈ) বিরোধিতা বা অ্যামেন্সালিসম (Amensalism) : জীবাণু-গোষ্ঠীতে বহু জীবাণু পার্শ্ববর্তী জীবাণুর পক্ষে ক্ষতিকারক পদ্ধতিতে বিক্রিয়া করে। সাধারণতঃ যে সমস্ত জীবাণুকোষ জৈবনিক বিক্রিয়া দ্বারা বিষ জাতীয় পদার্থ নিঃস্বরণ করে (toxin) তারাই পার্শ্ববর্তী জীবাণুর পক্ষে ক্ষতিকারক হ'য়ে দাঁড়ায়। জলাশয়ে **অ্যানাবিনা** (**Anabaena**), **স্পাইরোগাইরা** (**Spirogyra**) ইত্যাদি শৈবাল এরকম বিষ নিঃস্বরণ ক'রে পার্শ্ববর্তী জীবাণুর বিরোধিতা করে। মৃত্তিকাতে **ট্রাইকোডার্মা** (**Trichoderma**), **ব্যাসিলাস** (**Bacillus**) ও বহু **অ্যাক্টিনোমাইসিটস**-এর জীবনপ্রক্রিয়া এইরকম।

যে সমস্ত বিরোধিতাতে জীবাণু উৎপাদিত বিষয়টি অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় এবং জীবাণু তার দ্বারা বিরোধিতা করে তাদের বলা হয় **অ্যান্টিবায়োসিস** (antibiosis)।

(উ) লুণ্ঠনজীবিতা বা প্রিডেশন (Predation) :

জীবাণুগোষ্ঠীতে কিছু জীবাণু রয়েছে যারা অন্য কিছু জীবাণুকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় লুণ্ঠনজীবিতা। প্রোটো-জোয়া **কলপিডিয়াস** (**Colpidius**), মিক্সোব্যাক্টিরিয়া **মিক্সোকক্কাস** (**Myxococcus**) ও শুঙ্গল জীবাণু **ওকোমোনাস** (**Ochomonas**) এর ব্যাক্টিরিয়া ভক্ষণ বা ডাইনোফ্লাজেলেট **জিমনোডিনিয়াম** (**Gymnodinium**) এর শৈবাল ভক্ষণ এজাতীয় সম্পর্ক।

(ঊ) মিথোজীবিতা (Symbiosis) : দুটি জীবাণুর মধ্যে পরস্পর এমন সাহচর্য করতে হয়, যা কিছুটা বাধ্যতামূলক বা অপরিহার্য। সম্পর্কটি খুবই স্থিতিশীল। সবুজ শৈবাল ও এক ধরনের ছত্রাকের মিথোজীবি অবস্থাকে বলা হয় লাইকেন (lichen)।

(খ) পরজীবিতা (Parasitism) :

জীবাণুগোষ্ঠীতে একটি জীবাণু অন্য একটি জীবাণুকে আক্রমণ করে ও তার শরীর থেকে খাদ্য সংগ্রহ ক'রে জীবনধারণ করে। সেই সম্পর্ককে বলা হয় পরজীবিতা। ফাজ-ব্যাক্টিরিয়া সম্পর্ক পরজীবিতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

## ৫·৫৩ জীবাণুদের সাথে অন্যান্য জীবের সম্পর্ক :

জীবাণুর বাস্তসংস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে জীবাণুদের সাথে অন্যান্য জীবের সম্পর্কগুলির প্রাথমিক আলোচনা করা যায়। বিভিন্ন সম্পর্কগুলির মধ্যে মিথোজীবিতা (symbiosis) ও পরজীবিতা (parasitism) অন্যতম।

(অ) মিথোজীবিতা-জীবাণু ও জীবের মধ্যে :

দুটি ভিন্নতর (dissimilar) প্রজাতি একটি জীব ও অন্যটি জীবাণু হলেও তাদের মধ্যে পরস্পর সহযোগিতার অপরিহার্য সম্পর্ককে বলা হয় মিথোজীবিতা। শুঁটী জাতীয় ফসলের সাথে **রাইজোবিয়াম** ব্যাক্টিরিয়ার সম্পর্কটি মিথোজীবিতার একটি উদাহরণ।

(আ) পরজীবিতা-জীবের উপরে জীবাণুর :

জীবাণুর উপর জীবাণুর পরজীবিতার মত অন্য জীবের উপর জীবাণুদের পরজীবিতাও দেখা যায়। জীবাণু উদ্ভিদ বা প্রাণীদেহে আক্রমণ ক'রে খাদ্য সংগ্রহ করে। এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই আক্রান্ত উদ্ভিদ বা প্রাণী রোগগ্রস্ত হয়। আক্রমণকারী জীবাণু হয় পরজীবি ও রোগের কারণ এবং আক্রান্ত উদ্ভিদ বা প্রাণীকে বলা হয় পোষক জীব।

## ৫·৬০ জীবাণুর বিস্তার ও বাস্তসংস্থান :

প্রকৃতিতে জীবাণুর বিস্তার ঘটে (dispersal) বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা। জীবাণুগোষ্ঠীর যে এক একটি পরিস্থিতিতে সংযুতির স্থিতিশীলতা তা বহুলাংশে বিস্তার ক্ষমতার উপরও নির্ভরশীল। প্রত্যেক জীবাণুর প্রকৃতি অনুযায়ী বিস্তারের একটা প্যাটার্ন (pattern) থাকে। জীবাণুর বা জীবাণুর স্পোরের ক্ষুদ্রত্ব, হালকা চেহারা, শুঙ্গ, পক্ষ্ম ইত্যাদিজনিত সচলতা তাদের বিস্তার ও বাস্তবন্টনে সহায়তা করে।

যেসব ক্ষেত্রে জীবাণুকোষ, তার স্পোর বা অন্য অঙ্গ বাতাস, জল,

জীবজন্তু ইত্যাদির সাহায্যে বিস্তার লাভ করে তাদের বলা হয় অক্রিয় বিস্তার। জীবাণুর মধ্যে এই প্রক্রিয়ায় বিস্তারের প্রচলন অত্যধিক। সীমিত-সংখ্যক জীবাণু মূলতঃ শৈবাল, ছত্রাক ও প্রোটোজোয়ারা নানাভাবে সক্রিয় বিস্তার করতে পারে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবাণু বিস্তারের ঘটনা হচ্ছে **পাস্তুরেলা পেসটিস** (Pasturella pestis) এর ফ্লিয়াবীটল (flea bettle) এর মাধ্যমে মহাসাগর পার হ'য়ে আগমন বা ড্রাগনমাছির মাধ্যমে প্রোটো-জোয়া ও শৈবালের কয়েক শত কিলোমিটার বিস্তার। বহু রোগসৃষ্টিকারি জীবাণু মানুষের সাহায্যে বিস্তার লাভ ক'রে তাদের নূতন বাস্তুসংস্থান করে যেমন **প্লাসমোডিয়াম, নাইসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস** (Neisseria meningitidis), **সালমোনেলা** ইত্যাদি। অন্য জীবজন্তুর সাহায্য নেয় যারা তাদের মধ্যে **ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস** ও **ব্রুসেলা** (Brucella) অন্যতম। উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিকারী বহু জীবাণুর বিস্তারে মাটি ( **পি. সোলানেসিয়েরাম** ), মানুষ ( **জা. ক্যামপেসট্রিস** ), কীট যথা **ফাইলকনিসটিস** ( **জা. সাইট্রি** ) প্রভৃতির সহায়তাও তাদের নূতন পরিস্থিতিতে বাস্তুসংস্থানে সক্ষম করে।

## ৫·৭০ বায়ুস্তরের জীবাণু ও প্রকৃতিতে তার প্রভাব ঃ

বায়ুস্তরে বহু খনিজ ও জীবজাত বস্তুকণা ও জীবাণু সবসময় ভেসে বেড়ায়। জীবাণু বা জীবাণুর স্পোরগুলি বায়ুস্তরে অতি অল্প সময়ই জীবিত থাকে। সমস্ত ছত্রাক, মস্ ও ফার্ন-এর স্পোর ছাড়াও বিভিন্ন উদ্ভিদের পরাগরেণু, শৈবালের কোষ, ব্যাক্টিরিয়ার কোষ ও স্পোর, প্রোটোজোয়ার সিষ্ট এমনকি ভাইরাসগুলিও পৃথিবী পৃষ্ঠে বাতাসের ঘনিষ্ঠতম স্তরে ভাসমান। এই ভাসমান জীবাণু ও কণাগুলি সাধারণতঃ ১ মাইক্রোমিটার (μm) থেকে ৩০ মাইক্রো-মিটার (μm) পর্যন্ত মাপের হয়। সূর্যের বিকিরণ ও পৃথিবীপৃষ্ঠে তার বিভিন্ন প্রকার প্রতিফলন জনিত শক্তির সাহায্যে বাতাস সর্বদাই সচল। সাধারণতঃ পৃথিবীর মেরু অঞ্চলগুলি সূর্যকিরণ থেকে যতটা শক্তি সংগ্রহ করে তার চেয়ে বেশী হারায় আর ৪০° উঃ থেকে ৪০° দঃ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় সৌর শক্তি যতটা গৃহীত হয় তদপেক্ষা কম পরিত্যক্ত হয়। ফলে বিষুব অঞ্চল (equatorial) থেকে উষ্ণতার একটা প্রবাহ মেরু অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হওয়া দরকার হয়। এটা বাতাস প্রবাহের সাহায্যে সংঘটিত হয়। ফলে

গরম হাওয়া মেরু অঞ্চলের দিকে এবং শীতল হাওয়া বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। আর একটি তাপ প্রবাহ মাটি থেকে উপরদিকে প্রবাহিত হয় (convection)। এসবের ফলে বায়ুস্তরে ৫০০ থেকে ১০০০ মিটার পর্যন্ত একটা চঞ্চলতা (turbulence) সৃষ্টি হয়।

## ৫·৭১ বায়ুবাহিত জীবাণুগুলির উৎস :

উদ্ভিদের উপরিস্তরের জীবাণু বা এপিফাইটগুলি (epiphytes) অথবা মৃত গাছপালার মৃতজীবিগুলিই এর উৎস। জীবাণুগুলি বাতাসে পরনির্ভর (passive) হ'য়ে ভাসে যদিও বহু ছত্রাক তাদের স্পোরকে সক্রিয়ভাবে বাতাসে পৌঁছে দেয়। বাতাসে বৃষ্টি ফোঁটাও জীবাণুর কার্যকরীবাহক হিসাবে কাজ করে। ছত্রাকের ক্ষেত্রে কনিডিওফোর যে স্পোরকে উচ্চে ধারণ ক'রে থাকে তার ফলেও স্পোরের এই বাতাসে ওড়া সহজ হয়। পোষকজীবজন্তু ও মানুষ তাদের হাঁচি ও কাশির মাধ্যমে জীবাণুকে প্রাথমিক বিস্তারশক্তিসহ বাতাসে পাঠায়। সাধারণতঃ যে কোন ভৌত চঞ্চলতা (disturbance)ই এদের বাতাসে পৌঁছাতে সাহায্য করে। পোষক উদ্ভিদও আক্রমণকারি জীবাণুকে সচল বায়বীয়স্তরে তুলে ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে।

## ৫·৭২ বাতাসে জীবাণুর বিস্তার ও অবস্থান :

জীবাণু বাতাসে ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ তার পতনের গতি বারংবার আন্দোলিত ও উর্দ্ধমুখী বাতাসের গতির চেয়ে কম থাকে। বাতাসে পতনোন্মুখ কণার প্রান্তিক বেগ (terminal velocity) তার ব্যাসার্ধের বর্গের সাথে আনুপাতিক সম্পর্কযুক্ত। কুড়ি মাইক্রন ব্যাসযুক্ত একটি জীবাণুর গতি হয় প্রতি সেকেণ্ডে ১ সেন্টিমিটার। সুতরাং বেশিরভাগ স্পোরের পতনগতি প্রতি সেকেণ্ডে ০·০৫-২·০ মিটার। বায়ুমণ্ডলে বাতাসের গতি সাধারণতঃ প্রতি সেকেণ্ডে ৩০ সেন্টিমিটার। এই গতি সহজেই স্পোরের পতনগতিকে বাধা দিয়ে স্পোরকে ভাসিয়ে রাখে। তবে বায়ু নিশ্চল হলে স্পোরের মাটিতে পড়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী।

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বায়ুমণ্ডলে উচ্চতাবৃদ্ধির সাথে সাথে জীবাণুর সংখ্যা কমতে থাকে। মোটামুটি ২-৪ কি. মি. উর্দ্ধে বায়ুমণ্ডলে জীবাণু প্রায় অনুপস্থিত। অবশ্য অন্য বহু কারণে এই রীতি পরিবর্তিত

হতে পারে। গ্রামাঞ্চলের বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে জীবাণুসংখ্যা প্রায় ১০,০০০ এবং বেশীরভাগই ছত্রাকও ব্যাক্টিরিয়া জাতীয় জীবাণু থাকে। শহরাঞ্চলে এই সংখ্যাটি অধিক হলেও অবস্থাটি খুবই অস্থির এবং অঞ্চলভিত্তিক স্বাতন্ত্রও দেখা যায়। জীবাণুর আনুভূমিক (horizontal) বিস্তারের ক্ষেত্রে জীবাণুসংখ্যা সবসময়ই উৎস থেকে সর্বাধিক ১০০ মিটার দূরত্ব যেতে পারে। জলভাগের বায়ুমণ্ডলের ক্ষেত্রে তীরভূমি থেকে জলভাগের কেন্দ্র অভিমুখে জীবাণুসংখ্যা অতিক্রুত হ্রাস পায়। মধ্যসমুদ্রে বাতাসে দু'একটি সামুদ্রিক জীবাণু দেখা যায়।

বায়ুমণ্ডলে জীবাণুর বিস্তারে বৃষ্টিপাত একটি অন্যতম বাধা। সাধারণতঃ ০·২ মাইক্রোমিটারের (µm) চেয়ে বড় যে কোন জীবাণু বা কণাই বারিবিন্দুর কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে মাটিতে পড়ে যায়।

## ৫·৭৩ বাতাসে জীবাণুর উপস্থিতির ফলশ্রুতি ঃ

মানুষের বা অন্য প্রাণীর রোগ জীবাণুর বিস্তারে বায়ুমণ্ডলের ভূমিকা খুব একটা কার্যকরী নয়। তবে উদ্ভিদ রোগের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব যথেষ্ট। মানুষের কিছু ছত্রাকজনিত রোগের জীবাণু মৃত্তিকার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে বিস্তার লাভ করে।

## ৫·৭৪ বদ্ধ বায়ুমণ্ডলের জীবাণু ঃ

উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডলের বহু জীবাণুই বাড়ী বা অট্টালিকা মধ্যস্থ বদ্ধ বায়ুমণ্ডলে অবস্থানে সক্ষম। বেশীরভাগ রোগজীবাণু এই বদ্ধ পরিবেশেই প্রাণী বা উদ্ভিদ উৎস থেকে উদ্ভূত। জীবের শ্বাসনালী বা অন্য অংশ থেকে বর্জিত বহু জীবাণু রয়েছে। এই সমস্ত জীবাণুর সংখ্যা সময়ের সাথে ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় বিশেষতঃ ঘরগুলিতে বায়ু চলাচল ব্যবস্থা যথাযথ না হলে। বদ্ধ বায়ুমণ্ডলে জীবাণু বহু বস্তু যথা ব্যবহৃত জামাকাপড়, বিছানাপত্র, মানুষের ত্বকের শুষ্ক আবরণ ( scales) বা চুল, জীবজন্তুর খাদ্যদ্রব্য ও শুষ্ক রেচিত পদার্থ প্রভৃতি থেকে আসে। উন্মুক্ত বায়ুমণ্ডল অপেক্ষা বদ্ধ বায়ুমণ্ডলে প্রায়ই জীবাণুর ভাসমান জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

বদ্ধ বায়ুমণ্ডলে ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস প্রভৃতি সর্বপ্রকার জীবাণুই থাকতে পারে। যেসমস্ত রোগ জীবাণু এইভাবে বাতাস বাহিত হয় তার

মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, হাম, বসন্ত প্রভৃতির ভাইরাস, টনসিলাইটিস, যক্ষা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, প্রভৃতি রোগের ব্যাক্টিরিয়া, এলার্জী, শ্বাসযন্ত্রের নানা রোগ প্রভৃতির ছত্রাক খুবই দেখা যায়। মানুষের উপর এদের প্রভাব সহজ বোধ্য।

## ৫·৮০ জলভাগের জীবাণু ও প্রকৃতিতে তার প্রভাব ঃ

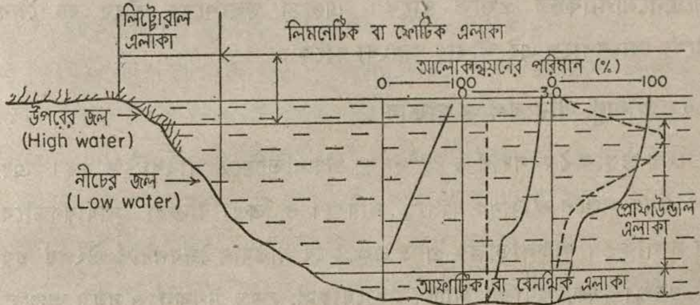
পৃথিবীর সমগ্র জলভাগের প্রায় সর্বত্রই জীবাণু বিদ্যমান। বাতাস থেকে বৃষ্টি, ঝড় ও বরফবাহিত হ'য়ে বহু জীবাণু জলে আসে। পৃথিবী পৃষ্ঠের মৃত্তিকা ঘরবাড়ী, উদ্ভিদ, প্রাণী-সমস্ত কিছুর থেকে জলবাহিত হ'য়ে বিভিন্ন জীবাণু জলাশয়ে উপনীত হচ্ছে। স্বাভাবিক প্রস্রবণ ও আর্টেসিয় কূপ থেকে উদ্গত জল তুলনামূলক ভাবে জীবাণুমুক্ত থাকে কারণ ঐ জলধারা প্রস্তর ও অন্য স্তরের মধ্য দিয়ে পরিস্রুত হয়ে নীচে গিয়ে জমে।

জলের উৎস অনুযায়ী জলাশয়ের জীবাণুর প্রকৃতি ও সংখ্যা নির্ধারিত হয়। এ ছাড়া জলের জৈব ও অজৈব বস্তু, তার ভৌগোলিক, জৈবিক ও আবহাওয়া সম্পর্কীয় অবস্থাও এ ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করে। বৃহৎ জলাশয়গুলি যথা মহাসমুদ্র, সমুদ্র, নদী ইত্যাদিতে জীবাণুরা আবহাওয়ার চরম অবস্থাগুলি থেকে বহু দূরে থাকে। ছোট জলাশয়গুলির জীবাণুর উপর এদের প্রভাব অসীম। প্রবাহমান জলাশয়ের জীবাণুর উপরও এদের প্রভাব প্রবল। জলাশয়ে বিভিন্ন খাদ্যবস্তু ও বিভিন্ন ধরনের কণা বিভিন্ন পরিমাণে থাকে এবং এদের পরিমাণ উচ্চতর এলাকার জলের অপেক্ষা নিম্নাঞ্চলের জলে অধিক। যে সমস্ত জীবাণু প্রায় সমস্ত জলাশয়েই থাকে তাদের সংখ্যা খুবই সীমিত। যে সমস্ত জলাশয় অতি উচ্চসংখ্যায় জীবাণু ধারণ করতে পারে তাদের বলা হয় উচ্চসংখ্যক জীবাণু ধারণক্ষম বা ইউট্রফিক (eutrophic) এবং স্বল্পজীবাণু ধারণক্ষমদের অলিগোট্রফিক (oligotrophic) বলা হয়। জলাশয়ের খাদ্যবস্তুর পরিমাণ অত্যল্প (autochthonous) হ'লেই জলাশয় স্বল্পজীবাণু ধারণক্ষম হয়। মধ্যবর্তী অবস্থাযুক্ত জলাশয়কে বলা হয় মেসোট্রফিক (mesotrophic)।

## ৫.৮১ জলবাসী জীবাণুর প্রকৃতি ঃ

যে কোন জলাশয়কে জীবাণুবিজ্ঞানগত ভাবে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা (ক) জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বস্থ সর্বাধিক খাদ্যবস্তু সম্বলিত লিট্টোরাল

জোন (littoral zone), (খ) সালোক সংশ্লেষনযোগ্য যথেষ্ট আলোযুক্ত লিমনেটিক জোন (limnetic zone), (গ) লিমনেটিক জোনের মধ্যবর্তী স্বল্প আলোকযুক্ত প্রোফাউণ্ডাল জোন (profoundal zone)। (ঘ) জলাশয়ের তলদেশে কর্দমাক্ত বেনথিক জোন (benthic zone) রয়েছে। এই অঞ্চল বা জোনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক জীবাণু রয়েছে লিট্টোরাল ও বেনথিক জোন দুটিতে (চিত্র-৭৮)। লিম্নেটিক জোনেও থাকে যথেষ্ট।




চিত্র ৭৮ : জলাশয়ের বিভিন্ন অঞ্চল

(ক) জলবাসী স্বজীবি জীবাণু শৈবাল : জলাশয়ে জৈবপদার্থ উৎপাদনকারী প্রধান জীবাণু হচ্ছে শৈবাল। জলমধ্যে শুধুমাত্র আলোকিত অংশে এদের পাওয়া গেলেও মিষ্টি ও লবণাক্ত জলের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির জীবাণু বসবাস করে। জলের গভীরতা অনুযায়ী নিম্নস্তরে (benthic) এক প্রজাতির শৈবাল থাকে এবং জলভাগে অন্য আরেক প্রজাতি পাওয়া যায়। তৃতীয় আর একটি প্রজাতি জলের উদ্ভিদগাত্রে (epiphytic) বা প্রাণীগাত্রে (epizooic) বৃদ্ধি পায়।

জলজ জীবাণুর উপর কয়েকটি কারণ অত্যধিক প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে (ক) বিকিরণ প্রবাহ (radiation flux) অন্যতম। ইহা জলমধ্যে ৫৮ অক্ষাংশে গভীরে পৌছায় ও সালোক সংশ্লেষণে সহায়তা করে। (খ) উক্ত বিকিরণজনিত যে উত্তাপ সৃষ্টি হয় তার প্রভাব ও এই জলবাসী শৈবালের উপর পড়ে। আলোর এই প্রভাব জলের গভীরতা বৃদ্ধির সাথে গুণোত্তর হারে

কমে। শৈবালের প্রায় সমস্ত প্রজাতিই বিভিন্ন মরশুমে বিভিন্ন হারে জলভাগে সংখ্যাবৃদ্ধি করে।

(খ) জলবাসী পরজীবি জীবাণু:

জলাশয়ে পরজীবি জীবাণুর সংখ্যা জলের খাদ্যবস্তুর পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। এই জীবাণুগুলি জলজ উদ্ভিদের আশেপাশে বহু সংখ্যাতে থাকে। সমুদ্রজলের উপরিভাগে **সিউডোমোনাস, ভিব্রিও, ফ্লাভোব্যাক্টিরিয়াম, অ্যাক্রোমোব্যাকটর** প্রভৃতি থাকে। এছাড়া জলাশয়ের তীরে বহু জৈব পদার্থের আশেপাশে এই জীবাণু অসংখ্য থাকে।

## ৫.৯০ জীবাণু, পরিবেশ ও প্রভাব:

সমগ্র ভূত্বকে জৈবপদার্থ সৃষ্টির ক্ষমতা অঞ্চলভিত্তিতে পরিবর্তিত হয়। এর সাথে ঐসব অঞ্চলে জীবাণুর সংখ্যা, পরিমাণ ও ক্রিয়াবিক্রিয়া সাধারণভাবে সরল সম্পর্কিত। অঞ্চলভিত্তিক প্রতি একরে যে পরিমাণ জৈবপদার্থ উৎপন্ন হয় তা নিম্নরূপ। মরু, অনার্দ্র, আর্দ্র, নদীমোহনা, সমুদ্র উপকূল ও সমুদ্র অঞ্চলে যথাক্রমে 0·33, 0·5-1·5, 1·5-5·0, 5·0-10·0, 1·0-1·5 ও 0·5 টন জৈবপদার্থ উৎপন্ন হয়।

প্রকৃতিতে মানুষের প্রয়োজনে কৃষিকর্ম, শিল্প, প্রভৃতি বহু প্রকল্প ও কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়া চলছে। জীবাণুগোষ্ঠীর যে ভারসাম্য স্বাভাবিক ভাবে রয়েছে তা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রক্রিয়াতে পরিবর্তিত বা বিনষ্টও হচ্ছে। প্রকৃতিতে অন্য পরিবর্তনের প্রভাব যেমন জীবাণু জগতের উপর পড়ছে তেমনি জীবাণু জগতের পরিবর্তনগুলির প্রভাবও জীবজগতে বা মানুষের জীবনে ফিরে আসছে নানা ভাবে।

কৃষিকার্যে ব্যবহৃত জৈব বা সংশ্লেষিত দু'রকম সার, বিভিন্ন শিল্পজাত জঞ্জাল, শহরাঞ্চলের ময়লা প্রভৃতি জীবাণু জগতে তুমুল প্রভাব সৃষ্টি করছে। যার ফলে নূতন সমস্যাবলী দেখা দিচ্ছে। বহুবিধ প্রভাবের মধ্যে দু-একটির প্রকৃতি বোঝা গেছে। আরও বহু প্রভাব চিহ্নিতও করা যায়নি, বা তাদের কারণ নির্ণয় করা যায়নি।

(ক) অনেক ক্ষেত্রে শিল্প বা কৃষিজাত জঞ্জাল জলাশয়ের সম্পূর্ণ খাদ্যবস্তুর পরিমাণ দ্রুত বাড়িয়ে দিচ্ছে। যার ফলে ঐ জলাশয়ে জীবাণুর সংখ্যা অত্যন্ত

উচ্চহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অত্যধিক সংখ্যক জীবাণু সীমিত জলাশয়ে সৃষ্টি হওয়ার ফলে সেখানে অক্সিজেনের অভাব ঘটছে। অক্সিজেনের অভাব জলবাসী প্রাণী যেমন মাছ ইত্যাদির সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে বা তাদের লুপ্ত করছে। এটিই বর্তমানে ইউট্রফিকেশনের সমস্যা।

(খ) বিভিন্ন শিল্পের শীতলীকরণ স্তম্ভে (cooling tower) ও পুষ্করিণীতে শৈবালের অত্যধিক বৃদ্ধি ঘটে। বৃহদাকার জাহাজের তলদেশেও এই সমস্ত শৈবাল বা অন্য ছত্রাক বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া এই উষ্ণতাযুক্ত জল জলাশয়ে মৎস্যদের পক্ষেও ক্ষতিকারক।

(গ) সাধারণতঃ আবর্জনার উন্মুক্ত জারণ (sewage oxidation) করার জন্য পুষ্করিণীগুলিতে প্রথমে সবুজ শুঙ্গযুক্ত (flagellate) ও পরে বর্তুলাকার (coccoid) শৈবালের বৃদ্ধি ঘটে। ফলে যে অক্সিজেন ($O_2$) সৃষ্টি হয় তাতে আবর্জনার জারণ যথাযথ ব্যাক্টিরিয়া সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। তবে পরবর্তীকালে এই শৈবালের অপসারণ একটি সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। এই শৈবালে প্রোটিনের আধিক্যের জন্য অন্য খাদ্যবস্তুর সাথে মিশিয়ে পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত জলাশয়ে অত্যধিক পরিমাণে বিভিন্ন প্রকার লবণ সৃষ্টি হয় যার অপসারণ ও একটি সমস্যাবিশেষ।

(ঘ) পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাতে জলের গুণগত মান বজায় রাখা বিশেষতঃ জীবাণুমুক্ত রাখার সমস্যা চিন্তার ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে শৈবালের বৃদ্ধি অত্যধিক হ'লে ফল ক্ষতিকর হয়। জলে দুর্গন্ধ ও অবাঞ্ছনীয় রঙ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী স্তরে পরিস্রাবকের বালু স্তরটিও অকেজো হ'য়ে পড়ে। উন্মুক্ত আধারে সাধারণতঃ ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া ও শৈবাল দ্বারা তৈরী একটি আঠাল বস্তু পরিস্রাবক স্তরটির কার্য ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। পরে প্রোটোজোয়ারা এটি ভক্ষণের দ্বারা সমস্যারও সৃষ্টি করে।

# ছয়

# মৃত্তিকা-জীবাণু বিজ্ঞান
## (Soil Microbiology)

"...অসংখ্য ক্ষুদ্রতম জীবাণু কতনা উপায়ে বসবাস করছে
এখানে। খাচ্ছে, শ্বাস নিচ্ছে, বৃদ্ধি পাচ্ছে, সংখ্যা বাড়াচ্ছে
এবং টিকে থাকার যুদ্ধে মরছে।"
—এল. জি. কলোডনি

৬.০০ পৃথিবীর অসংসক্ত বহিস্তরভাগকে বলা হয় মৃত্তিকা। শিলার ক্ষয়ীভবনের ফলে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়া ও উদ্ভিদের প্রকৃতি অনুযায়ী পৃথিবীপৃষ্ঠকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা সম্ভব। মরু অঞ্চল, বনাঞ্চল প্রভৃতি অঞ্চলগুলির বিভিন্নতা সম্ভবত ঐসব অঞ্চলের বিশেষ আবহাওয়া ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকা কণার উৎপত্তিগত দিক থেকে মৃত্তিকা দু'টি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত। (১) খনিজ মৃত্তিকা (২) জৈববস্তু জনিত মৃত্তিকা। পৃথিবীর বেশীর ভাগ অঞ্চলে খনিজ মৃত্তিকাই বেশী দেখা যায়। তাই মৃত্তিকার জীবাণু পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশীর ভাগ গবেষণা ও আলোচনা ঐ মৃত্তিকা গোষ্ঠীতেই হয়েছে।

শিলার ক্ষয়ীভবনের পর যে মৃত্তিকা হয় তার যে সমস্ত অংশ থাকে প্রথমে তা আলোচনা করা হচ্ছে।

### ৬.১০ মৃত্তিকার বিভিন্ন অংশ :

সাধারণতঃ মৃত্তিকার পাঁচটি মূল অংশ যথা খনিজ অংশ (minerals), জৈব অংশ (organic matter), আর্দ্রতা, বায়বীয় অংশ ও জীবাণু রয়েছে। সাধারণতঃ খনিজ অংশ থাকে প্রায় 51% এবং জৈব অংশ 9%। আর্দ্রতা ও বায়বীয় অংশ থাকে 40% এবং জীবাণু 1% এরও কম। প্রথমোক্ত চারটি অংশের সমস্ত রকমের উপাংশগুলির প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে মৃত্তিকার জীবাণুসংক্রান্ত পরিস্থিতি। বিশেষতঃ মৃত্তিকার জীবাণুগুলির জৈব

প্রকৃতি, গোষ্ঠীগত বিস্তার, তুলনামূলক সংখ্যা ও কার্যকরী প্রাধান্য সবকিছুই নির্ভর করে পূর্বোক্ত বিষয়গুলির উপর।

আবহাওয়াজনিত অনিয়ত ক্ষয়ীভবনের (weathering) প্রক্রিয়া মাধ্যমে তৈরী মৃত্রিকাস্তর তিনটি উপস্তরের (horizons) দ্বারা গঠিত হয়। উপস্তরগুলি ক, খ ও গ (A, B and C) নামে চিহ্নিত।

(অ) মৃত্তিকার বহিস্তর বা ক-স্তর (A-horizon) :

এই স্তরের মধ্যে রয়েছে উপরিভাগের মৃত্তিকা (top-soil) যা সাধারণতঃ জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে কালো রঙ ধারণ করে। এই জৈব পদার্থের মধ্যে আদিম জৈব পদার্থ (native organic fraction) বা হিউমাস (humus) থাকে যা জীবাণুজনিত ক্ষয়ীভবনে বিনষ্ট হয় না।

(আ) অধমৃত্তিকাস্তর বা মৃত্তিকার খ-স্তর (B-horizon or subsoil) : মৃত্তিকার বহিস্তরের নিম্নবর্তী স্তরটিকেই বলা হয় অধ-মৃত্তিকাস্তর বা খ-স্তর। সাধারণতঃ খনিজ পদার্থে গঠিত এই স্তরের জৈব পদার্থ জীবাণুর ক্ষয়কার্যের প্রভাবে অজৈব পদার্থে পরিণত হয়।

(ই) সর্বনিম্নস্তর বা গ-স্তর (Bed rock or C-horizon) : প্রায় অক্ষয় বা অতি সামান্য ক্ষয় প্রাপ্ত যে ভিত্তি প্রস্তর স্বরূপ শিলাস্তর মৃত্তিকার খ-স্তরের নীচে থাকে তাকে সর্বনিম্নস্তর বলা হয়।

৬·১২ মৃত্তিকার বিভিন্ন অংশে যে খনিজ (mineral) বস্তু থাকে তাদের আকার অনুযায়ী কয়েকটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা সম্ভব। ক্লে কণাগুলি (clay) 0·002 মি.মি থেকে ছোট কণা। 0·002 থেকে 0·02 মি.মি মাপের কণাগুলিকে বলা হয় পলি (silt), 0·02 থেকে 0·20 মি.মি মাপের কণাগুলিকে বলা হয় মিহিবালি (fine sand), 0·20 হইতে 2·00 মি.মি. মাপের কণাগুলিকে বলা হয় মোটাবালি (coarse sand) এবং 2·00 মি.মি. এর চেয়ে বড় খনিজগুলিকে বলা হয় নুড়ি (gravel)। মৃত্তিকাতে এই খনিজ অংশ বা কণাগুলি যে সমপরিমাণে ও সমভাবে (homogeneous) মিশ্রিত তা নয়।

খনিজ কণাগুলির সাথে জৈব পদার্থের মিশ্রণে কতকগুলি মৃত্তিকা-দানা (soil crumbs) সৃষ্টি হয় যেগুলি মৃত্তিকার উর্বরতার ক্ষেত্রে অতি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান অংশ। মৃত্তিকার প্রয়োজনীয়, রন্ধ্রবহুল (porus) প্রকৃতি

মৃত্তিকাতে জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের জন্য ও জলনিষ্কাশনের জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

মৃত্তিকার আর্দ্রতার মূল উৎস হচ্ছে বৃষ্টিপাত। আদর্শ মাটিতে বৃষ্টিপাতের পর মৃত্তিকা-রন্ধ্রাবলীর (pore spaces) মাধ্যমে ও মাধ্যাকর্ষণের শক্তিতে সঞ্চিত জল মৃত্তিকার তলদেশে পৌঁছে যায়। শুধুমাত্র যে জলটুকু মৃত্তিকা মধ্যস্থ কৌশিক নালীতে (capillary space) আবদ্ধ থাকে সেইটুকুই মৃত্তিকাতে থেকে যায়। মৃত্তিকা মধ্যে বিভিন্ন দ্রবণের (solute) চলাচলে মাধ্যাকর্ষণ প্রভাব যুক্ত জল (gravitational water) ও কৌশিক নালী মধ্যস্থ জলের ভূমিকা অপরিসীম।

সর্বপরি মৃত্তিকার আবহাওয়া পৃথিবী পৃষ্ঠের আবহাওয়া থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির। মৃত্তিকার আবহাওয়াতে তুলনামূলক ভাবে কার্বনডাই অক্সাইড ($CO_2$) এর পরিমাণ অধিক এবং অক্সিজেন ($O_2$) এর পরিমাণ কম থাকে। মৃত্তিকা জলমগ্ন হলে উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলের সাথে মৃত্তিকার বায়বীয় অংশের যোগাযোগ ও আদান-প্রদান বাধাপ্রাপ্ত হয়। জলমগ্ন হওয়ার জন্য সৃষ্ট অবাত অবস্থাতে মৃত্তিকাস্তরে কার্বনডাই অক্সাইড ($CO_2$) ছাড়া মিথেন ($CH_4$), হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) ইত্যাদিও সঞ্চিত হয়।

## ৬·২০ মৃত্তিকাতে বসবাসকারী জীবাণু :

মৃত্তিকায় বসবাসকারি জীবাণুর সংখ্যা বহু। ইদানীং জানাগেছে মৃত্তিকার বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া মূলতঃ জীবাণু জনিত। এই সমস্ত বিক্রিয়ার অনেকগুলি ব্যাক্টিরিয়াজনিত এবং আরও কিছু ছত্রাক জনিত। মৌলিক তথ্য বা জ্ঞান লাভ ছাড়াও মৃত্তিকা ভিত্তিক কৃষিকর্মের প্রয়োজনে মৃত্তিকাতে জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছুটা জানাগেছে। মৃত্তিকার উর্বরতার উপর বিশ্বের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মৃত্তিকা মধ্যে বিভিন্ন খনিজের পরিবর্তন চক্র এবং তার সাথে আবহাওয়ার সম্পর্কও পরস্পর নির্ভরশীলতা সম্পর্কে একটা ধারণার প্রয়োজন রয়েছে। কৃষির নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার সংস্পর্শে আসছে। তাদের মৃত্তিকার জীবাণুর ও উৎপাদনশীলতার উপরে প্রভাবও কিছুটা বোঝা গেছে।

মৃত্তিকাতে বহু সংখ্যক জীব ও জীবাণু রয়েছে। বৃহৎ প্রাণীগুলির মধ্যে কেঁচো অন্যতম। এদের সংখ্যা প্রতি গ্রাম মৃত্তিকায় 0·001টি হলেও পরিমাণ প্রতি মিটার বর্গতে 80 গ্রাম মাত্র। তুলনামূলকভাবে জীবাণুর পরিমাণ ও সংখ্যা ( সারণী-২৮ ) অনেক বেশী।

**সারণী ২৮ : মৃত্তিকা ও জীবাণু**

| জীবাণু | পরিমাণ গ্রাম/প্রতি বর্গ মিটার | সংখ্যা প্রতি গ্রাম মাটিতে |
|---|---|---|
| ব্যাক্টিরিয়া | ১৬০ | $৯·৮ \times ১০^{৭}$ |
| অ্যাক্টিনোমাইসিটস | ১৬০ | $২·০ \times ১০^{৬}$ |
| ছত্রাক | ২০০ | $১·২ \times ১০^{৫}$ |
| শৈবাল | ৩২ | $২·৫ \times ১০^{৪}$ |
| প্রোটোজোয়া | ৩৮ | $৩·০ \times ১০^{৪}$ |
| কৃমি | ১২ | ১·৫ |

জীবাণুগুলির মধ্যে সংখ্যায় ব্যাক্টিরিয়া সর্বাধিক যদিও পরিমাণে ছত্রাকের তুলনায় অনেক কম। তবে ব্যাক্টিরিয়ার সামগ্রিক গোষ্ঠীগতভাবে ( অ্যাক্টি-নোমাইসিটস সহ ) পরিমাণ ও বেশী। জীবাণুজনিত জৈববস্তু (biomass) সম্পূর্ণ জৈববস্তুর অর্ধেকের বেশী নয়। মৃত্তিকার প্রাণীরা জীবাণুর মত মৃত্তিকার রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত বা ত্বরান্বিত করতে পারে না। কিন্তু প্রাণীদের চলন ক্ষমতা ও খাদ্যনালীর জীবাণুবৈশিষ্ট্য মৃত্তিকার প্রকৃতির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

## ৬·২১ মৃত্তিকার ব্যাক্টিরিয়া :

মৃত্তিকাতে বিভিন্ন আকৃতির ও জৈবনিক প্রকৃতিযুক্ত ব্যাক্টিরিয়া রয়েছে। বেশীরভাগ হলেও সমস্ত ব্যাক্টিরিয়া মৃত্তিকাতে বসবাসকারি নয়। এই সমস্ত ব্যাক্টিরিয়া তাদের জীবনচক্রের কিছু অংশ মৃত্তিকাতে কাটায় মাত্র। মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত ব্যাক্টিরিয়াগুলিকে বিভিন্ন বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে বিভিন্নভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ করা যায়। যেমন অবাত ও সবাত, স্বভোজী বা

স্বাবলম্বী ও পরভোজী বা অবলম্বী, মৃতজীবি, মিথোজীবি ও পরজীবি ইত্যাদি।

(অ) মৃত্তিকাতে যে সমস্ত সবাত ব্যাক্টিরিয়া অত্যন্ত উচ্চহারে বর্তমান তাদের মধ্যে **সিউডোমোনাস, আক্রোমোব্যাক্টর ও ব্যাসিলাস** গণের বিভিন্ন প্রজাতি অন্যতম। অবাত ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে **ক্লস্ট্রিডিয়ামের** কয়েকটি প্রজাতি অন্যতম।

(ক) মৃত্তিকাতে ব্যাক্টিরিয়ার যে গোষ্ঠীকে সর্বাধিক পাওয়া যায় তারা মৃত্তিকার প্রাথমিক, স্বীয় (indigenous) জীবাণুগোষ্ঠী। তাদের বলা হয় স্বনির্ভর বা অটোকথোনাস (autochthonous) জীবাণু। এই গোষ্ঠীর অসংখ্য ব্যাক্টিরিয়া তাদের আকৃতি পরিবর্তন করতে পারে, যেমন **আর্থ্রোব্যাক্টর (Arthrobactor)** গণ। **আগ্রোব্যাক্টিরিয়াম (Agrobacterium), মাই-ক্রোকক্কাস (Micrococcus)** প্রভৃতি গণও এই গোষ্ঠীভুক্ত। মৃত্তিকাতে স্থায়ী জীবাণুর সংখ্যা মোটামুটি স্থির থাকে। মাটির কোন প্রকার সংশোধন (amendment) করেও এদের সংখ্যা পরিবর্তন করা যায় না।

(খ) আরও বহু ব্যাক্টিরিয়া মৃত্তিকাতে রয়েছে যাদের সংখ্যা মৃত্তিকাতে সরবরাহকৃত খাদ্যবস্তু (substrate) র উপর নির্ভরশীল। খাদ্যবস্তু সরবরাহের পরিবর্তনের সাথে যে গোষ্ঠীর জীবাণুর সংখ্যা পরিবর্তন বা সংখ্যাবৃদ্ধি হয় তাদের খাদ্যবস্তু ভিত্তিক জীবাণুগোষ্ঠী বা জাইমোজেনাস (Zymogenous or fermentative) জীবাণুগোষ্ঠী বলা হয়। খাদ্যবস্তু ভিত্তিক এই প্রকার প্রতি-বেদনকে বলা হয় খাদ্যভিত্তিক প্রতিবেদন (Zymogenous response)। এজাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে **নাইট্রোসোমোনাস (Nitrosomonas), নাইট্রোব্যাকটর (Nitrobacter), থায়োব্যাসিলাস (Thiobacillus)** ইত্যাদি যাদের পছন্দমত খাদ্যবস্তু হচ্ছে যথাক্রমে অ্যামোনিয়াম ($NH_4^+$), নাইট্রাইট ($NO_2$), গন্ধক প্রভৃতি। বহু অ্যাক্টিনোমাইসিটসও এই গোষ্ঠীর জীবাণু।

(আ) মৃত্তিকায় ব্যাক্টিরিয়ার মোট সংখ্যা প্রাপ্ত খাদ্যবস্তু ছাড়াও মৃত্তিকার সামগ্রিক আবহাওয়া যথা উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও বায়বীয় পদার্থের পরিমাণের ও বিস্তারের উপর নির্ভরশীল। মৃত্তিকা আবহাওয়ার এই বিশেষত্ব গুলির উপর জীবাণুর সময়গত (temporal) ও স্থানিক (spatial) ব্যাপকতা বা

বিস্তার নির্ভরশীল। স্বভাবতই জীবাণুর সংখ্যার সময়গত ও স্থানিক পরিবর্তনশীলতা বিভিন্ন ঋতুর সাথে সম্পর্কিত। বিভিন্ন কারণ যথা উষ্ণতা ইত্যাদির উপরও নির্ভরশীল। আর্দ্রতার আধিক্য ( জলমগ্নতা ) বা স্বল্পতা উভয়ই মৃত্তিকার জীবাণু প্রকৃতি ও সংখ্যা নির্ণয়ে অত্যন্ত প্রভাবশালী। মৃত্তিকায় সাধারণত 4-10 পর্যন্ত অম্ল-ক্ষারত্ব ব্যাক্টিরিয়া সহ্য করতে সমর্থ। যদিও মৃত্তিকাতে ক্ষার অপেক্ষা প্রশমিত (neutral) অবস্থাই এদের সর্বাপেক্ষা পছন্দ।

(ই) সাধারণতঃ মৃত্তিকার গভীরতা বৃদ্ধির সাথে জৈব পদার্থের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়। যদিও সর্বত্রই সর্বাধিক জৈব পদার্থ যুক্ত মৃত্তিকাতেই যে সর্বাধিক জীবাণু পাওয়া যায় তা নয়। মৃত্তিকায় বৃদ্ধিশীল উদ্ভিদমূলের উপস্থিতি ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যাবৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ। মূল নিঃসৃত বহু খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি এই অঞ্চলে ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি করে। এছাড়া জৈব পদার্থকণার চতুষ্পার্শ্বেও ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা থাকে যথেষ্ট বেশী। এ সমস্ত প্রভাব এলাকার জীবাণু ব্যতীত অন্যান্য স্থানে জীবাণুগুলি মৃত্তিকাতে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলোনী হিসাবে অবস্থান করে। এই প্রভাবের উর্দ্ধে মৃত্তিকা জীবাণুগুলির প্রায় 60% ক্ষেত্রেই কলোনীতে মাত্র 2–6টি কোষ থাকে, 20% ক্ষেত্রে থাকে 7টি কোষ এবং বাকী ক্ষেত্রে কোষগুলি এককভাবে অবস্থান করে। কলোনীগুলি প্রায়ই মৃত্তিকার খনিজ কণাগুলির উপরে অবস্থিত কলয়েড (colloid) জাতীয় বস্তুর আস্তরণের সাথে যুক্ত। একটি মৃত্তিকাদানায় (crumb) বহির্ভাগেই সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যাক্টিরিয়া অবস্থান করে, কেন্দ্রে থাকে সর্বনিম্ন।

## ৬·২২ মৃত্তিকার ছত্রাক ঃ

মৃত্তিকায় মূলতঃ যে সমস্ত ছত্রাক অত্যন্ত উচ্চ সংখ্যায় বিদ্যমান সেগুলি হচ্ছে **অ্যাসপারজিলাস, মিউকর, পেনিসিলিয়াম** ও **ট্রাইকোডার্মা** গণগুলির প্রজাতিবর্গ। অন্য আরও কিছু ছত্রাকও মৃত্তিকাতে যথেষ্ট দেখা যায়। সেগুলি প্রধানত **রাইজোপাস, জাইগোরিঙ্কাস (Zygorynchus), ফুসেরিয়াম, সেফালোস্পোরিয়াম (Cephalosporium). ক্লাডোস্পোরিয়াম (Cladosporium)** ও **ভার্টিসিলিয়াম (Verticillium)** গণের প্রজাতি বর্গ। এই ছত্রাকগুলি মৃত্তিকা থেকে উচ্চ সংখ্যায় পাওয়া যায়। এটা এদের

প্রসারিত (inflated) সংখ্যা ছাড়া কিছুই নয়। এদের অত্যন্ত দ্রুত স্পোর উৎপাদন ক্ষমতাই এর কারণ। এছাড়া বেসিডিওমাইসিট্‌ শ্রেণীর এবং ডেমাসিয়েসি (Dematiaceae) পরিবারের ছত্রাক মৃত্তিকাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকলেও তাদের অস্তিত্ব শুধুমাত্র অনুবীক্ষণ যন্ত্রেই নির্ণয় সম্ভব।

কর্ষিত জমির মৃত্তিকা এবং অম্ল মৃত্তিকাতে ছত্রাক জনিত জৈববস্তু সবাধিক পরিমাণে থাকে। জাইমোজেনাস ব্যাক্টিরিয়ার মতই, মৃত্তিকায় অধিকতর জৈবপদার্থ সরবরাহের ফলে এই সমস্ত ছত্রাকের সংখ্যা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, এবং এদেরও জাইমোজেনাস প্রকৃতির বলে ধরা হয়। তবে ছত্রাকের স্পোরগুলিকে অবশ্য অটোকথোনাস বলা যায় কারণ এদের সংখ্যা খাদ্যবস্তু নির্ভর নহে। ছত্রাকের ক্রিয়াকলাপও আর্দ্রতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অবশ্য বহু ছত্রাকের শুষ্কতা সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে। ঠিক এই কারণেই শুষ্ক অঞ্চলের (arid) মাটিতে ব্যাক্টিরিয়ার তুলনায় ছত্রাকের সংখ্যা অধিক। বেশীর ভাগ ছত্রাকই সবাত। ফলে মৃত্তিকার জলমগ্ন অবস্থাতে এরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়, এবং সম্পৃক্ত (saturated) মাটিতে এদের সংখ্যা সীমিত।

মৃত্তিকাতে কিছু ছত্রাক অন্য জীবাণুর উপর লুণ্ঠনজীবি (predator) হিসাবে বসবাস করে। লুণ্ঠনজীবিতার মূল শিকার কৃমি (nematode) হলেও অন্য কিছু অ্যামিবা ইত্যাদিও এর মধ্যে আছে। মৃত্তিকার সম্পূর্ণ জীবাণু গোষ্ঠীর তুলনাতে ছত্রাকের সংখ্যা সীমিত। এছাড়া মৃত্তিকাতে বেশ কিছু ছত্রাক থাকে যারা উদ্ভিদ রোগ সৃষ্টিকারী।

ছত্রাক সাধারণত মৃত্তিকা কণার সাথে সংশ্লিষ্ট অবস্থায়ই থাকে। এই সংস্পর্শের পরোক্ষ কিন্তু অতি প্রয়োজনীয় অবদান হচ্ছে ক্লেকণার গ্রথনের (texture) উন্নতিকরণ। বৃহদাকার জৈবকণার সাথেও ছত্রাক সংযুক্ত থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মৃত্তিকাজীবি এই সমস্ত ছত্রাক তাদের সূত্রাকৃতি শরীর আবর্তন করে মূলোপম ছত্রাক অঙ্গ ( rhiromorph ) সৃষ্টি করে যা বিশেষতঃ বনাঞ্চলের মৃত্তিকার উপরিভাগে অবস্থান করে।

## ৬.২৩ মৃত্তিকার শৈবাল :

মৃত্তিকাতে যথেষ্ট পরিমাণে জীবাণু-শৈবাল রয়েছে। ইজরায়েলের নেগেভ মরুভূমির মত অত্যধিক অনার্দ্র অঞ্চলেও মৃত্তিকার উপরিভাগে শৈবালকে

পাওয়া যায়। মরুঅঞ্চলে উপরিভাগের বালুকা যখন যথেষ্ট স্বচ্ছ হয় তখন উপরিস্তরের বালির নীচে সামান্য আর্দ্র স্তরে শৈবাল বসবাসে সমর্থ। অন্যদিকে আন্টার্টিকার অত্যধিক শীতল মরুভূমিতেও শৈবাল দেখা যায়।

মৃত্তিকার শৈবাল গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানতঃ সায়ানোফাইটা (Cyanophyta) দলভুক্ত **সিজোথ্রিক্স** (**Schizothrix**) ও **মাইক্রোকোলিয়াস** (**Micro-coleus**) ও গোলাকৃতি ক্লোরোফাইটা (Chlorophyta)-গুলি অন্যতম। সামগ্রিকভাবে মৃত্তিকার শৈবালগোষ্ঠী বহু বিসদৃশ অবস্থাতে বসবাস করতে সক্ষম। মৃত্তিকাতে জৈববস্তুর পরিমাণ যথেষ্ট বেশী হওয়াতে খালি চোখেও এই সব জীবাণু দেখা যায়।

মৃত্তিকার যথেষ্ট গভীর স্তর পর্যন্ত শৈবাল বিদ্যমান থাকলেও, শুধুমাত্র উপরিভাগেই এরা সক্রিয় থাকে। ব্যাক্টিরিয়ার সাথে অস্তিত্ব বজায় রাখার (survival) যুদ্ধে এরা সমকক্ষ নয়। নিম্নমুখী জলধারার সাথে এরা মৃত্তিকার গভীরতম স্তর পর্যন্ত অনুস্রাবিত হ'য়ে পৌছায় এবং স্পোর হিসাবে জীবিত থাকে। অন্য বহু শৈবাল স্পোর সৃষ্টি ছাড়াও বহু দিন অনার্দ্র মৃত্তিকাতে জীবিত থাকে। মৃত্তিকাতে বসবাসকারি শৈবালের মধ্যে শুঙ্গল (flagellate), বর্তুলাকার (coccoid) ও সূত্রাকৃতি (filamentous) প্রজাতিগুলি অন্যতম। এরমধ্যে প্রশমিত থেকে ক্ষার মাটিতে সায়ানোফাইসি পরিবারভুক্ত **নসটক**, **আনাবিনা**, **সিলিণ্ড্রস্পারমাম**, শৈবাল, অম্ল মৃত্তিকাতে ক্লোরোফাইসি পরিবারের **ক্লোরেলা** ও **ক্লোরোকক্কাম** এবং অন্য আরও কিছু শৈবাল যেমন ডায়াটম, **ক্লামাইডোমোনাস** বা **হর্মিডিয়াম** অন্যতম।

বহু সায়ানোফাইটা (Cyanophyta) গোষ্ঠীর শৈবাল আবহাওয়া থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে। এই সমস্ত ছত্রাক স্বাবলম্বী (autotroph) হলেও কিছু অবলম্বী (heterotroph) হিসাবেও বৃদ্ধি পেতে পারে। ছত্রাক বহু খাদ্যবস্তু ব্যবহার করলেও মৃত্তিকাতে বহু নতুন জৈব পদার্থ দানও করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এদের অ্যান্টিবায়োসিস ক্রিয়াও জানা গেছে।

## ৬·২৪ মৃত্তিকার অন্যান্য জীবাণু :

মৃত্তিকাতে বসবাসকারি অন্য জীবাণুর মধ্যে অসংখ্য প্রোটোজোয়া ও কৃমি রয়েছে। প্রোটোজোয়াগুলি সাধারণত মৃত্তিকাকণার গায়ে জমা আর্দ্রতাতে

বসবাস করে। কৃমিগুলি মৃত্তিকার উপরিস্থলে উদ্ভিদের মূলের কাছাকাছি থাকে।

কিছু বৃহৎ প্রাণী যথা কেঁচো ইত্যাদি এক স্তর থেকে অন্য স্তরে চলাচল করে। ফলে তারা মৃত্তিকার আবহাওয়াতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

অত্যধিক আর্দ্র ও জলমগ্ন মৃত্তিকাতে অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক প্রাণী ও জীবাণু থাকতে পারে। মৃত্তিকার কর্ষণের পরও মৃত্তিকাতে প্রাণীদের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পায়।

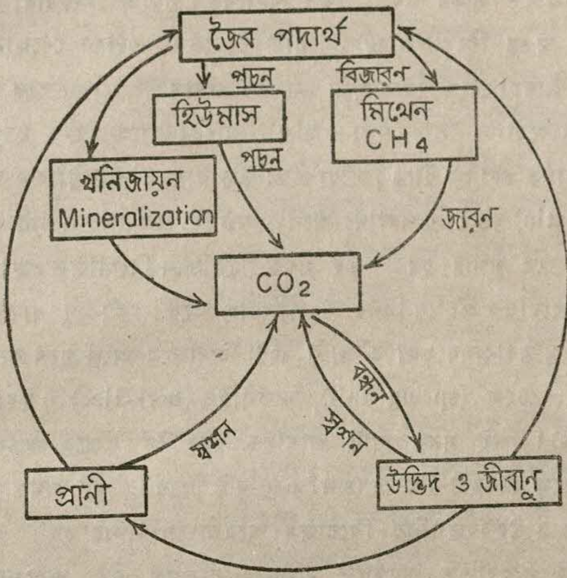
## ৬·৩০ মৃত্তিকাতে বিভিন্ন পরিবর্তনশীল বিক্রিয়া চক্র :

জীবদেহের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি অজৈব অবস্থা থেকে জৈব অবস্থাতে এবং জৈব অবস্থা থেকে অজৈব অবস্থাতে বিভিন্ন বিক্রিয়া মাধ্যমে প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হয়। এগুলিই উক্ত বস্তুর বিক্রিয়াচক্র। বর্তমানে মৃত্তিকার অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়া মূলতঃ জীবাণুজনিত বলে জানা গেছে। বহু মৌলিক পদার্থের জীবাণুজনিত পরিবর্তনের পরম্পরা শ্রেণীবদ্ধভাবে চক্ররূপ পরিগ্রহ করে। এই বিক্রিয়াচক্রগুলি কৃষির পক্ষে প্রয়োজনীয়। কারণ মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদের খাদ্য আহরণের সাফল্য এগুলির উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে কৃষি বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে এই বিক্রিয়াচক্রগুলিকে প্রয়োজনীয়-ভাবে প্রভাবিত করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে মৃত্তিকার পূর্ণ সাহচর্য নেওয়া হচ্ছে।

## ৬·৩১ কার্বন বিক্রিয়া চক্র :

এই পরিবর্তনচক্র মূলতঃ অবলম্বী জীবাণুদের দ্বারা কার্যকরী হয়। এই বিক্রিয়াচক্রে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আবদ্ধ হয় (fixed) ও বিপরীত বিক্রিয়া দ্বারা বিমুক্ত (released) হয়। মৃত্তিকায় উৎপন্ন ৭০ শতাংশ গ্যাসই জীবাণু দ্বারা উৎপাদিত হয়। পৃথিবীপৃষ্টের উদ্ভিদ অত্যন্ত উচ্চহারে বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড ($CO_2$) গ্রহণ ক'রে সালোক সংশ্লেষ করে। অন্যদিকে মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের বিয়োজন হবার ফলে কার্বনডাই-অক্সাইড ($CO_2$) বিমুক্ত হয়ে বাতাসে ফিরে আসে। জীবজগতে এই কার্বন বিক্রিয়াগুলি যে চক্রাকারে আবর্তিত হয় তার

চিত্ররূপ নীচে দেওয়া হল ( **চিত্র-৭৯** )। কার্বন বিক্রিয়া চক্রের বিভিন্ন প্রধান বিক্রিয়াগুলির আলাদা আলোচনা করা হচ্ছে।




চিত্র ৭৯ : মৃত্তিকাতে কার্বন বিক্রিয়াচক্র

(ক) জৈব পদার্থের বিয়োজন :

উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহ ও তাদের দেহজাত বস্তুগুলিই মৃত্তিকার জৈব পদার্থের মূল উৎস। এইসব বস্তু মারফৎ কার্বন যুক্ত বৃহৎ অণুগুলি ও স্বল্পকিছু ক্ষুদ্র অণু মৃত্তিকাতে উপস্থিত হয়। উদ্ভিদের যেসব বৃহৎ অণু এভাবে মৃত্তিকাতে যুক্ত হয় তার মধ্যে হেমিসেলুলোস (hemicellulose), সেলুলোস ও লিগনিন (lignin) বা তাদের মিলিত অবস্থা রয়েছে। এছাড়া স্বল্প পরিমানে চর্বি, মোম (waxes) ও তৈলজাতীয় পদার্থ, প্রোটিন ও নিউক্লিক অম্ল মাটিতে যুক্ত হয়। প্রাণীদেহ থেকে একই ধরনের কিছু বৃহদাণু যেমন কেরাটিন (keratin), মায়োসিন (myosin), ফিব্রিনোজেন (fibrinogen) ও অন্যান্য প্রোটিন, চর্বি ও মৃত্তিকাতে সংযুক্ত হয়। অমেরুদণ্ডী প্রাণী, ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতি জীবাণু দেহ থেকে মাটিতে আসে কাইটিন, মিউরিন (murein) ইত্যাদি।

মৃত্তিকার উপরিস্তরে এই সমস্ত জৈব অবশিষ্ট (residue)-গুলি বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয়। সমস্ত জীবাণু সমস্তরকম জৈব পদার্থকে বিয়োজন করতে সক্ষম নয়। জৈব পদার্থের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বিয়োজক জীবাণুগোষ্ঠী রয়েছে। এছাড়া যেকোন পরিস্থিতিতে আবহাওয়াও বিয়োজনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। জৈব পদার্থের বিয়োজন সাধারণতঃ আর্দ্র আবহাওয়াতে দ্রুত হয়। শুষ্ক আবহাওয়াতে এটা হয় ধীরে। সাধারণতঃ উচ্চ কার্বন : নাইট্রোজেন অনুপাত (C : N ratio) যুক্ত জৈব পদার্থের অপেক্ষা স্বল্প সি. এন. অনুপাতযুক্ত পদার্থের বিয়োজন দ্রুত সম্পন্ন হয়। এই সমস্ত বিয়োজনে বিয়োজিত বস্তুর আধান মৃত্তিকাই বিয়োজক জীবাণু নির্ণয় ও সরবরাহ করে। জীবাণু ব্যতীত অন্য যে সমস্ত মৃত্তিকা-বসবাসকারি প্রাণী এই বিয়োজনে অংশ গ্রহণ করে তারা হচ্ছে স্প্রিং টেইল (spring tail), বার্কলাইস (bark-lice) ও ইয়ার উইগ (ear-wigs)। এই সমস্ত প্রাণী প্রাথমিক স্তরে জৈব বস্তুকে খণ্ড-খণ্ড করে জীবাণুর পক্ষে কার্যকরী বহিস্তর (surface) বৃদ্ধি করে। এই সমস্ত প্রাণীর পৌষ্টিক তন্ত্রে জৈববস্তুগুলির বিয়োজন অনেকাংশে সম্পন্ন হয়। অতঃপর জৈব বস্তুটি পরিবর্তিত অবস্থাতে মৃত্তিকার সংস্পর্শে এলে অসংখ্য জীবাণু একটি খাদ্য প্রতিবেদনশীল পদ্ধতিতে (zymogenous) বিয়োজনে অংশ গ্রহণ করে। এতে সংশ্লিষ্ট জীবাণুর সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত বিয়োজন প্রথমে জীবাণু-কোষ নিঃসৃত উৎসেচকের সাহায্যে ঘটে এবং এই স্তরে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া উৎসেচক, জীবাণু ও সামগ্রিকভাবে বিক্রিয়াটির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বিয়োজনের গতি ঠিক হয় অনেকটাই আবহাওয়ার দ্বারা।

জৈবপদার্থের এক বিরাট অংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ($CO_2$) পরিবর্তিত হয়; কিছু জীবাণুর কোষবস্তুতে ও বাকী অংশ হিউমাসে (humus) পরিণত হয়। হিউমাস বলতে একটি কালচে রঙের অনিয়তাকার (amorphus) জৈব পদার্থকে বোঝায় যা মৃত্তিকার উর্বরতার জন্য অতি প্রয়োজনীয়। হিউমাস সৃষ্টি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য না হলেও এর সৃষ্টিতে মৃত্তিকার প্রাণীকুলের (fauna) উপস্থিতি যে এই কার্যে অতি প্রয়োজনীয় তা বোঝা

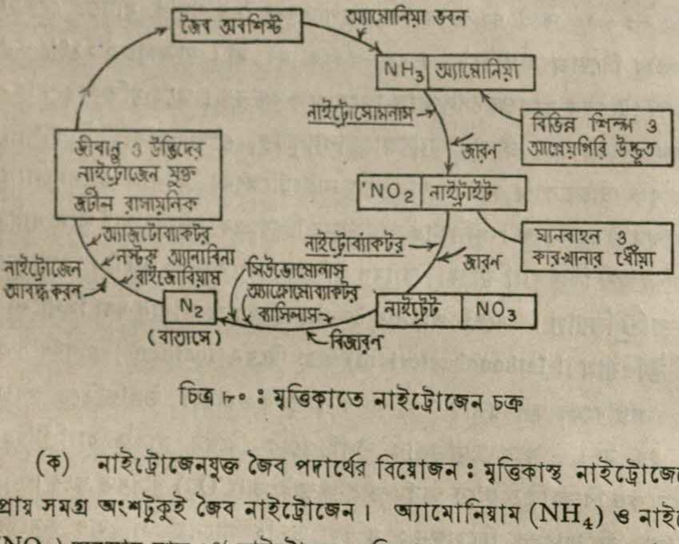
গেছে। প্রাণীবিহীন মৃত্তিকাতে হিউমাসের অনুপস্থিতি এ ব্যাপারে অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়।

এর রাসায়নিক প্রকৃতি সম্ভবতঃ পলিফেনল (polyphenol) জাতীয়, অত্যন্ত জটিল রাসায়নিক যাতে অ্যামিনোশর্করা ও অ্যামিনো অম্ল রয়েছে। এর রাসায়নিক প্রকৃতি সর্বক্ষেত্রে একরকম নয়। এর প্রকৃতি বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার হয়। জৈব পদার্থের সেলুলোস মূলতঃ ছত্রাকদ্বারা বিয়োজিত হয়। মৃত্তিকা চাষ করা হলে এ জাতীয় কিছু জীবাণু যেমন **সাইটোফাগা (Cytophaga)** বা **স্পোরোসাইটোফাগা (Sporocytophaga)**-র সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সেলুলোসের বিয়োজন মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেনের পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। জীবাণুর শরীরের C: N. অনুপাত হচ্ছে ১০ : ১। তাই এর চেয়ে কম অনুপাতযুক্ত জৈব পদার্থ মাটিতে দেওয়া হলে তার বিয়োজনে নাইট্রোজেনের অভাব হয় না। মৃত্তিকাতে ১২% এর কম নাইট্রোজেন থাকলে সেলুলোস বিয়োজন বন্ধ হয়। তবে মৃত্তিকার নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী জীবাণু **অ্যাজোটোব্যাক্টর, স্পোরোসাইটোফাগার** সাথে যুক্ত ভাবে কাজ করে। যার ফলে নাইট্রোজেনের জোগান ও সেলুলোস বিয়োজন উভয়ই চলে। মৃত্তিকায় কাইটিনের বিয়োজন ঘটায় অ্যাক্টিনোমাইসিট্স ও অন্য কিছু ব্যাক্টিরিয়া। জলমগ্ন জমিতে সেলুলোস ও কাইটিন বিয়োজন করে **ক্লস্ট্রিডিয়াম**। যথেষ্ট পরিমাণ জৈবপদার্থ অবাত জীবাণু যথা **মিথানোব্যাক্টিরিয়াম (Methanobacterium)** দ্বারা মিথেন (methane)-এ পর্যবসিত হয়। স্বল্পদিনের জলমগ্নতায় এবং অপর্যাপ্ত জৈব পদার্থের উপস্থিতিতে অবশ্য এটা হয় না। কারণ মৃত্তিকার উপরিস্তরের মিথেন জারক ব্যাক্টিরিয়া মিথেনকেও বিয়োজিত ক'রে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে ($CO_2$) পরিণত করে।

(খ) হিউমাসের বিয়োজন: মৃত্তিকাতে হিউমাসের পরিমাণ সময়ের সাথে কিছুটা পরিবর্তিত হয়। বিশেষ বিয়োজন প্রক্রিয়াতেই এটি সম্ভব হয়। কিছু মৃত্তিকা-পরিচর্যা ব্যবস্থা দ্বারা হিউমাস বিয়োজনের পরিমাণ অনেকটা কমানো যায়। হিউমাস মোটামুটি সাধারণ বিয়োজন-সহনশীল। মৃত্তিকায় জৈব পদার্থের সরবরাহ অধিক হ'লে হিউমাসের বিয়োজন বাড়ে, সম্ভবতঃ জাইমোজেনাস জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে। অবশ্য হিউমাসের যথাযথ বিয়োজন অটোকথনাস জীবাণুর দ্বারাই সম্ভব।

## ৬·৩২ নাইট্রোজেন চক্র :

নাইট্রোজেনও বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পর্যবসিত হয়। এই পরিবর্তনের উপর কৃষি উৎপাদন বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। যেসমস্ত জীবাণু নাইট্রোজেনচক্রের বিক্রিয়াগুলি পরিচালিত করে তারা স্বাবলম্বী। জীবাণুর শরীরে প্রায় ১০-১৫% নাইট্রোজেন থাকে। জৈব বস্তুর নাইট্রোজেন অংশের অ্যামোনিয়া করণ, নাইট্রিকরণ, ডিনাইট্রিকরণ, গ্যাস হিসাবে নাইট্রোজেনের বিমুক্তি, বায়ু থেকে নাইট্রোজেনের আবদ্ধকরণ ও জৈববস্তুতে পরিবর্তন—সবটাই সামগ্রিকভাবে এ চক্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। চক্রটি চিত্রে উপস্থাপিত হল ( **চিত্র-৮০** )




চিত্র ৮০ : মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেন চক্র

(ক) নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব পদার্থের বিয়োজন : মৃত্তিকাস্থ নাইট্রোজেনের প্রায় সমগ্র অংশটুকুই জৈব নাইট্রোজেন। অ্যামোনিয়াম ($NH_4$) ও নাইট্রেট ($NO_3$) অবস্থায় মাত্র ২% নাইট্রোজেন মৃত্তিকাতে থাকে। যে সমস্ত নাইট্রোজেনযুক্ত জৈব পদার্থ মৃত্তিকায় রয়েছে বলে জানা গেছে তাদের ২০-৫০% অ্যামিনো অম্ল, ৫-১০% অ্যামিনো শর্করা এবং ১% পুরাইন বা পিরিমিডিন।

ক্লেকণার সাথে আবদ্ধ অ্যামোনিয়ামের ($NH_4$) পরিমাণ ও নির্ণয়যোগ্য। বাকী অনেক নাইট্রোজেন মৃত্তিকাতে ঠিক কি ভাবে রয়েছে তা সঠিক জানা নেই।

জৈব উৎস বস্তুগুলিতে নাইট্রোজেনযুক্ত বৃহদাণুগুলি মৃত্তিকাতে ক্ষুদ্র অণুতে পর্যবসিত হয়েই যুক্ত হয়। প্রোটিনজাতীয় পদার্থ মৃত্তিকাতে **ব্যাসিলাস সিউডোমোনাস** ইত্যাদি জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয়। ক্ষার মৃত্তিকায় এই বিয়োজন করে **আর্থ্রোব্যাক্টর** (**Arthrobacter**) আর অম্লমাটিতে ছত্রাক। বিয়োজন উদ্ভূত অ্যামিনো অম্লমৃত্তিকার প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য অ্যামিনো অম্লগুলি ডিঅ্যামিনেটেড হ'য়ে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি হয়। সাধারণত গ্লুটামিক অম্ল বিয়োজিত হয় না। থ্রিওনাইন, মেথিও-নাইন ও লাইসিন প্রভৃতি ধীরগতিতে বিয়োজিত হয়। অ্যামিনো পলি-স্যাকারাইডগুলি খুব অল্পসংখ্যক অবাত জীবাণু যেমন **ক্লস্ট্রিডিয়াম** দ্বারা বিয়োজিত হয়। অবশ্য কৃষিজমিতে এদের পরিমাণ খুবই সামান্য। পদ্ধতিগত ভাবে প্রথমে হাইড্রোলাইজড হ'য়ে অ্যামিনোশর্করা সৃষ্টি হওয়া এবং পরে ডিঅ্যামিনেটেড হওয়ার মাধ্যমে বিয়োজন সম্পন্ন হয়। নিউক্লিক অম্লগুলির বিয়োজন আরও জটিল। বিভিন্ন ছত্রাক যথা **অ্যাসপারজিলাস, পেনি-সিলিয়াম, ক্লস্ট্রিডিয়াম, ব্যাসিলাস** প্রভৃতি জীবাণুদ্বারা প্রথমে নিউক্লিক-অম্লগুলি নিউক্লিওটাইডে পর্যবসিত হয়। পরে নিউক্লিওটাইডগুলি ডিফসফোরিলেটেড (dephosphorylated) হ'য়ে জৈবক্ষার ও শর্করাতে পরিণত হয়। স্বভাবতঃই এক্ষেত্রে প্রধান উৎপাদিতবস্তুটি হচ্ছে অ্যামোনিয়া। যদি জৈব পদার্থের CN-অনুপাত ১২ : ১ এর অধিক হয় তবে প্রচুর অ্যামোনিয়া ঐ জীবাণুরাই ব্যবহার করতে বাধ্য হবে। অনুপাত ১২ : ১ এর কম হ'লে $NH_3$ নাইট্রিফাইং জীবাণুদ্বারা জারিত হবে এবং অন্য জীবাণুদ্বারা ব্যবহৃত হবে।

(খ) অ্যামোনিয়ামএর জারণ : (Nitrification)

দুটি স্বাবলম্বী ও স্ববাত ব্যাক্টিরিয়া **নাইট্রোব্যাক্টর** (**Nitrobacter** ও **নাইট্রোসোমোনাস** (**Nitrosomonas**) মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের এই অবস্থা-পরিবর্তন ঘটায়। ব্যাক্টিরিয়া দুটি ক্ষুদ্র, দণ্ডাকৃতি গ্রামঋণাত্মক এবং মেরুজ শুঙ্গযুক্ত সচল প্রকৃতির। যে বিক্রিয়া মাধ্যমে পরিবর্তনটি সাধিত হয় তা নিম্নরূপ।

১। প্রথম স্তরে $NH_4$ থেকে $NO_2$ সৃষ্টি হয় **নাইট্রোসোমোনাস**-এর সাহায্যে। $2NH_4^+ + 3O_2 \rightarrow 2NO_2^- + 4H^+ + 2H_2O$

২। দ্বিতীয় স্তরে $NO_2$ হইতে $NO_3$ সৃষ্টি হয় **নাইট্রোব্যাক্টর**-এর সাহায্যে $2NO_2^- + O_2^- \rightarrow 2NO_3^-$

বিক্রিয়াগুলি বহুল পরিমাণে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিকভাবে বিক্রিয়াগুলি শুধু স্বল্পক্ষার বা প্রশমিত মাটিতে সম্ভব। বিক্রিয়াগুলির উপর মৃত্তিকার অম্ল-ক্ষারত্বের প্রভাব যথেষ্ট। মৃত্তিকার অম্লত্ব 6·0-এর কম হলে বেশীরভাগ নাইট্রোজেন $NH_4^+$ অবস্থাতেই থাকে। অত্যধিক ক্ষার অবস্থাতে বেশী থাকে $NO_2^-$ আয়ন। অত্যধিক ক্ষরা বা উষ্ণতায় **নাইট্রো-ব্যাক্টর**-এর অক্ষমতার জন্য মৃত্তিকাতে $NO_2^-$ এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকাতে শর্করাজাতীয় বস্তু পরিমান বৃদ্ধি পেলেও অ্যামোনিয়ামের জারণ বন্ধ হতে পারে। কারণ শর্করা-অবলম্বি জীবাণুর অত্যধিক সংখ্যাবৃদ্ধি **নাইট্রোব্যাক্টর** এর সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাহত করে। মৃত্তিকার জলমগ্নতাও অ্যামোনিয়ার জারণ বন্ধ করে।

ধান ছাড়া অন্য ফসলের কাছে নাইট্রোজেনের $NO_3^-$ অবস্থা $NH_4^+$ অবস্থা অপেক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য। ফলে এই জারণ-বিক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। একমাত্র বনভূমি, ফলবাগান ও তৃণভূমি ছাড়া সমস্ত চাষ করা ভূমিতেই যথেষ্ট কার্যকরী। ফলে ঐ পরিস্থিতিগুলি ফসলকে $NH_4^+$ অবস্থাতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করতে হয়। অত্যধিক অম্লমাটিতে $NH_4^+$ আয়ন নাইট্রোজেনের একটি প্রায় স্থায়ী অবস্থা, ঋণাত্মক ক্লে-কণাতে সংশ্লিষ্ট থাকে। অন্যদিকে $NO_3^-$ ও $NO_2^-$ আয়ন অতি সহজেই জলে চোঁয়াইয়া নীচে যায়। $NO_2^-$ আয়ন অম্ল মাটিতে গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বা নাইট্রাস অক্সাইড (nitrous oxide)-এ পর্যবসিত হয়ে বাতাসে উড়ে যেতে পারে। $NH_4^+$ এর ক্লেকণা আবদ্ধ অংশের খুব সামান্যই উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য হয়। অত্যধিক $NH_4^+$ আয়নও ফসলের পক্ষে বিষাত্মক (toxic) হয়। অতি ক্ষার অবস্থাতে $NH_4^+$ গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েও উড়ে যায়।

এ সমস্ত সত্ত্বেও অ্যামোনিয়ার জারণ ক্রিয়াকে কৃষির ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে অপ্রয়োজনীয় বিক্রিয়া চিন্তা করে কৃষি জমিতে এই বিক্রিয়া অথবা **নাইট্রোসমোনাস**-এর ক্রিয়া বন্ধ করার জন্য একটি পিরিডিন (pyridine) উদ্ভূত রাসায়নিক ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা গেছে।

(গ) নাইট্রোজেনের বিজারণ বা ডিনাইট্রিফিকেশন (Denitrificatipn): মৃত্তিকাতে যে বিক্রিয়া $NO_3^{(-)}$ বা $NO_2^{(-)}$ কে $NO^-$ বা $N_2$ গ্যাস-এ পরিবর্তিত করে তাদের নাইট্রোজেনের বিজারণ বলা হয়। অবশ্য উদ্ভিদগুলিও এই সমস্ত আয়ন আত্তীকরণ করে। মৃত্তিকা থেকে নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অংশ বিজারিত হ'য়ে গ্যাস অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং মৃত্তিকা ত্যাগ করে বায়ুমণ্ডলে যায়।

অবলম্বি ব্যাক্টিরিয়া গোষ্ঠী যথা **সিউডোমোনাস অ্যাক্রোমোব্যাক্টর** বা **ব্যাসিলাস** প্রভৃতি এই বিজারন সংঘটিত করে।

$$NO_3 \longrightarrow NO_2 \longrightarrow NH_3$$

$$NO_3 \longrightarrow NO_2 \longrightarrow N_2O,\ N_2$$

যেহেতু $NO_3^-$ আয়ন অক্সিজেনের পরিবর্তে ইলেকট্রন গ্রাহক হিসাবে কাজ করে তাই মৃত্তিকার বাতাশ্বয়ন নাইট্রোজেনের বিজারণ কমাতে পারে। অম্ল মাটিতে ৫·০—৫·৫ এর কম অম্লত্বে খুব সামান্যই $NO_3^-$ নষ্ট হয়। মৃত্তিকাতে জৈব পদার্থের প্রচুর সরবরাহ এবং পরনির্ভর ব্যাক্টিরিয়ার খাদ্য বস্তুর যথেষ্ট সরবরাহ থাকলে এই বিক্রিয়া যথেষ্ট কমে যায়।

(ঘ) বায়বীয় নাইট্রোজেনের জৈব আবদ্ধকরণ (Biological nitrogen fixation): অজৈব পদ্ধতিতে বজ্রপাতের সাথে অথবা অটোমোবাইলের ইঞ্জিনে নাইট্রোজেন জারিত হয়ে মৃত্তিকায় সংযুক্ত হতে পারে। বায়ুমণ্ডলের বিরাট নাইট্রোজেন সম্ভার এইভাবে পরিবর্তিত হ'য়ে মৃত্তিকাতে প্রতিনিয়ত সংযুক্ত হচ্ছে। কিন্তু নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে জৈব পদ্ধতিগুলি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। প্রকৃতিতে বিভিন্নগোষ্ঠীর অসংখ্য জীবাণু এই নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণে অংশ গ্রহণ করে ( সারণী-২৯ )।

সারণী ২৯ : নাইট্রোজেন আবদ্ধকারি জীবাণু

| অমিথোজীবি (non-symbiotic) | | | মিথোজীবি (symbiotic) | |
|---|---|---|---|---|
| ব্যাক্টিরিয়া | নীল-সবুজ শৈবাল | ছত্রাক | জীবাণু | পোষক উদ্ভিদ |
| স্বালোক সংশ্লেষে অক্ষম : | | | | |
| অ্যাজোটব্যাক্টর | আনাবিনা | পুলুলেরিয়া | রাইজোবিয়াম | শুঁটিজাতীয় ফসল |
| অ্যাজোটোমনাস | ক্যালোথ্রিক্স | রডোটরুলা | ক্লেবসিয়েলা | সাইকোট্রিয়া |
| ক্লস্ট্রিডিয়াম | ক্লোরোগ্লিয়া | | অ্যাক্টিনো-মাইসিটিও ছত্রাক | আলনাস |
| ডেরক্সিয়া | ফিসারেলা | | | কাস্থয়ারিণা |
| ব্যাসিলাস | মাস্টিগোক্লেডাস | | | |
| বাইজারিঙ্কিয়া | নসটক্ | | | কম্পটোনিয়া |
| সিউডোমোনাস | সাইটোনেমা | | | করিয়েরিয়া |
| স্পাইরিলাম | স্টীগোনেমা | | | সাইকাস |
| ডিসালফভিব্রিও | টলিপোথ্রিক্স | | | ভিসকারিয়া |
| নোকারডিয়া | | | | হিপ্পোফি |
| এন্টারোব্যাক্টিরিয়া | | | | কেরাটোজামিয়া |
| ক্রোমোব্যাক্টিরিয়াম | | | | সারকোকারপাস |
| স্বালোক সংশ্লেষকারী : | | | | |
| ক্লোরোবিয়াম | | | | সাক্রোজামিয়া |
| ক্রোমাসিয়াম | | | | মিরিকা |
| মিথানোব্যাক্টিরিয়াম | | | | সেফার্ডিয়া |
| রডোমাইক্রোবিয়াম | | | | পুর্সিয়া |
| রডোসিউডোমোনস | | | | |
| রডোস্পাইরিলাম | | | | |

ধরা হয় বছরে সারা পৃথিবীতে ৩ হাজার ৫০০ কোটি টন নাইট্রোজেন বিভিন্নভাবে বাতাস থেকে মাটিতে আবদ্ধ হচ্ছে। সমস্ত কাজটি দু'টি প্রধান প্রক্রিয়া যথা মিথোজীবি ও অমিথোজীবি আবদ্ধকরণ (symbiotic and non

symbiotic N-fixation) দ্বারা হচ্ছে। মিথোজীবি জীবাণুগুলি সাধারণতঃ শুঁটীজাতীয় ও অন্য কিছু উদ্ভিদের মূলে মিথোজীবি হিসাবে বসবাসকালে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে যা পোষক উদ্ভিদ বা পরোক্ষভাবে অন্য উদ্ভিদ ব্যবহার করে। ব্যাক্টিরিয়া, নীল সবুজ শৈবাল, ছত্রাক, অ্যাক্টিনোমাইসিট প্রভৃতি বিভিন্ন জীবাণু গোষ্ঠী এই কাজে সক্ষম হলেও প্রকৃতিতে এই কাজে মূলতঃ কিছু ব্যাক্টিরিয়া যেমন মিথোজীবিদের মধ্যে **রাইজোবিয়াম** এর বিভিন্ন প্রজাতি ও প্রকার এবং অমিথোজীবিদের মধ্যে **অ্যাজোটোব্যাক্টর**-এর প্রজাতি প্রধান দায়িত্ব পালন করে। কিছু নীলসবুজ শৈবাল যথা **নস্টক**, **অ্যানাবিনা** ইত্যাদিও যথেষ্ট দায়িত্ব পালন করে।

জীবাণুর এই ক্ষমতার কৃষির ক্ষেত্রে প্রয়োগের সম্ভাবনা নানা কারণে আশাপ্রদ নয়। মিথোজীবি ব্যাক্টিরিয়াগুলির ক্ষেত্রে এদের প্রায়োগিক ব্যবহার যথেষ্ট কার্যকরীও উৎসাহ ব্যঞ্জক হ'লেও অমিথোজীবিদের ক্ষেত্রে এটির ব্যবহারিক দিক এখনও সফল নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বাতাসের $\frac{4}{5}$ অংশ নাইট্রোজেন হওয়া সত্বেও মাটিতে ফসলের খাদ্যাভাবের মধ্যে নাইট্রোজেন অন্যতম রয়ে গেছে।

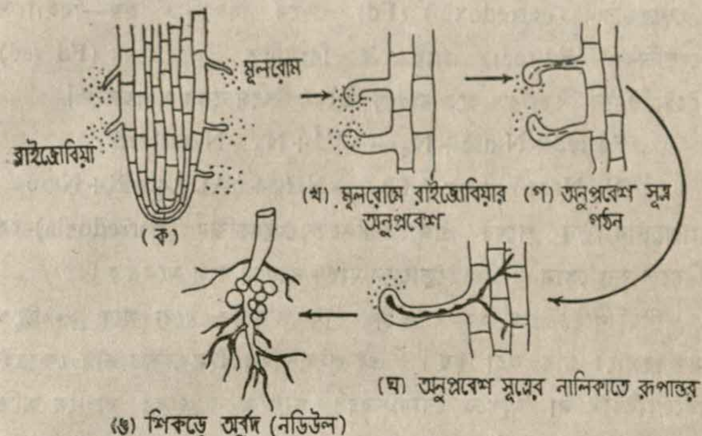
প্রকৃতিতে **অ্যাজোটোব্যাক্টর** প্রতিগ্রাম শর্করা ব্যবহার ক'রে মাত্র ৫·২০ মিঃ গ্রাম নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে। অর্থাৎ প্রতি একর জমিতে ৫·২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে মাত্র যার জন্য অন্ততঃ ১০০০ পাঃ শর্করা লাগে। এজন্যই কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে **অ্যাজটোব্যাক্টর** এর সম্ভাবনা আরও পরীক্ষা সাপেক্ষ। অন্য অমিথোজীবিদের সম্ভাবনা আরও সুদূর পরাহত। অত্যধিক উর্বরা শক্তি সম্পন্ন মৃত্তিকাতে **অ্যাজোটোব্যাক্টর**-এর সম্ভাবনা অবশ্য উজ্জ্বল, যেমন দেখা গেছে মিশরে। ক্রান্তীয় অঞ্চলে ধানের জমিতে যে সমস্ত নীল-সবুজ শৈবাল জন্মায় তাদেরও মৃত্তিকার নাইট্রোজেন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অবদান রয়েছে। মিথোজীবি জীবাণুরাও মৃত্তিকাতে যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে। এ সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান বহুদিনের এবং প্রথম ঘোষণাটি করেন মটর ও ক্লোভারের (Clover) ক্ষেত্রে আতওয়াটার, ১৮৮৫ (Atwater) এবং হেলরিগেল ও উইলফারত, (Hellriegel and Wilfarth)। এই জীবাণুগুলি বাতাসের নাইট্রোজেন অন্য বস্তুর সাথে উৎসেচকের সহায়তায় সংযুক্ত ক'রে কোষের জৈব পদার্থে পরিণত করে। জৈব পদার্থ মধ্যে ঐ

নাইট্রোজেন আরও বিজারিত অবস্থাতে থাকে। ঐ জৈব পদার্থ পরে বিয়োজিত হ'য়ে একটি বিশেষ অবস্থায় বিমুক্ত হয় যা ফসল গ্রহণ করে। যে উৎসেচক নাইট্রোজেন আবদ্ধ করাতে অংশ নেয় সেটি অনেক ক্ষেত্রে নাইট্রোজেনের সংস্পর্শেই তৈরী হয় (adaptive)।

(ঙ) মিথোজীবি জীবাণুর নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণের সূক্ষ্ম-প্রক্রিয়া: বিজ্ঞানী বাইজারিঙ্ক ১৮৮৮-তে প্রথম নাইট্রোজেন আবদ্ধকারি ব্যাক্টিরিয়ার স্বতন্ত্রীকরণ ও আবাদ করেন। পরে এই জীবাণুটি **রাইজোবিয়াম** বলে পরিচিত হয়। এক্ষেত্রে পোষক উদ্ভিদ ও **রাইজোবিয়াম** স্বতন্ত্রভাবে জীবন ধারণে সক্ষম হলেও নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার কাজে তারা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই জীবাণুগুলি গ্রাম ঋণাত্মক ও দণ্ডাকৃতি। এরা অর্বুদের (nodule) মধ্যে অথবা অ্যালকালয়েড (alkaloid) যুক্ত খাদ্য মাধ্যমে আবাদে অসমান আকৃতি ও শাখা-প্রশাখা যুক্ত কোষে (bacteroid) পরিণত হয়। কার্যকরী অর্বুদগুলি সাধারণত প্রাথমিক মূলের উপর তৈরী হয়।

পোষককোষে এরা অনুপ্রবেশ ক'রে একটি অর্বুদ (nodule) সৃষ্টি করে। বড় এবং রক্ত-রঙা কেন্দ্রযুক্ত অর্বুদগুলিকে আবদ্ধকরণে কার্যকরী দেখা যায়। ইদানীং জীবাণুর নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ ক্ষমতাটি বংশগত বিশেষত্ব বলে বোঝা গেছে এবং এর কোষান্তরণ (transformation) ও সম্ভব হয়েছে। মৃত্তিকাতে অর্বুদগঠনের সাফল্যের জন্য শুঁটীজাতীয় ফসল ও তার পরিপূরক (compatible) জীবাণু প্রজাতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। মৃত্তিকাতে নাইট্রোজেনের অভাব থাকাটাও প্রয়োজনীয়। মিথোজীবি জীবাণুরা প্রচুর আঠাল পদার্থ দ্বারা নিজেদের কোষকে পোষক মূলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করে। পরে কোষের সংখ্যা ও কোষের আকৃতি যথেষ্ট বাড়ায়। ফলে মূলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য অর্বুদ গঠিত হয়। জীবাণুর পলিসাকারাইড এর পর মূলের পলিগ্যালাকটুরনেস সৃষ্টিতে উৎসাহ দেয় ও নিজে অসংযতভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মূল রোমের (root hair) মোড়কের (fold) মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। তারপর জীবাণু মূলের কর্টেক্স স্তর পর্যন্ত পৌছায়, এবং কোষগুলিকে বিভাজন ও বৃদ্ধিতে উদ্দীপিত করে। জীবাণু ইতিমধ্যে ব্যাক্টেরয়েড অবস্থাতেই জীবাণু-সিষ্ট (cyst) এর মধ্যে বিভাজিত হয়। উদ্ভিদ-

কোষের ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। এসবের ফলে সামগ্রিকভাবে অর্বুদ সৃষ্টি হয়। (চিত্র-৮১)।




চিত্র ৮১ : মিথোজীবি জীবাণুর অর্বুদ সৃষ্টি

এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি সেলুলোস হাইড্রোলাইজ করতে পারে না। তাই শিকড়ের রোঁয়ার সেলুলোস হীন প্রান্তেই তারা অনুপ্রবেশ করে। পরে গোলাপী রঙের লেগহিমোগ্লোবিন রঙ্গক (leghaemoglobin pigment) সৃষ্টি হয় যা নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার কাজে লাগে।

কৃষিক্ষেত্রে এই নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া দ্বারা যে পরিমাণ নাইট্রোজেন সংযোজিত হয় তা ১ একরে প্রায় ১০০ পাউণ্ড পর্যন্ত। নিউজিল্যাণ্ডে ক্লোভার ফসলের ক্ষেতে অবশ্য ৫০০ পাউণ্ড পর্যন্ত নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার কথা জানা গেছে। এরকম উচ্চহারে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার কথা আরও জানা গেছে অ্যাল্‌নাস (**Alnus**), হিপোফি (**Hippophae**), ইলেইগনাস (**Elaeagnus**), মিরিকা (**Myrica**) প্রভৃতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্রে কার্যকরী জীবাণুর মধ্যে ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক, অ্যাক্টিনোমাইসিটস সবই রয়েছে।

নাইট্রোজেন আবদ্ধ করার রাসায়নিক বিক্রিয়াটি অমিথোজীবিদের ক্ষেত্রে কিছুটা বোঝা গেছে। **ক্লস্ট্রিডিয়াম** এর উপর গবেষণাতে দেখা গেছে যে

পাইরুভিক অম্ল ব্যবহারের সাথে নাইট্রোজেন আবদ্ধ করণেও কোষের একটি মলিবডেনামযুক্ত উৎসেচক-নাইট্রোজিনেস (nitrogenase) কার্যকরী।

ফেরেডক্সিন (Ferredoxin) (Fd) প্রথমে বিজারিত হয়—বিজারিত ফেরেডক্সিনএ (Fd red)। পরে ঐ বিজারিত ফেরেডক্সিন (Fd red) নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে নাইট্রোজিনেস উৎসেচকের সহায়তায়।

$$\text{Fd red} + \text{N-ase} + N_2 \longrightarrow \text{Fd} + N_2 - \text{N-ase red}$$

$$N_2.\text{Nase red} + \text{r ATP} \longrightarrow NH_3 + \text{nADP} + \text{nPi} + \text{Nase}$$

**অ্যাজটোব্যাক্টর** গণের প্রজাতিগুলিতে ফেরেডক্সিন (Ferredoxin)-এর পরিবর্তে অন্য কোন (H) হাইড্রোজেন বাহক রয়েছে বলে মনে হয়।

পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রায় ১৩০০ শুঁটীজাতীয় উদ্ভিদের মধ্যে মাত্র ১০০টিকে ফসল হিসাবে চাষ করা হয়। এই ফসলগুলির বীজ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রাইজোবিয়াম না মিশিয়ে বোনা হয়। যার ফলে এদের মাধ্যমে অতি সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেনই আবদ্ধ হয়। মৃত্তিকার আদিম (native) **রাইজোবিয়ামগুলির** আবদ্ধকরণ ক্ষমতা খুবই সীমিত। বিভিন্ন রাইজোবিয়াম প্রজাতিগুলির পোষক বা ধারক উদ্ভিদ যেগুলি এ পর্যন্ত নির্ণীত হয়েছে সেগুলি নিম্নরূপ ( সারণী-৩০ )।

**সারণী ৩০ : রাইজোবিয়ামের বিভিন্ন প্রজাতির ধারক উদ্ভিদ**

| প্রজাতি | ধারক উদ্ভিদ | আবদ্ধ নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রতি বছরে/ হেক্টরে ( কেজি না ) |
|---|---|---|
| **রা. মেলিলোটি (R. meliloti)** | আলফা আলফা, সুইট ক্লোভার ও মেথী | ১০০—৩০০ |
| **রা. ট্রাইফোলি (R. trifoli)** | ক্লোভার | ১০০—১৫০ |
| **রা. লেগুমিনসেরাম (R. leguminosarum)** | সীম | ২৪০—৩২৫ |
| | মটর, মসুর ও খেসারি | ১০০ |
| **রা. ফাসিওলি (R. phaseoli)** | | |

| প্রজাতি | ধারক উদ্ভিদ | আবদ্ধ নাইট্রোজেনের পরিমাণ প্রতি বছরে/ হেক্টরে ( কেজি না ) |
|---|---|---|
| রা. লুপিনি (R. lupini) | লুপিন ও সেরাডেল্লা | ১৫০—২০০ |
| রা. জাপোনিকাম (R. japonicum) | সয়বীন | ৬০—৮০ |
| অনির্ণীত রাইজোবিয়াম প্রজাতি (Rhizobium lp.) | বাদাম, বরবটী, মুগ, অড়হড়, গুয়ার, লিমাবীন | ৪৫—৫৫ |
| ” | ভেলভেটবীন, মথবীন, ডেসমোডিয়াম | ১০০—৪০০ |
| | ছোলা | — |

পশুখাদ্য ফসলগুলি অন্য শুঁটী জাতীয় ফসলের তুলনাতে অধিক নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে, কারণ এদের শর্করার প্রয়োজন অতি অল্প। এই জীবাণুগুলি ধারক উদ্ভিদে প্রোটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা ছাড়াও খাদ্য প্রাণ ও ধাতব বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এ সমস্ত কারণে উদ্ভিদের সাধারণ বৃদ্ধির হার বাড়িয়ে ধারক উদ্ভিদগুলিকে অধিক রুচিকর (palatable) ও খাদ্যবস্তু যুক্ত করে। ফসলের মধ্যে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ ক্রিয়া চলে অল্পক্ষণ, বিশেষত ফিল্ডবীনে (fieldbean)। আবার সয়বীনে এই ক্রিয়া বেশী দিন ধরে চলে।

(চ) নীল-সবুজ শৈবালের নাইট্রোজেন আবদ্ধ করণ: অমিথোজীবি জীবাণুগুলির মধ্যে **অ্যাজোটোব্যাক্টর** ছাড়া নীল-সবুজ শৈবাল (blue-green algae) একটি অন্যতম জীবাণু গোষ্ঠী যাদের মৃত্তিকায় নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ ক্ষমতা সারা পৃথিবীর মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। নীল-সবুজ শৈবালগুলি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পাওয়া যায় ও বৃদ্ধি পায়। এই জীবাণু গোষ্ঠী হয়ত সবচেয়ে ব্যাপক এলাকাজুড়ে পৃথিবী পৃষ্ঠে নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণে লিপ্ত। কারণ এই গোষ্ঠীর জীবাণুগুলি ভূমিভাগে প্রায় সর্বত্র, মিষ্টজলাশয়ে ও সমুদ্রে বসবাস

করে। শুধুমাত্র অম্ল মাটি ছাড়া প্রায় সবরকম অবস্থা বা আবহাওয়াতে এরা বৃদ্ধিতে সক্ষম ও নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে। এরা আণ্টার্কটিক মহাসাগরের শীতলতম জল থেকে উচ্চ উষ্ণতা যুক্ত উষ্ণ প্রস্রবণের জলেও বসবাস করে। ০°—৬০° সেঃ উষ্ণতার মধ্যে স্বচ্ছন্দে বৃদ্ধি পায় ও নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে।

অবশ্য এটা ঠিকই যে এই বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস ক্ষমতা একটি প্রজাতির নীলসবুজ শৈবালেরই যে রয়েছে তা নয়। এদের বহু প্রজাতির বহুরকম পরিবেশ সহনশীলতা রয়েছে। যে সমস্ত গণে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারক প্রজাতি যথেষ্ঠ রয়েছে সেগুলি হচ্ছে **আনাবিনা (Anabaena), নসটক (Nostoc), ক্যালোথ্রিক্স (Calothrix), গ্লিওট্রাইকা (Gleotricha)** ইত্যাদি।

রোয়া ধানচাষের জমিতে এই জীবাণুগুলি নিয়মিত নাইট্রোজেন জোগায়। আন্তর্জাতিক ধান্য গবেষণাগার, ফিলিপিনে একই জমিতে নাইট্রোজেন সার ব্যতীত পরপর ২৩টি ধান ফসল চাষ করেও জমির উর্বরতার কোন বিশেষ হ্রাস লক্ষ্য করা যায়নি। এক্ষেত্রে এই নীলসবুজ শৈবালই ফসলের টেনে নেওয়া নাইট্রোজেন পুরিয়ে আসছে এতদিন ধরে।

মিশরের গিজা অঞ্চলে এদের দুটি প্রজাতি যথা **টলিপোথ্রিক্স টেনুইস (Tolypothrix tenuis) ও আউলোসিরা ফার্টিলিসিমা (Aulosira fertilissima)** অন্যদের তুলনাতে অধিক নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে। পরে ওখানে শৈবালের আবাদ দিয়ে ইনকুলেট (inoculate) করে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাওয়াতে ও দেশের অন্তত ১০% ধানের জমিতে এই আবাদ দ্বারা ইনকুলেট করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতবর্ষেও এ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই শৈবালের প্রকৃতি অত্যন্ত সহনশীল। কৃষিক্ষেত্রে এদের প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে অসীম। তবে এদের আবদ্ধ করা নাইট্রোজেন উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য অবস্থায় থাকে না বলে ধানের জমিতে স্বাভাবিকভাবে বিয়োজিত হ'য়ে গ্রহণযোগ্য হলেও অন্য ফসলের মাঠে এদের ব্যবহারের অসুবিধা থেকেই যাচ্ছে।

আরেকটি ক্ষেত্রে একটি নীলসবুজ শৈবাল **আনাবিনা অ্যাজোলা (Anabaena azolla)** একটি জলজ ফার্ণ—**অ্যাজোলা (Azolla)**-র পাতায় একটি বৃহৎ ছিদ্রে বসবাস করে এবং নাইট্রোজেন আবদ্ধ করে। নীল সবুজ শৈবাল উক্ত ফার্ণটির সাথে মিথোজীবি সম্পর্ক বজায় রাখে। মুক্ত পরিবেশে **আনাবিনার**

কোষে যেখানে মাত্র ৫% কোষ নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণে সক্ষম (heterocyst) সেখানে মিথোজীবি অবস্থাতে ১৫-২০% এ জাতীয় কোষ থাকে। এছাড়া শৈবালটির মিথোজীবি অবস্থাতে বৃদ্ধির হার অত্যন্ত উচ্চ। কিছু দেশে এই আনাবিনা-অ্যাজোলা জোট বছরে হেক্টর প্রতি ১০০-১৫০ কেজি নাইট্রোজেন আবদ্ধ করতে পারে। ধানের জমিতে অবশ্য আজোলার পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো ধানের পক্ষে ক্ষতিকরও হতে পারে। মোটামুটি ধানের জমির ৫০% আজোলা পরিবৃত থাকলেই সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। আলো-অন্ধকার সবসময় নাইট্রোজেন আবদ্ধকরণ চললেও রাতে এর পরিমাণ যথেষ্ট কম থাকে। তবে এই ব্যবস্থা শুধুমাত্র রোয়া ধানেই গ্রহণ করা সম্ভব।

## ৬·৩৩ মৃত্তিকাতে ফসফরাস পরিবর্তনচক্র :

জীব ও জীবাণুকোষে ফসফরাস মূলতঃ নিউক্লিক অম্ল তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়; ফসফোলিপিড ও অন্য জৈব ফসফরাসঘটিত অণু সৃষ্টিতেও লাগে। একাজে তারা সাধারণতঃ দ্রবণীয় অজৈব ফসফরাস অণুই ব্যবহার করে। মৃত্তিকায় ফসফরাসের পরিমাণ প্রায়ই বেশ কম। ফসফরাসের পরিবর্তনচক্রতে ফসফরাস-এর অবস্থার পরিবর্তন হয় জৈব থেকে অজৈব এবং দ্রবণীয় থেকে অদ্রবণীয়তে। এই চক্রে স্বাবলম্বী জীবাণুর খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা নাই। আত্তীকৃত ফসফরাস জৈব অণুতে এষ্টার তৈরীর মাধ্যমে প্রবেশ করে এবং কোষের বিনাশের পর ডি. এন. এ, আর. এন. এ, এ. টি. পি, এ. ডি. পি প্রভৃতি দ্রবনীয় অজৈব অণু হিসাবে মুক্ত হয়।

যে কোন জৈব পদার্থ মৃত্তিকায় দেওয়া হ'লে পরজীবি জীবাণুরা তাদের বিয়োজনও বিভাজন করে। এই বিয়োজন আবার আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। জৈব পদার্থ থেকে ফসফরাস মুক্ত করা ও উদ্ভিদের খাদ্য হিসাবে মৃত্তিকায় সরবরাহের কাজে **ব্যাসিলাস মেগাথেরিয়াম ফস-ফাটিকাম (B. megatherium phosphaticum)** এর কিছু ভূমিকা রয়েছে। জৈব পদার্থে ০·২ শতাংশের কম ফসফরাস থাকলে তা জীবাণুর শরীরেই আত্তীকৃত হয়। বেশী থাকলে তবেই বেশীটুকু মৃত্তিকাতে যুক্ত হয় ও উদ্ভিদের কাজে লাগে।

বিভিন্ন জৈবপদার্থ সূত্রে মৃত্তিকাতে আগত বিভিন্ন ফসফরাস যুক্ত বৃহদাণু

যথা ডি. এন. এ, আর. এন. এ-র বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সম্পূর্ণভাবে কোষে অনুপ্রবেশ করতে পারে যদিও বহু জীবাণু এদের হাইড্রোলাইস ক'রে অজৈব ফসফরাসে পরিণত করে। ফলে অন্য বস্তুগুলির মত ফসফরাস জারিত বা বিজারিত কিছুই হয় না, ফসফরাস জারণ বা বিজারণের কাজে সক্ষম জীবাণুর কথা কিছু জানা নাই।

প্রকৃতিতে দ্রবণীয় ফসফরাস প্রায় মেলে না। তারা সব সময়ই কেলসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) ও লোহা (Fe)-র সাথে অদ্রব লবণ সৃষ্টি করে। শিলা থেকে ফসফরাস অদ্রব ও অজৈব অবস্থাতেই মৃত্তিকায় আসে। কৃষি জমিতে সার হিসাবে যেসমস্ত ফসফরাস উৎস যোগ করা হয় যেমন হাড়গুঁড়া (bonemeal), ফসফেট শিলা (rock phosphate) ইত্যাদি সবই অদ্রব ফসফরাস এর উৎস।

মৃত্তিকাতে অবস্থিত অজৈব, অদ্রব ফসফরাসের দ্রবীভবন বহুল পরিমাণে তরান্বিত হয় জীবাণু নিঃসৃত জৈব অম্লের সহায়তায়। একাজে ব্যবহার্য কিছু অজৈব অম্ল যথা নাইট্রাস, নাইট্রিক অম্লও জীবাণুজনিত নাইট্রিফিকেশনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। মাটিতে সালফুরিক অম্ল গন্ধক জারক ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়। বিক্রিয়াগুলি নিম্নরূপ,

$$Ca_3(PO_4)_2 + 2HNO_3 \longrightarrow 2CaHPO_4 + Ca(NO_3)_2$$

$$Ca_3(PO_4)_2 + 4HNO_3 \longrightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2Ca(NO_3)_2$$

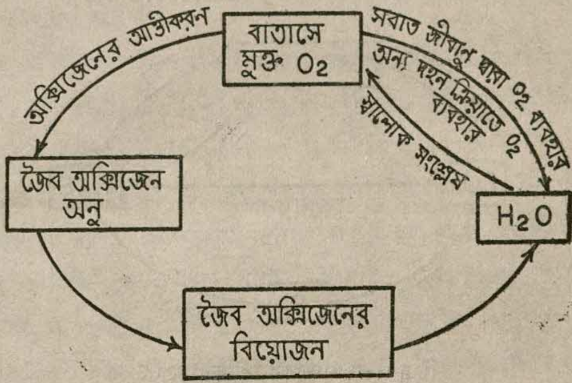
$$Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow 2CaHPO_4 + CaSO_4$$

বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্তিকাতে ফসফরাসের অভাব দেখা যায়। কিন্তু মাটির জলমগ্নতা অদ্রবণীয় ফসফরাসকে অনেকটা দ্রবণীয় করে তোলে। জলাশয় প্রভৃতিতে মনুষ্য অধ্যুসিত এলাকার জঞ্জাল, কৃষিকার্যে প্রয়োগকরা সারের ধোয়ানি ইত্যাদির সাহায্যে ফসফরাসের পরিমাণ খুবই বেশী হয়। এই ফসফরাসই জলাশয়ে কচুরীপানা বা বিভিন্ন শৈবালের অত্যধিক বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

### ৬·৩৪ মৃত্তিকাতে অক্সিজেনের বিক্রিয়াচক্র :

সালোক সংশ্লেষকারি জীবাণুরা কার্বনডাই-অক্সাইডকে ($CO_2$) বিজারিত করতে জলকে ব্যবহার ক'রে অক্সিজেন ($O_2$) প্রস্তুত করে। তবে ক্লোরোফিল এ

বিহীন জীবাণুরা অক্সিজেন ($O_2$) উৎপাদনে আদৌ সক্ষম কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যে সমস্ত জীবাণুতে উদ্ভিদের সবুজ কণা রয়েছে শুধু তারাই অক্সিজেন ($O_2$) উৎপাদনে সক্ষম। সমস্ত সবাত জীবের পক্ষে অক্সিজেন ($O_2$) অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। স্বল্প অক্সিজেন নির্ভর জীবাণুদের অক্সিজেন ($O_2$) লাগে সামান্য পরিমাণ। অক্সিজেন ($O_2$) অবাত জীবাণুদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না শুধু নয় তাদের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। অক্সিজেনের বিক্রিয়াচক্রের চিত্ররূপ ( **চিত্র-৮২** ) দেওয়া হল।




চিত্র ৮২ : অক্সিজেন বিক্রিয়াচক্র

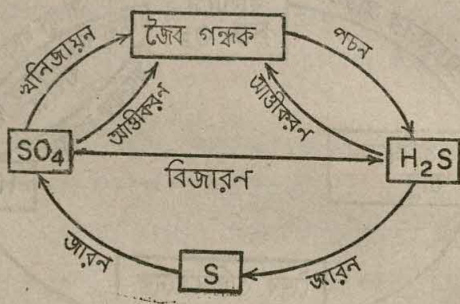
## ৬·৩৫ মৃত্তিকায় গন্ধকের পরিবর্তন চক্র :

প্রোটিনের অংশ হিসাবে গন্ধক ঘটিত অ্যামিনো অম্ল যথা সিসটিন, সিসটাইন ও মেথিওনিন জীব ও জীবাণু দেহে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। গন্ধকের বিক্রিয়াচক্রতে বহু জীবাণু কার্যকরী ভূমিকা পালন করে, তবে তাদের অনেকেই যতটা জলে, ততটা মৃত্তিকায় কার্যকরী নয়। প্রকৃতিতে বিভিন্ন জলাশয়ে গন্ধকের জারণে এরা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করে।

কৃষিজমিতে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গন্ধক যথেষ্ট পরিমাণে থাকে এবং চাষের মাটির জীবাণু ও ফসলের প্রয়োজন মেটায়। গন্ধক মূলতঃ উৎসশিলা ও জৈব পদার্থ থেকে মাটিতে আসে। কিছু কিছু জমিতে গন্ধকের অভাবও দেখা যায় এবং সার হিসাবে গন্ধকের প্রয়োগ লাভজনকও। বেশীর ভাগ মৃত্তিকাতে

প্রায় ৯০% গন্ধকই জৈব পদার্থের সাথে যুক্ত, যার মধ্যে ৪০% অ্যামিনো অম্ল হিসাবে ও ৫০% গন্ধক যুক্ত পলিসাকারাইডে থাকে। অজৈব গন্ধকের মধ্যে অধিকাংশই সালফেট ($SO_4$) হিসাবে ও অতি সামান্য পরিমাণ সালফাইড বা অন্য বিজারিত অবস্থাতে পাওয়া যায়।

সমস্ত ফসলই সাধারণতঃ সালফেট ($SO_4$) হিসাবে গন্ধক গ্রহণ করে। যদিও এরা কিছুটা গন্ধক যুক্ত অ্যামিনো অম্ল হিসাবেও গ্রহণ করতে পারে জীবাণুরা অবশ্য সবরকম গন্ধকই ব্যবহারে সক্ষম। ফলে যে কোন প্রকার গন্ধকই জীবাণুর সাহায্যে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে (**চিত্র-৮৩**)।




চিত্র-৮৩ঃ গন্ধকের বিক্রিয়াচক্র

গন্ধকের জারণঃ বহু রঙবিহীন ও সালোক সংশ্লেষক ব্যাক্টিরিয়া বিভিন্ন সালফাইড বা বিজারিত সালফারকে ($H_2S$) জারিত ক'রে সালফেট ($SO_4$) তৈরি করে। গন্ধক পরবর্তী স্তরে জারিত হলে কোষে শক্তি সঞ্চার হয়। ক্রোমাসিয়েসি (Chromatiaceae) পরিবারের বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়া যেমন **থায়োব্যাসিলাস, থায়োব্যাক্টিরিয়াম, থায়োস্পাইরা** প্রভৃতি গন্ধক জারণে সক্ষম।

মৃত্তিকাতে সবাত অবস্থাতে জৈব গন্ধক জাতীয় পদার্থ অতি দ্রুত সালফেট ($SO_4$)-এ রূপান্তরিত হয়, প্রথমে হাইড্রোজিনেটেড গন্ধক ($H_2S$) হয়ে। অবাত অবস্থাতে অবশ্য প্রধানত হাইড্রোজিনেটেড সালফারই ($H_2S$) তৈরী হয়। জৈব পদার্থে কার্বন: সালফার (C : S) অনুপাত ২০০-র কম না হলে গন্ধক উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য অবস্থায় আসে না। মৃত্তিকায় গন্ধক হাইড্রোজিনেটেড সালফার ($H_2S$) অবস্থাতে খুব একটা থাকে না। যদিও

**থায়োব্যাসিলাস** হাইড্রোজিনেটেড সালফারকে ($H_2S$) কতটা জারিত করে তার পরিমাপ কিছু নাই। জলমগ্ন জমিতে অবশ্য প্রচুর হাইড্রোজিনেটেড গন্ধক ($H_2S$) বা অন্য সালফাইড তৈরী হয় যার ফলে মৃত্তিকা কালো রঙের হয়। কর্দমাক্ত জমির সবাত উপরিস্তরেও **বেগিঅটা (Beggiota)** হাইড্রোজেন সালফাইডকে ($H_2S$) জারিত করে। মৃত্তিকায় গন্ধক প্রয়োগে **থা. থায়োক্সিডানস (Th. thioxidans)**এর প্রচুর সখ্যা বৃদ্ধি ঘটে এবং সালফুরিক অম্ল ($H_2SO_4$) সৃষ্টি হয়। **থায়োব্যাসিলাস** এর পছন্দসই অম্লতা ৩·০ হলেও ০·৫ অম্লতায় পর্যন্ত জীবাণু কাজ করে। বিভিন্ন প্রজাতির ব্যাক্টিরিয়া বিভিন্ন পদ্ধতিতে জারণ করে।

(১) $5Na_2S_3O_3 + H_2O + O_2 \rightarrow 5\ Na_2SO_4 + H_2SO_4 + 4S$

(২) $2\ Na_2S_2O_2 + O_2 + H_2O \rightarrow Na_2S_4O_6 + 2\ NaOH$

(৩) $2\ S + 3\ O_2 + 2\ H_2O \rightarrow H_2SO_4$

গন্ধকের বিজারণ : অল্প কিছু অবাত ব্যাক্টিরিয়া গন্ধক বিজারণে সক্ষম। এদের শহরের ময়লা (sewage), দূষিত জল, হ্রদ, সমুদ্র, তৈলকূপ প্রভৃতির জঞ্জালে এমনকি গো-জাতীয় প্রাণীর রুমেনেও (rumen) পাওয়া যায়। মৃত্তিকাতে সালফেটকে ($SO_4$) এরা বিজারিত করে। গ্রাম ঋণাত্মক, বক্র দণ্ডাকৃতি এই ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে অন্যতম **ডিসালফভিব্রিও ডিসালফিউরিকানস (Desulfvibrio desulfuricans)** বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যথেষ্ট বিদ্যমান। শর্করা, কোহল ও জৈব অম্লের উপস্থিতিতে এরা অবলম্বী জীবাণু হিসাবে বৃদ্ধি পায়। আর হাইড্রোজেন ($H_2$) অম্ল ব্যবহার ক'রে স্বাবলম্বী হিসাবে বৃদ্ধি পায়। শুধু মাত্র জলমগ্ন জমি ছাড়া কৃষি জমিতে এদের খুব একটা কার্যকরী ভূমিকা নাই। এই জীবাণুগুলি অবাত। এর মধ্যে স্পোর সৃষ্টিকারী জীবাণু যেমন **ডিসালফোটমাকুলাম (Desulfotomaculum)** রয়েছে। (চিত্র-৮৩)

## ৬·৩৬ মৃত্তিকাতে লৌহের পরিবর্তনচক্র :

মৃত্তিকাতে লৌহ ফেরাস ($Fe^{++}$) ও ফেরিক ($Fe^{+++}$) এই দুই অবস্থাতে অবস্থান করে। প্রশমিত মৃত্তিকাতে ফেরাস অবস্থা সহজেই অদ্রবণীয় ফেরিক অবস্থাতে পরিণত হয়। জলমগ্ন মৃত্তিকাতে ফেরিক অবস্থা বহুল পরিমাণে

বিজারিত হ'য়ে দ্রবণীয় ফেরাসে পরিণত হয়। গভীর নলকূপ দ্বারা উত্তোলিত জলে ও প্রচুর ফেরাস লৌহ থাকে যা নলকূপের আস্রাবকের (filter) ক্ষতি করে। মৃত্তিকার অম্লত্ব ও রেডক্স পোটেনসিয়াল (redox potential) এর প্রভাবেই লৌহ এই দুই অবস্থার মধ্যে পরিবর্তনশীল থাকে, জীবাণু খুব সামান্য পরিমাণ লৌহই গ্রহণ করে মূলত সাইটোক্রোম প্রণালীর (cytochrome system) হিমি গ্রুপ (heme group) এর গঠন কার্যে ব্যবহারের জন্য। কিছু জীবাণু লৌহকে ফেরাস থেকে ফেরিক অবস্থাতে পরিবর্তিত করতে পারে যেমন **ফেরোব্যাসিলাস ফেরক্সিডানস (Ferrobacillus ferroxidans)** ও **থায়োব্যাসিলাস ফেরকৃসিডানস (Thiobacillus ferroxidans)**। এই প্রক্রিয়াতে স্বজীবি জীবাণুগুলি কার্বনডাই অক্সাইড ($CO_2$) বন্ধন কার্যে প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করে। ফলে ব্যাক্টিরিয়ার তৈরি ফেরিক হাইড্রক্সাইড কোষের চারপাশে আঠাল পদার্থ স্তরে জমা হয়। অম্ল প্রস্রবনে বা খনির নিষ্কাশন ব্যবস্থাতে যে লৌহ অধক্ষিপ্ত হয় তার জন্য এই ব্যাক্টিরিয়াগুলিই দায়ী।

## ৬.৪০ মূল-মৃত্তিকামণ্ডল বা রাইজোস্ফিয়ার (Rhizosphere) :

মূলের চারপাশে বেশ কয়েক ইঞ্চি দূরত্ব পর্যন্ত মৃত্তিকার একটি মণ্ডলাকার অংশে জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ সাধারণ মৃত্তিকার তুলনাতে বহু গুণ বেশী দেখা যায়। এই মণ্ডলের জীবাণুর সংখ্যা ও প্রকার সাধারণ মৃত্তিকা থেকে তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী। এই মণ্ডলটিকে মূল মৃত্তিকা-মণ্ডল বা মূল প্রভাবিত মৃত্তিকা মণ্ডল (rhizosphere) বলা হয়। মণ্ডলের জীবাণুগুলিকে মূল মৃত্তিকা মণ্ডলের জীবাণু বলা হয়। মূলের এই প্রভাব সর্বাধিক বোঝা যায় মূলের ঠিক বহিত্বকের উপরের মৃত্তিকাতে এবং সেই অঞ্চলটিকে বলা হয় মূলগাত্র মণ্ডল বা রাইজোপ্লেন (rhizoplane)।

স্বভাবতই এই মণ্ডলে জীবাণুদের মধ্যে সর্বপ্রকার বাস্তসংস্থান জাতীয় সম্পর্ক ও বিক্রিয়া (interaction) দেখা যায়, যার মধ্যে সহাবস্থান, পরস্পর নির্ভরশীলতা, বিরোধিতা, লুণ্ঠনজীবিতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিক্রিয়াগুলির কোনটি উদ্ভিদের পক্ষে অপরিহার্য, কোনটি অসহযোগী; কোনটি প্রয়োজনীয়।

মৃত্তিকার মূলমণ্ডলের জীবাণুগত যে চিত্র তা একটি উদাহরণে বোঝা

যাবে। গ্রে ও উইলিয়ামস, ১৯৭০ সালে গমের ক্ষেত্রে যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন তা নিম্নরূপ ( সারণী-৩১ )।

**সারণী ৩১ঃ গমের মাটিতে জীবাণু পরিস্থিতি**

| জীবাণু | সংখ্যা (× ১০$^{৬}$) প্রতিগ্রাম মাটিতে সাধারণ মৃত্তিকা | মূলমণ্ডল | সংখ্যার অনুপাত মূলমণ্ডল/ সাধারণ মৃত্তিকা |
|---|---|---|---|
| ব্যাক্টিরিয়া | ৫৩ | ১২০০ | ২৩ : ১ |
| অ্যাক্টিনোমাইসিট্স্ | ৭ | ৪৬ | ৭ : ১ |
| ছত্রাক | ০·১ | ১২ | ১২০ : ১ |
| প্রোটোজোয়া | ০·০০১ | ০.০০২৪ | ২ : ১ |
| শৈবাল | ০·০২৭ | ০·০০৫ | ২·২ : ১ |
| **বিভিন্ন ব্যাক্টিরিয়া গোষ্ঠী** | | | |
| অ্যামোনিয়া উৎপাদক | ০·০৪ | ৫০০ | ১২·৫০০ : ১ |
| অবাত | ৬ | ১২ | ২ : ১ |
| সবাত | ০·১ | ০·৭ | ৭ : ১ |
| স্পোর সৃষ্টিকারি | ০·৫৭৫ | ০·৯৩০ | ২ : ১ |
| রেডিও ব্যাক্টর গোষ্ঠী | ০·০১ | ১৭ | ১৭০০ : ১ |
| অ্যাজটোব্যাক্টর | ০·০০১ | <০·৯০১ | ? |
| ডিনাইট্রিফায়ার | ০·১ | ১২৬ | ১২৬০ : ১ |

মূলমণ্ডলের জীবাণুরা যেমন উদ্ভিদমূলের প্রভাবে প্রভাবান্বিত তেমনি তাদেরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে উদ্ভিদের উপর।

## ৬·৪১ উদ্ভিদের উপর মূলমণ্ডলের প্রভাব ঃ

মূলমণ্ডলের প্রভাব সর্বাধিক দেখা যায় উদ্ভিদের অঙ্গ বৃদ্ধির সর্বোচ্চ হারের সময়ে। বিভিন্ন ফসলের মধ্যে শিম্বজাতীয় ফসলের মূলমণ্ডলে অন্য উদ্ভিদ অপেক্ষা বেশী প্রভাব দেখা যায়। এই প্রভাবের মধ্যে জীবাণুর সামগ্রিক সংখ্যাবৃদ্ধি ছাড়া অ্যামিনো অম্ল নির্ভর জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধিও লক্ষ্যণীয়।

মূলমণ্ডলের বহুজীবাণু উদ্ভিদের স্বার্থে নাইট্রোজেনকে নাইট্রেট ($NO_3$) বা অন্য রাসায়নিক হিসাবে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য করে তোলে। গন্ধকের গ্রহণযোগ্য অবস্থা সৃষ্টি করে গন্ধকজারক জীবাণুরা, আবার বেশকিছু জীবাণু কিছু রাসায়নিক উৎপাদন করে যা শিলাজ ও অস্থিজ ফসফরাসকে দ্রবীভূত ক'রে উদ্ভিদের গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

মূলমণ্ডলের জীবাণু কিছু সময়বিশেষে অক্সিন (auxin) ও উদ্ভিদ দেহরস (phytohormone) যথা ইনডোল অ্যাসেটিক অম্ল (indole acetic acid) ও সৃষ্টি করে। এই রাসায়নিকগুলি মূলের বৃদ্ধি যথেষ্ট উৎসাহিত করে। ফসলের বৃদ্ধি ও ফলন বাড়ায়। ক্ষেত্র বিশেষে জীবাণু সৃষ্ট অক্সিন (auxin) উদ্ভিদের ক্ষতিও করে যেমন ধানের ক্ষেত্রে রোগসৃষ্টিকারী একটি ছত্রাক **জিব্বারেলা ফুজিকুরই ( Gibberella fuzikuroi )** জিব্বারেলিক অম্ল ( gibberelic acid ) সৃষ্টি করে। ঐ অম্লে ধানগাছ অস্বাভাবিক দীর্ঘ হ'য়ে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। **ব্যাসিলাস** এর একটি প্রজাতি তামাকের গোড়াতে একটি বিষ (toxin) নিঃসরণ করার ফলে তামাকের 'সরুপাতা' (frenching) লক্ষণ দেখা দেয়। মূলমণ্ডলে বেশ কিছু খাদ্যপ্রাণও উৎপাদিত হয় যা বর্তমানে জীবাণু সৃষ্ট বলেই ধরা হচ্ছে।

## ৬·৪২ মূলমণ্ডলের জীবাণুর উপর উদ্ভিদের প্রভাব :

মূলমণ্ডলের জীবাণুদের জন্য বহু প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু উদ্ভিদের মূল সরবরাহ করে। শিম্বজাতীয় উদ্ভিদের মূল বহু দ্রবনীয় জৈব নাইট্রোজেন ঘটিত বস্তু নিঃসরণ করে। নিঃসৃত দ্রব্যগুলির মধ্যে অ্যামিনো অম্ল অন্যতম। এজন্যই মূলমণ্ডলে অ্যামিনো অম্ল ব্যবহারকারী জীবাণুর সংখ্যা অত্যধিক। এছাড়া বহু উদ্ভিদমূল অন্য জৈব রাসায়নিক যথা ম্যালিক অম্ল (malic acid), পেন্টোস (pentose) ও ফসফাটিড (phosphatids) প্রভৃতি নিঃসরণ করে।

মূলের ত্বকত্যাগ (sloughing off ) অথবা পুরাতন মূলের মৃত্যু মূলমণ্ডলে শর্করার ও সমতুল রাসায়নিকের দুটি অন্যতম উৎস। এই শর্করা-উৎস স্বাভাবিকভাবেই মূলমণ্ডলে একবিরাট সংখ্যক নাইট্রোজেন আবদ্ধকারি জীবাণুর বৃদ্ধির সহায়ক হয়। এই সব বস্তু পরিবর্তিত হ'য়ে হিউমাস, গ্লুকোস ও অন্য প্রয়োজনীয় বস্তু তৈরি হয়। এর ফলে জীবাণু সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

জীবাণু সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, গন্ধক ইত্যাদি শোষণ ক'রে তাদের চোঁয়ান পদ্ধতিতে (leaching) বিনষ্ট হওয়াতে বাধা দেয়। উদ্ভিদ, জীবাণুর জন্য খাদ্য সংশ্লেষণের কাজে নিযুক্ত এবং জীবাণু খাদ্য সংগ্রাহক, প্রস্তুতকারক ও রক্ষক হিসাবে কাজ করে।

৬.৪৩ মৃত্তিকাবাহী ও মৃত্তিকা সংশ্লিষ্ট বহু উদ্ভিদ রোগের ক্ষেত্রে রোগ জীবাণু উদ্ভিদের মূলমণ্ডলের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনে সমর্থ হ'লে তবেই রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। এ সমস্তক্ষেত্রে মূলমণ্ডলের বিক্রিয়াগুলি সামগ্রিক-ভাবে আরো জটিল হয়ে ওঠে।

রোগগ্রস্থ বা মৃত উদ্ভিদের মূল অধিক পরিমাণে পচনশীল মূলবস্তু সরবরাহ করে। এটা জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সাধারণতঃ মূল-নিঃসৃত বহু অ্যামিনো অম্ল রোগজীবাণুর সহায়ক। এই সমস্ত অম্লজীবাণুর বৃদ্ধি ও স্পোর অঙ্কুরোদ্গম তরান্বিত করে। কখনও বা রোগজীবাণু বিরোধী জীবাণু-দের নাশ করে।

মূলমণ্ডলের মধ্যে উদ্ভিদ রোগজীবাণুর অংশগ্রহণে জটিলতা বৃদ্ধি পায়। তিসীর **ফুসেরিয়াম** জনিত ঢলা রোগের ক্ষেত্রে দেখা যায় সহনশীল 'প্রকার' এর তিসী তার মূলমণ্ডলে **ফুসেরিয়ামের** সাথে একটি বিরোধমূলক (antago-nistic) ছত্রাকের (যথা **ট্রাইকোডার্মা Trichoderma**) সংখ্যাবৃদ্ধি করে। ওটের (oats) ক্ষেত্রে রোগ প্রকিরোধী প্রকারের তুলনাতে অন্য প্রকারের মূল-মণ্ডলে ম্যাঙ্গানীজ জারক ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যাধিক্য ম্যাঙ্গানীজের অভাব সৃষ্টি করে। ফলে ওটের ঐ প্রকার (variety)টি রোগ প্রতিরোধহীন হ'য়ে যায়। তাই উদ্ভিদের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে উদ্ভিদ মূল, মূলমণ্ডলের স্বাভাবিক জীবাণু ও রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সম্পর্কটি একটি জটিল অথচ নির্ণায়ক প্রক্রিয়া।

# সাত

## পানীয় জল, দুগ্ধ ও খাদ্যদ্রব্যের জীবাণু বিজ্ঞান

(Microbiology of drinking water, milk and food)

"...বীভৎস আগ্নেয়গিরির মত গর্তযুক্ত পনীর—
যেন কোন অপার্থিব গরুর অস্বাভাবিক দুধ
ফুটতে ফুটতে—এমন হয়ে গেছে..."
—জি. কে. চেষ্টারটন

৭.০০ পানীয় জলের অর্থ হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্যহানিকর জীবাণু ও রাসায়নিক থেকে মুক্ত জল। স্বাভাবিক কারণেই মানুষকে পানীয় জলের জীবাণু পরিস্থিতি বিশেষতঃ রোগজীবাণু নিয়ে বহু চর্চা ও গবেষণা করতে হয়েছে। কারণ পৃথিবীর বিরাট জনসংখ্যার বহু রোগ সমস্যার এই পানীয় জলের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে। পানীয়জলের রাসায়নিক অবস্থার প্রভাব যথেষ্ট থাকলেও জীবাণুজনিত সমস্যাগুলিই প্রাথমিক।

দুধ মানব জীবনে আর একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পানীয় যার জীবাণু পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকার হ'তে পারে। তাই দুধের স্বাভাবিক জীবাণু পরিস্থিতির পরোক্ষভাবে মানব জীবনের স্বাভাবিক কাজকর্মে যথেষ্ট অবদান আছে।

দুধের তৈরী খাবার দাবার ও অন্য আরও অনেক যেমন মাছ, ডিম, মাংস প্রভৃতির ওপর জীবাণুর প্রভাব অপরিসীম। এই জাতীয় অনেক খাবার তৈরির পদ্ধতিও জীবাণুর উপর নির্ভরশীল। জীবাণুদের সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভের অনেক আগে থেকেই বহু দেশে বহু বিচিত্র খাবার তৈরী করা হ'য়ে আসছে বিভিন্ন ধরনের গাঁজানো, শুকানো ইত্যাদি পদ্ধতির মাধ্যমে যাতে অনেক সময় পদ্ধতিটি পুরো বা অংশত জীবাণু নির্ভর। শুধু ভারতবর্ষেরই বহু প্রান্তে এ জাতীয় বহু খাবার দাবারের চল রয়েছে। এর মধ্যে দৈ (curd) ইডলি (Idlee), শুঁটকীমাছ (dried fish) প্রভৃতি অন্যতম। উপজাতি ও দরিদ্র

মানুষের মধ্যে প্রচলিত পানীয় 'পচাই', 'তাড়ি' ইত্যাদিতে জীবাণুর অবদান বর্তমানে অনেকটাই বোঝা গেছে।

## ৭.২০ পানীয় জলের জীবাণু : দূষিতকরণ ও সংরক্ষণ :

জল একটি অতি প্রয়োজনীয় রাসায়নিক যৌগ। পৃথিবীপৃষ্ঠে সমগ্র জীবন-প্রক্রিয়াই জল নির্ভর। পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রায় তিন চতুর্থাংশ জল। পৃথিবীর উপর আবহাওয়ার পরিবর্তনে যে জল-চক্র ঘুরছে তাতে বছরে আরো ২৪ হাজার কিউবিক মাইল জল পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডল হ'তে পড়ছে। পৃথিবী পৃষ্ঠের জল বাষ্পীভবন, বাষ্পমোচন (transpiration) ও প্রাণীজগতের নিশ্বাসের (exhalation) দ্বারা বায়ুমণ্ডলে উঠে যায়। পরে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে আবার পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসে। জলের, বিশেষতঃ পানীয় জলের পরিমাণ, চক্র, রাসায়নিক ও জীবাণুগত পরিস্থিতি সম্পর্কে ইদানীং সঙ্গত কারণেই বিজ্ঞানী মহলে যথেষ্ট চর্চা হচ্ছে।

সাধারণত পানীয় জলের জন্য স্থলভাগের উপরিস্তরে (surface) যে জলাশয়গুলি রয়েছে যথা নদী, সরোবর, সমুদ্র, মহাসমুদ্র প্রভৃতি তাদের জল বিভিন্নভাবে পরিস্রবণের পর অথবা সোজাসুজি সংগ্রহ করা হয়। এই সমস্ত জল প্রায়ই বিভিন্ন কারণে যথা শিল্প ও কৃষিক্ষেত্র থেকে নির্গত জঞ্জাল (effluent) দ্বারা দূষিত হ'য়ে থাকে। জীবাণু জনিত দূষিতকরণ ও আরেকটি প্রধান সমস্যা।

পানীয় জল জীবাণুর দ্বারা দূষিত হয় নানা ভাবে। বিভিন্ন জীবের রেচিত পদার্থগুলি দ্বারা দূষণ এর মধ্যে অন্যতম। এতে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধির জীবাণু পানীয় জল মিশে যায়। মানুষের যে সমস্ত রোগজীবাণু প্রায়ই জলকে দূষিত করে ও জলধারা বাহিত হয় তার মধ্যে টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, আমাশয়, কলেরা, ডায়রিয়া, জণ্ডিস ইত্যাদি অন্যতম।

## ৭.২১ জলের জীবাণু পরিস্থিতি :

জলের জীবাণু পরিস্থিতি যথেষ্ট জটিল। জলে জীবাণুর সংখ্যা ও প্রকৃতি নির্ভর করে মূলতঃ জলে জীবাণুর খাদ্যদ্রব্য, জীবাণুনাশক, অন্য জীবাণু প্রভৃতির সংখ্যা ও প্রকৃতির উপর। জলে জীবাণুরা বিভিন্ন রকম খাদ্যের জোগান পায়। দেখা গেছে নিম্নবর্তী কাদাজল স্তরে (benthic zone) এবং তীরবর্তী

আলোকোজ্জল অঞ্চলে (littoral zone) খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য থাকে। যার ফলে এই দুই অঞ্চলে জীবাণুর সংখ্যাও অধিক হয়। তীরবর্তী অঞ্চল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে জীবাণুর সংখ্যা যথেষ্ট কম থাকে।

বহুক্ষেত্রে জলে অতি উচ্চ পরিমাণে লবণ থাকে। এই লবণ জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ মৃত সাগর (Dead sea)। অন্য কিছু জলভাগের জলে উচ্চ পরিমাণে হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) থাকাতে শৈবালের সংখ্যা কমে যায়। জলে সংগৃহীত অম্ল জাতীয় রাসায়নিক যৌগগুলিও অনেক জীবাণুর পক্ষে হানিকর। জলে বসবাসকারি জীবাণুগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কগুলি জীবাণুর সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধিতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। প্লাঙ্কটন (Plankton)রা ব্যাক্টিরিয়া ও শৈবালকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। জলে বসবাসকারি **ডেলোভিব্রিও** বা ডেলা (**Bdellovibrio**), ফাজ প্রভৃতিরা কোটি কোটি ব্যাক্টিরিয়াকে ধ্বংস করে। অন্য আরও কিছু জলের জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের মাধ্যমেও প্রভাব বিস্তার করে। এছাড়া ভৌত কারণ যথা উষ্ণতা, অম্ল-ক্ষারত্ব, জলের চাপ, বায়ুর চাপ, অসমোটিক চাপ ইত্যাদি ও জলাশয়ের জীবাণুর উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বে আলোচিত জলাভাগের স্তরবিন্যাসে দেখা যায় বিভিন্ন স্তরে জীবাণুরা সংখ্যায় ও প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রকার।

অগভীর জলাশয়ে অত্যাধিক খাদ্যবস্তু থাকার ফলে নানা ধরনের বহু জীবাণু দেখা যায়। প্রবাহমান নদী বা অন্য জলাশয়ের বিভিন্ন অংশে জীবাণু পরিস্থিতি বিভিন্ন প্রকার। জঞ্জালবাহী নালির মুখে জীবাণুর সংখ্যা অত্যধিক হয়। দেখা যায় এরা বহু মানুষের রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম। আবার নদীর জলে জীবাণুর সংখ্যা খুবই কম। ঝর্ণার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝর্ণাতে জলের উষ্ণতা, খাদ্যবস্তুর পরিমাণ ইত্যাদিও জীবাণু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

### ৭.২২ জলের দূষণ ও সংক্রমণ সমস্যা :

অধিকাংশ জলাশয়েই যথেষ্ট পরিমাণে জীবাণুর খাদ্য থাকে। শৈবালদের জন্য খনিজ বস্তুর সরবরাহই যথেষ্ট। ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে রাসায়নিক ভাবে স্বাবলম্বী (chemolithotroph) ও সালোক সংশ্লেষক স্বনির্ভর (photolithotroph) জীবাণুরা জলে সামান্য কিছু খাদ্যবস্তুর উপস্থিতিতেই সংখ্যা বৃদ্ধি

করতে সক্ষম। জলাশয়ে স্বাবলম্বীরা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথেই অবলম্বীরা (heterotroph) আস্তে আস্তে বৃদ্ধির সুযোগ পায়, মৃত ও পচনশীল স্বাবলম্বীদের সৃষ্ট জৈব খাদ্যবস্তুর সরবারাহের জন্য। এই সমস্ত জীবাণু জৈব পদার্থকে খনিজ পদার্থে বিয়োজিত (mineralization) ক'রে, পরিবেশে কার্বনডাই অক্সাইড ($CO_2$) এর বৃদ্ধি ঘটায় ও অম্লত্বের পরিবর্তন ঘটায়। অন্য আরও বহু জীবাণুও জলকে এইভাবে পচনে সাহায্য করে।

কিছু প্রোটোজোয়া, শৈবাল ও লৌহ-ব্যাক্টিরিয়া জলের স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তন করে। এছাড়া আরও কিছু জীবাণু জলের রঙ পরিবর্তন করেও জলে আঠাল পদার্থের (slime) পরিমাণ বাড়ায়। ফলে জলের নালি ও পরিস্রাবক বন্ধ হ'য়ে যায়। এই অবস্থাগুলি জলের দুর্যোগ (water calamities), লালজল (redwater) প্রভৃতি নামে পরিচিত। জলে বসবাসকারি এ জাতীয় জীবাণুর মধ্যে **সাইডেরোকাপসা (Siderocapsa)**, **স্ফেরোটিলাস(Sphaerotilus)**, **গ্যালিওনেলা (Gallionella)**, **কলোব্যাক্টর (Caulobacter)** ইত্যাদি অন্যতম। এছাড়া বিভিন্ন রোগ জীবাণু যারা জলকে দূষিত ক'রে যেমন কলেরা রোগের **ভিব্রিও কোলেরি (Vibrio choleri)** টাইফয়েডের **সালমনেলা টাইফি (Salmonella typhi)**, ব্যাসিলারি আমাশয়ের **সাইজেলা ডিসেনটেরি (Shigella dysenteriae)**, গ্যাস্ট্রি-এনটেরাইটিস-এর **সালমনেলা টাইফিমুরিয়াম (S. typhimurium)**, প্যারাটাইফয়েডের **সালমনেলা প্যারাটাইফি (S. paratyphi)** ইত্যাদির কথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

### ৭.২৩ দূষিত জলের বিশুদ্ধকরণ :

পানীয় জলের বিশুদ্ধকরণের ইতিহাসে দেখা যায় ১৯০৮ সালে আমেরিকার জারসি শহরে জনসাধারনের ব্যবহার্য জল প্রথম হাইপোক্লোরাইট (hypo-chlorite) দ্রবণের সাহায্যে শোধন করা হয়। এরপর কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্যাস-ক্লোরিণের ব্যবহার শুরু হয়। জনস্বাস্থ্য প্রকল্পতে এই ব্যবস্থা বহু দেশের বহু সহরে নানাভাবে উন্নতি লাভ করেছে। সাধারণতঃ লাক্টোস যুক্ত জীবাণু খাদ্য মাধ্যমে ৩৫° সে. উষ্ণতাতে অম্লত্ব ও গ্যাস উৎপাদন দেখে এবং

দণ্ডাকৃতি, স্পোরবিহীন, গ্রাম ঋণাত্মক ব্যাক্টিরিয়াগুলি দেখে দূষণ নির্ণয় করা হয়।

বিশুদ্ধকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য।

যে সমস্ত জলাশয়ে শৈবাল জলের দুর্গন্ধ ও রঙ সৃষ্টি করে সেখানে তাদের ০·৩২ পিপিএম (ppm) পরিমাণ তুঁতে ($CuSO_4$) ব্যবহার করে দমন করা হয়।

জলের মধ্যে সোডিয়াম বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইট (Na-or Ca-chlorite) মিশ্রিত ক'রে কার্যত ক্লোরিন গ্যাস দিয়ে বিশুদ্ধকরণ করা হয়। এতে তুলনামূলক ভাবে খরচ বেশী হলেও জলের স্বাদের পরিবর্তন হয় না। সক্রিয় কয়লা গুঁড়া (activated charcoal) দ্বারা পরিস্রবণ করেও জল বিশুদ্ধকরণ সম্ভব। এতে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ দূর হয়। তবে জলের সমস্ত দূষক দূর হয় না। ফলে অধিকতর শোধনের প্রয়োজন হয়। জলের রঙ ও ঘোলাটে ভাব দূর করতে ফটকিরি বা অ্যালুমিনিয়াম সালফেট (alum বা $Al_2(SO_4)_3$, $18H_2O$) যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। একই কাজে ফেরিক ক্লোরাইড, ফেরিক সালফেট, সোডিয়াম অ্যালুমিনেট ও কালফটকিরি ($FeCl_3$, $Fe(SO_4)_3$, Na-aluminate ও black alum) ও ব্যবহার করা হয়। এই রাসায়নিকগুলি ঘনীভবন ও আকুঞ্চন (coagulation-flocculation) পদ্ধতিতে বিভিন্ন দূষক অত্যন্ত কার্যকরী ভাবে দূর করে।

পরিস্রাবণ : জলের পরিস্রুতিকরণের কাজে তিনটি মূল পদ্ধতি বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

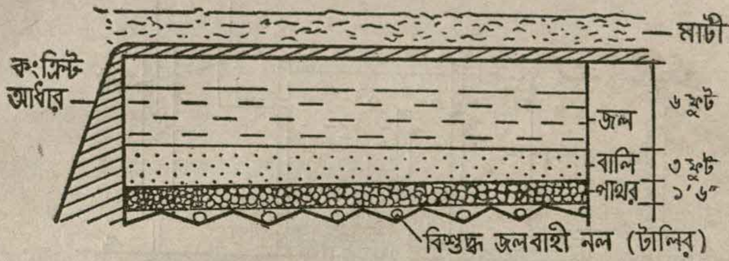
থিতান (Sedimentation) :

এটি একটি সময় সাপেক্ষ পদ্ধতি এবং সম্পূর্ণ পরিস্রুত জল উৎপাদনে সক্ষম। এর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত সহজ ও যে কোন পরিস্থিতিতে সম্ভব।

পরিস্রাবণ (filtration) :

সাধারণতঃ জল পরিস্রাবণে বিভিন্ন প্রকার পরিস্রাবক যথা বালুকাযুক্ত ধীর পরিস্রাবক (slow sand filter), বালুকা যুক্ত দ্রুত পরিস্রাবক (rapid sand filter), ডায়াটম-মৃত্তিকা যুক্ত পরিস্রাবক (diatomaceous earth filter) ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায় বিভিন্ন দেশে। সহজে ব্যবস্থাপনা করা

যায় যে বালুযুক্ত ধীর পরিস্রাবক তার চিত্ররূপ নিম্নে দেওয়া হল ( **চিত্র-৮৪** )। এই পদ্ধতিতে বালির উপরিস্তরের ৩-৪ ইঞ্চিতে লক্ষ লক্ষ ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি দ্বারা সৃষ্ট আঠাল স্তর বা স্মুতডেক তৈরী হয় যার ফলে বালির পরিস্রাবক ছিদ্রগুলি (pores) ক্ষুদ্রতর হ'য়ে আরও কার্যকরী হয়।



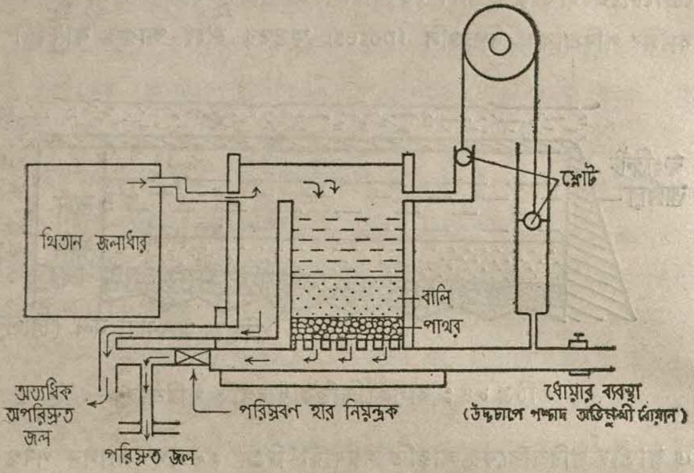

চিত্র ৮৪ : বালুকাভিত্তিক ধীরগতি পরিস্রাবক

এ জাতীয় পরিস্রাবকের আকৃতি অনুযায়ী দিনে ৫০ লক্ষ গ্যালন পর্যন্ত জল উৎপন্ন হতে পারে। এর উপরিস্তর যথাসময়ে পরিস্কার করলে বহুদিন কার্যকরী থাকে।

বালুকাযুক্ত দ্রুত পরিস্রাবকের ক্ষেত্রে ( **চিত্র-৮৫** ) কোন আঠাল স্তর সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না। এ জাতীয় পরিস্রাবক প্রতি একরে দিনে প্রায় ২০০০ লক্ষ গ্যালন জল পরিস্রুত করতে সক্ষম। ইদানীং যে 'ডায়াটমাইট পরিস্রাবক' ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে বহু নলের উপর সামুদ্রিক ডায়াটম জীবাণুর সিলিকা জাতীয় (siliceous) জীবাশ্ম দ্বারা গঠিত মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া থাকে। এক্ষেত্রে আরও অল্প সময়ে ও পরিসরে অধিক পরিমান জল পরিস্রুত হয়। ইদানীং আরও একটি পদ্ধতি বিপরীত অভিস্রবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা জলের পরিস্রবণ আরও কার্যকরী হচ্ছে। এক্ষেত্রে সেলুলোস অ্যাসিটেট (cellulose acetate) দ্বারা গঠিত আস্তরণের মধ্য দিয়ে জলকে উচ্চ চাপের ( ১৫০০ থেকে ৪০ psi ) সাহায্যে পরিস্রুত করা হয়।

পানীয় জলকে দূষণ সমস্যা মুক্ত বিশেষত সংক্রামক জীবাণু মুক্ত রাখার জন্য বাড়ী, শহর ও শিল্পজাত ময়লা (sewage)অপসারণের (disposal) সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয়। বহু সংক্রামক জীবাণু যথা ক্লষ্ট্রি-

ডিয়াম (Clostridium) মাইক্রোকক্কাস (Micrococcus), ল্যাক্টোব্যাসিলাস (Lactobacillus), স্ট্রেপটোকক্কাস (Streptococcus) ও বিভিন্ন




চিত্র ৮৫ : বালুকাভিত্তিক দ্রুতগতি পরিস্রাবক

এন্টারোব্যাক্টিরিয়া (Enterobacteria) এই সমস্ত উৎস থেকেই পানীয় জলে সংক্রামিত হয়। স্বভাবতই ময়লা শোধন ব্যবস্থা ও পানীয় জল শুদ্ধ রাখার কাজে ময়লার বিজ্ঞানসম্মত অপসারণ ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয়।

## ৭·৩০ দুগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও জীবাণু :

দুধের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুগুলি খুব একটা স্থিতিশীল হারে (proportion) থাকে না। উৎপাদক জন্তু, তাদের প্রকার ও বয়সের সাথে দুধের সংযুতি (composition) পরিবর্তনশীল। এ ছাড়াও যে কোন প্রাণীর দুধের সংযুতি পরিবর্তিত হয়। সাধারণতঃ গরুর দুধে ৮৭·৫% জল ছাড়া ৫% ল্যাকটোস শর্করা, ৩·৬% মাখন জাতীয় স্নেহপদার্থ, ২·৫% কেসিন জাতীয় প্রোটিন, ·৭% অ্যালবুমিন ও গ্লোবুলিন এবং ০·৭% খনিজ পদার্থ থাকে। গো-দুগ্ধের অম্লক্ষারত্ব হয় ৬·৭-৬·৯। এ ছাড়া বিভিন্ন পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ এ, বি, সি ও ডি থাকে। সব মিলিয়ে জীবাণুর পক্ষে দুধ একটি আদর্শ খাদ্য মাধ্যম।

দুধ থেকে যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য তৈরী হয় তার অনেকগুলিই কিছু বিশিষ্ট জীবাণুর দ্বারা দুধের পরিবর্তনসাধন ক'রে সৃষ্টি হয়। এজাতীয় দুগ্ধজাত খাদ্যর মধ্যে দৈ, মাখন, পনীর ইত্যাদি অন্যতম।

দুধ ও দুগ্ধজাত সমস্ত খাদ্যই অন্য কিছু পচন সৃষ্টিকারি জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিছু প্রাণীদেহে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুও এই সমস্ত খাদ্যমাধ্যমে বসবাস করে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই দুধ ও এই সমস্ত দুগ্ধজাত খাদ্যাদি, যা মানুষ প্রতিনিয়তই ব্যবহার করছে তাদের মধ্যে রোগজীবাণুর বসবাস একটি অত্যন্ত দুশ্চিন্তার কারণ।

### ৭·৩১ দুধের সাধারণ জীবাণুগোষ্ঠী ঃ

সুস্থ গরুর পালানে (udder) যে দুধ ক্ষরিত হয় তা জীবাণুমুক্ত। ক্ষরণের পর কিছু পরজীবি জীবাণু যেমন **মাইক্রোকক্কাস, ব্যাসিলাস, এসেরিসিয়া (Escherichia), করাইনেব্যাক্‌টেরিয়াম** ও **ল্যাকটোব্যাসিলাস** দুধে প্রবেশ করে। এই জীবাণুগুলি পালানে বাঁটের (teat) মধ্যেও কিছুটা প্রবেশ করতে পারে। ফলে দোহন করা দুধে প্রতি মিলিলিটারে হাজার হাজার ব্যাক্টিরিয়া বসবাস করে। এছাড়াও দুধ দোহনের পাত্র, দোহনকারীর হাত ও উক্ত এলাকার বাতাস ইত্যাদি থেকেও আরও কিছু জীবাণু দুধে আসতে পারে। গরুর পায়ের উপরিভাগ, পালান, লেজ ইত্যাদি থেকেও জীবাণু দুধে আসার সম্ভাবনা যথেষ্ট। এদের মধ্যে **স্টাফাইলোকক্কাস** ও করাইনেফর্ম ব্যাক্টিরিয়াই প্রধান।

৭·৩২ যদিও এই জীবাণুগুলি সাধারণতঃ বিপদ্‌জনক নয় তবে এরা দুধকে অম্ল ক'রে তুলতে ও তার পচন ঘটাতে পারে। বিভিন্ন জীবাণু কাঁচা বা পাস্তরাইজ (pasteurized) করা দুধ উভয়েরই পচন সৃষ্টি করে। তাদের কয়েকটির তালিকা নিম্নে দেওয়া হল। (সারণী-৩২)।

**সারণী ৩২ ঃ জীবাণু ও দুধের বিভিন্ন পচন**

| পচনের প্রকার | জীবাণু |
|---|---|
| তেতো দুধ | স্টেপটোকক্কাস ক্রেমরিস (S. cremoris) |
| নীল দুধ | সিউডোমোনাস সিনসায়ানি (Ps. syncyanae) |

| পচনের প্রকার | জীবাণু |
|---|---|
| লাল দুধ | সেরাসিয়া মার্সারেনস্ (Serratia marcerens) |
| মিষ্ট ছানা কাটা দুধ | ব্যাসিলাস সিরিয়াস |
| আঠাল (ropy) দুধ | আলকালিজেনস ভাইকোলাক্টিস (Alcaligens viscolactis) |
| অম্ল দুধ | স্ট্রেপটোকক্কাস লাক্টিস (S. lactis) |
| গাঁজানো দুধ | ক্লস্ট্রিডিয়াম (Clostridium sp.) |
| ছিদ্রাল দই | এন্টারব্যাক্টর এরোজিনস্ (Enterobacter aerogens.) |
| মর্চেদাগ | প্রপাইনোব্যাক্টিরিয়াম (Propinobacterium) |
| ছাইরঙা দুধ | ক্লস্ট্রিডিয়াম |
| পনীরের ছাতা | ক্লাডোস্পরিয়াম, জিওট্রাইকাম (Geotrichum) পেনিসিলিয়াম। |

জীবাণু কক্সিয়েলা বার্নেটি (Coxiella burneti) দুধেই থাকে এবং মনুষ্য-দেহে Q-জ্বর সৃষ্টি করে। এই জীবাণু গরুর শরীরেও জ্বর সৃষ্টি করে। কক্সিয়েলার কথা যতদিন জানা ছিলনা ততদিন দুধকে মাইকোব্যাক্টিরিয়াম মুক্ত করার জন্য ১৪৩° ফা এ ৩০ মিনিট রেখে পাস্তরাইজ করা হত। পরবর্তী-কালে কক্সিয়েলার সমস্যা ধরা পড়ার পর তাকে দুধ থেকে অপসারণের জন্য ১৪৫$^{0}$ ফা. উষ্ণতাতে পাস্তরাইজ করার পদ্ধতি চালু করা হল।

৭·৩৩ মিষ্ট নবনী (cream) থেকে তৈরি মাখনের সংরক্ষণ ক্ষমতা খুবই কম। প্রথমতঃ কিছু জীবাণু মাখন তৈরীতে অংশগ্রহণ করে। প্রথমে S. lactis ও S. cremoris নবনীর ল্যাক্টোস গাঁজিয়ে মাখনকে অম্ল করে তোলে। পরে আরও দুটি ব্যাক্টিরিয়া যথা লিউকোনস্টক সিট্রোভোরাম (L. citrovorum) ও এল. ডেক্সট্রানিকাম (L, dextranicum) থেকে উদ্ভুত সাইট্রিক অম্লকে পরিবর্তিত ক'রে ডাইঅ্যাসেটিল (diacetyl) তৈরী করে যাতে মাখনের বিশেষত্ব গন্ধটুকু আসে। এছাড়াও অন্য অনেক জীবাণু এতে অংশগ্রহণ করতে পারে, এবং বিভিন্ন মাখনে বিভিন্ন রকমের গন্ধ সৃষ্টি করে। এই

প্রক্রিয়াতে যথাযথ উষ্ণতা একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশেষত্ব। বিশেষতঃ ২০° সে. এর কাছাকাছি উষ্ণতা নবনীর অম্লত্ব প্রাপ্তির জন্য অতি প্রয়োজনীয়।

মাখনের মধ্যে কর্মরত জীবাণু মাখনবিন্দুগুলির উপরিস্তরের আর্দ্রতার মধ্যেই অবস্থান করে। মাখন জলে ধোয়া হলে ঐ সমস্ত জীবাণু তাদের খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয় ও তাদের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। পচনক্ষমতাযুক্ত ছত্রাক অবশ্য এভাবে দূর করা সম্ভব নয়।

## ৭·৩৪ পনীর (cheese) তৈরী ও তার পচন সমস্যা :

কাঁচা দুধ ৬৮° সে. উষ্ণতাতে ১৫ সেকেণ্ড উত্তপ্ত করে পাস্তুরাইজ করা হয়। এতে **এস. লাকটিস** ও **এস. ক্রেমরিস** এর আবাদ ল্যাকটিক অম্ল তৈরী করার জন্য সাজো (starter) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পনীরে প্রয়োজনীয় গন্ধের উপর নির্ভর করে কিরকম জীবাণু দেওয়া হবে এই প্রক্রিয়াতে। জীবাণু সাধারণতঃ তাদের স্নেহপদার্থ বিয়োজক (lipolytic) বিক্রিয়া দ্বারা পনীরের বিশেষ গন্ধ সৃষ্টি করে। **এল. কেসি (Lactobacillus casei)** প্রকারের জীবাণু মোমের মত নম্র গন্ধযুক্ত পনীর সৃষ্টি করে। অন্য আর কিছু জীবাণু আবার সুপক্ব (mellow) ও বাদামী (nutty) গন্ধযুক্ত পনীর সৃষ্টি করে।

গরুর স্তনপ্রদাহ (mastitis) রোগ কমাতে যেসমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয় পরে তা গরুর দুধে পনীর সৃষ্টির সমস্যা তৈরী করে। সাধারণতঃ দুধে সঠিক সাজো (starter) দিলেই দম্বল (rennet) তৈরী শুরু হয়। পরে এই জমা বস্তুটিকে ছোটছোট টুকরো করে কেটে মধ্যের ঘোলটা বার ক'রে ফেলা এবং চাপ দিয়ে স্থূল খণ্ডতে (block) পরিণত করলে সেগুলির প্লাস্টিক (plastic) প্রকৃতি আসে। পরবর্তী স্তরে এই পনীর খণ্ডগুলিকে ভেঙ্গে, লবণ মিশিয়ে আবার ছাঁচে চাপা হয়। এই লবণযুক্ত খণ্ডগুলিকে মোমের আস্তরণে মোড়া হয় এদের ওজন হ্রাস ও ছত্রাকজনিত পচন বন্ধ করার জন্য। আস্তরণ-যুক্ত খণ্ডগুলি ১৩° সে এ ২৯৪ মাস ধরে পাকানো (ripening) হয়। এই প্রক্রিয়াটির উপরই পনীরের গুণাগুণ নির্ভর করে।

পনীর তৈরীর বিভিন্ন স্তরে জীবাণুর প্রভাব বিভিন্ন প্রকারের। ক্যামেমবার্ট পনীরে প্রথম স্তরে **এস. ল্যাকটিস,** দ্বিতীয় স্তরে **পেনিসিলিয়াম** ও **অম্ল-**

ডিয়াম এবং তৃতীয় স্তরে এল. কেসি কাজ করে। ওলন্দাজদের পনীরের আঠাল খোলস (clammy rind) টা. ৫·৩ অম্লতাতে করাইনেব্যাক্টিরিয়াম দ্বারা তৈরী হয়। এই প্রক্রিয়াতে প্রথমে ক্যানডিডা (Candida) ও ডিবারো-মাইসেস (Debaromyces) থাকলে ভালো হয়। আবার অন্য কতকগুলি পনীর যেমন ট্রাপিষ্ট (Trappist), টিলসিটার (Tilsiter) লাইডারক্রাঞ্জ (Liederkrantz) জাতীয় পনীরগুলির উপরিস্তরে একটি সবাত ব্যাক্টিরিয়া যথা ব্রেভিব্যাক্টিরিয়াম লাইনেনস (Brevibacterium linens) এর আস্তরণ থাকে।

## ৭·৩৫ দুগ্ধজাত পানীয় ও জীবাণু :

বিভিন্ন ধরনের 'গাঁজানো পানীয়' (beverages) তৈরীতে বহু জীবাণুকে ব্যবহার করা হয়। পুরাকাল থেকে ভারতবর্ষে যে দৈ তৈরী হয়ে আসছে তা এস. ল্যাক্‌টিস দ্বারা এভাবেই তৈরী হয়। ইউরোপে ইওগোরট (yoghurt) বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে অম্লদুধ এ জাতীয় খাদ্য বস্তু। এগুলিতে দুধকে জীবাণুর মাধ্যমে পরিবর্তন ক'রে তৈরী করা হয়। নীচের তালিকাতে পানীয়গুলির জীবাণু পরিচিতি দেওয়া হল। সারণী-৩৩।

**সারণী ৩৩ : দুগ্ধজাত পানীয় ও জীবাণু**

| দুগ্ধজাত পানীয় | ব্যবহৃত জীবাণু | কি ভাবে ব্যবহার হয় | কোন দেশে |
|---|---|---|---|
| দই (Dahi or Curd) | এস. ল্যাকটিস | অর্ধ তরল পানীয় | ভারতবর্ষ, বাংলাদেশ |
| ইউগোরট (Yoghurt) | এস. থারমোফিলাস ও এল. বুলগারিকস | কাস্টার্ড জাতীয় অর্ধ তরল পানীয় | ইউরোপ, জাপান |
| অম্ল দুগ্ধ (Acidophilus milk) | এস.অ্যাসিডোফিলাস | তরল পানীয় | দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া |
| কুয়োমিস (Kuomiss) | এস. ল্যাক্‌টিস ও এল. বুলগারিকাস | ধূসর পানীয় | জাপান |

## ৭·৩৬ জীবাণু ও অম্ল খাদ্যদ্রব্য :

বিভিন্ন তণ্ডুল, আমিষ ইত্যাদি খাদ্যবস্তু নানা প্রকার জীবাণু দ্বারা পরিবর্তিত ক'রে বহু বিচিত্র খাদ্য সম্ভার সৃষ্টি করার পদ্ধতি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। পৃথিবীর পূর্বাঞ্চলের দেশসমূহে মূলতঃ বিশেষ গন্ধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ও সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন ধরনে খাদ্য গাঁজান হত। অম্ল জীবাণু জনিত প্রক্রিয়া দ্বারা বহু প্রকার খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করাটা বহুল প্রচলিত ছিল বহুদিন থেকে। খাদ্য বস্তু প্রস্তুতকরার এই সব জীবাণু নির্ভর প্রক্রিয়া দ্বারা খাদ্য বস্তুর পরিমাণ বৃদ্ধি ছাড়াও উৎপাদিত খাদ্যের গুণাবলীও বৃদ্ধি পায়—বর্দ্ধিত পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ ও খনিজ পদার্থ সৃষ্টির মাধ্যমে।

জীবাণুর সাহায্যে খাদ্যের খাদ্য-মূল্য বৃদ্ধি বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ফার্মেন্টেশন বা গাঁজানো (fermentation) পদ্ধতিতে বহু মাদক সুরাজাতীয় ও বিশেষ গন্ধ ও স্বাদযুক্ত পানীয় সৃষ্টি করলে স্বাদ ও গন্ধের পরিবর্তন ছাড়া ভিটামিন, প্রোটিন ও অবশ্য প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ চাল, ভুট্টা, বাজরা, কাসাভা বা অন্য তণ্ডুল জাতীয় দানা ছাড়া মাছও একটি অত্যন্ত উচ্চহারে ব্যবহৃত সামগ্রী যা এভাবে ফার্মেন্ট করা হয়। পশ্চিমী মাদক দ্রব্যগুলির সাথে দেশী মাদক যথা 'পচাই', 'গাঁজানো ভাত' কাঞ্জির ( বাজরাজাত ) প্রভৃতির কার্যত কোন মিল নেই। এই গাঁজানো খাদ্য বস্তুগুলিতে জীবাণু ও মূল খাদ্য বস্তু দুইই উপস্থিত থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই এই ফার্মেন্টেশনের ফলে প্রস্তুত করা পানীয়টি ঘোলাটে, গন্ধনির্বাহী ও দুগ্ধ শুভ্র (opalescent) ঔজ্জ্বল্য যুক্ত হয়। শর্করাজাতীয় খাদ্যবস্তুর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ দুটি মূল পদ্ধতির সাহায্যে এগুলি তৈরী করা হয়।

(ক) একটি ক্ষেত্রে যেমন কাঞ্জির বিয়ারের তণ্ডুল ( বাজরা ) দানা অঙ্কুরোদ্গম হ'য়ে কিছু উৎসেচক তৈরী হলে শ্বেতসার (starch) এর একটি অংশ শর্করাতে পরিবর্তিত হয়। শর্করাগুলি পরে ঈষ্ট ( **স্যাকারোমাইসেস সেরেভিসি** ) দ্বারা গাঁজানোর ফলে ইথাইল কোহল তৈরী হয় এবং ঈষ্টের বৃদ্ধির ফলে যে খাদ্যপ্রাণ, প্রোটিন ও অ্যামিনো অম্লগুলি তৈরী হয় সেগুলি অপরিশ্রুত ঐ মাদকে যুক্ত হ'য়ে তার খাদ্যমূল্য বাড়ায়।

(খ) অন্য দুটি জীবাণু যথা ঈষ্ট ( **এণ্ডোমাইকপসিস বারটনি** ) এবং

অ্যামাইনোমাইসেস রুক্সি (Aminomyces rouxii) ও শ্বেতসারকে বিয়োজিত ক'রে শর্করায় পরিণত করে। পরে কোহল সৃষ্টি করে। উৎপাদিত পানীয়তে ১-৮% ইথাইল কোহল থাকে। ইন্দোনেশীয় টাপেকেতান (tapeketan) এভাবেই তৈরী হয়।

এ জাতীয় কিছু খাদ্যবস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে একটি তালিকাতে নানা রকম খাদ্যবস্তুতে জীবাণুর অংশ গ্রহণের ফলে কি বিচিত্র খাদ্য সম্ভার তৈরী হচ্ছে তার একটা চিত্র দেওয়া হচ্ছে। সারণী-৩৪।

**সারণী-৩৪ জীবাণু ও বিভিন্ন মনুষ্য খাদ্য সম্ভার :**

| খাদ্যবস্তু | উৎসখাদ্য | জীবাণু | কোন দেশে ব্যবহৃত |
|---|---|---|---|
| কাফির বিয়ার (Kaffir beer) | বাজরাদানা | স্যাকারোমাইসেস সেরেভিসি | দক্ষিণ আফ্রিকায় বাণ্টুরা |
| টাপেকেতান (Tapeketan) | „ | এণ্ডোমাইকপসিস বারটনি | ইন্দোনেশিয়া |
| সেক (Sek) | ধান | ল্যাক্টোব্যাসিলাস ও স্যাকারোমাইসেস | জাপান |
| পচাই বা হাড়িয়া (Indigenous drink) | ভাত | স্যাকারোমাইসেস ও স্ট্রেপটোকক্কাস | ভারতবর্ষ |
| তাড়ি (I. D) | তালের ও খেজুরের রস | স্যাকারোমাইসেস ও স্ট্রেপটোকক্কাস | „ |
| পান্তা (Fermented rice) | ভাত | জানানেই | „ |
| ইডলি ও দোসা (Idlee & Dosha) | চাল ও কলাই ডাল | লিউকোনস্টক ও স্ট্রেপটোকক্কাস | „ |

| খাদ্যবস্তু | উৎসখাদ্য | জীবাণু | কোন দেশে ব্যবহৃত |
|---|---|---|---|
| সোয়ু (Soyu) | গম ও সয়বীন | ইষ্ট, অ্যাস্পারজিলাস অরাইজী ও ল্যাক্টোব্যাসিলাস | জাপান |
| নাট্টো (Natto) | সয়বীন | ব্যাসিলাস সাবটিলিস | জাপান |
| সুফু (Sufu) বা সয়বীন দৈ | " | অ্যাক্টিনোমিউকর এলিগানস | চীন |
| কাটসুয়োবুসি (Kutsuo-busi) | বা নিতো মাছ | অ্যাসপারজিলাস গ্লকাস | জাপান |
| শুঁটকী মাছ (Dried fish) | বিভিন্ন মাছ | জানানেই | ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ |
| নামপ্লা বা মাছের সস (Nampla) | মাছ | লবণ সহনশীল ব্যাক্টিরিয়া | থাইল্যাণ্ড |
| নোনা ইলিশ (Salted Hilsa) | ইলিশ মাছ | " | ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ |
| আম্‌সি | কাঁচা আম | " | ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ |

অন্যান্য কতকগুলি অতি প্রচলিত জীবাণু জনিত খাদ্যবস্তুর সম্পর্কে যেটুকু জানা গেছে তা নিম্নরূপ।

১। জীবাণু ও পরিজ (Porridges) :

পরিজ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মানুষের একটি প্রিয় খাদ্য। কাসাভাকে (Cassava) গাঁজিয়ে এটি তৈরী করা হয়। **করাইনেব্যাক্টিরিয়াম ম্যানিহটি** ব্যাক্টিরিয়া এক্ষেত্রে কাসাভার শ্বেতসারকে প্রথমে বিয়োজিত (হাইড্রোলাইস) করে। এর ফলে ল্যাকটিক ও ফরমিক অম্ল সৃষ্টি হয়। পরে

অন্য একটি ছত্রাক **জিওট্রাইকাম ক্যানডিডাম (Geotrichum candidum)** ঐ অম্লগুলিকে জারণ করার ফলে পরিজের বিশেষ গন্ধটি (gau) সৃষ্টি হয়।

২। জীবাণু এবং ইড্‌লী ও দোসা :

পালিশ করা চাল ও কলাইডাল স্বতন্ত্রভাবে ভিজিয়ে, গুঁড়িয়ে ১ : ১ থেকে ৩ : ১ পর্যন্ত বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে সম্পূর্ণ মিশ্রণের প্রায় দ্বিগুণ জল ও ১% হারে লবণ মিশিয়ে সারারাত ঢেকে রাখলে মিশ্রণটি ৪-৫ অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। যে জীবাণুগুলির ক্রিয়াতে এই গাঁজানো ঘটে তারা হচ্ছে **লিউকোনস্টক মেসেনটেরয়েডস (Leuconostoc mesenteroids)** ও **স্ট্রেপটোকক্কাস ফিকালিস**। পরে উক্ত অর্ধতরল মিশ্রণ ছোট ছোট কাপে ঢেলে তা বাষ্পে সিদ্ধ (steam cooking) ক'রে নিলে হয় ইডলি। মিশ্রণটি চাটুতে স্বল্প তেলে পাতলা আস্তরণের মত ছড়িয়ে ভাজার পর দোসা তৈরী হয়। এই জীবাণু সহযোগে তৈরী খাদ্যগুলি বর্তমানে অত্যন্ত মূল্যবান শিশু খাদ্য হিসাবেও ঘোষিত হয়েছে।

৩। কোকো, কফি ইত্যাদি পানীয় প্রস্তুত করার প্রাথমিক স্তরেও কফি বেরীর (berry) বহিস্তরের অপ্রয়োজনীয় খোসাটি কিছু জীবাণু যথা **ট্রাইকোডার্মা (Trichoderma)** এর সাহায্যে কার্যকরীভাবে অপসারিত করা হয়। পরে ঐ ফল থেকে প্রয়োজনীয় পদ্ধতির মাধ্যমে কোকো বা কফি তৈরী করা হয়।

## ৭·৩৭ খাদ্যদ্রব্যাদির পচন ও জীবাণু :

বহু খাদ্যদ্রব্যের পচনে জীবাণুর দায়িত্ব সর্বজনস্বীকৃত। আসলে জীবাণু সর্বক্ষেত্রেই পচনক্রিয়া সংঘটনের জন্য দায়ী।

(ক) রুটীর পচন ও জীবাণু :

রুটী তৈরীর জন্য আটা, জল ও লবণ মিশিয়ে যে মাখা বা ডাফ্‌ (dough) তৈরী হয় তা গাঁজিয়ে তোলা হয় ঈষ্ট **স্যাকারোমাইসেস সেরেভিসি (S. cerevisiae)** এর সাহায্যে। ঈষ্ট মেশানোর পর ঘণ্টাকয়েক 'মাখা'টা ফুলে ফাঁপার পর ভাজতে হয়।

এই প্রস্তুত প্রক্রিয়ার যে কোন স্তরে রুটী পচনক্ষম জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে। অত্যধিক **লিউকোনস্টক** সংক্রমণে তার আঠাল পদার্থ ঈষ্ট-এর ফাঁপানো (baking) গুণাবলী নষ্ট করে। এছাড়াও বিভিন্ন ছত্রাক যথা

**পেনিসিলিয়াম, অ্যাসপারজিলাস, অয়িডিয়াম** প্রভৃতি রুটীকে নানাভাবে পচায়।

সাধারণতঃ আর্দ্রতা রোধক মোড়ক-কাগজে এদের প্রতিরোধ করা হয়। রুটীতে সংরক্ষক হিসাবে বিভিন্ন রাসায়নিক যথা অ্যাসেটিক অম্ল, অ্যাসিড কেলসিয়াম ফসফেট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ইদানীং রুটীর চরিত্র পরিবর্তন না করেও তার আর্দ্রতা যথেষ্ট কমানোর পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। সবকিছুর ওপরে রুটী তৈরী করার কারখানার পরিস্কার পরিচ্ছন্নতাও রুটীর পচন সমস্যা মোকাবিলা করার কাজে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়।

(খ) ডিমের পচন ও জীবাণু :

মুরগীর বেশীরভাগ ডিমেরই ভিতরটা জীবাণুমুক্ত হয়। তবে তাদের খোলা ও ভিতরের অংশটুকুতে গ্রাম ধনাত্মক ব্যাক্টিরিয়া দেখা যায়। পচা ডিমে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গ্রাম ঋণাত্মক ব্যাক্টিরিয়া থাকে, যার মধ্যে **অ্যালকালিজেন্স ফিকালিস (Alcaligens faecalis) প্রোটীয়াস ভালগারিস (Proteus vulgaris)** ও **সিউডোমোনাস ফ্লুরেসেন্স (Pseudomonas fluresence)** অন্যতম। ডিমে **সালমনেলাও** সংখ্যাবৃদ্ধি করতে সক্ষম। হাঁসের ডিমেও একই ধরনের পচন সমস্যা রয়েছে। ডিমকে জীবাণুমুক্ত রাখতে গেলে পাখীগুলিকেই যথাসম্ভব রোগমুক্ত ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়।

(গ) মাংসের পচন ও জীবাণু :

তাজা মাংসতে কিছু জীবাণু উৎপাদক প্রাণীর লসিকা (lymph node) গুলি থেকে আসে। তবে বেশীর ভাগ পচন ক্রিয়াক্ষম জীবাণু উৎপাদক প্রাণীর দেহজাত ময়লা ইত্যাদি থেকে আসে। মাংস কাটার যন্ত্রপাতি, বাতাস ইত্যাদি থেকেও মাংসে জীবাণু আসে। প্রাণীটির অসুস্থতা বা ক্লান্তি শরীরে মরণ-সংকোচন বা রিগর মরটিস (rigor mortis) তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে। এর ফলে পচন ত্বরান্বিত হয়। মাংসে যথেষ্ট গ্লাইকোজেন থাকলে সাথে কিছুটা ল্যাকটিক অম্লও থাকে যার ফলে মাংসের ব্যাক্টিরিয়াজনিত পচন বাধাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণীর রক্ত থেকেও **সেরাসিয়া (Serratia), সিউডোমোনাস, আক্রোমোব্যাকটর (Achromobactor)** প্রভৃতি ব্যাক্টিরিয়া মাংসে আসে। কাটা প্রাণী ঝুলিয়ে রাখার সময় কিছু ছত্রাক (ঈষ্ট) ও

ব্যাক্টিরিয়া মাংসে আসে। এই জীবাণুগুলি অবশ্য মাংস ঠাণ্ডা রাখলে আসতে পারেনা। ঠাণ্ডাতে থাকলেও মাংসের পচন হয় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে। উপরিভাগে **সিউডোমোনাস** একটা আঠাল স্তর ও অস্বাভাবিক গন্ধ সৃষ্টি করে। **ক্লষ্ট্রিডিয়াম নভি** (**Cl. novyi**) নামক ব্যাক্টিরিয়া ভিতরের অংশে পচন ধরাতে পারে। এজাতীয় কিছু জীবাণু শূকরের হ্যাম (Ham) কে অম্ল করে তোলে। মাংস স্থানান্তরের সময়ও **ক্লাডোস্পরিয়াম** ছত্রাক মাংসের ওপর কাল দাগ ধরায়। অন্যকিছু ব্যাক্টিরিয়া মাংসতে দুর্গন্ধ (rancidity) সৃষ্টি করে।

(ঘ) মাছের পচন ও জীবাণু :

সুস্থ মাছের অভ্যন্তরীণ অংশ জীবাণুমুক্ত হলেও বহিস্তরে বহু ব্যাক্টিরিয়া থাকে। সামুদ্রিক মাছের গায়ে **সিউডোমোনাস, অ্যাক্রোমোব্যাক্টর, ভিব্রিও, অ্যালকালিজেনাস** প্রভৃতি ব্যাক্টিরিয়া থাকে। মাছের পেটেও কিছু অবাত জীবাণু পাওয়া গেছে। ঠাণ্ডা এলাকাতে মাছে **ক্লষ্ট্রিডিয়াম বটুলিনাম** যথেষ্ট পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা সংরক্ষিত মাছেও **সিউডোমোনাস** সংক্রমণ ঘটে। অনেক মাছ লবণ জলের ( ৩%-র বেশী ) ডুবিয়ে অথবা মশলা দিয়েও সংরক্ষণ করা যায়। এতে গ্রাম ঋণাত্মক ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা কমে। ঠাণ্ডাতে মাছ ধোঁয়ানো (smoking) মাছ সংরক্ষণের আর একটি পদ্ধতি। এসব ব্যাপারে 'মাছের কাঠি' (fish sticks) খুবই কার্যকরী। কড ও হাডক মাছ ঠাণ্ডা ক'রে সেই মাছের টুকরো কেটে নিয়ে মশলাতে ডুবিয়ে ভেজে ( ২৬০° সে. এ ২ মিনিট ), প্যাকেটে ভরে ঠাণ্ডায় সংরক্ষণ করা হয়। ভারতীয়দের শুট্‌কীমাছ তৈরী দ্বারা সংরক্ষণ বা লবণ-মাছ তৈরী দ্বারা সংরক্ষণ পদ্ধতি হিসাবে খুবই কার্যকরী এবং সস্তা। তবে এসব সংরক্ষিত মাছে সবসময়ই একটা বিশেষ গন্ধ আসে।

এরকম বহু খাদ্যদ্রব্য পচনে জীবাণুর ক্রিয়াকলাপ বোঝা যায়।

# আট

## প্রায়োগিক জীবাণু বিজ্ঞানের আরও কিছু দিক
## (Some more Areas of Applied Microbiology)

"...প্রকৃতিতে একদল অব্যক্ত জীবাণু জৈব পদার্থের
নিহিত শক্তির অনেকটাই 'মিথেনে' পরিণত করছে।
এতকাল আমরা সেটা উপেক্ষা করেছি।"
—এম. পি. ব্রিয়ান্ট

৮'০০ জীবাণুদের মনে করা যায় অনেকগুলি উৎসেচকের একটি সু-সংগঠিত ব্যবস্থা। যে কোন একটি উৎসেচকের নির্ভেজাল অণুর চেয়ে এই সংগঠিত ব্যবস্থা অনেক জটিল অথচ কার্যকরী। জীবাণুরা তাদের উপকারি ও অপকারি উভয় প্রকার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে অত্যন্ত প্রভাবশালী। মানুষের দেহেও বহু শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়াতে জীবাণুর প্রভাব যথেষ্ট। এখনও পর্যন্ত জীবাণুজনিত বেশকিছু রোগের হাতে মানুষ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পন করে আছে। মূলতঃ বহু রোগের কারণ হিসাবে জীবাণুদের দেখার জন্যই এদের সম্পর্কে সচেতনতার বৃদ্ধি ঘটেছে। বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধী প্রক্রিয়া যেমন টিকা (vaccine) বা রোগনির্মূল করতে সক্ষম ঔষধ যেমন অ্যান্টিবায়োটিক বা অন্য ঔষধ আবিষ্কৃত হ'য়েছে। এই সমস্ত রোগের প্রকৃতি বুঝতে গিয়ে স্বভাবতই জীবাণু সম্পর্কে বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

জীবাণুর বিভিন্ন ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়াজনিত উৎপাদিত বস্তুর বৈচিত্র্যই বহু শিল্প (industry) সৃষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে বহু খাদ্য, পানীয়, ঔষধ ও অন্যান্য বহু মূল্যবান রাসায়নিক প্রস্তুত শিল্পই জীবাণু নির্ভর। ভারতবর্ষে এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য পুণার কাছে পিমপ্রিতে বা হৃষিকেশে অবস্থিত ঔষধ শিল্প অন্যতম। জীবাণু নির্ভর পদ্ধতিতে বহু খাদ্য দ্রব্যের গুণগতমান উন্নত করা হচ্ছে। খাদ্য-দ্রব্য ও অন্য বহু ব্যবহার্য ও মূল্যবান বস্তুর পচনে জীবাণুর দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী এবং এর ফলেও মানুষ শঙ্কিত। এসমস্ত

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রীর কার্যকরী সংরক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণাও ত্বরান্বিত হয়েছে। জনজীবনে আরও বহু স্থানে জীবাণু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান কার্যে লিপ্ত। নিষ্কাশিত জলপূর্ণ আবর্জনা (sewage)র যথাযথ পরিবহন, পচন ও দূরীকরণ বা কৃষিকার্যে জীবাণুর প্রত্যক্ষ ব্যবহার সম্ভাবনা অত্যন্ত মূল্যবান। ফসলের বা মৃত ফসলের অবশিষ্টাংশ বা অন্য আবর্জনার রূপান্তর মনুষ্য সমাজে এক অতি প্রয়োজনীয় প্রণালী যা মূলতঃ জীবাণু নির্ভর।

মোটামুটি ৩০° সে. উষ্ণতায় ৭'০০ অম্লক্ষারত্বে অধিকাংশ জীবাণু উপরোক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ভাবে তাদের কার্যসমাধা করে।

## ৮'১০ জীবাণু ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির পচনসমস্যা ঃ

খাদ্যদ্রব্য ছাড়া যেসব শিল্পজাত দ্রব্য-সামগ্রী জীবাণুজনিত কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার মধ্যে সেলুলোস জাতীয় দ্রব্য সামগ্রী অন্যতম। সেলুলোস রাসায়নিক দিক থেকে বিটা-১-৪-গ্লুকোপাইরানোস ($\beta$ 1-4 glucopyr-anose) দ্বারা গঠিত একটি হোমোপলিমার যার আণবিক ওজন ১-১'৩$\times$১০$^{৬}$। শাখাপ্রশাখাহীন এই চেনটি ৪০০০ আংষ্ট্রম (A) লম্বা।

৮'১১ তুলা থেকে উৎপাদিত বিভিন্ন ধরনের সমস্ত কাপড়েই মূলতঃ সেলুলোস রয়েছে। সাধারণ পরিধেয় বস্ত্র ছাড়া ত্রিপল, চট, ক্যাম্বিস, দড়ি ইত্যাদি বহুবিধ বস্তুও সেলুলোস দ্বারা গঠিত। কাগজ ও কাগজ-জাত মূল্যবান পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যাদিও মূলতঃ সেলুলোস।

সেলুলোসের বিয়োজনের সময় সাধারণতঃ প্রথমে সেলুলোস দানা (crystal) বিচ্ছিন্ন হয়। পরে সম্পূর্ণ অণুটি উৎসেচক দ্বারা হাইড্রোলাইজড হ'য়ে সেলোবিয়োস (Cellobiose) এ পর্যবসিত হয়। সেলোবিয়োসটি আবার বিটা-গ্লাইকোসাইডেস ($\beta$ glycosidase) উৎসেচক দ্বারা হাইড্রোলাইজড হ'য়ে গ্লুকোস হয়।

যেসব জীবাণু সেলুলোস জাত বস্তু সামগ্রীর বিয়োজন ঘটায় তাদের মধ্যে **কিটোমিয়াম গ্লবসাম (Chaetomium globosum) স্টাকিবট্রিস আত্রা (Stachybotrys atra)** ছত্রাক অন্যতম। এছাড়াও **মাইরোথেসিয়াম (Myrothecium)** আছে। আরও কিছু ছত্রাক যেমন **মিউকর, অ্যাসপারজিলাস, পেনিসিলিয়াম ও ফুসেরিয়াম** ঠিক সেলুলোস বিয়োজন না করলেও তার

ওপরের রং ইত্যাদি প্রলেপের উপর এই সমস্ত জীবাণুগুলি বৃদ্ধি পায়। সেলুলোস বিয়োজনে ব্যাক্টিরিয়ার অবদান খুবই সীমিত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবাত অবস্থাতে এরা সেলুলোস হাইড্রোলাইস (hydrolyse) করে, এবং এজাতীয় ব্যাক্টিরিয়াগুলি যথা **সেলিভিব্রিও** (**Cellvrbrio**), **সেলুলোমোনাস** (**Cellulomonas**), **সাইটোফাগা** (**Cytophaga**)। কাগজ ও কাগজের মণ্ডের ক্ষেত্রে খুব বেশী ক্ষতিকারক জীবাণু হচ্ছে **অলটারনেরিয়া, অ্যাসপারজিলাস, পেনিসিলিয়াম,** ও **ক্লাডোস্পোরিয়াম**। অল্প কিছু ব্যাক্টিরিয়া যেমন **ফ্লাভোব্যাক্টিরিয়াম** (**Flavobacterium**), **সিউডোমোনাস ডিসালফভিব্রিও** ও **ক্লষ্ট্রিডিয়াম** কাগজ মণ্ডের আঠাল অবস্থা সৃষ্টি ক'রে, অপ্রয়োজনীয় করে তোলে এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।

কাগজের জীবাণুজনিত বিয়োজনে উষ্ণতা, অক্সিজেনের সরবরাহ, আর্দ্রতা, অম্লত্ব প্রভৃতি অত্যন্ত প্রভাবশালী। আর্দ্রতার প্রভাব সর্বাধিক বলে এই সমস্ত বস্তুর সংরক্ষণ পদ্ধতিতে এদের অনার্দ্র রাখাটা একটি প্রকৃষ্ট উপায়। আর্দ্র আবহাওয়াতে বস্তুগুলিকে অনার্দ্র রাখা অসম্ভব বলে রাসায়নিক সংরক্ষক ও ব্যবহার করতে হয়।

বিভিন্ন ভারি ধাতুজাত লবণ একাজে লাগান হয়। সাধারণতঃ তামাঘটিত-লবণ কাগজ মণ্ডতে মেশানো হয়। কৃত্রিমতন্তু, রেয়ন (cellulose acetate) প্রভৃতি বিশেষ ধরনের কৃত্রিমতন্তু প্রায়ই জীবাণু আক্রমণ মুক্ত থাকে। উল বা উলজাত দ্রব্য মূলতঃ প্রোটিন। এদের জীবাণু জনিত বিয়োজন খুবই সামান্য। তবে এই বস্ত্রগুলির উপরে জমা ময়লাতে বহু পচনক্রিয়াপটু জীবাণু যেমন অ্যাক্টিনোমাইসিটস থেকে যায়। আরও কিছু মানুষের কিছু রোগজীবাণুও এই বস্ত্রগুলিতে থাকে। উলে মানুষের যেসব রোগজীবাণু প্রায়ই দেখা যায় তার মধ্যে **ব্যাসিলাস আনথ্রাসিস** বা **ট্রাইকোফাইটন** অন্যতম।

## ৮·১২ কাষ্ঠজাত দ্রব্যের জীবাণুজনিত পচন ও সংরক্ষণঃ

উদ্ভিদের জাইলেম বা পরিবাহক কলা হচ্ছে কাঠ এবং উদ্ভিদের এই অংশ লিগনিন ও সেলুলোস সহযোগে কিছুটা পারেনকাইমা জাতীয় কোষ দ্বারা তৈরী হয়। কোষ প্রাচীরে সেলুলোস, লিগনিন ছাড়া পলিসাকারাইড যেমন জাইলান, হেমিসেলুলোস, মানান ইত্যাদি থাকে।

লিগনিন একদল সিরিনজালডিহাইড, ভ্যানিলিন ও কনিফেরিল আলকোহল জাতীয় বৃহদাণু দ্বারা গঠিত। এই অণুগুলি সহজে বিয়োজিত হয় না। গুপ্ত-বীজীদের (angiosperm) কাঠ (wood) কে সাধারণতঃ কঠিনকাঠ (hard wood) এবং কনিফারদের (conifer) কাঠকে সাধারণতঃ নরম কাঠ (soft wood) বলা হয়। গঠন প্রকৃতি, রাসায়নিক প্রকৃতি ও বিয়োজিত হবার সামর্থর দিক দিয়ে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র বর্তমান। যেসব জীবাণু বিভিন্ন কাঠ ও কাষ্ঠজাত দ্রব্য পচনে সক্ষম তাদের একটি ক্ষুদ্র তালিকা দেওয়া হল। সারণী-৩৫।

**সারণী ৩৫ : জীবাণু ও কাষ্ঠজাতদ্রব্যের পচন**

| আক্রান্তকাষ্ঠ বা কাষ্ঠজাত দ্রব্য | আক্রমনকারী জীবাণু | পচনের প্রকৃতি |
|---|---|---|
| করাত দ্বারা কাটাকাঠ | মেরুলিয়াস লাক্রিমানস (Merulius lachrymans) | শুকনা পচন |
| কাটাকাঠ ও বোর্ড | কনিওফোরা সেরিবেলা (Coniophora cerebella) | কালোজালি দাগযুক্ত পচন |
| দাঁড়ানো গাছের কাঠ | ফোমেস অ্যানোসাস ও (Fomes anosus) আর্মিলেরিয়া মিলি (Armillaria mellea) | শুক্না পচন |
| মৃতগাছ | ফিস্টুলিনা হেপাটিকা (Fistulina hepatica) পলিপোরাস (Polyporus) গ্যানোডার্মা (Ganoderma) | ” |

ছত্রাক কাঠে লিগনিন বিয়োজন না ক'রে সেলুলোস বিয়োজন করলে পচনের রঙ হয় বাদামী। সেলুলোস ও লিগনিন—দুইই বিয়োজন করলে রঙ হয় সাদা। কাষ্ঠপচনের অন্যতম প্রধান ছত্রাক **মেরুলিয়াস (Merulius)** বাদামী

পচনের সাথে কাঠটিকে টুকরো টুকরো খণ্ডে পরিণত করে। **ফোমেস (Fomes)** এর আক্রমণ হলে কাঠের মধ্যে ছোটছোট সাদাগর্ত তৈরী হয় এবং সময় সময় গাছের শিকড়ও পচায়।

কাঠের উপর পচনের প্রভাব বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। পচনের পরিমাণ অনুযায়ী কাঠের ঘনত্ব (density) হ্রাস, কুঞ্চন (shrinkage) বৃদ্ধি, রাসায়নিক সংযুতির (composition) ও রঙের পরিবর্তন ও সর্বপরি কাঠের শক্তি (strength) হ্রাস প্রভৃতি দেখা যায়। কুঞ্চিত কাঠ থেকে পরবর্তীকালে তক্তা তৈরী (plank) করার সময় যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। রাসায়নিক পরিবর্তন কাঠকে মণ্ড তৈরীর কাজেও অযোগ্য করে তোলে। অবাঞ্ছিত রঙ বহুক্ষেত্রে কাঠের ব্যবহার সীমিত করে। পচনের সবচেয়ে ক্ষতিকারক প্রভাব হচ্ছে কাঠের শক্তি হ্রাস যা কাঠের ব্যবহারিক মূল্য হ্রাস করে। আসলে কাঠের শক্তি বলতে প্রসার্য শক্তি (tensile strength), আনতি (bending), আঘাত-শক্তি (impact) ও পেষণ বিরোধী শক্তি (crush strength) প্রভৃতির সমন্বয়কেই বোঝায়। এদের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর কাঠের ব্যবহার-যোগ্যতা নির্ভরশীল। কিছু ছত্রাক রয়েছে যেমন **পেনিসিলিয়াম (Penicillium)** ও **অ্যাসপারজিলাস** কাঠে রঙ সৃষ্টি ক'রে তাকে বহুক্ষেত্রে ব্যবহারের অযোগ্য করে তোলে। অত্যন্ত আর্দ্র এলাকাতে কাঠের নরম পচন দৃষ্টি-গোচর হয়। কাঠের বহিস্তরকে **কিটোমিয়াম, জাইলেরিয়া, ফোমা, বাইস্পোরা** ইত্যাদি ছত্রাক সরসম্পঞ্জের মত ক'রে তোলে। কাঠের অধিকাংশ পচন ছত্রাক দিয়ে হলেও ব্যাক্টিরিয়া দিয়েও এর পচন অবাত অবস্থাতে (জলে ডোবান থাকলে) হয়। এরকম অবস্থা মণ্ড কারখানার কাঠডোবান পুকুরে প্রায়ই দেখা যায়। যেসব কাঠ নদীতে ভাসিয়ে দূরে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানেও দেখা যায়।

কাঠের পচন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়ানো মৃত গাছ তাড়াতাড়ি কাটা ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখা। অত্যধিক মূল্যবান গাছের ক্ষেত্রে শল্য-চিকিৎসা দ্বারা আক্রান্ত অংশ বাদ দেওয়া যেতে পারে। কতকগুলি কাঠের জাত রয়েছে যাতে পচন যথেষ্ট কম দেখা যায়। অত্যন্ত সীমিত পচন সমস্যা দেখা যায় সেগুন (Teak ; **Tectona grandis**), আখরোট, (walnut ; **Juglans sp.**) রেড সেডার, (Red cedar ; **Thuja plicta**)

ও ওক (oak ; **Quercus** sp.) প্রভৃতি কাঠে। কঠিন কাঠ (heart wood) কোমল কাঠ (sap wood) অপেক্ষা ২০% কম আদ্র´। ফলে কঠিন কাঠে পচন কম হয়। রাসায়নিক সংরক্ষণে আলকাতরা থেকে তৈরী ক্রিওসোট (creosote) খুবই কার্যকরী। তবে এতে কাঠে একটা রঙ ধরে ও উগ্র গন্ধ হয়। মূল্যবান কাঠে তাই বিভিন্ন তামা ঘটিত রাসায়নিক দেওয়া হয়। বড় ট্যাঙ্কে রেখে উচ্চচাপে বিভিন্ন ঔষধ কাঠে ঢোকানও হয়।

## ৮·১৩ পেট্রোলিয়াম ও অন্য হাইড্রোকারবন জাতীয় দ্রব্যের বিয়োজন ও জীবাণু ঃ

পেট্রোলিয়াম জাতীয় দ্রব্যসামগ্রীর বিয়োজনে ব্যাক্টিরিয়া প্রধান ভূমিকা পালন করে, কারণ এর বিয়োজন মূলতঃ অবাত অবস্থাতেই ঘটে। অপরিশ্রুত তেলে জল ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। এর ফলে তেলে জীবাণু আক্রমণ তরান্বিত হয়। তৈল জাতীয় পদার্থে যেসব ব্যাক্টিরিয়া বিয়োজন ঘটায় তাদের উৎস মাটি। **সিউডোমোনাস এরুজিনসা (Psudomonas aeruginosa)**, **ডিসালফভিব্রিও, মাইকোব্যাক্টিরিয়াম, অ্যাক্টিনো-মাইসিটস** ইত্যাদি তেলের পাত্রে প্রবেশের পর নল ও আধারে বসবাস করতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মাটির তলাতে সালফেট বিজারক ও অন্য তৈল বিয়োজনক্ষম ব্যাক্টিরিয়া থাকে। তারা ঐ তৈল বহুদিনধরে নষ্ট করে। এর ফলে সাধারণত তেলের সান্দ্রতা (viscosity) সামান্য নষ্ট হয়। জারণ ক্রিয়ার ফলে কিছু তেল নষ্ট হয় এবং তেলের অ্যালিফাটিক ও অ্যারোমাটিক অংশের পরিমাণেরও পরিবর্তন হয়। গ্যাসোলিন, কেরোসিন, প্যারাফিন ইত্যাদির বিয়োজন জনিত ক্ষতি খুব একটা সমস্যা নয়। বিয়োজনে কোষে উৎপাদিত রাসায়নিক যৌগগুলি যেমন হাইড্রোজেন সালফাইড ($H_2S$) এর পরিমাণ বেড়ে গেলে তেলের গ্রহণযোগ্যতা কমে। মিথেন তৈরী হ'বার ফলে তেলের আধারে বিস্ফোরণও ঘটে। এরোপ্লেনে ব্যবহৃত তেলে **ক্ল্যাডোস্পরিয়াম রেসিনি (Cladosporium resinae)** র বৃদ্ধি তৈলনালী ইত্যাদি বন্ধ ক'রে বিপদ্‌জনক দুর্ঘটনা ও ঘটাতে পারে। বিয়োজনের ফলে যেসব জৈব অম্ল সৃষ্টি হয় তারা তৈলাধার ও নালীর ক্ষতি করে। শুধুমাত্র এই ছত্রাকের জন্যই জেট প্লেনগুলির সমস্ত তেল এখন সুক্ষ্ম পরিস্রাবক দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয়। তরলগতি নির্ভর

যন্ত্রেও (hydraulic) তেলের এ জাতীয় সমস্যা রয়েছে এবং তা প্রতিরোধের জন্য ছত্রাকনাশী ঔষধও মেশান হয়। তৈলকূপ খননের কাজেও ডিসালফভিব্রিও ব্যাক্টিরিয়া সালফুরিক অম্ল তৈরী ক'রে নালির ক্ষয়সাধন (corrosion) করে। নীচের দিকের এসমস্ত নল বদ্‌লানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তৈলকূপ খননে যে অন্তঃপ্রবেশ কূপ (injection well) গুলি দিয়ে উচ্চচাপে জল ঢুকিয়ে তৈল বার করা হয় সেগুলিও কিছু জীবাণু বন্ধ করে দিতে পারে।

## ৮·১৪ জীবাণু ও অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের বিয়োজন সমস্যা :

জীবাণুর বিয়োজন পরিধি বিরাট ও প্রায় সীমাহীন। বিভিন্ন প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য বিভিন্ন জীবাণু বিয়োজন করে। তার একটা ক্ষুদ্র তালিকা দেওয়া হ'চ্ছে শুধুমাত্র এই বিয়োজন পরিধি সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা করার জন্য ( সারণী-৩৬ )।

**সারণী ৩৬ : জীবাণু শিল্পজাত দ্রব্যসম্ভারের ক্ষয় পচন ও প্রতিরোধ**

| শিল্পজাতদ্রব্য | দ্রব্যের অবস্থান/ ব্যবহার | আক্রমণকারী জীবাণু | প্রতিরোধ ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|
| আতস কাঁচ (lens) | বিভিন্ন মূল্যবান যন্ত্রপাতিতে | অ্যাসপারজিলাস | অনার্দ্র রাখা ও ধূমায়ন (fumigation) |
| রঙ ও বার্ণিশ (paints and varnishes) | আসাবাবপত্র, দরজা-জানলা যন্ত্রপাতি | পুলুলেরিয়া (Pulularia), ফোমা, ক্লাডোস্পরিয়াম ও সিউডোমোনাস | জীবাণুনাশী রাসায়নিক |
| প্রস্তরাদি (stones) | অট্টালিকা ; হর্ম, স্মৃতিস্তম্ভ, অলংকার | থায়োব্যাসিলাস (Thiobacillus) | পরিচ্ছন্নতা |
| প্লাস্টিক (plastics) | বিভিন্নদ্রব্যাদি | পেনিসিলিয়াম ও অ্যাসপারজিলাস | প্লাস্টিসাইজার, লরেট ও ওলিয়েটের সাথে রাসায়নিক মেশানো |

| শিল্পজাত দ্রব্য | দ্রব্যের অবস্থান/ ব্যবহার | আক্রমণকারী জীবাণু | প্রতিরোধ ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|
| রবার জাতদ্রব্য (Rubber materials) | টায়ার, টীউব ইত্যাদি দ্রব্য | অ্যাক্টিনোমাইসিটস ও সেরাসিয়া | বিভিন্ন ছত্রাকনাশী যথা থাইরাম, জিনেব মেশানো |
| তড়িৎ অপরিবাহী দ্রব্য (electric insulators) | ইলেকট্রিক তার ও অন্যান্য স্থানে | বিভিন্ন ছত্রাক | পলিভিনাইল ক্লোরাইড অপরিবাহী তৈরী |
| আঠা (gum) | বই, খাতা ইত্যাদি | ক্লাডোস্পরিয়াম ও মিউকর | গঁদ ও ময়দার আঠার পরিবর্তে প্লাস্টিক আঠা যথা ইউরিয়া ফরমালডিহাইড পলিমার ব্যবহার |
| চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য | ব্যাগ, জুতো, স্যুটকেশ ইত্যাদি | বিভিন্ন ছত্রাক | ক্রোমট্যান পদ্ধতি ব্যবহার ও নাইট্রোফেনল প্রয়োগ |
| সিল্ক ও সিল্কজাত দ্রব্য | বস্ত্র ইত্যাদি | " | ময়লা মুক্ত রাখা |
| উল ও উলজাত দ্রব্য | শীত বস্ত্রাদি | মাইক্রোস্পোরাম ও **(Microsporum)** ট্রাইকোফাইটন | " " |
| পাটজাত দ্রব্য | কাছি, দড়ি, চট, ত্রিপল, জাল ইত্যাদি | হুমিকোলা **(Humicola)** কিটোমিয়াম, জালেরিয়ান **(Zalerian)** | ডাই ক্লোরোফিল ও পেণ্টা ক্লোরোফেনল জাতীয় রাসায়নিক ব্যবহার |

| শিল্পজাত দ্রব্য | দ্রব্যের অবস্থান/ব্যবহার | আক্রমণকারী জীবাণু | প্রতিরোধ ব্যবস্থা |
|---|---|---|---|
| জ্বালানী (fuels) | মোটর, ট্রাক্টর, উড়োজাহাজ রকেট প্রভৃতি | থার্মোডেনড্রন (Thermodendron) ও ক্লাডোস্পো-রিয়াম | জ্বালানীতে ডোডে-কেন বা সিটেন জাতীয় সরল চেন জাতীয় রাসায়নিক কমিয়ে অকটেন বেশী রাখা। আধারে টলুইন মেশানো |

## ৮·২০ জীবাণু ও বিভিন্ন জীবের রোগ সমস্যা :

জীবাণুর সর্বাধিক ক্ষতিকর যে ক্রিয়াকলাপ তার মধ্যে বিভিন্ন জীব যথা মানুষ, অন্যান্য প্রাণী ও উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টি অন্যতম। বিশেষতঃ মানুষের রোগ সৃষ্টির জীবাণু সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা বেড়েছে। ফসলও গৃহপালিত জীব-জন্তুর রোগ সৃষ্টি ক'রেও জীবাণুরা মানুষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে।

## ৮·২১ জীবাণু ও মানুষের রোগ সমস্যা :

মানুষের অসংখ্য রোগের কারণ কোন না কোন জীবাণু। ব্যাক্টিরিয়াজনিত বহু রোগ যেমন টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, কলেরা, ডিপথিরিয়া, টিটেনাস, যক্ষা, সিফিলিস ইত্যাদি ; ভাইরাসজনিত বহু রোগ যেমন বসন্ত, হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হারপিস, পোলিও, ক্যানসার, ইত্যাদি, প্রোটোজোয়াজনিত কিছু রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, আমাশয় ইত্যাদি মানুষের জীবনে অত্যন্ত ভীতিজনক ও সমস্যা বিশেষ।

জল, মাটি, ময়লা, বাতাস, খাদ্য ইত্যাদি বহু উৎস থেকে এই রোগগুলির জীবাণু মানুষকে আক্রমণ করে। সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার অন্য কিছু অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ মানুষকে এই সমস্ত রোগ আক্রমণে সহায়তা করে।

এই সমস্ত রোগজীবাণু সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে এবং

তাদের নিয়ন্ত্রণ ও বিনাশ করার বিভিন্ন পদ্ধতিও আবিষ্কৃত হয়েছে যা আগে আলোচিত হয়েছে।

মনুষ্য দেহের বহিস্তরেও প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে প্রায় ২ লক্ষ জীবাণু অবস্থানকরে যাদের তিনটি গোষ্ঠীতে ভাগ করা যায়, যথা ডিপথেরয়েডস (Diptheroids), **মাইক্রোকক্কাস** ও **স্টাফাইলোকক্কাস** এবং ঈষ্ট বা **পিটিরোসপরাম (Pityrosporum)**।

দেহমধ্যে আরও বহু জীবাণু বিভিন্ন ভাবে প্রবেশ করে ও বিভিন্ন কলা আক্রমণ করে। মনুষ্য রোগসৃষ্টিকারী প্রধান জীবাণুগুলিকে একটি ক্ষুদ্র তালিকাবদ্ধ ক'রে উপস্থাপিত করা যায়। সারণী—৩৭। এই জীবাণু গোষ্ঠীগুলি স্বতন্ত্রভাবে দেহত্বক, শ্বসনযন্ত্রের উপবিভাগ, শ্বসন যন্ত্রের নিম্নভাগ, খাদ্যানালীর বিভিন্ন অংশে, যৌন ও রেচন তন্ত্রের স্নায়ুতন্ত্র, রক্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট লসিকাতন্ত্র প্রভৃতির রোগ সৃষ্টি করে। এছাড়া খাদ্যনালীর রোগ সৃষ্টিকারী আর একদল জীবাণু খাদ্যকে বিষে পরিণত করেও রোগ সৃষ্টি করে (food poisoning) যেমন ত্বকের কিছু জীবাণু আঘাতপরবর্তী পচনের (wound infection) জন্য দায়ী।

**সারণী ৩৭ : জীবাণুজনিত মনুষ্য রোগ**

| রোগ | জীবাণু | আক্রান্ত অঙ্গ |
|---|---|---|
| কার্বাঙ্কল ও ফুরাঙ্কল (Curbuncles & Furuncles) | **স্টাফাইলোকক্কাস অরিয়াস** | দেহত্বক |
| বসন্ত (Small pox) | **বসন্ত ভাইরাস ভ্যারিওলা** | " |
| ডিপথেরিয়া (Diptheria) | **করাইনেব্যাক্টেরিয়াম ডিপথেরি** | গলা |
| নিউমোনিয়া (Pneumonia) | **স্ট্রেপটোকক্কাস নিউমোনি** | ফুসফুস |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) | **মিক্সোভাইরাস** | শ্বসন যন্ত্রের নিম্নাংশ |

| রোগ | জীবাণু | আক্রান্ত অঙ্গ |
|---|---|---|
| হুপিং কাশি (Whooping cough) | বর্দেটেলা পারটুসিস (Bordetella pertussis) | শ্বসন যন্ত্রের নিম্নাংশ |
| যক্ষা (Tuberculosis) | মাইকোব্যাক্টিরিয়াম টুবারকুলসিস | মূলত: শ্বসন যন্ত্রের নিম্নাংশ |
| মামপ্‌স (Mumps) | পারামিক্সোভাইরাস | পারটিড লালা গ্রন্থি |
| কামলা (Hepatitis) | ভাইরাস | যকৃত |
| দাস্ত ও বমন (Diarrhea & Vomiting | সাল্‌মনেলা | পাকস্থলী ও অন্ত্র |
| আমাশয় (Dysentry) | সাইজেলা ডিসেনটেরি (Shigella dysenteriae) | অন্ত্র |
| কলেরা (Cholera) | ভিব্রিও কোলেরি | পাকস্থলী ও অন্ত্র |
| অ্যামিবায়োসিস (Amoebiosis) | জিয়ার্ডিয়া লামবলিয়া (Giardia lamblia) ও এন্টামিবা হিস্টোলিটিকা | পাকস্থলী |
| খাদ্য বিষক্রিয়া (Food poisoning) | ক্লস্ট্রীডিয়াম ও ব্যাসিলাস | পাকস্থলী ও অন্ত্র |
| বি. কোলাই (B. coli) | এসেরিসিয়া কোলাই | রেচন তন্ত্র |
| গনোরিয়া (Gonorrhea) | নাইসেরিয়া গনরহি (Neisseria gonorrhoeae) | জনন-তন্ত্র |
| সিফিলিস (Syphilis) | ট্রেপোনেমা প্যালিডাম (Treponema pallidum) | |
| মেনিনজাইটিস (Meningitis) | নাইসেরিয়া মেনিনজাইটিডিস | স্নায়ুতন্ত্র |
| কুষ্ঠ (Leprosy) | মাইকোব্যাক্টিরিয়াম লেপ্রি | স্নায়ুতন্ত্র |

| রোগ | জীবাণু | আক্রান্ত অঙ্গ |
|---|---|---|
| পোলিও (Poliomyelitis) | পোলিও ভাইরাস | স্নায়ুতন্ত্র |
| জলাতঙ্ক (Hydrophobia) | র‍্যাবিস ভাইরাস | স্নায়ুতন্ত্র |
| পোড়া ঘা (Burn wound) | সিউডোমোনাস এরুজিনাস ও স্ট্যাফ অরিয়াস | আঘাতপ্রাপ্ত কলা |
| কাটা-ঘা (Surgical wound) | স্ট্যাফ-অরিয়াস ও স্ট্যাফ-পায়োজিনস | কাটা কলা |
| টিটেনাস (Tetanus) | ক্লস্ট্রিডিয়াম টিটানি | আঘাতপ্রাপ্ত কলা |
| রক্তে বিষক্রিয়া (Septicemia) | ই. কোলি, এন্টারোব্যক্টর এরোজিনস ইত্যাদি | রক্ত |

## ৮.২২ জীবাণু ও অন্যান্য প্রাণীর রোগ সমস্যা :

বহু জীবাণু মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী দেহেও রোগ সৃষ্টি করে। নিম্নে একটি তালিকা দেওয়া হল। এরা মানুষের উপকারী প্রাণীকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করে। এছাড়া অনেকগুলি জীবাণু এই সমস্ত প্রাণীদেহ থেকেও মানুষকে আক্রমণ করে।

**সারণী ৩৮ : বিভিন্ন প্রাণীর জীবাণুজনিত রোগ**

| রোগ | আক্রান্ত প্রাণী | জীবাণু | মানুষকে আক্রমণ |
|---|---|---|---|
| শ্বাসকষ্ট (strangles) | ঘোড়া (horse) | স্ট্রেপটোকক্কাস ইকুই (**Streptococcus equi**) | করে না |
| স্তনপ্রদাহ (mastitis) | গরু (cows) | স্ট্রে. আগাল্যাক্‌টি (**Streptococcus agalactiae**) | করে না |
| প্লেগ (plague) | ইঁদুর (rats) | পাস্তুরেলা পেসটিস (**Pasturella pestis**) | করে |

| রোগ | আক্রান্ত প্রাণী | জীবাণু | মানুষের দেহে আক্রমণ |
|---|---|---|---|
| সংক্রামক গর্ভপাত (contagius abortion) | গরু, ঘোড়া ও ভেড়া (cow, horse & sheep) | ব্রুসেলা আবোর্টাস (**Brucella abortus**) | করে |
| ,, | শূকর (swine) | ব্রু. সুই (**B. suis**) | করে না |
| ইনফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) | বাঁদর (monkey) | হিমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জী (**Haemophilus influenzae**) | করে |
| আনথ্রাক্স (anthrax) | গরু ও ভেড়া (cow & sheep) | ব্যাসিলাস আনথ্রাসিস (**Bacillus anthracis**) | করে |
| পচনশীলক্ষত (Gas gangrene) | গরু ও ভেড়া (cattle & sheep) | ক্লস্ট্রিডিয়াম ওয়েলচি (**Clostridium welchii**) | করে |
| ডিপথেরিয়া (Diptheria) | খরগোশ (Rabbit) | করাইনেব্যাক্টিরিয়াম ডিপথেরি (**Corynebacterium diptheriae**) | করে |
| যক্ষা (Tuber-culosis) | গরু (Catlle) | মাইকোব্যাক্টিরিয়াম টিউবারকুলোসিস (**Mycobacterium tuberculosis**) | করে |
| ,, | পাখী (birds) | মাই. অ্যাভিয়াম (**My. avium**) | করে না |
| জলাতঙ্ক (Rabies) | কুকুর (dogs) | র‍্যাবিস ভাইরাস (**Rabies virus**) | করে |

**৮.২৩ জীবাণু ও উদ্ভিদের রোগ সমস্যা :**

উদ্ভিদের বেশীর ভাগ রোগই জীবাণুজনিত এবং রোগজীবাণুগুলির মধ্যে ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস, কৃমি এমনকি শৈবালও রয়েছে। জীবাণুর আক্রমণের ফলে উদ্ভিদের উপর নানা লক্ষণ প্রকাশ পায়। পচন (rotting), ধসা (damping off), দাগ (spot), ঝলসানো (blight), ঢলে পড়া (wilt), অর্বুদ (gall), হলুদছোপ (mosaic) ইত্যাদি খুবই পরিচিত লক্ষণ। আক্রমণকারী জীবাণুকে রোগজীবাণু (pathogen) এবং আক্রান্ত উদ্ভিদকে পোষক (host) বলা হয়। রোগজীবাণুরা বিভিন্নভাবে ও পরিমাণে পোষক উদ্ভিদের ওপর নির্ভরশীল।

যেসব ক্ষেত্রে জীবাণু পোষক উদ্ভিদের ওপরই সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পায় ও সংখ্যাবৃদ্ধি করে যেমন ছত্রাকের মধ্যে তুলারোগের (downy mildew), সাদাগুঁড়া রোগের (powdery mildew) ও মর্চেরোগের (rusts) জীবাণু ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়ার মধ্যে **রিকেটসিয়া (Rickettsia)** এবং ভাইরাসের সকলেই দায়বদ্ধ পরজীবি (obligate parasite)। বাকীদের মধ্যে বহু ছত্রাক, ব্যাক্টিরিয়া, কৃমি, শৈবাল ইত্যাদি জীবাণু পোষক উদ্ভিদ ছাড়া অন্য কৃত্রিম খাদ্যেও চাষযোগ্য।

জীবাণু উদ্ভিদদেহে ঢুকে কয়েকটি স্তর পার হ'য়ে রোগসৃষ্টি ক'রে। প্রথমতঃ প্রবেশ-পূর্ব (pre penetration) স্তরে জীবাণু বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদের সংস্পর্শে আসে। সংস্পর্শে আসা স্পোর বা প্রোপাগুল (propagule) এর অঙ্কুরোদ্গম হ'য়ে ছত্রাক উদ্ভিদদেহে বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে (post infection) জীবাণুর সংখ্যাবৃদ্ধি বা সূত্রাণুর দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ক'রে উদ্ভিদ দেহস্থিত বিভিন্ন কলা আক্রমণ করে। এই ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ আকৃতির পরিবর্তনগুলি রোগের লক্ষণ হিসাবে প্রকাশিত হয়।

উদ্ভিদও বিভিন্নভাবে রোগ প্রতিরোধ করে। বপন বা রোপনের সময় পরিবর্তনের দ্বারা উদ্ভিদের অপ্রতিরোধী স্তর ও জীবাণুর আবির্ভাবের অসঙ্গতি উদ্ভিদরোগ এড়াতে (escape) সহায়তা করে। যেমন জলদি মুগে হলুদ ছোপ রোগ কম হয়। উপরিস্তরের পুরু ত্বকে (cuticle) জীবাণুর আক্রমণ (invasion) বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন দেখা যায় আলুবোখরার (plum) **স্কেলেরোটিনিয়া (Sclerotinia)** সহনশীল প্রকারে। আলু **এস. স্কাবিস (S. scabies)**

জীবাণু আক্রমণ প্রতিরোধ করে কর্কস্তর সৃষ্টির মাধ্যমে (cork formation)। বহু ফসলের প্রতিরোধী প্রকারগুলি তাদের দেহে কিছু প্রতিরোধী রাসায়নিক সৃষ্টি করে। কিছু পেঁয়াজের প্রকারে প্রোটোক্যাটেচুইক অম্ল (protocatehuic acid) এর অবস্থান তার রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু **কোলেটোট্রাইকাম সারসিনান্স (Colletotrichum circinans)** কে সফলভাবে প্রতিরোধ করে। জীবাণু আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হিসাবেও (response) কিছু পোষক উদ্ভিদে প্রতিরোধী রাসায়নিক সৃষ্টি হয়। যাদের ফাইটোঅ্যালেক্সিন (phytoalexin) বলা হয়; যেমন মটরের কিছু 'প্রকারে' পিসাটিন সৃষ্টি (pisatin) হ'য়ে রোগ প্রতিরোধ করে।

কতকগুলি প্রধান ফসলের উচ্চহারে ক্ষতিকারক রোগের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। সারণী-৩৮।

**সারণী ৩৮ : জীবাণু ও উদ্ভিদ রোগ**

| উদ্ভিদ রোগ | জীবাণু | কতটা ক্ষতিকারী |
|---|---|---|
| ধানের পোড়াদাগ (Blast) | **পাইরিকুলেরিয়া অরাইজী** | ব্যাপক |
| ধানের ব্যাক্টিরিয়াজনিত ঝলসানো (Bacterial Blight) | **জ্যানথোমোনাস অরাইজী** | বহু বিস্তৃত |
| গমের বাদামীমর্চে (Rust) | **পাক্সিনিয়া রিকনডিটা** | ব্যাপক |
| আখের লালপচা (Red rot) | **কোলেটোট্রাইকাম ফ্যালকাটাম** | ব্যাপক |
| পাটের ডাঁটাপচা (Stem rot) | **মাক্রোফোমিনা ফাসিওলিনা** | ব্যাপক |
| ছোলার ঢলে পড়া (Wilt) | **ফুসেরিয়াম অক্সিপোরাম সাইসেরিসে** | ব্যাপক |
| মুগের হলুদ ছোপ (Mosaic) | ধানের হলুদ মোসেক ভাইরাস | ব্যাপক |
| আলুর নাবিধসা (Late Blight) | **ফাইটফ্থোরা ইনফেসটানস** | ব্যাপক |

| উদ্ভিদ রোগ | জীবাণু | কতটা ক্ষতিকারী |
|---|---|---|
| কপির কালোপচা (Black rot) | জ্যান্থোমোনাস কাম্পেসট্রিস | ব্যাপক |
| আলু ও বেগুনের ঢলে পড়া (Wilt) | সিউডোমোনাস সোলানেসিয়েরাম | ব্যাপক |
| আমের বিকৃত মুকুল (Malformation) | ফুসেরিয়াম মনিলিফরমি | যথেষ্ট |
| কলার পানামা ঢলা (Panama wilt) | ফুসেরিয়াম | যথেষ্ট |
| লঙ্কার ক্ষত রোগ (Anthracnose) | কোলেটোট্রিকাম ক্যাপসিসি | যথেষ্ট |
| লেবুর দ্রুতশুকান (Quick decline) | ট্রিসটেজা ভাইরাস | যথেষ্ট |
| বেগুনের ব্যাক্টিরিয়াজনিত ঢলা (Bacterial wilt of Brinjal) | সিউডোমোনাস সোলানেসিয়েরাম | যথেষ্ট |

উদ্ভিদের রোগগুলির দমনব্যবস্থা মূলতঃ দুটি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। (ক) রোগসৃষ্টি প্রতিরোধ (prophylaxis) ও (খ) পোষকের প্রতিরোধ শক্তি-বৃদ্ধি (immunization)। রোগসৃষ্টি প্রতিরোধ বলতে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আইন-গত পদ্ধতি (regulatory measures), পরিচ্ছন্নতা (sanitary measures), সংরক্ষণ (protection) প্রভৃতি অন্যতম। অন্যদিকে পোষক উদ্ভিদের প্রতিরোধ শক্তিবৃদ্ধি করা যায় নতুন প্রকার প্রজনন দ্বারা (breeding resistant variety), বা সঞ্চয়ণ দ্বারা (selection)। প্রতিরোধী রাসায়নিক দ্বারা উদ্ভিদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির ঘটনা খুবই সীমিত। উদ্ভিদদেহে বসবাস-কারী জীবাণুকে সর্বাংগবাহী ছত্রাকনাশী (systemic fungicide) দ্বারা উৎখাত ক'রে উদ্ভিদকে রোগমুক্ত করার উপযুক্ত রাসায়নিক ইদানীং বেশ কিছু আবিষ্কৃত হয়েছে।

## ৮·৩০ জীবাণুভিত্তিক শিল্প :

জীবাণুর ক্ষতিকারক ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত বহুক্ষেত্রে উপকারী প্রভাবও লক্ষণীয়। মানুষের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জীবাণুকে নানা কাজে ব্যবহারের দৃষ্টান্ত বহু।

মানুষ এবং তার পালিত জীবজন্তুর জীবন ও স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে অত্যাবশ্যক বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক, ঔষধ ও টিকা (vaccines) র প্রস্তুত কার্যে জীবাণু ব্যবহারের সাফল্য অসীম। জীবাণুজনিত যে সমস্ত রাসায়নিকের জীবাণুনাশের বা প্রতিরোধের যথেষ্ট ক্ষমতা রয়েছে অত্যন্ত অল্প মাত্রাতে ব্যবহার করলেও। এই রাসায়নিকগুলি রোগ নিরাময়ী (therapeutic) বা প্রতিরোধী (prophylactic) হয়। এদের বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic)। জীবাণুজনিত অন্য ঔষধের (drugs) মধ্যে বহু উৎসেচক ভিত্তিক ঔষধও রয়েছে। মৃত বা অক্ষম (attenuated) জীবাণুকোষ বা তার অংশ দ্বারা সৃষ্ট টিকা মানুষ ও অন্য প্রাণীর শরীরে প্রয়োগের (administered) পর সেই জীবাণু প্রাণীদেহে অধিকতর প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে। মানুষের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই শিল্পে নানারকম টিকা প্রস্তুত ক'রে মানুষের অসীম উপকার হচ্ছে।

৮·৩১ সারাবিশ্বে নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের অনুসন্ধান অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলা সত্ত্বেও এখনও বহু জীবাণুজনিত রোগের ঔষধ অজ্ঞাত রয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদক জীবাণুগুলি মূলতঃ মৃত্তিকাবাসী। অতি প্রয়োজনীয়

**সারণী ৩৯ : জীবাণু ও অ্যান্টিবায়োটিক**

| অ্যান্টিবায়োটিক | উৎপাদক জীবাণু | যে রোগ উপশম করে |
|---|---|---|
| পেনিসিলিন | পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম | শ্বসন যন্ত্রের রোগ |
| স্ট্রেপটোমাইসিন | স্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস | ক্ষয় রোগ ও অন্যান্য |
| টেট্রাসাইক্লিন | স্ট্রেপ রিমোসাস | আন্ত্রিক ও অন্য রোগ |
| ক্লোরোমাইসেটিন | স্ট্রেপ ভেনিজুয়েলি | আন্ত্রিক জ্বর |
| গ্রিসিওফুলভিন | পেনিসিলিয়াম পাটুলেটাম | ছত্রাক জনিত রোগ |

কয়েকটি মাত্র অ্যান্টিবায়োটিকের তালিকা এ সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। সারণী-৩৯।

মানুষের জীবাণুজনিত রোগগুলির মধ্যে অনেকগুলির যেমন অ্যামিবাজনিত আমাশয় (amoebic dysentry), কালাজ্বর কলেরা, গনোরিয়া, একাজ্বরী জ্বর, ব্যাক্টিরিয়াজনিত আমাশয় (Bacillary dysentry), সিফিলিস, ক্ষয় রোগ, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, বিভিন্ন কৃমির সংক্রমণ প্রভৃতির জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য রাসায়নিক ঔষধ থাকলেও কোন অ্যান্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষধ জানা নেই। মানুষের যে সমস্ত রোগের জীবণুজনিত ঔষধ বিশেষতঃ অ্যান্টিবায়োটিক দ্বারা উপশম হয় তাদের সংখ্যাও কম নয়। কিছু চর্মরোগের (mycetoma) ক্ষেত্রে পেনিসিলিনের সিঞ্চন চিকিৎসা বা কর্টিসোন (cortisone) ও নিসটাটিন (nystatin) এর মিশ্রণের প্রলেপ কিছুটা কার্যকরী। ফুসফুসের হিস্টোপ্লাসমোসিস (Histoplasmosis) রোগে অ্যাম্ফোটেরিসিন-বি (amphotericin-B) যথেষ্ট কার্যকরী। ব্যাক্টিরিয়াজনিত ক্ষয় রোগে আইসোনায়াজাইড (isoniazide) এর সাথে স্ট্রেপটোমাইসিন দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার্য। আন্ত্রিকজ্বরের (enteric fever) জন্য ক্লোরোমাইসেটিন, নিউমোনিয়ার জন্যে পেনিসিলিন, অ্যাম্পিসিলিন (ampicillin) বা এরিথ্রোমাইসিন (erythromycin), কর্ণ-গহ্বরের পীড়ার জন্য জেণ্টামাইসিন (gentamycin) বিস্ফোটকের জন্য পটাশিয়াম পেনিসিলিন (K-penicillin), অ্যামিবায়োসিস এর জন্যে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন (oxytetracycline), রিকেটসিয়াজনিত টাইফয়েডে ক্লোরোমাইসেটিন এবং অর্ব্বুদের জন্য মাইটোমাইসিন-সি (mitomycin-C) বা অ্যাক্টিনোমাইসিন-ডি (actinomycin-D) বহুলব্যবহৃত।

জীবাণুজনিত কিছু অ্যান্টিবায়োটিক বিভিন্ন প্রাণীর রোগ নিরোধক হিসাবে ছাড়াও তাদের বৃদ্ধি বর্দ্ধক (growth promotor) হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। মুরগী, শুয়োর, গরু প্রভৃতির ক্ষেত্রে আমেরিকাতে ব্যাসিট্রাসিন (bacitracin), ক্লোরোমাইসেটিন, অক্সিটেট্রাসাইক্লিন, পেনিসিলিন, প্রোকেন (procaine) ও টাইলোসিন প্রভৃতির ব্যবহার ঐ সমস্ত প্রাণীর বৃদ্ধির হার ২-৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে। ইদানীং কালে জীবাণুর মধ্যে বংশসূত্র বহির্ভূত ঔষধ প্রতিরোধী বিশেষত্ব (extrachromosomal drug resistance) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যে এই সমস্ত কার্যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার সংযত করার চেষ্টা চলছে।

উদ্ভিদের রোগদমনে দু'একটি অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকরীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে যেমন ধানের পোড়াদাগের জন্য ব্লাস্টিসিডিন-এস (Blasticidin-s) ও ও কাসুগামাইসিন (Kasugamycin) এবং লঙ্কার ব্যাক্টিরিয়াজনিত পাতার দাগ, বাঁধাকপির কালোপচা ইত্যাদির জন্য স্ট্রেপটোমাইসিন ও টেট্রাসাইক্লিনের মিশ্রণ (Streptocycline)। এক্ষেত্রেও মানুষের রোগের জন্য অতি প্রয়োজনীয় স্ট্রেপটোমাইসিন এর কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার সংযত করার চেষ্টা হচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে স্টেপটোমাইসিনের টেট্রাসাইক্লিন মিশিয়ে ব্যবহার করা হলেও এটা সংযত করা জন-স্বাস্থ্যের স্বার্থেই প্রয়োজনীয়।

## ৮·৩২ টিকা বা ভাক্সিন (vaccine) :

টিকা বা ভাক্সিন বর্তমানে একটি বহুল প্রচলিত রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এইগুলি সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট জীবাণুরই মৃত বা অক্ষম কোষ বা অংশ দ্বারা তৈরী করা হয়। টিকাগুলি তাদের সংযুতি, কার্যকারিতা, প্রতিরোধক্ষমতার দায়িত্ব প্রভৃতির দিক থেকে নানারকমের হয়। সংযুতির দিক থেকে টিকা ভৌত বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে অক্ষম করা বা মৃত সংশ্লিষ্ট জীবণু কোষ হ'তে পারে বা কোষ কণাও হ'তে পারে। অথবা তাদের অংশবিশেষ আঠাল পদার্থ বা টক্সিন দিয়েও তৈরী হ'তে পারে। বর্তমানে অতিপরিচিত টিকাগুলির একটি তালিকা উপস্থাপিত করা হচ্ছে। (সারনী-৪০)

সারণী ৪০ : জীবাণু ও টিকা

| রোগ | বর্তমান টিকা | দেওয়ার পদ্ধতি |
|---|---|---|
| কলেরা | সম্পূর্ণকোষের মৃত অবস্থা | ইনজেকশন |
| ডিপথেরিয়া | টক্সয়েড বা অধিবিত্ত (toxin) জাত | ” |
| টিটেনাস | ” ” | ” |
| পোলিও | অক্ষম বা হৃতশক্তি ভাইরাস | গলাধকরণ |
| টাইফয়েড | সম্পূর্ণ জীবাণুকোষের মৃত অবস্থা | গলাধকরণ |

কার্য্যকারিতা ও প্রতিরোধক্ষমতার স্থায়িত্বের দিক থেকে সমস্ত টিকা সমান কার্য্যকরী নয়। বসন্তের টিকা ১বছর কার্য্যকরী। কিন্তু পোলিও টিকা ততটা

কার্য্যকরী নয়। মেনিনজাইটিস-এর টিকার কার্যকারিতা কিছুক্ষেত্রে ( গ্রুপ-এ ও সি র বিরুদ্ধে ) সফল এবং কিছুক্ষেত্রে ( গ্রুপ-বি ) সফল নয়।

প্রোটোজোয়া জনিত রোগগুলি যথা ম্যালেরিয়া ইত্যাদির টিকা এখনও তৈরী করা সম্ভব হয়নি। নিউমোনিয়ার জন্য এখন পলিভালেন্ট (polyvalent) টিকা বেরিয়েছে। ক্ষয়রোগের টিকা বি. সি. জি. (B. C. G. বা Bacille Calmette Guerin strain) মানুষের সমাজে অতি পরিচিত। ক্রান্তীয় অঞ্চলে সমস্যা বিশেষ আন্ত্রিক গোলযোগের জন্য টিকা তৈরীর চেষ্টা এখনও সাফল্য লাভ করেনি। তবে টাইফয়েডের ক্ষেত্রে অতি সম্প্রতি এক টিকার গলাধকরণ যথেষ্ট কার্যকরী বলে দেখা গেছে। কলেরার ক্ষেত্রেও মৃত ব্যাক্টিরিয়া জনিত টিকা খুব একটা কার্যকরী নয়, তবে বর্তমানে আমেরিকাতে একরকম অক্ষম কোষ ভিত্তিক টিকা কার্যকরী হ'য়েছে। সাইজেলোসিস, ভাইরাস জনিত আন্ত্রিক গোলযোগ, প্রোটোজোয়া জনিত আমাশয় বা অন্য আন্ত্রিক রোগের কোন টিকা নাই।

## ৮.৪০ জীবাণু ও নানা রাসায়নিক :

জীবাণু বহু প্রকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সৃষ্টি ক'রে থাকে। এই রাসায়নিকগুলি মানুষের বিভিন্ন কাজে লাগে। এদের উৎপাদনের জন্য অনেক জীবাণুভিত্তিক শিল্প গড়ে উঠেছে। সারণী ৪১।

**সারণী ৪১ : জীবাণু ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক হারে উৎপাদিত রাসায়নিক**

| রাসায়নিক | জীবাণু | উৎপাদনহার | কোন বস্তুপরি উৎপাদন |
|---|---|---|---|
| সাইট্রিক অম্ল (citric acid) | অ্যাসপারজিলাস নাইজার | ৮০গ্রাম/প্রতিগ্রাম গ্লুকোস | গুড় (molasses) |
| ভিটামিন বি-১২ (vit-B-12) | প্রোপাইনোব্যাক্টিরিয়াম (Propinobacterium) | ২০মি.গ্রা/লিটারে | ভূট্টা |
| গ্লুটামিক অম্ল | করাইনেব্যাক্টিরিয়াম গ্লুটামিকাম | ৬০গ্রা/লিটারে | গুড় |
| লাইসারজিক অম্ল (lysergic acid) | ক্লাভিসেপ্‌স পারপুরিয়া | ৩০গ্রা/লিটারে | রাই শীষ |

| রাসায়নিক | জীবাণু | উৎপাদনহার | কোন বস্তুপরি উৎপাদন |
|---|---|---|---|
| আমাইলেস (amylase) | অ্যাসপারজিলাস অরাইজী | ৪০গ্রা/লিটার | বহু উদ্ভিদ দ্রব্য |
| জানথানস (xanthans) | জানথোমোনাস ফাসিওলি | ৩০গ্রা/লিটারে | — |
| লাইপেস (lipase) | রাইজোপাস | ২০গ্রা/লিটারে | — |
| জিব্বারালিন (gibberellins) | জিব্বারেলা ফুজিকুরই (**Gibberella fuzikuroi**) | ৫গ্রা/লিটারে | উদ্ভিজ দ্রব্য |
| ল্যাকটিক অম্ল | লাকটোব্যাসিলাস ডেলব্রুকি (Lactobacillus delbruckie) | | |
| নারিনজিনেস (naringinase) | অ্যাসপারজিলাস নাইজার | | |

(ক) বহু রাসায়নিক যৌগই জীবাণুরা তৈরি করে। এরমধ্যে বিভিন্ন শিল্প যেমন জ্যাম, জেলী, ফল-পানীয়, কেকবিস্কুট (confectionary) প্রসাধন দ্রব্য (cosmetics) উৎপাদক শিল্পে এই সব জীবাণু উৎপাদিত রাসায়নিক যথেষ্ট ব্যবহার হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বর্তমানে পৃথিবীতে শুধু ১ লাখ টন সাইট্রিক অম্লই তৈরী হচ্ছে জীবাণু আবাদ পদ্ধতিতে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপ্রাণ মানুষের জীবনে অপরিহার্য। খাদ্যপ্রাণও বহু তৈরী করা হচ্ছে জীবাণুর সহযোগিতায়। বেশীর ভাগ অ্যামিনো অম্লই আজকাল জীবাণু দ্বারা তৈরী হচ্ছে। সুপ (soup) ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যে গন্ধ ও যথাযথ স্বাদ সৃষ্টিকরার জন্য বছরে নূন্যতম ১লাখ টন গ্লুটামিক অম্ল জীবাণুর দ্বারা তৈরী করা হচ্ছে। জীবাণুর সংশ্লেষিত পলিসাকারাইড অত্যন্ত সস্তা উৎস-বস্তু থেকে সংশ্লেষণ সম্ভব, এবং বহু শিল্পে যেমন সিরাপ, আইসক্রীমে স্থিতি স্থাপক (stabilizer) হিসাবে, রঙ (paint) এ, ফাব্রিক রঙ (fabric paint)-এ তৈলকূপ খননের কাজে, প্রসাধন শিল্পে, নানা ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে সমস্ত

জীবাণু ঐসব পলিসাকারাইড সংশ্লেষণ শিল্পে বহুল ব্যবহৃত তার মধ্যে **লিউকোনসটক, জানথোমোনাস, ব্যাসিলাস, রাইজোবিয়াম** প্রভৃতি অন্যতম। এই জীবাণু সৃষ্ট পলিসাকারাইডগুলির উষ্ণতা, অম্ল-ক্ষারত্ব ও বিভিন্ন ধাতব লবণের সংস্পর্শে সহনশীলতা অত্যন্ত মূল্যবান বিশেষত্ব হিসাবে গণ্য হয়। এরা বিভিন্ন কাজে যেমন সমুদ্রগর্ভে তৈল খনের কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। **লিউকোনসটক** সংশ্লেষিত ডেক্‌সট্রান এককালে রক্ত প্লাজমার মূল্যবান পরিবর্ত (substitute) ছিল। জিব্বারালিন জাতীয় রাসায়নিক এখন কৃষিক্ষেত্রে বীজহীন আঙুর (seedless grapes) সৃষ্টি ইত্যাদি পদ্ধতিতে ব্যবহৃত হচ্ছে। **ক্লাভিসেপস** এর তৈরী লাইসারজিক অম্ল, ক্লাভিন (clavine ইত্যাদির ঔষধগত (pharmacological) ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী।

(খ) শিল্পে ব্যবহৃত উৎসেচক গুলির মধ্যে জীবাণু জনিত আমাইলেস (amylase) অন্যতম। মন্ত শিল্প থেকে সুরু করে সিরাপ ও রুটী তৈরীতে, কাগজ শিল্পে, কেক-রুটী শিল্পে এই উৎসেচক বহুল ব্যবহৃত। ব্যাক্টিরিয়ার আমাইলেসগুলি উচ্চতাপ সহনশীল ব'লে তাদের তাঁত শিল্পেও ব্যবহার করা হয়। ব্যাক্টিরিয়াজনিত প্রোটীয়েস উৎসেচক এখন চর্মশিল্পে ট্রিপসিন (trypsin) এর বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাঁত বা ফোটো শিল্পেও এর কদর খুব বেশী। সিল্ক বোনার আগে সেরিসিন (sericine) বা কেজিন (casein) দিয়ে যে তন্তুর শক্তি বৃদ্ধি করা হয় পরবর্তীকালে বোনাবস্ত্র থেকে সেই সেরিসিন নির্বিঘ্ন অপসারণের জন্য প্রোটীয়েস অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভালোজাতের পনীর তৈরীতে ছত্রাক যথা **এণ্ডোথিয়া, মিউকর (Endothia, Mucor)** সৃষ্ট রেনিন (rennin) উৎসেচক অতি প্রয়োজনীয়। **অ্যাসপারজিলাস** সৃষ্ট পেক্‌টিনেস লাগে কফি শুঁটির ব্যবহারিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াতে (Processing)। উলের গায়ে তৈলাক্ত আস্তরণ সৃষ্টিতে **রাইজোপাস** এর সংশ্লেষিত লাইপেস অবশ্য প্রয়োজনীয়। লেবুর রসের (juice) তিক্ত স্বাদের জন্য দায়ী নারিনজিনের রস থেকে (naringin) অপসারণে **অ্যাসপারজিলাস নাইজার** এর তৈরী নারিন্‌জিনেস (naringinase)-এর বিকল্প নেই।

৮·৪১ অনেক ক্ষেত্রে জীবাণুকে কোন রাসায়নিক যৌগের গঠন (structure) পরিবর্তনেও কাজে লাগানো হয়। একটি স্টেরয়েড (steroid) অণু সৃষ্টি করতে গবেষণাগারে ৩২টি ধাপের রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। ছত্রাকের

সাহায্যে এই স্টেরয়েড সংশ্লেষণ অতি সহজেই সম্ভব হয়েছে। রাসায়নিক পদ্ধতিতে যে কর্টিসোন (cortison) ও কর্টিলল (cortilol) অণু সংশ্লেষণ দুঃসাধ্য তা কানিংহামেলা ব্লাকেসলিয়ানা (**Cunninghamella blackesleana**) ছত্রাকের সাহায্যে ডিঅক্সিকর্টিসল (deoxycortisol) থেকে সংশ্লেষণ বিস্ময়কর ভাবে সম্ভব হয়েছে।

## ৮·৪২ জীবাণুনির্ভর শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা :

মৃত বা লালসমুদ্রের উচ্চ লবণযুক্ত জলে ডুনালিয়েলা (**Dunaliella**) নামক এক জীবাণু শৈবাল বাস করে। তারা প্রচুর পরিমাণে গ্লিসেরল (glycerol) তৈরী করে। এজাতীয় শৈবালগুলিকে এই কাজে লাগানোর পরীক্ষা অত্যুদ্দমে চলছে।

**ফুসেরিয়াম অক্সিস্পোরাম** জাতীয় ছত্রাক সৃষ্ট ফুসারিক অম্ল মানুষের ভয়ঙ্কর পার্কিনসন রোগের (Parkinson's Disease) সাথে সংশ্লিষ্ট উৎসেচক ডোপামাইন-বিটা-হাইড্রক্সিলেস (Dopamine-$\beta$-hydroxylase) কে নিষ্ক্রিয় করে। তাই একেও ব্যবহারের নানা চেষ্টা চলছে।

মনুষ্য-খাদ্য ছত্রাক **কোপ্রিনাস আত্রামেনটারিয়াস্** (**Coprinus atramentarius**) এ কোপ্রিন (Coprin) নামক একটি কোহল বিরোধী রাসায়নিক যৌগ রয়েছে। সুরাপানের ফলে নেশাগ্রস্থ ব্যাক্তির চিকিৎসাতে এই কোপ্রিনের ব্যবহারের সম্ভাবনা প্রচুর।

উচ্চ রক্তচাপ (hypertension) অবনমনে সমর্থ রক্তের কোলেস্টেরল বিধ্বংসী রাসায়নিক উৎপাদনক্ষম ছত্রাকও অচিরেই মিলবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন। একটা মোটামুটি হিসাবে দেখা যায় জীবাণুরা প্রায় ৫ সহস্র বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ও ৫ শত উৎসেচক সংশ্লেষণে সক্ষম। স্বভাবতই এর মধ্যে এক বিরাট সম্ভাবনার বীজ নিহিত রয়েছে।

জীবাণু **নোকার্ডিয়া** (**Nocardia**) অর্বুদ বিরোধী (antitumor) ক্রিয়াক্ষম আউসামিটোসিন (ausamitocin) জাতীয় অণু সংশ্লেষণে সক্ষম।

কিছু ব্যাক্টিরিয়াতে ইনসুলিন তৈরীর বংশাণু (gene) প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। এখন এই ব্যাক্টিরিয়াগুলি মানুষের অন্ত্রে সংস্থাপন ক'রে বহুমূত্র রোগীদের (diabetes) সমস্যা দূরীকরণের এক অসাধারণ প্রচেষ্টা চলছে।

মানুষের মস্তিষ্কের হাইপোথালামাস (hypothalamus) এ সৃষ্ট আর একটি প্রয়োজনীয় হরমোন সোমাটোস্টাটিন (somatostatin) জীবাণু দ্বারা সৃষ্টির চেষ্টা **ই. কোলি** এর ক্ষেত্রে সফল হওয়াতে জীবাণুর এই ধরনের ব্যবহারে যথেষ্ট আশার কারণ রয়েছে।

বর্তমানে মাটির তলাতে মিথেন ব্যবহারকারি জীবাণুর সংখ্যা নির্ণয়ের সাহায্যে তৈলের অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হচ্ছে। তেলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে **ডিসালফ্ভিব্রিও**-কে ব্যবহার করার জন্য ও বিভিন্নদেশে চেষ্টা চলছে। এই জীবাণু তেলের গাঢ়ত্ব কমিয়ে দেয় এবং ক্যালকেরিয়াস (Calcarius) পাহাড় স্তরে কূপের ব্যাস বাড়িয়ে দিতে পারবে পাহাড় গলিয়ে। সামুদ্রিক জল যে তৈল সমস্যার সৃষ্টি করে তাকেও ঈষ্ট ও ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা বিনষ্ট করা একটা গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

## ৮·৫০ জীবাণুভিত্তিক কৃষিকর্ম ও প্রকৌশল :

কৃষিকর্ম ও অন্য বহু প্রকৌশলগত ক্রিয়াকলাপে জীবাণুর দায়িত্ব গ্রহণ ও পালন লক্ষ্যণীয়। কৃষিকর্মের বহু কার্যাবলী ও প্রকৌশলে কৃষি উৎপাদনগুলির যথাযথ প্রক্রিয়াকরণ (processing) ইত্যাদিতে জীবাণুর অবদানের কথা জানার ফলে মানুষের জীবনে জীবাণুর অপরিসীম প্রভাব বোঝা যায়।

৮·৫১ পাটের পচন-প্রক্রিয়া ও জীবাণু(Jute retting) : পাট, মেচতা-পাট প্রভৃতি তন্তু উৎপাদনকারি ফসলে উদ্ভিদের কাণ্ড থেকে পচনের ফলে যে তন্তু বার করা হয় তা অবাত জীবাণুজনিত প্রক্রিয়ার ফল। গঠনগতভাবে উদ্ভিদদেহ শর্করার বিভিন্ন যৌগ যেমন সেলুলোস, হেমিসেলুলোস, পেকটিন প্রভৃতি দিয়ে তৈরী। কোষপ্রাচীরের সেলুলোস সাধারণতঃ জীবাণুদ্বারা সহজে আক্রান্ত হয় না, যদিও হেমিসেলুলোস ও পেকটিন অনেক সহজে হাইড্রোলাইজড্ হয়।

যখন পাটের বাণ্ডিলগুলি পুষ্করিণীর জলে বা ধীর প্রবাহিনী জলে ডোবানো হয় তখন পেকটিক বস্তুগুলি জল শোষণ ক'রে ফুলে ওঠে। জলে দ্রবণীয় অংশ বেরিয়ে আসে। এতে জীবাণুর বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ তৈরী হয়। অবাত জীবাণুরা পেকটিক বস্তুগুলিকে হাইড্রোলাইজ করে। জীবাণুগুলির মধ্যে **ক্লস্ট্রিডিয়াম পেক্টিনোভোরাম** ও **ক্ল. ফেলসিনেয়াম (Cl. felsineum)**,

এর উপস্থিতিতে ২ সপ্তাহেও পচনসম্পন্ন হতে পারে। সবাত পরিস্থিতিতে যে পাট পচানোর রীতি রয়েছে যাতে পাটের বাণ্ডিলগুলি মাঠেই ফেলে রাখা হয় তাতে **ক্লাডোস্পরিয়াম হারবেরাম (Clad. herbarum)** বা **সি. ফ্লুরে-সেন্স (Ps. flurescens.)** জীবাণু ডাঁটাগুলিকে আক্রমণ করে ও পচন সম্পন্ন করে। তবে এই পদ্ধতিতে সময় লাগে বেশী—প্রায় ৩ মাস।

## ৮·৫২ সাইলেজ তৈরী ও জীবাণু (silage making) :

যে কোন ফসলের পরিত্যক্ত অংশে যাতে যথেষ্ট পরিমাণ শর্করা থাকে তা থেকে সাইলেজ তৈরী করা সম্ভব। এই শর্করা জীবাণুর দ্বারা অম্লে রূপান্তরিত হ'লে সেই অম্লই এই পশুখাদ্য সংরক্ষণ করে। সাধারণতঃ ভুট্টা, বাজরা ও অনেক রকমের শুঁটী জাতীয় ফসলের পাতা ও ডালপালা থেকে সাইলেজ তৈরী করা হয়। গাছপালাগুলি ছোট ছোট ক'রে কাটার পর একটি বায়ু চলাচল নিরোধী (airtight) কুঠীতে (silo) বন্ধ ক'রে রাখা হয়। পরে সমস্তটাকে চাপ দিয়ে ভিতরের বাতাস বা'র করে দিয়ে জল দেওয়া হয়। যে সমস্ত জীবাণু ঐ কাটাগাছে থাকে যথা **এসেরিসিয়া** ও **এরোব্যাকটর (Aerobacter)** তারা গাছের শর্করাকে গাঁজিয়ে ফেলে। প্রথমে যেটুকু অক্সিজেন ($O_2$) থাকে তা ঐ ফসলের পাতা ও ডাল শ্বসনের সাহায্যে শেষ ক'রে ফেলে। এর ফলে যথেষ্ট উত্তাপ সৃষ্টি হয় ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) তৈরী হয়। পরে অম্লত্বের বৃদ্ধির সাথে **ষ্ট্রেপটোকক্কাস** ও **ল্যাকটোব্যাসি-লাস** জাতীয় ব্যাক্টিরিয়ার সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। যথেষ্ট (৩—৫%) পরিমাণে ল্যাকটিক, অ্যাসেটিক ও বুটিরিক (butyric) অম্ল ও কিছুটা কোহল তৈরি হয়। এর ফলে সাইলেজটি কয়েক বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত হয়। সমস্ত গাঁজানো প্রক্রিয়াটি মাসখানেকে শেষ হয়। সাইলেজটির অম্লত্ব বৃদ্ধি ছাড়াও এটি বিশেষ গন্ধযুক্ত হয় ও এর খাদ্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

## ৮·৫৩ কম্পোষ্ট পচন প্রক্রিয়া ও জীবাণু (composting) :

জৈবপদার্থ জঞ্জালের জীবাণু জনিত পচনকে বলা হয় কম্পোষ্ট তৈরী করা (composting)। কম্পোষ্ট তৈরীর কাজ বহুদিন ধ'রে মানুষের জানা একটা প্রক্রিয়া। নানা রকমের ব্যাক্টিরিয়া এই পচনক্রিয়া সংগঠিত করে।

জৈবপদার্থের পরিবেশটা উপযুক্ত হ'লে জীবাণুজনিত পচনের হার বৃদ্ধি পায়। সংগঠিত কম্পোষ্ট এর ক্ষেত্রে উষ্ণতা ১০—৪০° সে. থেকে ৫০—৭০° সে. পর্যন্ত লাগে। সংশ্লিষ্ট জীবাণুর প্রকৃতি অনুযায়ী এটি নির্ধারিত হয়। এছাড়াও অক্সিজেন ($O_2$) এর সরবরাহ, আর্দ্রতা এবং ব্যবহৃত জৈব পদার্থের উপরও অনেকটা নির্ভর করে। অনেক ব্যাক্টিরিয়া তাদের পচনক্রিয়ামাধ্যমে যে শক্তি সৃষ্টি করে তাতে কম্পোষ্টের উষ্ণতা স্বভাবতই বৃদ্ধি পায়। সবাত প্রক্রিয়াই এক্ষেত্রে দুর্গন্ধ মুক্ত কম্পোষ্ট তৈরীতে সক্ষম।

কম্পোষ্টিং-এ কৃষিজমির ব্যবহার্য বস্তুগুলির মধ্যে গড়ে সর্বোচ্চ আর্দ্রতার পরিমাণ ৮০-৮৫%. আর শহরাঞ্চলে কাগজে ৫৫%। এই সমস্ত বস্তু অন্য জৈব পদার্থ সহযোগে কম্পোষ্ট তৈরীতে ব্যবহৃত হয়।

পচনযোগ্য বস্তুর কার্বন ও নাইট্রোজেন-এর অনুপাতের উপর কম্পোষ্ট-পচন অনেকাংশে নির্ভরশীল। সকল পচনের প্রয়োজনে এই অনুপাত ৩০ : ১-এর বেশী হলে চলেনা। আবার ২০ : ১-এর কম হলে নাইট্রোজেন কিছুটা অ্যামোনিয়া ($NH_3$) হিসাবে নষ্ট হ'তে পারে। ফলে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই অনুপাতের কম বেশী সংশোধনের জন্য সবুজ বস্তু বা বিভিন্ন জীব বা মাছের জঞ্জাল দেওয়া হয়, নাইট্রোজেনের উৎস হিসাবে এবং খড় ইত্যাদি কার্বনের উৎস হিসাবে।

৮.৫৪ তামাকপাতা শুষ্কজরানো ও জীবাণু (curing) : তামাকের পাতা প্রথমে সংরক্ষণার্থে শুকানর পর দ্বিতীয় পর্যায়ে গাঁজানো হয়। মূলতঃ তার রঙ, গন্ধ ও গ্রথন উন্নত করার জন্য।

গাছ থেকে পাতা তোলার পর পাতাগুলি আঁটি বেঁধে দড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়, বিভিন্ন পদ্ধতিতে শুষ্ক সংরক্ষণের (curing) জন্য। ঝিমিয়েপড়া পাতাগুলি ৪০ দিন ধরে দিনে রৌদ্রে শুকানো ও রাতে হিমে ভিজানো হয়। সিগার পাতার ক্ষেত্রে অবশ্য এটা ছায়াতেই করা হয় ২ মাস ধরে। অনেকক্ষেত্রে ঘরের মধ্যে এই ঝোলান পাতার তলাতে হালকা আগুনের ব্যবস্থা রেখে আগুন-শুকানোও (fire-cure) করা হয়। তিন সপ্তাহ ধরে শুকান হয় পাইপের তামাক তৈরীর জন্য। সিগারেটের তামাক গরম হাওয়া (flue-curing) পদ্ধতিতে ধোঁয়া ব্যতিরেকে পাইপের সাহায্যে পাতায় উত্তাপ দিয়ে কয়েকদিনে পাতার রঙ হলুদ ও পাকা করা ও ডাঁটা শুকান (২৫—৭৫° সে.) হয়।

পরবর্তীকালে শুকানো তামাক পাতাকে যখন গাঁজান হয় তখন একটু ভিজিয়ে নানারকম পাত্রে বিশেষ চাপে ভরে, ৪৫° সে. উষ্ণতাতে ও ৬০% আর্দ্রতাতে (আর. এইচ) রাখা হয়। সাধারণতঃ ভিজান পাতা ঘরের মেঝেতে থাক দিয়ে মাদুর দিয়ে ঢেকে রাখা হয় ভিতরটা ঘামানোর উদ্দেশ্যে। ২—৩ দিন পরে ওপর-নীচে ক'রে উল্টে-পাল্টে দেওয়া যায়। উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণের জন্য ঠাণ্ডা জল ছিটানো বা ঢাকা খুলে রাখা হয়। এই স্তরে যথাযথ জীবাণুজনিত গাঁজানর ফলে স্তূপ থেকে কার্বনডাই-অক্সাইড ($CO_2$), অ্যামোনিয়া ($NH_3$) ইত্যাদি বেরোয়। পাতা সুগন্ধ, হালকা রঙযুক্ত ও নরম-ভঙ্গুর অবস্থাযুক্ত হয়। পাতায় নিকোটিনের পরিমাণ অনেক কমে। এই পরিবর্তনটা মূলতঃ পাতার উৎসেচক দ্বারা হলেও কিছু জীবাণু যেমন **ব্যা. মেগাথেরিয়াম, ব্যা. সাবটিলিস,** বা **অ্যাসপারজিলাস** ও **পেনিসিলিয়াম** উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

## ৮.৫৫ বর্জ্য পদার্থের বন্দবস্তকরণ (Sewage disposal) :

ঘন জনবসতি পূর্ণ এলাকাতে সমস্ত বর্জ্য পদার্থর বন্দবস্তকরণ জীবাণুজনিত পদ্ধতিতে করা হয়। বর্জ্য পদার্থে সাধারণতঃ জৈব ও অজৈব বস্তু তরল জলীয় মাধ্যমে দ্রবীভূত থাকে। গৃহজাত বর্জ্য পদার্থে (domestic sewage) সর্বাধিক থাকে স্নেহজাতীয় অম্ল (fatty acids)। তারপর থাকে কার্বহাইড্রেট ও প্রোটিন। এছাড়াও স্নেহজাতীয় অম্লের ইষ্টার দ্রবণীয় অম্ল ইত্যাদি থাকে। এদের বিয়োজনে সর্বক্ষেত্রে জীবাণুর ভূমিকা প্রধান হলেও পদ্ধতি হিসাবে নানা পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থ শোধন করা হয়।

### (ক) অবাত উপহ্রদ বা ধাপা (Lagoon) :

বিভিন্ন প্রকার ঘন জৈব বর্জ্য পদার্থ বহুকাল ধরে দেশী পদ্ধতিতে উন্মুক্ত মাঠে ২—৫' গভীর খাত খনন করে জমা করা হয় যা তরল বা অর্ধতরল অবস্থার জন্য অবাত পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং উন্মুক্ত আবহাওয়াতেই জৈব বর্জ্য পদার্থর পচনক্রিয়া বলে।

জীবের বর্জ্য পদার্থে বহুল পরিমাণে পচনশীল বস্তু থাকে। এই সমস্ত অবাত উপহ্রদে বিভিন্ন স্তরে পর পর বহু বিক্রিয়ার মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ

পরিবর্তিত হয়। এই বর্জ্য পদার্থ পয়ঃপ্রণালীজাত (sewage) বর্জ্য পদার্থ থেকে স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়। যেমন এর ঘনত্ব বেশী হয়।

(ক) প্রথম স্তরের বিক্রিয়াতে স্নেহ পদার্থ, প্রোটিন ও সেলুলোজ আংশিক বিয়োজিত হয়।

(খ) পরবর্তী স্তরে পচনশীল বস্তুগুলির অধিকতর বিয়োজন ও পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জৈব অম্লতে পরিণত হয় ও কার্বনডাই-অক্সাইড ($CO_2$) ও তৈরী হয়।

(গ) তৃতীয় স্তরে কিছু জীবাণু যেমন মিথানোজেনিক ব্যাক্টিরিয়া উপরোক্ত বস্তুগুলি থেকে মিথেন ($CH_4$) গ্যাস সৃষ্টি করে। সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হতে দীর্ঘ সময় ব্যায়িত হয়। পুরাতন অবাত 'উপহ্রদে' পচনের হার হ্রাস পায়। অনেক ক্ষেত্রেই চুণ প্রয়োগের দ্বারা এগুলিকে প্রয়োজনীয় 'উচ্চ ক্রিয়াক্ষমতা' স্তরে উন্নীত করা যায়। শীতের মরশুমে পচনের হার সাধারণতঃ হ্রাস পায়। বর্জ্য পদার্থ-উপহ্রদগুলিতে বিপুল পরিমাণে জ্বালানী অর্থাৎ মিথেন গ্যাস উৎপন্ন ও নষ্ট হচ্ছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে প্লাস্টিক আস্তরণের সাহায্যে উক্ত গ্যাস সংগ্রহ করে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃতও হচ্ছে।

এই সমস্ত প্রাণীজ বর্জ্য পদার্থ সবাত পদ্ধতিতেও পচানো বা বিয়োজন সম্ভব। সেক্ষেত্রে ল্যাকটিক অম্ল ব্যাক্টিরিয়া ও **কাণ্ডিডা (Candida)** বা ঈষ্ট অংশ গ্রহণ করে।

শহরাঞ্চলের যাবতীয় বর্জ্য পদার্থ বৃহদাকার জলাশয়ে (tank) জলপ্রবাহ দ্বারা বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পয়ঃ প্রণালীর (sewerage) মাধ্যমে। জলাশয়ে বর্জ্য পদার্থ বাতাস দ্বারা বাতান্বিত (aerate) করা হয় এবং কয়েক ঘণ্টা দ্রুত ঘন্টনের মাধ্যমে বর্জ্যের জলীয় অংশ পার্শ্ববর্তী নদীতে এবং বাকী অংশটুকু পাতন জলাশয়ে (settling tank) নেওয়া হয়। বর্জ্য পদার্থে বেশী কার্বো-হাইড্রেট থাকলে পচানোর জন্য অতিরিক্ত নাইট্রোজেন যুক্ত পদার্থ দিতে হয়। একে বলা হয় সক্রিয় বর্জ্য (activated sludge)। পরে এর পচনে যেসব জীবাণু অংশ গ্রহণ করে তার মধ্যে **জুগ্লীয়া র‍্যামিজেরা (Zoogleea ramigera)**, নাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়া ও প্রোটোজোয়া অন্যতম। এক্ষেত্রে **কার্বনডাই-অক্সাইড ($CO_2$) ও অ্যামোনিয়া ($NH_3$) বাতাসে নির্গত হয়।**

**(ক) বর্জ্য পদার্থ ও শৈবালের চাষ:**

বর্জ্য পদার্থ পূর্ণ প্রকৃতিতে সাধারণতঃ জীবাণু শৈবালই বেশী দেখা যায়। বৃহত্তর শৈবালগুলি দেখা যায় অনেক কম। তবে উদ্দেশ্যমূলক আবাদের ক্ষেত্রে বড়গুলিই সুবিধাজনক ভাবে সংগ্রহযোগ্য (easily harvested)। এ জাতীয় যে জীবাণুগুলির চাষ সফলভাবে করা গেছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্যতম।

| শৈবাল | সুবিধা | আবাদস্থল | ব্যবহার |
|---|---|---|---|
| **স্পিরুলিনা** (Spirulina) | সাধারণ মসলিন দ্বারা পরিস্রবণ মাধ্যমে স্বতন্ত্র করা যায় | চাদ, ভারতবর্ষ ও মেক্সিকো | মুরগীর খাবার |
| **সেনেডেসমাস** (Scenedesmus) | সহজে আবাদ ও সংগ্রহযোগ্য | " | Cyclops-দের খাবার। |

**৮·৬০ ফসলের কীটের জীবাণুজনিত দমন পদ্ধতি (Microbiological control of crop pests):**

অন্য সমস্ত জীবের মত কীটেরও জীবাণুজনিত রোগ হয় বেশ কিছু। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ রকমের জীবাণু পাওয়া গেছে যারা কীটের শরীরে নানাভাবে আক্রমণ করে। শুধু আর্থ্রোপডদেরই (Arthropod) আক্রমণ করে অন্ততঃ ১০০ প্রজাতির ব্যাক্টিরিয়া এবং ১০০ রকমের ভাইরাস। সমস্ত কীট গোষ্ঠী ধরলে প্রায় ৭৫০ রকমের রোগ সৃষ্টিকারী ছত্রাক এবং ৩০০ রকমের প্রোটোজোয়া রয়েছে।

প্রকৃতিতে এই কীট রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের কীটনাশক ক্রিয়াকর্ম দেখেই এদের ফসলের কীট শত্রু দমনের কাজে লাগানোর কথা চিন্তা করা হয়েছিল। এ জাতীয় কয়েকটি জীবাণু এবং তাদের আক্রান্ত কীটের নাম সারণী-৪২ এ দেওয়া হল।

সারণী ৪২ : ফসলের কীট শত্রু ও তাদের রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু

| জীবাণু | কীটগোষ্ঠী | জীবাণুর আবাদ সম্ভাবনা |
|---|---|---|
| ব্যাক্টিরিয়া : | | |
| ব্যাসিলাস থুরিনজিয়েনসিস (B. thuringiensis) | লেপিডপটেরা | কৃত্রিম খাদ্যে আবাদ সম্ভব |
| ব্যা. পপিলি (B. popillae) | কোলিঅপটেরা | ” |
| ব্যা. মরিটাই (B. moritai) | ডিপটেরা | ” |
| ছত্রাক : | | |
| এণ্টমপথোরা ভিরুলেণ্টা (Entomophthora virulenta) | অ্যাফিড, ক্যাটার-পিলার | ” |
| হিরসুটেলা থমপসনি (Hirsutella thompsoni) | মাকড় | ” |
| প্রোটোজোয়া : | | |
| নোসেমা আলজেরি (Nosema algerae) | মশক | জীবন্ত পোষক কীটে |
| নো. লোকাষ্টি (N. locustae) | গঙ্গাফড়িং | ” |
| ভাইরাস : | | |
| নিউক্লিওপলিহেড্রসিস ভাইরাস (Nucleopolyhedrosis virus) | হেলিওথিস জীই (Heliothis zeae) | ” |
| গ্রানুলোসিস ভাইরাস (Granulosis viruses) | কাইলো সাপ্রেসালিস (Chilo suppressalis) | ” |

৮.৬১ ফসলের কীট শত্রু দমনের উদ্দেশ্যে **ব্যা. থুরিনজিয়েনসিস** ও **ব্যা. স্ফেরিকাস** (**B. sphaericus**) এর আবাদ করা হয় কৃত্রিম খাদ্যে। **ব্যা. পপিলি** ও **ব্যা. লেনটিমরবাস** (**B. lentimorbus**) এর আবাদ করা হয় কীটের শরীরে। উভয় ক্ষেত্রেই গাঁজানো প্রক্রিয়ায় তরল খাদ্য বস্তুতে ডোবান (submerged) আবাদ বা অর্ধ-কঠিন খাদ্য বস্তুতে আবাদ করা যায়। থুরিনজিয়েনসিস এর আবাদের খাদ্য মাধ্যম তৈরী হয় গমের কুঁড়ো (bran), সয়াবীনগুঁড়ো, পরিবর্দ্ধিত পারলাইট (expanded perlite), গ্লুকোস ও অজৈব লবণ মিশ্রণে। এই আবাদ করতে সময় লাগে ৩৬-৪৮ ঘন্টা। নিমজ্জিত আবাদের (submerged culture) ক্ষেত্রে মাছের গুঁড়ো, সয়বীন গুঁড়ো, ঝোলাগুড় ইত্যাদি দ্বারা তরল খাদ্য মাধ্যম তৈরী করা হয়। পরে সমগ্র কঠিন খাদ্য মাধ্যম বা তরল মাধ্যম থেকে আলাদা করা জীবাণুগুলি ব্যবহৃত হয়। পপিলির ক্ষেত্রে তাদের আবাদ করা হয় তৃতীয় ইনস্টার (3rd instar) শুককীটে। এবং ১৬-২১ দিনে আক্রান্ত শুককীটগুলি গুঁড়ো করে পপিলি পাউডার তৈরী করা হয়। এ পর্যন্ত থুরিনজিয়েনসিসটি সারা পৃথিবী ব্যাপী ব্যবহৃত হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে। প্রায় ১৫০টি ফসলের কীট শত্রুর উপর প্রয়োগ করা যায়। এদের মধ্যে বাঁধাকপির লুপার, জিপসীমথ, ইউরোপীয় ভূট্টার মাজরা, আঙুরের পাতামোড়া কীট, আখের মাজরা পোকা, তুলোর ফলছিদ্রকারি কীট প্রভৃতি অন্যতম। পপিলি গুবরে পোকার কীড়ার 'দুধরোগ' সৃষ্টি করে।

ভাইরাসগুলির মধ্যে নিউক্লিওপলিহেড্রোসিস ভাইরাসগুলির কীট দমনে যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। প্রোটোজোয়াগুলি পোষক কীট সম্পর্কে খুবই নির্দিষ্ট (specific)। ফলে অন্য উপকারি কীটের যেমন চিংড়ি, মৌমাছি ইত্যাদির কোন ক্ষতি করবে না। ভূট্টার ছিদ্রকারি কীটের ক্ষেত্রে এর সাফল্য আশাতীত। **নমুরিয়া** জাতীয় ছত্রাকের কনিডিয়া দ্বারা ঘোলা জলে বহু ধরনের শুককীট ধ্বংস করা সম্ভব হয়েছে। **হিরশুটেলা** দিয়েও লেবুর কীট শত্রু দমনে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করা গেছে। পূর্ব ইউরোপ ও এশিয়াতে কডলিং মথ (codling moth) দমনে **বিউভেরিয়া** (**Beauveria**) জীবাণু কীটনাশক অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছে। এমন কি এর প্রভাব ২-৩ বছর স্থায়ী হয়েছে, আলুর কলোরাডো বীটল (colorado potato betle) এর ক্ষেত্রে।

এই ছত্রাক মৃত্তিকায় বসবাসকারি কীট দমনেও যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। ফসলের মৃত্তিকাবাসি কীট শত্রু দমনে **মেটারহিজিয়াম আনাইসোপ্লিই** (**Metarhizium anisopliae**) ও যথেষ্ট কার্যকরী। জলজ পরিস্থিতিতে (aquatic) ও এ জাতীয় ছত্রাক যেমন **কুলিসিনোমাইসেস** (**Culicino-myces**) ও **লাজেনিডিয়াম** (**Lagenidium**) এর মশক দমনে ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

কৃষিক্ষেত্রে ফসলের কীট ও রোগ দমনে জীবাণুর ব্যবহারের ক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। **সিউডোমোনাস আবিকোনেনসিস** (**Ps. abikonensis**) একটি রাসায়নিক সৃষ্টি করে যা লেবুর কর্কট (citrus canker) ও ধানের পোড়াদাগ (Rice blast) রোগের জীবাণুদের নাশক। এ জাতীয় দমন ব্যবস্থার পরিবেশের উপর কোন অস্বাভাবিক প্রভাব থাকে না। তাই এর ব্যবহারের বৃদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট উজ্জ্বল।

## ৮·৭০ জীবাণুর আবাদ : মনুষ্য বা পশু খাদ্য হিসাবে :

জীবাণুর আবাদ ক'রে উৎপন্ন জীবাণুদেহ খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের চল খুব বেশী দিনের নয় যদিও জীবাণুকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণের রেওয়াজ বহু পুরাতন।

পৃথিবীতে প্রতি বছরে উদ্ভিদের মাধ্যমে ১০-১৫ টনের মত সেলুলোস সংশ্লেষিত হচ্ছে। এই সেলুলোসের বেশীর ভাগটাই লিগনিন এর সাথে মিশে জটিল লিগনোসেলুলোস (lignocellulose) হিসাবে থাকে। কাষ্ঠবিহীন (non-woody) উদ্ভিদে বা উদ্ভিদের কাষ্ঠবিহীন অংশে অবশ্য বেশী থাকে সেলুলোস। সেলুলোসকে বহু জীব কাজে লাগাতে পারে খাদ্য হিসাবে। লিগনোসেলুলোসকে সেলুলোসে পরিবর্তিত ক'রে নেওয়া যায় ফসফরিক অম্ল দিয়ে শোধন ক'রে। কিছু জীবাণু রয়েছে যারা লিগনোসেলুলোস ও ব্যবহার করতে সক্ষম। এই ধরনের জীবাণু মূলতঃ ছত্রাক যারা সেলুলোস বা লিগনোসেলুলোসে বৃদ্ধি পায় এবং যে ছত্রাকফল তৈরী করে সেটা মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ঠিক এই কারণে সেলুলোসকে খাদ্যে রূপান্তরে সক্ষম জীবাণুদের আবাদ করাতে মানুষ উৎসাহী হয়েছে। যে সমস্ত জীবাণু এইভাবে মানুষের অখাদ্য সেলুলোস ও লিগনোসেলুলোসকে মানুষের

খাদ্যে রূপান্তরিত করতে পারে তাদের মধ্যে কয়েকটি জীবাণুর একটি তালিকা দেওয়া হল। সারণী-৪৩।

**সারণী ৪৩ : আবাদ সম্ভাবনাযুক্ত মনুষ্য খাদ্য জীবাণু**

| জীবাণু | কিসে আবাদ করা যায় | মনুষ্য খাদ্য হিসাবে সম্ভাবনা |
|---|---|---|
| **ছত্রাক :** | | |
| প্লিউরোটাস সাজরকাজু (Pleurotus sajor-caju) | খড়, কাঠ, মাটি | চাষ হচ্ছে, ভারতে |
| ভলভারিয়েলা ভলভাসিয়া (Volvariella volvacia) | খড় | „ „ |
| লেনটিনাস ইডোডস (Lentinus edodes) | কাঠ | সম্ভাবনা আছে |
| অ্যাগারিকাস বাইস্পোরাস (Agricus bisporus) | খড় ও অশ্ববর | চাষ হচ্ছে, ভারতে |
| মরচেলা এসকুলেন্টা | যায় না | প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ |
| **ব্যাক্টিরিয়া :** | | |
| থার্মোঅ্যাক্টিনোমাইসিটস (Thermo-actinomycetes) | কাঠ ও পাতা গুঁড়া | বিদেশে চাষ হচ্ছে |
| জান্থোমোনাস ক্যাম্পেসট্রিস (Xanthomonas campestris) | উদ্ভিদ বস্তু | „ „ |

৮.৭২ এটা অত্যন্ত লক্ষণীয় যে প্লিউরোটাস, ভলভারিয়েলা ও লেনটিনাস এর ক্ষেত্রে আবাদের জন্য খুব একটা নিয়ন্ত্রিত আবহাওয়া বা নির্বীজ পরিবেশ লাগে না। এসব অঞ্চলে মোটামুটি স্বাভাবিক আবহাওয়াতে চাষ করা যায়। প্রথম দুটির ক্ষেত্রে ফসল তুলতে কয়েক সপ্তাহ এবং পরেরটির ক্ষেত্রে কয়েক মাস

লাগে। সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক প্রথমটি কারণ এর খাদ্য চাহিদা খুব নির্দিষ্ট নয়, এর বৃদ্ধি নির্দিষ্ট তাপ মাত্রা সাপেক্ষ নয় এবং ছত্রাকফলগুলি সংরক্ষণ যোগ্য।

উষ্ণ এলাকাতে ( ৫৫-৬৫° সে. ) থার্মোঅ্যাক্টিনোমাইসিটস ব্যাক্টিরিয়া একটি আর্দ্র কাপড়ে ছড়ানো সংশোধিত (pretreated) গুঁড়ো কাঠের ওপর অন্ধকারে চাষ করা সম্ভব। এর অসুবিধার মধ্যে স্পোরগুলি থেকে চাষীর অ্যালার্জিযুক্ত আলভিওলাইটিস (allergic alveolitis) হ'তে পারে।

কিছু গ্রাম ঋণাত্মক, সবাত ব্যাক্টিরিয়া যেমন **জা. কাম্পেসট্রিস** বা **সি. ফ্লুরেসেন্স** সেলুলোস কাজে লাগতে পারে ২০-৩০° সে. উষ্ণতায় ও ৬.৫-৮.০ অম্ল-ক্ষারত্বে যদি খাদ্য মাধ্যমে সামান্য ঈষ্ট এক্সট্রাক্ট দেওয়া যায়। পরিবর্তিত অবস্থাতে ঐ খাদ্যমাধ্যম মূল্যবান পশু খাদ্যে পরিণত হয়।

সামুদ্রিক শৈবাল **কসমারিয়াম টারপিনিকে** (**Cosmarium turpinni**) পশুখাদ্যে প্রোটিন উৎস হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনা ও যথেষ্ট উজ্জ্বল।

## ৮.৮ জ্বালানী, শক্তি ও জীবাণু :

শিল্পে কোহল তৈরী হয় সাধারণতঃ কৃত্রিম বা অজৈব পদ্ধতিতে। খনিজ জ্বালানী তৈলের মূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে নূতন জ্বালানীর অনুসন্ধান বৃদ্ধি পেয়েছে। কোহল, অ্যাসিটোন, মিথেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি রাসায়নিক যা সাধারণতঃ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয় না সেগুলির সহজ সংশ্লেষণ এর চেষ্টা চলছে। এর মধ্যে অন্যতম জীবাণু দ্বারা জ্বালানী সৃষ্টি ও ব্যবহারের সম্ভাবনার পরীক্ষা।

জীবাণু সৃষ্ট জ্বালানীর মধ্যে একটি অন্যতম হচ্ছে জৈবগ্যাস (bio-gas)। বিভিন্ন ধরনের জৈবগ্যাস জীবাণুর সাহায্যে সৃষ্টি করা যায়। এর মধ্যে জীব-জন্তুর ও মানুষের বর্জ্য পদার্থ ও কৃষি ক্ষেত্রের জঞ্জাল থেকে মিথেন গ্যাস সৃষ্টির সম্ভাবনা অতি উজ্জ্বল। এই গ্যাসের শক্তির পরিমাপ প্রতি কেজি গ্যাসে ৫৫.৫ মেগাজুলস (MJ)। শৈবালের দ্বারা সৃষ্ট জ্বালানী হাইড্রোজেন এর শক্তির পরিমাণ প্রতি কেজিতে ১৪২ মেগাজুলস (MJ)। তরল জ্বালানীর মধ্যে মিথেন থেকে মিথানল সৃষ্টি করলে তাতে শক্তির পরিমাণ হয় প্রতি কেজিতে

২৩৮ মেগাজুলস (MJ)। উদ্ভিদ শস্য, গুড়, দানা প্রভৃতি থেকে ইথানল সৃষ্টি করলে তাতে শক্তির পরিমাণ প্রতি কেজিতে ৩০·৬ মেগাজুলস (MJ)।

তরল জ্বালানীগুলির জীবাণু দ্বারা উৎপাদন শিল্পস্তরে এখনও কোন দেশে গৃহীত হয়নি। কিন্তু জৈবগ্যাস বিরাট এলাকা জুড়ে, অতি অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করা সম্ভব। ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশে বিশেষভাবে ভারতবর্ষে, ব্রাজিলে ও অন্যান্য দেশে জৈব গ্যাস উৎপাদনের বিরাট পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছে।

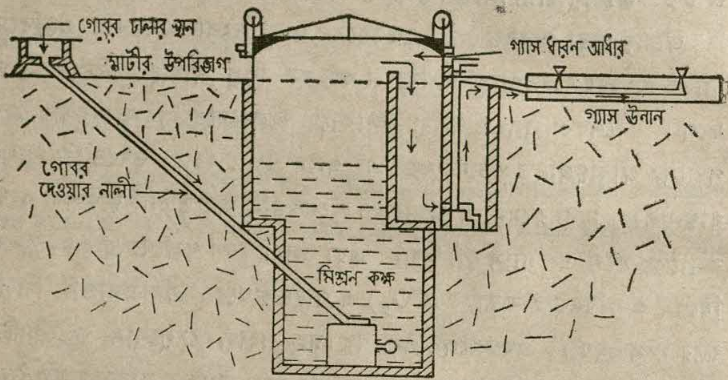
## ৮·৮১ জীবাণু দ্বারা মিথেন তৈরীর প্রক্রিয়া :

জীবাণু দ্বারা জৈববস্তু থেকে শুদ্ধ মিথেন গ্যাস উৎপাদন সম্ভব। প্রকৃতিতে বিভিন্ন অবস্থায় 'জৈবগ্যাস' বা মিথেন সৃষ্টি হয় কিছু জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের ফলে। বিশেষতঃ জলা ও জলমগ্ন এলাকাতে জলের মধ্যে অবাত অবস্থায় জৈব পদার্থের জীবাণুজনিত পচনের ফলে এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। তৃণভোজী প্রাণীর খাদ্যনালীর মধ্যে রুমেন ও বৃহদান্ত্রেও অনেকগুলি অবাত ব্যাক্টিরিয়ার কার্য-কলাপের ফলে এই গ্যাস সৃষ্টি হয়। এরা জলমগ্ন জৈব পদার্থের প্রায় ৯০%-কে মিথেন ও কার্বনডাই-অক্সাইড ($CO_2$) এ পরিণত করে। বিক্রিয়াগুলি তিনটি স্তরে সম্পন্ন হয়। প্রথমে জৈব পদার্থের স্নেহ পদার্থ, সেলুলোস ও প্রোটিন অংশগুলি স্বতন্ত্র ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয়। উদ্ভূত রাসায়নিকগুলি জৈব অম্লতে পরিবর্তিত হয় অন্য ব্যাক্টিরিয়া দ্বারা। সর্বশেষে মিথেন ব্যাক্টিরিয়া উক্ত জৈব অম্লগুলিকে বিয়োজন ক'রে মিথেন ও কার্বনডাই-অক্সাইড ($CO_2$) এ পর্যবসিত করে। উদ্ভূত শক্তির মাত্র ১০% জীবাণু নিজে ব্যবহার করে।

গোবর, গোমূত্র ও শহরের অন্যান্য জঞ্জাল থেকে হিসাব মত তাদের দাহ্য শক্তিরই ৩০-৫০% মিথেনে জীবাণুজনিত পদ্ধতিতে পর্যবসিত হ'তে পারে। দক্ষ ব্যবস্থাপনাতে ১ লিটার এই জাতীয় জঞ্জাল থেকে দিনে ৪-৫ লিটার মিথেন গ্যাস সৃষ্টি করা সম্ভব। আনাজ ও উদ্ভিজ অন্য পদার্থ থেকে আরও বেশী অর্থাৎ প্রায় ৭০% শক্তি মিথেনে পরিবর্তিত করা সম্ভব। এ জাতীয় বর্জ্য পদার্থ ভিত্তিক জ্বালানী গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র ব্যবস্থা (plant) ইদানীং কিছু তৈরী হয়েছে। দাহ্য গ্যাস সৃষ্টির যন্ত্রে যে বর্জ্য বা অন্ত্যপদার্থ (residue) ব্যবহৃত হয় তা সাধারণতঃ যথেষ্ট পরিমাণ অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন,

ফসফেট ও জীবাণু কোষে পরিপূর্ণ থাকে। এই জৈব অন্তর্বস্তু (residue) সার বা পশু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। দুর্গন্ধযুক্ত ও বহু সংক্রামক ব্যাধির জীবাণুতে পরিপূর্ণ এই বর্জ্য পদার্থের এ ধরনের উৎপাদনমুখী ব্যবহারের সম্ভাবনা যথেষ্ট আশার কারণ হয়েছে।

তিন চারটি গরুর বর্জ পদার্থ দিয়ে দিনে তিন ঘন মিটার ($3m^3$) গ্যাস উৎপাদন করতে পারে এমন গোবর গ্যাস উৎপাদক যন্ত্রের পরিকল্পনা ও নির্মাণ ব্যয় ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের হিসাব অনুযায়ী ৩ হাজার টাকা।




চিত্র-৮৬ : গোবরগ্যাস উৎপাদন ব্যবস্থা
( ভারতীয় কৃষি-গবেষণা কেন্দ্র )

শীতকাল ব্যতীত অন্য সময় এই যন্ত্র ব্যবস্থার কর্মক্ষমতা ও ব্যবহার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। চিত্রে ( **চিত্র-৮৬** ) একটি মডেল গোবর গ্যাস উৎপাদক যন্ত্র দেখান হয়েছে।

## ৮·৮২ জীবাণু জনিত হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপাদন পদ্ধতি :

সাধারণতঃ সূর্যের অফুরন্ত শক্তিকে কাজে লাগানর নানা প্রচেষ্টার মধ্যে জীবাণু জনিত প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক সম্ভাবনা যথেষ্ট। সমস্ত সবুজ গাছ এবং শৈবাল ও কার্বনডাই-অক্সাইডকে ($CO_2$) জলের সহায়তায় বিজারণ করতে সৌর শক্তিকে কাজে লাগায়। এসব ক্ষেত্রে অক্সিজেন ($O_2$) অণু হিসাবে

উদ্ভূত হয় এবং সাথে সাথে রিডিউসিং ইকুইভালেন্টগুলি (reducing equivalent) যথা হাইড্রোজেন আয়ন ও ইলেকট্রন কার্বনডাই-অক্সাইডকে ($CO_2$) বিজারণ ক'রে কোষ বস্তু উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

শৈবাল জনিত এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার কিছু পরিবর্তন সাধনের ফলে হাইড্রোজেন অণু উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই জৈব ফোটোলাইসিসি বহু শৈবালে দেখা যায় যেমন **ক্লোরেলা ভালগারিস (Chlorella vulgaris), ক্লামাইডোমোনাস ডিবারিয়েনাম (Chlamydomonas debaryanum), ডুনালিয়েলা (Dunaliella sp), কনড্রাস ক্রিসপাস (Chondrus crispus), কোরালিনা অফিসিনালিস (Corallina officinalis), সেরামিয়াম রুব্রাম (Ceramium rubrum), পরফিরিডিয়াম আক্রজিনিয়াম (Porphyridium acrugineum)** ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়া শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি হিসাবে আর্থিক দিক দিয়ে লাভজনক হ'তে পারে। শক্তি উৎস হিসাবে হাইড্রোজেনের ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের সমস্যাও সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এই গ্যাস উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উৎসগুলি যথা জল ও সূর্যরশ্মির সরবরাহ পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রায় অসীম। এই শৈবালগুলির মধ্যে বেশ কিছু প্রকার আবার বহু প্রকার বর্জ্য পদার্থেও চাষযোগ্য। তবে হাইড্রোজেন ($H_2$) উৎপাদনে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী বর্ণের নির্বাচনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এখনও। মিথেনের তুলনাতে হাইড্রোজেনের শক্তি সঞ্চয়ের হার অনেক কম। ব্যবহৃত উৎস বস্তুর মাত্র ৩০% হাইড্রোজেন উৎপাদনের মাধ্যমে সংগৃহীত হ'তে পারে। সেটা মিথেনে ৮০%।

### ৮·৮৩ জীবাণুজনিত ইথানল প্রস্তুত পদ্ধতি :

যথেষ্ট শর্করাযুক্ত জৈব পদার্থ থেকে সহজেই ইথানল প্রস্তুত করা সম্ভব। আখ, ভূট্টা, গম, ধান, কাসাভা প্রভৃতি সবকিছুই কার্যকরী উৎস হতে পারে। শুদ্ধ ইথানল, পেট্রল, গ্যাসোলিন বা ডিজেলের সাথে মিশ্রিত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভব। এজন্য ইথানল যথেষ্ট শুদ্ধ (pure) বা অনার্দ্র না হলেও চলে।

লিগনোসেলুলোজ জাতীয় জঞ্জাল (waste) যথা ধানের খড়, ভূট্টার গাছ, আখের ছাবড়া প্রভৃতি থেকেও ইথানল উৎপাদন সম্ভব। এক্ষেত্রে উচ্চতাপ-

গ্রাহী (thermophilic) ব্যাক্টিরিয়া যথা **ক্লস্ট্রিডিয়াম থার্মোসেলাম (Cl. thermocellum)** ও **মিথানোব্যাক্টিরিয়াম থার্মোঅটোট্রফিয়াম (M. thermoautotrophium)** এর মিশ্রণ ভিন্ন জৈব পদার্থ থেকে জৈব গ্যাস অর্থাৎ মিথেন ও অ্যাসিটেট এর মিশ্রণ সৃষ্টি করে।

## ৮.৮৪ মিথানল উৎপাদনে জীবাণুজনিত পদ্ধতি ঃ

পৃথিবী পৃষ্ঠে অবাত পরিস্থিতিতে জলাশয় বা তার তলদেশে মিথেনগ্যাস স্বাভাবিক ভাবেই তৈরি হচ্ছে। তৈল শোধনাগারগুলির (oil refinery) উপজাত দ্রব্য (by-product) হিসাবেও এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতিতে স্বাভাবিকভাবে উৎপন্ন এই মূল্যবান গ্যাস ব্যবহার যোগ্য এলাকাতে নিয়ে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। অথচ মিথানলে শক্তির পরিমাণও বেশী এবং তার বহনও তুলনামূলকভাবে সহজ। বহু ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে মিথানলের ব্যবহার পরীক্ষিত ও গৃহীত। মিথেন জারক ব্যাক্টিরিয়া মিথেন থেকে যে পদ্ধতিতে কার্বনডাই-অক্সাইড ($CO_2$) তৈরি করে সেই বিক্রিয়াপথে মিথানল তৈরি হয়। বর্তমানে এই বিক্রিয়াপথে মিথানলে পরবর্তী ধাপগুলি বিভিন্ন বিক্রিয়া প্রতিবন্ধক (inhibitor) যথা আয়ডোআসিটেট (iodoacetate) ও EDTA ব্যবহার দ্বারা কার্বনডাই-অক্সাইড ($CO_2$) এর পরিবর্তে মিথানল উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এই ব্যাক্টিরিয়ার কিছু পরিব্যক্ত প্রকার (leaky mutant) আবিষ্কার করেছেন যার সাহায্যে হয়ত প্রতিবন্ধক ছাড়াও মিথানল উৎপাদন সম্ভব হবে।

## ৮.৮৫ শক্তিনিহীত ও অন্য ধাতুর জীবাণুজনিত পদ্ধতিতে নিষ্কাশন ঃ

অম্ল পরিবেশে বসবাসকারি ব্যাক্টিরিয়া **থায়োব্যাসিলাস ফেরক্সিডানস** বিজারিত লৌহকে (ferrus) জারিত ক'রে বিভিন্ন ধরনের অদ্রব সালফাইড (sulfide) বা দ্রবণীয় গন্ধক (soluble sulfur) তৈরি করে। পাইরাইট খনিজে এসব ধাতুর জারণ জারিত লৌহ, $H_2SO_4$ প্রভৃতির ধাতব লবণ তৈরি করে। জারণ পদ্ধতিতে উৎপাদিত এই লৌহ ও সালফিউরিক অম্ল ($H_2SO_4$) কাঁচা আকরিক থেকে মূল্যবান ধাতু ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনে সহায়তা করে।

ভারতবর্ষ, কানাডা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে এই পদ্ধতিতে ধাতু নিষ্কাশন বৃহদাকারে সংগঠিত হচ্ছে। যে সমস্ত স্থানে মৃত্তিকায় পাইরাইটিক ইউরেনিয়াম

অক্সাইড রয়েছে সেখানে ধাপে ধাপে (terrace) চোঁয়ান নিষ্কাশক (leaching liquid) তরল পদার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে ইউরেনিয়াম মৃত্তিকাস্থ সূক্ষ্মছিদ্র মাধ্যমে নিষ্কাশন করা হয়। নিম্নমানের (০·০১ – ০·০৫% $U_3O_8$) ইউরেনিয়াম আকরিক থেকে সাধারণ নিষ্কাশন পদ্ধতিতে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন ব্যয়সাধ্য হয় ও খরচে পোষায় না (uneconomic)। সেসব ক্ষেত্রে ব্যাক্টিরিয়াজনিত এই নিষ্কাশন পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য হয়। এছাড়া ধাতু উত্তোলনের পর পরিত্যক্ত খনির খামগুলির ইউরেনিয়াম শুধুমাত্র এই জীবাণু ভিত্তিক পদ্ধতিতেই নিষ্কাশন সম্ভব। স্বভাবতই এটি একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় নিষ্কাশন পদ্ধতি। এই জীবাণু ভিত্তিক নিষ্কাশন আরও বহু ধাতু যথা কোবাল্ট, তামা, সীসা ও দস্তার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

## ৮·৮৬ কাগজ শিল্প ও জীবাণু ঃ

উদ্ভিদ দেহকে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে সবশেষে কাগজে পরিণত করার প্রক্রিয়া সভ্য মানুষের সমাজের এক অতি মূল্যবান প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রেও জীবাণুর প্রভাব ও অবদান অপরিসীম।

কাগজ তৈরীর জন্য পচানো কাঠকে বলা হয় মণ্ড (pulp)। কাঠকে মণ্ডতে পরিণত করার যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জীবাণু ভিত্তিক সবরকম প্রক্রিয়ারই প্রচলন রয়েছে। তবে যান্ত্রিকভাবে মণ্ড প্রস্তুত করার পদ্ধতিরও জীবাণুর উপর নির্ভরতা যথেষ্ট। জীবাণুর ক্রিয়াকলাপের ফলে কাঠের সেলুলোস তন্তুগুলি বিয়োজিত হয়। অত্যধিক বিয়োজনে তৈরি কাগজের দ্রাঢ্য বা রঙও বিনষ্ট হতে পারে। **কর্টিসিয়াম ইভলভেনস (Corticium evolvens) ফ্লামুলা স্পুমসা (Flammula spumosa), ফোমেস অ্যানোসাস (Fomes anosus)** ইত্যাদি ছত্রাক এই সমস্ত বিয়োজন ঘটায়। **কনিওফোরা সেরিবেলা (Coniophora cerebella)** মণ্ডতে হালকা রঙ সৃষ্টি করে। এছাড়া অন্য যে সব রঙ সৃষ্টি হয় তার মধ্যে—**পলিপোরাস অ্যাবিয়েটিনাস (Polyporus abietinus)** গাঢ় বাদামী, **ক্লাডোস্পোরিয়াম** নীলচে কাল, **টরুলা (Torula)** গোলাপী বা **ফোমা লিগনিকোলা (Phoma lignicola)** বেগুনী।

কাগজের জীবাণু জনিত বিয়োজন (deterioration) মণ্ড তৈরীর সর্বস্তরে হ'তে পারে। শিল্প বিজ্ঞানীদের কাছে জীবাণুর উপস্থিতি 'স্লাইম' (slime)

নামে পরিচিত। মণ্ডের এখানে সেখানে আঠাল, দড়ির বা রবারের মত দেখা যায়। এই স্লাইমের জন্য প্রতি টন কাগজ তৈরী করতে ১০-৪০ টাকা নষ্ট হয়, কারণ সংক্রামিত মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত করার কাজে সময় বেশী লাগে, যন্ত্র ভালো কাজ করে না ও উৎপাদিত কাগজ নীচু মানের হয়। **ডিসাল্ফ-ভিব্রিও** জীবাণু অনেক ক্ষেত্রে কাগজের 'ভাঙ্গন' (breaks) এর জন্য দায়ী। স্লাইমের সাথে জড়িত ব্যাক্টিরিয়াগুলির মধ্যে **এরোব্যাক্টর এরোজিনস** ও **ব্যাসিলাস** অন্যতম। এসব জীবাণু সংক্রমণ কমানোর জন্য মণ্ডকে গরম কষ্টিক সোডার জল দিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা ভাল ফল দেয়। জলে গ্যাস ক্লোরিন থাকলেও কাজ হয়। সর্বাধিক ব্যবহৃত রাসায়নিক হচ্ছে ডাইমিথাইল টেট্রাহাইড্রোথায়াডায়াজিন থায়োন (dimethyl-tetrahydrothiadiazine thione)।

## ৮·৮৭ পেন্টের জীবাণুজনিত পচন :

পেন্ট তরল অথবা মাখান উভয় অবস্থাতেই জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হয়। জল নির্ভর পেন্টগুলির **সি. এরুজিনস** দ্বারা পচন ঘটে। অন্য দ্রবণে গোলা পেন্টগুলির ক্ষেত্রে মাখান অবস্থাতেই জীবাণুর আক্রমণ ঘটে। যে সমস্ত ছত্রাক একাজে লিপ্ত তাদের মধ্যে **অ্যাসপারজিলাস, পেলিসিলিয়াম, ফুসেরিয়াম** ও **মারিনাস** অন্যতম। তৈল জাতীয় পেন্টের পচন ঘটায় মূলতঃ **পুলুলেরিয়া পুলুলানস (Pullularia pululans)**। এর ক্রিয়াকলাপে মাখানো পেন্টে চকিং (chalking) হয় বা ছাল উঠে যায়। অনেক ক্ষেত্রে সংরক্ষক হিসাবে পেন্টে বেরিয়াম মেটাবোরেট, জিঙ্ক অক্সাইড প্রভৃতি মেশান হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ফিনাইল পারদ যৌগও মেশান হয়। সমুদ্র গর্ভে পেন্ট **এন্টারোব্যাক্টিরিয়া** ও **ফ্লাভোব্যাক্টিরিয়াম** দ্বারা আক্রান্ত হয়।

## ৮·৯০ জীব বা অন্য জীবাণুর সাথে সম্পর্কযুক্ত জীবাণুর ব্যবহার :

পূর্বে বর্ণিত বিভিন্ন জীব ও জীবাণুর পরস্পর সম্পর্ক ও তার প্রভাব ছাড়া জীবাণু আরও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য জীবের সাথে বা অন্য জীবাণুর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ক'রে বসবাস করে। এই সম্পর্কযুক্ত জীবাণুগুলিকেও বিভিন্নভাবে মানুষের প্রয়োজনে লাগানো হয়। এ জাতীয় দু'একটির কথা বর্তমানে আলোচনা করা হচ্ছে।

**৮·৯১ লাইকেন : দুই জীবাণুর সম্পর্ক ও তার প্রভাব (Lichen) :**

ছত্রাক ও শৈবালের সম্মিলিত (composite) অবস্থাকে বলা হয় লাইকেন। এ জাতীয় সম্পর্ক যুক্ত ছত্রাককে বলা হয় মাইকোবায়ন্ট (Mycobiont) এবং শৈবালকে ফাইকোবায়ন্ট (Phycobiont)। সম্মিলিত জীবাণুর থালাসে উভয় সঙ্গীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে, যদিও উভয়ের মধ্যে ছত্রাকই প্রভাবশালী সঙ্গী। এক্ষেত্রে ছত্রাকগুলির বেশীর ভাগই অ্যাসকোমাইসিট শ্রেণীর আর শৈবালগুলি ক্লোরোফাইটা, সায়ানোফাইটা ইত্যাদি গোষ্ঠীর। গঠনগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কয়েক প্রকারের লাইকেন প্রকৃতিতে দেখা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্রাসটোস (Crustose) জাতীয় যা পোষক (substrate) এর উপর ঘনিষ্ঠভাবে লেগে থাকে। উদাহরণ **লিউকোনোনা ভেরুকেরিয়া** (**Leuconona verrucaria**)। ফলিওস (Foliose) জাতীয়গুলিও পোষকে রাইজয়েড দ্বারা সংশ্লিষ্ট একটি বিষম পৃষ্ঠ (dorsiventral) পাতার মত লেগে থাকে। উদাহরণ **পারমেলিয়া (Parmelia)**। **ফ্রুটিকোস** (**Fruticose**) জাতীয়গুলি দড়ির মত আকৃতি যুক্ত। উদাহরণ **ক্লাডোনিয়া** (**Cladonia**) ইত্যাদি।

এই জীবাণু সম্মিলনী বহু রাসায়নিক সংগ্রহ করে। ফলে এদের শরীরে যথেষ্ট অজৈব পদার্থ থাকে। লাইকেনদের বিভিন্ন রঞ্জক (dye) সংশ্লেষণ শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বিশেষত লিটমাস (litmus) জাতীয় রঞ্জক সংশ্লেষণের কাজে। মেরু অঞ্চলের কিছু লাইকেন পশু খাদ্য হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এস্কিমোরা তাদের কারিবু (Caribou) জন্তুকে লাইকেন খাওয়ায়।

**৮.৯২ মাইকরাইজা : উদ্ভিদ ও জীবাণুর সম্পর্ক ও তার প্রভাব (Mycorrhiza and their influences) :**

উদ্ভিদের মূলে সবসময়ই এক প্রকার ছত্রাক সংক্রমিত (infected) থাকে, যাদের অন্যতম প্রভাব উদ্ভিদের খাদ্য ও জলগ্রহণ বৃদ্ধি করা। অনেকক্ষেত্রে এই সংক্রমণ উদ্ভিদের রোগ সৃষ্টিকারি জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধও করে। এরকম ছত্রাক সংক্রমিত উদ্ভিদ মূলকে বলা হয় মাইকরাইজা (Mycorrhizae). এই সম্পর্ক বিশেষ করে উদ্ভিদের যে খাদ্যবস্তু গ্রহণ বৃদ্ধি করে সেটি হচ্ছে

ফসফ্যাস। এর ফলে অত্যন্ত অল্প ফসফরাসযুক্ত মাটিতে উদ্ভিদের জীবনধারণের সুবিধা হয়। উদ্ভিদে বহুপ্রকার মাইকরাইজার সম্পর্ক দেখা যায় যার মধ্যে মূলতঃ দুই প্রকার মাইকরাইজা দেখা যায় কর্ষিত জমির ফসলে।

(ক) অন্তঃমাইকরাইজা (Endomycorrhiza) :

দু'একটি ফসল যথা কপি, শর্ষে বা বীট ও পালং ছাড়া প্রায় সব ফসলেই মাইকরাইজা হয়। ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে সব উদ্ভিদে এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বহু বড় গাছে মাইকরাইজা দেখা যায়। এদের ভাসকুলার-আরবাসকুলার (vascular arbascular type) বলা হয়। সবরকম মাটিতেই এই সম্পর্ক বর্তমান। এরা সাধারণত পোষক উদ্ভিদের বাছ বিচার করে না। শুঁটী জাতীয় ফসলে এরা অর্বুদ ধারণের হার বৃদ্ধি করে। মাটিতে এরা থাকে স্পোর হিসাবে। এই ছত্রাকগুলি উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তবে এপর্যন্ত এদের কৃত্রিম খাদ্যমাধ্যমে আবাদ সম্ভব হয় নি। উদ্ভিদের বহু খাদ্যাভাব ও শারীরবৃত্তিয় সমস্যার লক্ষণ এদের জন্যই দূরীভূত হয়।

স্বল্পদামী ফসফেট শিলা (rock phosphate) এই মাইকরাইজার সহযোগিতায়ই সার হিসাবে ফসলের কাজে আসে। এই ধরনের ছত্রাকের ইনকুলাম (inoculum) তৈরী করে উদ্ভিদের মূলে প্রয়োগকরার অত্যন্ত কঠিন প্রচেষ্টাও চলছে।

(খ) বহিঃমাইকরাইজা (Ectomycorrhiza) :

অন্তঃমাইকরাইজার মত অত নাহলেও বহিঃমাইকরাইজাও উদ্ভিদ মূলে যথেষ্ট দেখা যায়। বনাঞ্চলের বহু গাছ যেমন ওক, ফার, উইলো, পাইন, পপলার, বার্চ, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি বৃক্ষের মূলে আস্তরণের মত এই ছত্রাক থাকে। এজাতীয় ছত্রাক সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ছত্রাকফল যথা মাসরুম বা পাফবল তৈরীও করে, ছত্রাকফলের মধ্যস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র স্পোর দ্বারা এরা বিস্তার লাভ করে। এরাও উদ্ভিদের খাদ্য ও জলগ্রহণ বৃদ্ধি করে বা অত্যধিক ক্ষরা ও অম্ল অবস্থাতে উদ্ভিদের বেঁচে থাকার সহায়ক হয়। রোগ প্রতিরোধও করে। এরা পোষক উদ্ভিদ নির্ভর এবং পোষক উদ্ভিদ থেকে শর্করা, খাদ্যপ্রাণ, অ্যামিনো অম্ল প্রভৃতি গ্রহণ করে।

ইদানীং দেখা যাচ্ছে নূতন এলাকাতে কোন উদ্ভিদের রোপন ও স্থাপন সফল করার কাজে এদের অবদান যথেষ্ট। কিছু ছত্রাক যেমন **পিসোলিথাস**

টিংটোরিয়াস (Pisolithus tinctorius), রাইজোপোগন লুটিওলাস (Rhizopogon luteolus) প্রভৃতি বীজ বা চারার সাথে মিশিয়ে বপন বা রোপন করলে গাছের বাঁচার হার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাইনগাছে এরকম করে আমেরিকাতে যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক ফল পাওয়া গেছে। বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ হয়েছে। পরিত্যক্ত কয়লাখনির চত্বরে এভাবে ছাড়া গাছ বাঁচান দুষ্কর। এই জীবাণুগুলির সুবিধা এই যে এদের ছত্রাকফলে (পাফবল) একটিতে প্রায় ১৫ গ্রাম স্পোর থাকে, সংখ্যাতে যার হিসাব হচ্ছে ১ গ্রামে ১০০ কোটি। এগুলি শুষ্কভাবে ঠাণ্ডাতে প্রায় ৪ বছর বেঁচে থাকে। ফলে ব্যবহারিক সম্ভাবনা যথেষ্ট। নার্শারির মাটিতে এই স্পোর মিশিয়ে বীজ ফেললে যে চারা তৈরী হয় তাতে যথেষ্ট বহিঃমাইকরাইজা তৈরী হয় ও গাছের জীবিত থাকার ও বৃদ্ধির হার খুবই বাড়ে।

নয়

## উৎস ও অনুশীলনী গ্রন্থের তালিকা

(List of source books and books for further reading)


৯.১ সাধারণ উৎস গ্রন্থের তালিকা (General References) :

১। Mandelstam, J. and K. McQuillen (ed.) 19 Biochemistry of Bacterial Growth (2nd Ed.) ; Blackwell scientific Pub ; Oxford ; pp-582.

২। Dubos, R. 1960. The Unseen World ; Rockfeller Univ. Press ; New York.

৩। Anonymous, 1979. Microbial Processes ; Processing Technology for Developing Countries ; Nätional Academy of Science ; USA. pp-198

৪। Burrows, W. 1973 Text Book of Microbiology. (20th ed), W. B. Saunders Co. Philadelphia.

৯·২০ এক : উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের ইতিহাস :

১। Lechevalier, H. A and M. Solotorovsky. 1965 Three centuries of Microbiology : McGraw Hill, I N C, pp. 536.

২। Brock, Thomas (ed). 1961. Milestones in Microbiology ; Englewood Cliffs ; N. J ; Prentice Hall ; INC.

৯·৩০ দুই : বিভিন্ন জীবাণুর প্রকৃতি :

৯·৩১ ভাইরাস :

১। Goodheart. C. R. 1969. An introduction to virology ; W. B. Saunders Co ; Philadelphia.

২। Luria. S. E and J. E. Darnell. 1967. General Virology (2nd ed) ; John Wiley & Sons ; New York.

৯·৩২ ব্যাক্টিরিয়া :

১। Smith, R. W and Koffler, H. 1971. Bacterial flagella ; Advances in Microbial Physiology. 6 : 219-339

২। Harrison, R and Lunt, G. G. 1975. Biological Membranes and Walls ; New York ; Mercel Dekker. INC ; pp-495.

৩। Hawker, L. E and A. H. Linton. 1971. Microorganisms : Life, form and function Ed. Arnold Pub. Ltd ; pp-697.

৯·৩৩ ছত্রাক :

১। Ainsworth. G. C. and A. S. Sussman. 1965. The Fungi : An Advanced Treatise ; Vols. I-IV. Academic Press ; New York.

২। Alexopoulous, C. G. 1962. Introductory Mycology (2nd ed) ; Wiley Eastern Univ. Pub ; pp-613

৯·৩৪ শৈবাল :

১। Round. F. E. 1965. The Biology of the Algae ; Edward Arnold ; London ; pp-269.

৯·৩৫ প্রোটোজোয়া :

১। Kudo. R. R. 1966. Protozoology (5th ed) ; Springfield ; C. C. Thomas Publishers.

৯·৩৬ আঠাল ছত্রাক :

১। Martin, G. W. and Alexopoulous, C. J. 1969. The Myxomycetes ; Univ. of Iowa Press ; pp-576

**৯·৪০ তিন : শারীরবৃত্ত ও বংশাণুতত্ত্ব :**

৯·৪১ শারীরবৃত্ত :

১। Sokatch, J. R. 1969. Bacterial Physiology and Metabolism ; Academic Press ; London ; pp-443

২। Kaback, H. R. and Hong, J. S. 1973. Membranes and transport; Critical Reviews in Microbiology. **2** : 333-376.

৩। Turner, W. B. 1971. Fungal Metabolites; Academic Press; London; pp-446.

৯·৪২ বংশাণুতত্ত্ব :

১। Stent, G. 1971. Molecular genetics; W. H. Freeman Co; San Fransisco.

২। Braun, W. 1965. Bacterial Genetics. (2nd ed); W. B. Saunders Co; Philadelphia.

৩। Esser, K and Kuenen, R. 1967. Genetics of fungi; Springer Verlag; N. Y; pp-500.

৪। Watson, J. D. 1970. Molecular Biology of the Gene (2nd Ed); W. A. Benjamin INC; N. Y.

## ৯·৫০ চার : জীবাণুর খাদ্য ও ক্রমবৃদ্ধি :

১। Brock, T. D. 1972. Microbial growth rates in nature, Bact. Rev; **35** : 39

২। Stanier, R. M; Doudoroff and E. Adelberg. 1970. The microbial world (3rd ed); Englewood Cliffs; N. J; Prentice Hall, INC.

৩। Mitchison, J. M. 1971. The Biology of the cell cycle; Cambridge Univ. Press; pp-313.

## ৯·৬০ পাঁচ : পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থান :

১। Alexander, M. 1971. Microbial Ecology; John Wiley & Sons; New York.

২। Brock, I. D. 1966. Principles of Microbial Ecology; Engelwood cliffs; N. G; Prentice Hall.

৯·৭০ ছয় : মৃত্তিকার জীবাণু বিজ্ঞান :

১। Alexander, M. 1961. Introduction to Soil Microbiology ; John Wiley & Sons INC ; New York.

২। Gray, T. R. G and Parkinson, D (eds) 1968. The ecology of soil bacteria ; Liverpool University Press ; Liverpool, pp-681

৯·৭০ সাত : জল, খাদ্য ও দুগ্ধ সংক্রান্ত :

১। Jay, J. M. 1970 Modern Food Microbiology ; van Nostrand Peinhold ; N. Y.

২। Jackson. D. F. (ed). 1968. Algae, Man and the Environment ; Syracause Univ. Press ; pp-554.

৯·৮০ আট : প্রায়োগিক জীবাণু বিজ্ঞানের আরও কিছু দিক :

৯·৮১ প্রাণীরোগ সংক্রান্ত :

১। Anonymous 1976. The Yearbook of Agriculture : Animal Diseases ; USDA ; Washington DC.

৯·৮২ মানুষের রোগসংক্রান্ত :

১। Cluff. L. E. and J. E. Johnson (eds). 1978. Clinical concepts of infectious diseases.

২। Cruickshank, R (ed). 1965. Medical Microbiology a guide to Lab. Diagnosis and control of infections ; E & S ; Livingstone Ltd ; Edingburg, pp-1067.

৯·৮৩ উদ্ভিদ রোগ সংক্রান্ত :

১। Wheeler, B. E. J. 1969. Plant Diseases ; John Wiley and Sons Ltd ; London ; pp-374

২। Agrios, G. N. 1978. Plant Pathology ; 2nd Ed. Academic Press ; INC ; New York. pp. 723

৯.৮৪ অন্যান্য :

১। Oswald, W. J; Lee, E. W; Adam, B and Yao, K. H 1976. New waste water treatment method yields a harvest of saleable algae; WHO Chronicle; 32: 348-350

২। Burgen, H. D and N. W. Hussey (eds) 1971. Microbial control of insects and mites, Academic Press; N. Y.

৩। Gray, W. D. 1970. The use of fungi as food and in food processing; West Palm Beach; Florida; CRC Press.

৪। Schlegel, H. and L. Barnea (eds). 1977. Microbial Energy Conversion; Oxford; Pergamon Press.

# ব্যবহৃত পরিভাষা

**a**

aberration অস্বাভাবিক রূপ গ্রহণ
abrassive ঘষি, উকো
absorption বিশোষণ
acceleration ত্বরণ
acellular অকোষী
acentric অকেন্দ্রিক
accrvulus কনিডিয়াস্তূপ, অ্যাসারভূলাস
achromatic রঙমুক্ত
acid অম্ল
actinomycetes অ্যাক্টিনোমাইসিট সূত্রপম ব্যাক্টিরিয়া
activator শক্তিদাতা
adaptation অভিযোজন
adhesiveness আসঞ্জন ক্ষমতা
adsorption আসঞ্জন
aeration বাতায়ন
aerobic সবাত
agar আগার
agent নিমিত্ত
agglutination তঞ্চন
aggregation পুঞ্জীভবন
alcohol কোহল
algae শৈবাল
alkali ক্ষার
alkylating agent অ্যালকিলেটিং এজেন্ট
allele বংশাণুজুটী
alternate একান্তরঃ
alternation of generation জনুক্রম
ameba অ্যামিবা
amensalism বিরোধিতা
ammonification অ্যামোনিয়াভবন
amorphous অনিয়তাকার
anabolic উপচিতিমূলক
anaerobic অবাত
analogue সদৃশ অণু, অনুরূপ
anal pore পায়ু
anaphase স্বতন্ত্রীকরণ স্তর
anastral অনাক্ষত্রিক
anatomical শারীরস্থানিক
angiosperm গুপ্তবীজী
angular কোনাচে
animalcule কীটাণু, অ্যানিম্যালকিউল
anisogametangia অসম যৌনাঙ্গ
anisogametes অসম যৌনকোষ
antheridium পুংধানী, অ্যান্থেরিডিয়াম

anthracnose ক্ষতরোগ
antibiosis বিরোধিতা, অ্যান্টিবায়োসিস
antibiotic অ্যান্টিবায়োটিক, বীজঘ্ন
antibody জৈব প্রতিরোধক
antiparallel বিপরীতমুখী সমান্তরাল
antiseptic দূষণরোধী
aplanospore অচল স্পোর
apothecium অ্যাপোথেসিয়াম
appendaged উপাঙ্গযুক্ত
appressorium আবদ্ধকারী সূত্র
ascogonium স্ত্রীঅঙ্গ, অ্যাসকোগোনিয়াম
ascomycetes অ্যাসকোমাইসিটস
ascospore অ্যাসকোস্পোর
ascus অ্যাসকাস
ascus mother cell ভাবী অ্যাসকাস
aseptate দেওয়ালহীন
asexual অযৌন
assimilation আত্তীকরণ
astral ray নাক্ষত্রিক রশ্মি
attenuated অক্ষম
autoecology অটোইকলজি
autolytic স্ববিনাশী
autotroph স্বভোজী, অটোট্রফ
auxotroph অক্সোট্রফ

**b**

bacilliform দণ্ডাকৃতি
bacteria ব্যাক্টিরিয়া
basefibre তলতন্তু, পুচ্ছতন্তু
base plate তলচাকতি, তলদেশ
base sequence ক্ষারবিন্যাস
base spike তলকণ্টক, তলকাঁটা
basidiocarp ছত্রাকফল
basidiomycetes বেসিডিওমাইসিটস
basidiospore বেসিডিওস্পোর
basidium বেসিডিয়াম
bending আনতি
benthic zone বেনথিক জোন
beverage গাঁজানো পানীয়
bifid দ্বিবিভাজী
binary fission দ্বিবিভাজন
biogas জৈবগ্যাস
biplicity দ্বিত্ব
blight ঝলসানো রোগ
blue-green algae নীল-সবুজ শৈবাল
budding কলিস্ফুটি, মুকুলিত
bud-off কুঁড়ি ঝড়া
bursting বিস্ফোরণ মুক্তি

**c**

capsid ক্যাপসিড
capsomere ক্যাপসোমিয়ার
capsule ক্যাপসুল

cassava কাসাভা
catabolic অপচিতিমূলক
catalysis অনুঘটন
cellular বহুকোষী
cell wall কোষপ্রাচীর
centriole সেন্ট্রিওল
centromere সেন্ট্রোমিয়ার
charge আধান
cheese পনীর
chemolithotroph কেমোলিথোট্রফ
chemoorganotroph
 কেমোঅর্গানোট্রফ
chemostat কেমোস্টাট
chemotherapy রোগ নিরাময়
chiasmata কিয়াসমাটা
chitin কাইটিন
chlamydospore ক্লামাইডোস্পোর,
 স্ফীতস্পোর
chromatids ক্রোমাটিড
chromosome ক্রোমোসম, বংশসূত্র
chytridiomycetes চিট্রিডিওমাই-
 সিটস
cilia পক্ষ, রোঁয়া
ciliate পক্ষল
cistron সিসট্রন
clamp connection জোড়সেতু,
 ছত্রাক সূত্র-সেতু
class শ্রেণী
classification শ্রেণীবিন্যাস
adansonian অ্যাডানসনীয়
classical পরিচিত
hierarchial ক্রমোচ্চ
molecular অণুভিত্তিক
monothetic বিশেষ বৈশিষ্ট্য
 নির্ভর
numerical সংখ্যাভিত্তিক
phage typing ফাজ সচেতনতা
 ভিত্তিক
polythetic বহু বৈশিষ্ট্য নির্ভর
serotaxonomy রক্তরসভিত্তিক
clay ক্লেকণা
cleistothecium ক্লিস্টোথেসিয়াম
coarse sand মোটাবালি
coat খোলস
code সংকেত
coenocytic বহুকেন্দ্রযুক্ত
collar মূলদেশ, কলার
colloid কলয়েড
colony কলোনী
commensalism সহ অবস্থান, এক
 তরফা সাহচর্য
community বৃহৎগোষ্ঠী, জীবাণুগোষ্ঠী
compatibility যৌনমিল
compatible মিলনক্ষম
competetion প্রতিযোগিতা
complementary পরিপূরক
composition সংযুতি
compost কম্পোস্ট

condensor কনডেনসর
conidia কনিডিয়া
conjugate division যুগ্মবিভাজন
conjugation যৌনমিলন
conservative রক্ষণশীল
consistent অটল
contact সংসর্গ
contagius abortion সংক্রামক গর্ভপাত
contaminant দূষক
contamination দূষণ
contractileability সংকোচন ক্ষমতা
copulation মিলন
core অন্তর্বস্তু, কেন্দ্রাংশ
cork কর্ক
cosmic ray মহাজাগতিক রশ্মি
cream নবনী
cross সংকরণ
crush strength পেষণ বিরোধী শক্তি
cryptobiosis অক্রিয় জীবন
crystal কেলাস
cultivation আবাদ
culture আবাদ
curd দই
curl কোঁকড়ানো
curing শুষ্ক জরান
cuticle ত্বক
cyst সিস্ট
cytoplasm কোষরস
cytoplasmic granule কোষদানা
cytostome মুখবিবর

**d**

damping off ধসারোগ
decapsidation ক্যাপসিডমুক্তি
decline শুকানো
decomposition বিয়োজন
defective বিকলাঙ্গ
degenerate অস্থায়ী
deletion অপনোদন
density ঘনত্ব
density gradient ক্রমঘনত্বে অপকেন্দ্রিক centrifuge ঘূর্ণায়ন
dessication শুকানো
deuteromycetes ডিউটেরোমাইসিটস
diabetes বহুমূত্র
diabolic ডায়াবলিক
diarrhea দাস্ত রোগ
diatom ডায়াটম
diauxic দুই শীর্ষযুক্ত
differentials স্বতন্ত্রীকারক
differentiation পৃথগীভবন
diffusion ব্যপন, পরিব্যপন
dikaryon যুগ্মকেন্দ্র

dikaryotic ডাইক্যারিওটিক
dikinensis ডাইকাইনেনসিস
dioecious একলিঙ্গযুক্ত
diploid পূর্ণাবস্থা, ডিপ্লয়েড
diplotene ডিপ্লোটীন
disinfectant সংক্রমণনাশী
dispersal বিস্তার
disposal বন্দবস্তকরণ, অপসারণ
distal দূরতম
distribution বিস্তার
diversity বৈসাদৃশ্য
division বিভাগ
dominant প্রকট
donor দাতা
dormancy সুপ্তি, অবচেতনা
double helix দ্বি-আবর্ত
double stranded দুই সূত্রযুক্ত
dough মাখা
downy mildew তুলোরোগ
driving force চালক বল
droplet ফোঁটা
dysentry আমাশয়

## e

eclipse অবলুপ্তি, গ্রহণ
ecology বাস্তুসংস্থান
ecosystem বাস্তুপ্রক্রিয়া
electrophoresis বৈদ্যুতিক পৃথগী-করণ
elliptical উপবৃত্তাকার
encystment সিস্ট তৈরী, বেষ্টন প্রক্রিয়া
endergonic উষ্ণতাপোষক
endospore এণ্ডোস্পোর, অন্তঃস্পোর
endproduct উৎপাদিত অণু
enteric আন্ত্রিক
entity সত্তা
entropy এনট্রপি
envelop বহিরাবরণ
environment পরিবেশ
enzyme উৎসেচক
epiphyte উপরিজীবী, এপিফাইট
episome এপিসোম
equator টাকুমধ্যবর্তী অঞ্চল
equilibrium স্থিতাবস্থা, ভারসাম্য
eucarpic ইউকার্পিক
eucaryote সম্পূর্ণকেন্দ্রযুক্ত, ইউক্যারিওট
euglenophyta ইউগ্লিনোফাইটা
eutrophication ইউট্রফিকেশন
evolution বিবর্তন
excreted রেচিত
exergonic উষ্ণতাবিকিরক
exotoxin নির্গতবিষ
extrachromosomal বংশসূত্রবহির্ভূত
eye spot নয়ন ছাপ

f

fagocytosis গলাধঃকরণ
ফ্যাগোসাইটোসিস
falcate অর্ধচন্দ্রাকৃতি
family পরিবার
fascicle পুচ্ছপম
fat globule মেদবটীকা
feed back পশ্চাদজোগান
fermentation গাঁজান, ফার্মেন্টেশন
fertile সক্ষম
fertilise নিষেক ক্রিয়া
fertilisation নিষিক্তকরণ
" tube সংযোগ নালিকা
F-factor এফ-ফ্যাকটর, যৌননিমিত্ত
fibre সূক্ষ্মতন্তু
filamentous সূত্রাকৃতি
fine structure সূক্ষ্মগঠন
fire-cure আগুনশুকানো
fission বিভাজন, বিভক্তি
fixation আবদ্ধকরণ
flagella শুঙ্গ
flagellin ফ্লাজেলিন
flagellate শুঙ্গল
flagellation শুঙ্গবিন্যাস
flexible নমনীয়
fluidal তরলবৎ
food chain খাদ্যচক্র
foot and mouth এঁশো রোগ
form class শ্রেণীরমতগোষ্ঠী
fragmentation বিচ্ছিন্নকরণ
free energy মুক্তশক্তি
freezing হিমায়ন
fruiting body ছত্রাকফল,
ব্যাক্টিরিয়াফল
fructification ছত্রাকফল
fuel জ্বালানী
fumigation ধূমায়ন
fungus ছত্রাক
fusoid মূলাকৃতি

g

gall অর্বুদ
gamet গ্যামেট, যৌনকোষ
gametangia যৌনাঙ্গ, গ্যামেটাঞ্জিয়া
gene জীন, বংশাণু
generation পুরুষ
generation time বিভাজন সময়
genetic বংশগত
genetics বংশাণুতত্ত্ব, বংশাণুবিজ্ঞান
germicidal জীবাণুনাশক
germ theory স্বতঃজাত প্রকল্প
genome বংশবস্তু, জীনোম
genotypic বংশাণুগত
ghost অশরীরি
gliding পিছলানো, পিচ্ছিল
golgi apparatus গলগিযন্ত্র
gram negetive গ্রামঋণাত্মক
gram positive গ্রামধনাত্মক

gram reaction গ্রামবিক্রিয়া
gravel নুড়ি
growing point বিভাজন মুখ
growth ক্রমবৃদ্ধি
gum আঠা
gummosis আঠাগড়ানো রোগ

h

habitat বাসস্থান
hairy পালকাকৃতি
haploid অর্ধাবস্থাযুক্ত, হ্যাপলয়েড
haustoria শোষণসূত্র, হস্টোরিয়া
helical আবর্তাকার
helix আবর্ত
hepatitis কামলা
heptonema হেপ্টোনেমা
herbivorus শাকাসী
hermaphrodite উভলিঙ্গযুক্ত
Hertzian হার্টজীয়, বেতার তরঙ্গ
heterogametangia বিষমযৌনঅঙ্গ
heterogamete বিষমযৌনকোষ
heterokaryosis বহুকেন্দ্রীকতা
heterokont বিষমগুঙ্গযুক্ত
heterothallic বিষমসক্ষম
heterotroph পরভোজী, হেটারোট্রফ
holocarpic হলোকার্পিক
homeostasis স্থিতিশীলতা
homologue হোমোলোগ
homologous সমসংস্থিত
homothallic স্বসক্ষম
hook আঙটা
horizontal আনুভূমিক
host পোষক
hyaline রঙহীন
hydrophobia জলাতঙ্ক রোগ
hyperplasia কোষসংখ্যাবৃদ্ধি
hypertension উচ্চচাপ
hypha সূত্রাণু, হাইফা
hyphochytridiomycetes হাইফোচিট্রিডিওমাইসিটস
hypobiosis অক্রিয়তা
hypothesis উপাত্ত

i

icosahedral বিশতলী
immunity অনাক্রম্যতা
impact আঘাতশক্তি
inapparency অপ্রকাশ
individual প্রতিস্বিক
inducer প্ররোচক
induction প্রবৃত্তকরণ
inductive resonance আবেশক অনুরণন
inert অক্রিয়
infection সংক্রমণ
inheritance বংশধারা
injection ইনজেকশন

insoluble particles দানা
insulator অপরিবাহী
integrated সম্পূরিত
interference প্রতিবন্ধকতা
interferon ইনটারফেরন
interphase মধ্যবর্তীস্তর
invador হানাদার
invagination অর্ন্তমোড়ক
inversion উৎক্রমণ
ionised আয়নিত
isogamete সমযৌনকোষ
isogametangia সমযৌনাঙ্গ
isolation স্বতন্ত্রীকরণ
isometric সমমাপীতলযুক্ত

k

karyogamy ক্যারিওগ্যামি, কেন্দ্রমিলন
kingdom রাজ্য
kink ভাঁজ
knob উদ্‌গম

l

lagoon উপহ্রদ, ধাপা
lagphase অবিভাজনপর্ব
lamella ঝিল্লি
late blight নাবিধসারোগ
latency স্থায়ী অপ্রকাশ
latent period অবসরকাল
leaf curl পত্রকুঞ্চন
leaf roll পাতাপাকানো
legume শিম্ব
lens আতসকাঁচ
leprosy কুষ্ঠ
leptotene লেপ্টোটীন
lethal মৃত্যুদায়ী
lichen লাইকেন
limnetic লিমনেটিক
linkage লিংকেজ, বন্ধন
little leaf তুলসী লাগারোগ
littoral লিট্টোরাল
lobed লতিযুক্ত
localised স্থানিক
locomotion চলন
log phase গুণোত্তরপর্ব
lomasomes লোমাসম
lophotrichus বহুশুণ্ডী
loop ফাঁস, বিকল্প
luminescence আলোকদীপ্তি
lymph লসিকা
" node লসিকাগ্রন্থি
lysis বিনাশ, ধ্বংস
lysogenic সহনশীল
lysozyme লাইসোজাইম
lytic বিনাশকারী
" cycle বিনাশচক্র

m

macromolecules বৃহদাণু

malformation অপগঠন, বিকৃত মুকুল
malignant অসুস্থ
masking অস্থায়ী, অপ্রকাশ
mass ভর
mastitis স্তনপ্রদাহ
matrix মাট্রিক্স, ধারকমশলা
measles হামরোগ
medium খাদ্যমাধ্যম
meiosis অর্ধবিভাজন, মায়োসিস
mellow সুপক্ব
membrane ঝিল্লি
merozite মেরোজাইট
merozygote মেরোজাইগোট
mesosome মেসোসম
messenger সংবাদবাহক
metabolic জৈবনিক
metabolisation শারীরবৃত্তন
metaphase বিন্যাসস্তর
microaerophil স্বল্পবায়ুনির্ভর
microcyst মাইক্রোসিস্ট
microfibril সূক্ষ্মসূত্র
microscope অণুবীক্ষণযন্ত্র
" electron " , ইলেকট্রন
" phase contrast " ফেজ কনট্রাস্ট
mitochondria মাইটোকণ্ড্রিয়া
mitosis সমবিভাজন, মাইটোসিস
minerals খনিজ
mollicutes নমনীয় ব্যাক্টিরিয়া
molluscs মোলাস্কস
mosaic হলুদছোপ রোগ
monotrichous একতন্ত্রী
motile সচল
motility চলন
mucopeptide মিউকোপেপটাইড
mucosa শ্লেষ্মা
multicomponent বহু অংশযুক্ত
mutation পরিব্যক্তি
mutualism পরস্পর নির্ভরশীলতা
mycelium ছত্রাকসূত্র
" tertiary " কাঠামো গঠনকারি
mycetoma চর্মরোগ
mycetozoa মাইসেটোজোয়া
myxobacteria রজ্জুহীনকোমল ব্যাক্টিরিয়া
myxomycetes আঠাল ছত্রাক মিক্সোমাইটিস

n

naked cell উন্মুক্তকোষ
" ascus আধারহীন অ্যাসকস
native আদিম
necrosis শুকনোপচন
nematode নিমাটোড, কৃমি
neutral প্রশমিত
nitrification নাইট্রিফিকেশন
non overlapping অপ্রাবরণ

nucleoli নিউক্লিওলি
nuclear cycle কেন্দ্রচক্র
nucleus কেন্দ্র, নিউক্লিয়াস
nutty বাদামী (গন্ধ)

## O

obligate parasite দায়বদ্ধপরজীবি
" saprophyte " মৃতজীবী
oocyst উসিস্ট
oogonium স্ত্রীঅঙ্গ, উগোনিয়াম
oomycetes উমাইসিটস
oosphere স্ত্রীকোষ, উস্ফীয়ার
oospore উস্পোর
operator নিয়ন্ত্রক
operon অপেরণ
order বর্গ
organelle কোষঅঙ্গ
organicase জৈবক্ষার
organotroph জৈবখাদ্যনির্ভর
ornamentation অলংকরণ
osmosis আস্রাবণ, অভিস্রবণ
ostiole গলদেশ
oval উলম্ব
overlap অধিক্রমণ
oxidation জারণ

## P

pH অম্লক্ষারত্ব
paraflagellar শুঙ্গপরিবর্ত
paralysis পক্ষাঘাত
parasite পরজীবি
parenthosome লঘুবন্ধনী উপাঙ্গ
pasteurization পাস্তুরাইজেশন
patch তালি
pathway বিক্রিয়াপথ
pathogen রোগজীবাণু
penetration অনুপ্রবেশ
peptidoglycan পেপটিডোগ্লাইকান
perforated ছিদ্রাল
periferal প্রান্তস্থ
period পর্যায়
perithecium পেরিথেসিয়াম
peristome পার্শ্বস্থিত বিবর
peritrichous সর্বাঙ্গশুঙ্গী
permeable ভেদ্য
phage ফাজ
phagocytosis গলাধকরণ ফ্যাগোসাইটোসিস
phenotypic বৈশিষ্ট্যগত
phore বোঁটা, বৃন্ত
phosphorylation ফসফোরাইলেশন
photobacteria সালোক সংশ্লেষক ব্যাক্টিরিয়া
photolithotroph ফোটোলিথোট্রফ
photoorganotroph ফোটো-অর্গানোট্রফ
photosynthesis সালোকসংশ্লেষণ
phylum পর্ব

physiology শারীরবৃত্ত
pigment রঙ্গক, রঞ্জকপদার্থ
pili পিলি
pine cone মোচাকৃতি
pinocytosis পিনোসাইটোসিস
pioneer পথপ্রদর্শক
plantae প্লান্টী
plum আলুবোখরা
plasma membrane প্লাসমাআস্তরণ
plasmid প্লাসমিড
plasmodium প্লাসমোডিয়াম
plasmogamy কোষবস্তুমিলন
plastic প্লাস্টিক
plastid প্লাস্টিড
polar মেরুজ
polycytosis বৃহৎকোষসৃষ্টি
polyglucan পলিগ্লুকান
polyhedral বহুতলী
polypeptide পলিপেপটাইড
polyribosome রাইবোসমমালা
polysome পলিসোম
population প্রজন
porridge পরিজ
postulates সর্তাবলী
potential বিভব
powdery mildew সাদাগুঁড়ারোগ
precursor পূর্ববর্তী অণু
predation লুণ্ঠনজীবিতা
primer প্রাথমিক ছাঁচ
progeny বংশধরকোষ
projection অভিক্ষিপ্তঅঙ্গ
prokaryote অসম্পূর্ণকেন্দ্রযুক্ত, প্রোকারিওটা
prophage প্রোফাজ, সহঅবস্থানকারী
prophase প্রাথমিকস্তর
prophylaxis রোগসৃষ্টিপ্রতিরোধ
prostheca বহিরঙ্গ
protection সংরক্ষণ
protein প্রোটিন
protista প্রোটিস্টা, জীবাণুজগৎ
protocooperation পারস্পরিক সাহচর্য
protoplast কোষবস্তু
prototroph প্রোটোট্রফ
protozoa প্রোটোজোয়া, আদিম প্রাণী
pseudomycelium নকলছত্রাকসূত্র
putrefaction পচন
pycnidium পিকনিডিয়াম, কনিডিয়াকলস

**r**

rabies জলাতঙ্ক
radioactive তেজস্ক্রিয়
radiation flux বিকিরণপ্রবাহ
rancidity দুর্গন্ধ
random অস্থির
reassortment পুনর্বিন্যাস

recepient গ্রহীতা
receptor গ্রাহক
recessive অপ্রকট
receptive hyphae গ্রহীতাসূত্রাণু
reciproal পরিপূরক
recombination নবজোটবন্ধন
reduction বিজারণ
refractile বিচ্ছুরণকারী
regeneration পুনঃসজীবভবন
regulatory measure আইনগত পদ্ধতি
regulator নিয়ন্ত্রক
rennet দম্বল
replication সংখ্যাবৃদ্ধি
repression সংযতকরণ
reproduction জনন
residue অবশিষ্ট, অন্তপদার্থ
resin রজন
resonance অনুরণন
respiration শ্বসন
responsive প্রতিবেদনশীল
resting body জিরান অঙ্গ
" spore " স্পোর
" stage নিবৃত্ত অবস্থা
retting পচান (পাট)
rhizoid মূলোপম
rhizomorph ছত্রাকরজ্জু, রাইজোমরফ
ribosome রাইবোসম
rickettsia রিকেটসিয়া, কোমল ব্যাক্টিরিয়া
rigor-mortis মরণ-সংকোচন
rind খোলস
ripening পাকানো
rod দণ্ড
rotting পচন
rung ধাপ
rust মর্চেরোগ

S

salinity লবণাক্ততা
sanitary measures পরিচ্ছন্নতা
saprophyte মৃতজীবি
satellite উপগ্রহানুপম
satellitism উপগ্রহপম নির্ভরশীলতা
saturated সম্পৃক্ত
scale আঁশ
schizogamy বহুবিভাজন
sclerotium ছত্রাকগুটী,স্কেলেরোসিয়াম
secondary feeder গৌণবিয়োজক
secretory রেচক
sediment অবক্ষেপ, তলানি
segregation স্বতন্ত্রীভবন
selection সঞ্চয়ন
self compatible আন্তঃমিলনক্ষম
semiconservative অর্ধরক্ষণশীল
septate কামরাযুক্ত
septum দেওয়াল

septicimia রক্তে বিষক্রিয়া
sequence পর্যায়ক্রম, ছন্দ
serology সেরোলজী
serum রক্তরস
set দফা
sewage ময়লা, বর্জপদার্থ
sex cells যৌনকোষ
sexduction সেকসডাকসান
sex organ যৌনঅঙ্গ
sexual compatibility যৌনমিল
sexuality যৌনতা
sheath চর্ম, খোলস
sheathed চর্মাবৃত
shell খোলস
shunt বিকল্প
silage সাইলেজ
silkworm রেশমগুটী
silt পলি
slime আঠালপদার্থ
slime mould আঠাল ছত্রাক
smallpox বসন্ত
smoking ধোঁয়ান
smooth মসৃণ
soil crumbs মৃত্তিকাদানা
solute দ্রবঅণু
somatogamy জায়মানঅঙ্গ মিলন
spatial স্থানিক
species প্রজাতি
specific নির্দিষ্ট
spermation স্পার্মাসিয়া
spermatization স্পার্মাটিজেশন
spherical বর্তুলাকার
spindle বিভাজনটাকু
spirochete আবর্তাকার ব্যাক্টিরিয়া
spontaneous generation স্বতজাত
sporangium ধারকথলি
spore স্পোর
sporodochium কনিডিয়াকুশন
sporophore ধারকবৃন্ত
sporozoa স্পোরোজোয়া
stabiliser স্থিতিস্থাপক
staining রাঙানো
stalingphase জরাজীর্ণপর্ব
starch শ্বেতসার
starter সাজো
static বৃদ্ধিরোধক
stationary অপরিবর্তিত
sterigmata ছোটবৃন্ত
sterile নির্বীজ
stimulus উদ্দীপনা
strain বর্ণ
strand সূত্র
strangles শ্বাসকষ্ট
stroma ছত্রাকমাদুর
structure কাঠামো
submerged নিমজ্জিত (culture)
subpolar পার্শ্বস্থ
substitute পরিবর্ত

subunit উপকণা
sugarbeet চিনিবীট
surface পৃষ্ঠদেশ
surface layer বহিস্থপ্রলেপ
susceptible আক্রমণযোগ্য
suspension অবলম্বন
swarm cell সচলকোষ
swollen shoot শাখাস্ফীতি রোগ
symbiosis মিথোজীবিতা
symptom লক্ষণ
synapased সংযুক্ত
synergism জোটবদ্ধতা
synnemata সিনেমাটা
synthetic জ্ঞাতসংযুতি যুক্ত (মাধ্যম)
syntrophic সহভোক্তা
systemic সর্বাঙ্গবাহী

t

tadpole বেঙাচি
tail লাঙ্গুল, পুচ্ছ
taxonomy শ্রেণীবিন্যাস
teak সেগুন
temperate cycle সহাবস্থানচক্র
template ছাঁচ
tensile strength প্রসার্য শক্তি
tetanus ধনুষ্টঙ্কার
thallus থ্যালাস
theory প্রকল্প
therapy নিরাময়
thylakoid থাইলাকয়েড
toxin বিষ
transcription প্রতিলিপি সৃষ্টি
transition স্থানান্তরণ
transduction ট্রান্সডাকশন
transformation ট্রানসফরমেশন
translation সংকেতপঠন
translocation স্থানান্তরণ
transport chain পরিবহনধারা
transport process অনুপ্রবেশ প্রক্রিয়া
transversion তির্যক স্থানান্তরণ
triplet ত্রিবর্ণ
trophozite ট্রোফোজাইট
tuberculosis যক্ষা
tubular এককোষীসূত্র
tubules ক্ষুদ্রনালিকা
turbidostat টার্বিডোস্টাট
turn আবর্তন

u

udder পালান
undifferentiated অস্বতন্ত্রীভূত
unit membrane একক আস্তরণ
unstable অস্থায়ী

v

vaccine টিকা
vacuole শূন্যগর্ভ, ভাকিওল

variation প্রকারণ
varnishes বার্ণিশ
vector বাহকপোকা
vegetative জায়মান
vesicle কোস্কা
virion ভিরিয়ন
viroid ভাইরয়েড
virus ভাইরাস, জীবাণুকণা
virus, enveloped ভাইরাস, আবরিত
virus, helical ভাইরাস, আবর্তাকার
virus, icosahedral ভাইরাস, বিশতলী
virus, isometrie ভাইরাস, সমতলী
viscosity সান্দ্রতা
vitamine খাদ্যপ্রাণ
volutin ভলুটিন
vomiting বমন

W

walnut আখরোট
warty কুঞ্চিত
weathering ক্ষয়ীভবন
whiplash চাবুকাকৃতি
whorls আবর্ত
wilt ঢলেপড়া রোগ

X

x-ray এক্স-রে, রঞ্জনরশ্মি
x-ray diffraction রঞ্জনরশ্মি বিচ্ছুরণ

Y

yellow fever হলুদজ্বর
yoghurt ইওগোরট

Z

zoonoses জুনোসেস
zoospores সচলস্পোর, জুস্পোর
zygote জাইগোট, নিষিক্তডিম্ব
zygospore জাইগোস্পোর

## সাধারণ অনুক্রমণী

### ভ